লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে

এ টেল অব মিলিয়নস

রফিকুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে

এ টেল অব মিলিয়নস

রফিকুল ইসলাম

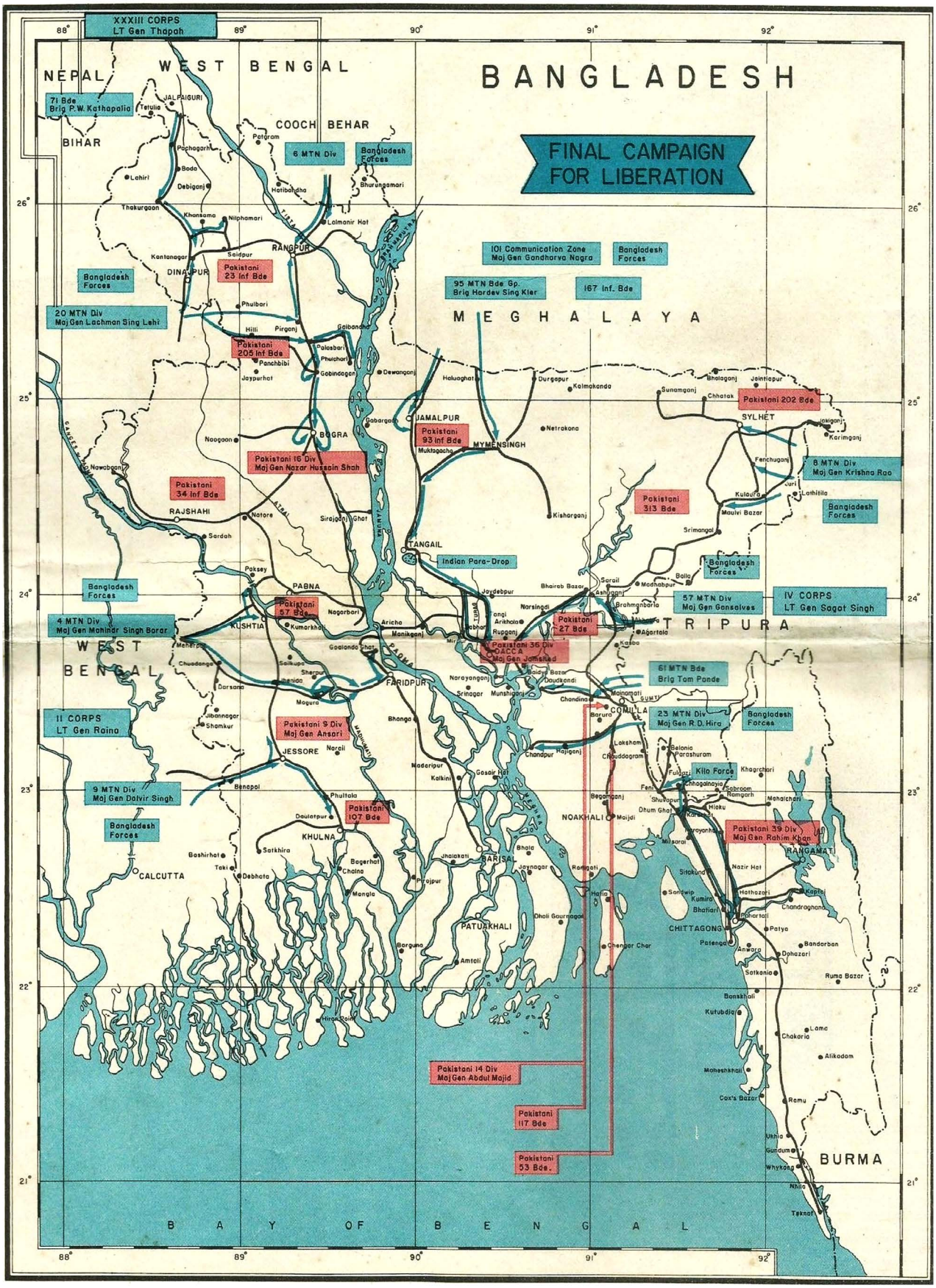
FINAL CAMPAIGN FOR LIBERATION
BANGLADESH
WEST BENGAL
NEPAL
BIHAR
MEGHALAYA
TRIPURA
BURMA
BAY OF BENGAL
XXXIII CORPS
LT Gen Thapan
71 Bde
Brig P.W. Kathapalia
6 MTN Div
Bangladesh Forces
101 Communication Zone
Maj Gen Gandharva Nagra
95 MTN Bde Gp.
Brig Hardev Sing Kler
167 Inf. Bde
20 MTN Div
Maj Gen Lachman Sing Lehl
Pakistani 23 Inf Bde
Pakistani 205 Inf Bde
Pakistani 16 Div
Maj Gen Nazar Hussain Shah
Pakistani 34 Inf Bde
Pakistani 93 Inf Bde
Pakistani 202 Bde
Pakistani 313 Bde
8 MTN Div
Maj Gen Krishna Rao
IV CORPS
LT Gen Sagat Singh
57 MTN Div
Maj Gen Gonsalves
Indian Para-Drop
4 MTN Div
Maj Gen Mahindr Singh Borar
Pakistani 57 Bde
Pakistani 27 Bde
Pakistani 36 Div
DACCA
Maj Gen Jamshed
61 MTN Bde
Brig Tom Pande
11 CORPS
LT Gen Raina
Pakistani 9 Div
Maj Gen Ansari
23 MTN Div
Maj Gen R.D. Hira
Kilo Force
9 MTN Div
Maj Gen Dalvir Singh
Pakistani 107 Bde
Pakistani 39 Div
Maj Gen Rahim Khan
Pakistani 14 Div
Maj Gen Abdul Majid
Pakistani 117 Bde
Pakistani 53 Bde.
SYLHET
MYMENSINGH
RAJSHAHI
KUSHTIA
PABNA
FARIDPUR
JESSORE
KHULNA
BARISAL
COMILLA
NOAKHALI
CHITTAGONG
RANGAMATI
CALCUTTA
JALPAIGURI
COOCH BEHAR
RANGPUR
DINAJPUR
BOGRA
JAMALPUR
TANGAIL
PATUAKHALI
Bangladesh Forces
Pakistani 313 Bde
Pakistani 202 Bde
Pakistani 34 Inf Bde
Pakistani 205 Inf Bde
Pakistani 23 Inf Bde
Pakistani 16 Div
Pakistani 93 Inf Bde
Pakistani 57 Bde
Pakistani 27 Bde
Pakistani 36 Div
Pakistani 9 Div
Pakistani 107 Bde
Pakistani 39 Div
Pakistani 14 Div
Pakistani 117 Bde
Pakistani 53 Bde.

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে

এ টেল অব মিলিয়নস

রফিকুল ইসলাম

৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

LAKHYA PRANER BINIMOYE
[Translated from 'A Tale of Millions']
Written by Rafiqul Islam B. U.

প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ১৯৮১
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬
প্রকাশক : রুবী ইসলাম
ছায়াপথ প্রকাশনী
ইসলাম চেম্বার (৭ তলা)
১২৫-এ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-২
স্বত্ত্ব : লেখক
অনুবাদ : ভুইয়া শাহাবুদ্দিন
অনুবাদ সম্পাদনা : সুকুমার বিশ্বাস, হামিদুর রহমান
প্রচ্ছদ দেবদাস চক্রবর্তী
মুদ্রণ : এ্যাবকো প্রেস লিঃ
৬।৭ আওলাদ হোসেন রোড
ঢাকা-১

মূল্য : একশত টাকা মাত্র

যে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে
বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত
তাঁদের অমর স্মৃতির প্রতি—

রীফকুল ইসলাম

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি সেই সব শহীদদের কথা যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। সহকর্মী এবং বন্ধু-বান্ধব যাঁরা যুদ্ধে বিভিন্নভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন এবং যাঁদের অবদান আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি তাদের কথাও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

সামরিক ও বেসামরিক চিকিৎসকগণ তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। সীমিত কর্মীবৃন্দ, অপ্রতুল ওষুধপত্র নিয়েই যুদ্ধের ভয়াবহতার সাথে পাল্লা দিয়ে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসার কাজ চালিয়ে গেছেন। স্কোয়াড্রনলীডার (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) শামসুল হক, মেজর (পরে কর্ণেল) খুরশীদ, মেজর (অবঃ) রেজা, মিঃ বড়ুয়া, ডাঃ গোফরান, ডাঃ মোস্তাফিজ এবং তাঁদের অধিনস্ত সকলেই আমাদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

বিমান বাহিনীর যাঁরা আমাদের সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন তাঁরা প্রমান করেছেন আকাশ যুদ্ধের ন্যায় স্থল যুদ্ধেও তাঁরা পারদর্শী। ফ্লাইট লেঃ (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল) সুলতান মাহমুদ এবং ফ্লাইং অফিসার (পরে উইং কমাণ্ডার (অবঃ)) সাখাওয়াত বিমান বাহিনীর সদস্য হয়েও স্থলযুদ্ধে পারদর্শিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ক্যাপ্টেন এনাম, ক্যাপ্টেন মাহফুজ, ক্যাপ্টেন মতিউর, লেঃ শওকত, লেঃ রকিব, লেঃ মনসুর, লেঃ ফজলুর রহমান এবং পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমী থেকে পালিয়ে আসা ক্যাডেট হামিদ এরা সবাই আমার অধীনে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এই বিরাট দায়িত্ব তাঁরা গভীর আত্মবিশ্বাসের সাথেই পালন করে প্রতিটি যুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে নেতৃত্ব দান করেছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রকৌশলী জনাব ইসহাক ও কৃতী ফুটবল খেলোয়াড় জনাব মারী যাঁরা কোয়ার্টার মাষ্টারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন—তাঁদের নামও উল্লেখ-যোগ্য।

যুদ্ধকালীন সময়ে আমি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক এবং ছাত্রদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। জনাব হান্নান (১নং সেক্টরের বেসামরিক ব্যাপারে সরকারী পরামর্শদাতা), ডাঃ আবু জাফর, মোশাররফ হোসেন,

মির্জা মনসুর, প্রফেসর নুরুল ইসলাম, ডাঃ মান্নান, ডাঃ ফয়েজ প্রমুখ এম. পি. এবং ব্যারিষ্টার আফছার সবাই মুক্তিযুদ্ধে এক নম্বর সেক্টরে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

রাঙামাটির তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার জনাব তৌফিক ইমাম যুদ্ধের প্রথম পর্যায় থেকেই বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম সেক্টরের যুদ্ধে তাঁর কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি।

অন্যান্য সেক্টরের মত আমাদের এলাকায়ও ভারতের জনগণ এবং বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। এ প্রসঙ্গে বিএসএফ-এর লেঃ কর্ণেল ঘোষ, মেজর প্রধান, ক্যাপ্টেন ঘোষ (ক্যাপ্টেন আলী ছদ্মনামে পরিচিত), সাবরুম পুলিশ স্টেশনের ও. সি. শ্রী মুখার্জী এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রী অনিল ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে আমি নিজে যা জানি অথবা অন্য সব যোদ্ধাদের সাথে আলোচনা করে নতুন যা কিছু জানতে পেরেছি তার ওপর ভিত্তি করেই আমি লিখেছি 'এ টেল অব মিলিয়নস' (লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে)। আমার নিজস্ব ডাইরী, আমার সেক্টরের যুদ্ধ সংক্রান্ত ডাইরী, যুদ্ধের সময়ের বিভিন্ন গেরিলা দলের রিপোর্ট—এ সব কিছুই এই গ্রন্থের তথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রায় সব সেক্টর কমাণ্ডার এবং অন্যান্য সামরিক অফিসারদের সাথে আলোচনা করেই এ সব সেক্টরের যুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ করি। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং অনেক মুক্তিযোদ্ধা এ ব্যাপারে আমাকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রথমে আমার লেখা চট্টগ্রামের দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা 'দি পিপলস ভিউ'তে ১৯৭২ সালে ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'দি পিপলস ভিউ'র সম্পাদক মরহুম জনাব নুরুল ইসলামের কাছে এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

বাংলা একাডেমীর শ্রী সুকুমার বিশ্বাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বেচ্ছায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভ্রম সংশোধন, টীকা, তথ্য নির্দেশনা গভীর অভিনিবেশ সহকারে সম্পাদন করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে অনুজপ্রতিম আবু ইউনুস ও আসাদুজ্জামান দিনরাত পরিশ্রম করেছেন।

এঁদের সবার কাছে আমি ঋণী।

ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬

—লেখক

ভূমিকা

মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে পারা এক বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের অনেককেই সে সুযোগ দিয়েছিলেন।

১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট ভারত উপ-মহাদেশ ভাগ হয়ে ভারত এবং পাকিস্তান এই দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের দুটি অংশ ভৌগোলিক দিক থেকে উপ-মহাদেশের দুই প্রান্তে অবস্থিত ছিলো। পূর্ব পাকিস্তানে ছিলো বাঙালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলো প্রধানত পাঞ্জাবী, সিন্ধী এবং পাঠান ভাষা-ভাষীদের প্রাধান্য।

পশ্চিম পাকিস্তানী আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য পাকিস্তান সেনা-বাহিনী ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ রাতে বাঙালীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উৎসুক পাঠক লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, ২৫শে মার্চ রাত সাড়ে আটটায় আমরা চট্টগ্রামে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছিলাম। এখানে প্রথম অংশগ্রহণকারী ছিলো চট্টগ্রামস্থিত বাঙালী ইপিআর বাহিনীর সৈন্যরা। এর দু'ঘণ্টা পর রাত সাড়ে দশটায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঙালী হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। চট্টগ্রামে পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক সফল অভিযানের সাথে এটা কোনক্রমেই সম্পর্কযুক্ত নয়। কারণ পাকিস্তানীরা এই গণহত্যার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলো ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে।

এবং এটাও লক্ষণীয় যে ২৫শে মার্চের রাত সাড়ে এগারোটায় সেনা-বাহিনীর কিছু বাঙালী অফিসার ও সৈনিককে পাকিস্তানীদের সংগে কাজ করতে হয়েছিলো। আল্লাহর অপার মহিমায় তাঁরা কেউ কেউ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পরবর্তীতে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিতে পেরেছিলেন।

তাই মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকায় বাঙালী সশস্ত্র ব্যক্তিদের কয়েকটি সুস্পষ্ট দলে ভাগ করা যায়।

স্বাধীনতার চেতনায় অনুপ্রাণিত এবং আক্রান্ত হবার আগেই পাকিস্তানীদের ওপর আক্রমণ করার মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি ছিল—এমন নিবেদিত ব্যক্তিগণ প্রথম পর্যায়ভুক্ত। তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রথম অবস্থাতেই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

দ্বিতীয় দলটিও স্বাধীনতার চেতনায় অনুপ্রাণিত ছিল। কিন্তু তাঁরা পাকিস্তানীদের প্রাথমিক আক্রমণের ব্যাপারে ততখানি সজাগ এবং প্রস্তুত ছিলেন না। তবুও যে মুহূর্তে এটা তাঁদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শুধুমাত্র তাঁদের চাকুরী নয়—তাঁদের জীবনও বিপন্ন—তখনই তাঁরা পাকিস্তানী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন।

আর যারা জীবনের ঝুঁকি নেয়াতো দূরের কথা, কর্মজীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে এমন পদক্ষেপ সম্পর্কেও বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল—তাদেরকে তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত করা যায়। তাদের কাছে স্বাধীন বাংলাদেশই বা কি—অবিচ্ছিন্ন পাকিস্তান-ই বা কি? ব্যক্তিগত কর্মজীবন ও নিজের ভবিষ্যৎই তাদের কাছে মূল বিবেচনার বিষয়। স্বাধীনতাকামী দল আর শত্রু পাকিস্তানী—দু'পক্ষের সাথেই এরা অত্যন্ত সুকৌশলে সমান সম্পর্ক বজায় রাখছিলেন, যাতে যে পক্ষই যুদ্ধে বিজয়ী হোক না কেন তাদের যেন কোন অসুবিধা না হয়। এই দলভুক্তরা মাত্র তখনই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয় যখন তারা বুঝতে পারে যে তাদের জীবনের ওপর কিছুটা হুমকীর সম্ভাবনা আছে। তাই স্বাধীনতা যুদ্ধে এই দল অবস্থার বিপাকে পড়েই অংশ গ্রহণ করে—স্বেচ্ছায় নয়।

চতুর্থ দলে রয়েছে অতি নগণ্য সংখ্যক কিছু ব্যক্তি যারা তাদের পাকিস্তানী প্রভুদের অনুগত দাস ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা তাদের কাছে অর্থহীন।

বেসামরিক জনসাধারণকেও কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমেই আসে স্বাধীনতা এবং বাংলার মানুষের ঘৃণিত শত্রুরা—সীমিত সংখ্যক রাজাকার, শান্তি কমিটির সদস্য, আল-বদর এবং আল-শামস্ যারা স্বেচ্ছায়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তে জড়িত এবং এদেশের বিরুদ্ধে শত্রু পাকিস্তানীদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। কিছু রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যদের অবশ্য অবস্থার চাপে অনিচ্ছায় কাজ করতে হয়। কিন্তু আল-বদর, আল-শামস্ স্বেচ্ছায় এবং অতুৎসাহী হয়েই এদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করে। পাকবাহিনীর সদস্যরা রাজাকারদের সাধারণত অশিক্ষিতদের মধ্য থেকেই বেছে নেয়। আল-বদর, আল-শামস্দের নেয়া হয় শিক্ষিতদের মধ্য থেকে। এরা পাকিস্তানীদের সাথে হাত মিলিয়ে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে। এমনকি এ দু'টি বাহিনী পাকিস্তানীদের যুদ্ধাপরাধে বিভিন্নভাবে সক্রিয় সহায়তা দান করে। এদের অপরাধ অমার্জনীয়। এই শিক্ষিতদের মধ্যে আরো কিছু সমানভাবে অপরাধী ব্যক্তি রয়েছে যারা দেশে বিদেশে বিভিন্নভাবে আমাদের স্বাধীনতার বিপক্ষে বক্তব্য রেখেছে।

এইসব 'কোলাবোরেটর' এবং আল-বদর ও আল-শামস্-এর সদস্যরা সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিরুদ্ধে যেসব জঘন্য অপরাধ করেছে সেসব অপরাধ পৃথিবীর

কোন দেশ ক্ষমা করেনি। কিন্তু অজ্ঞাত ও অগ্রহণযোগ্য কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাংলাদেশে নেয়া হয়নি। এমনকি এইসব শত্রুকে চিহ্নিত করার কোন বাস্তব পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়নি। অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ৪০ বছর পরেও মিত্রপক্ষের দেশ ও সরকারগণ এখনও সেইসব নাৎসী পার্টির সদস্যদের খুঁজে চলছে, যাঁরা মানব জাতির বিরুদ্ধে ঘৃণিত অপরাধে জড়িত ছিলো। সুষ্ঠুভাবে প্রণীত দলিলাদির ভিত্তিতে এইসব অপরাধীদের খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা তারা অব্যাহত রাখবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বাংলাদেশ সরকার এক পর্যায়ে যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা না করে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন করার চেষ্টা করেন। প্রকৃত অর্থে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীই ছিলো মুক্তিযোদ্ধা। তাই এ তালিকা প্রণয়ন বাস্তবধর্মী ছিলোনা। বরং মুক্তিযুদ্ধের শত্রুদের তালিকা প্রণয়ন ছিলো সহজসাধ্য, বাস্তবধর্মী। তাই আর কালক্ষেপন না করে আমাদের উচিত এই সব আল-বদর, আল-শামস, কোলাবোরেটর এবং রাজাকারদের তালিকা প্রণয়ন করা—যারা এদেশের মানুষের এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করেছে এবং বিভিন্ন ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধে জড়িত ছিলো।

বেসামরিক জনগোষ্ঠির যে এক কোটি নরনারী প্রাণ রক্ষার তাগিদে নিজ বাসভূমি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো, বস্তুত মুক্তিযুদ্ধে তাঁরা সরাসরি লিপ্ত হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতার প্রত্যাশায় তাঁরা যুদ্ধের দিনগুলো বিদেশের মাটিতে দুর্বিসহ দুঃখকষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করে। যুদ্ধের ন'মাস ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষ যদিও দুশ্চিন্তায় দিন কাটিয়েছে, তবু মৃত্যু-ভীতি তাদের খুব বেশি একটা উৎকণ্ঠিত করতে পারেনি।

পক্ষান্তরে যারা বাংলাদেশের মাটিতে পড়ে রইলো মরনপণ করে—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে গেলো, সর্বতোভাবে সহায়তা করলো সশস্ত্র সংগ্রামীদের—তাদের জন্য এই সুদীর্ঘ ন'মাস ছিলো মৃত্যুর বিভীষিকায় পূর্ণ। তাঁরা আমাদের গেরিলা বাহিনীদের আশ্রয় দিয়েছে, আহার জুগিয়েছে, চলার পথ দেখিয়েছে—গেরিলাদের সাজ সরঞ্জামের বোঝা বয়ে নিয়েছে মাইলের পর মাইল। পাকিস্তানীরা এদের ওপর নিয়েছে নির্মম প্রতিশোধ। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এদের বাড়ী-ঘর ধ্বংস করে দেয়, জ্বালিয়ে দেয় গ্রামের পর গ্রাম—হত্যা করে তাদের পরিবার পরিজনকে।

তাদের অবর্ণনীয় দুর্দশা, দুঃখ কষ্ট ছিলো এই বিয়োগান্ত মহানাটকের এক চিত্র। তার ওপর নেমে আসে আরো অসহনীয়, অমর্যাদাকর গভীর বেদনার আঘাত। প্রাণ রক্ষার জন্য যারা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলো তারা দেশে ফিরে এলো মুক্তিদাতার অহমিকা নিয়ে। যে সাড়ে ছ'কোটি মানুষ দেশের মাটিতে থেকে স্বাধীনতা

যুদ্ধে চূড়ান্ত অবদান রাখলো, করলো অচিন্তনীয় আত্মত্যাগ—তাদের সেই মহান ভূমিকাকে অবমূল্যায়নের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চললো। যে বৃহৎ জনগোষ্ঠির আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ব্যতীত এদেশের স্বাধীনতা অর্জন হয়তো কোনদিনই সম্ভব হতোনা—ভারত থেকে ফিরে আসা কিছু সংখ্যক পোষাকী মুক্তিযোদ্ধা সেই বৃহৎ জনগোষ্ঠির অবদানকে নির্লজ্জভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালালো। সকল তথ্যাদি সংগ্রহ না করেই তারা এদেশের আত্মত্যাগী জনগণকে কোন কোন ক্ষেত্রে দালালরূপে আখ্যায়িত করলো। লক্ষ কোটি মানুষের চরম আত্মত্যাগকে এমনিভাবে অপমানিত করার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

বেসামরিক ব্যক্তি যারা ভারতে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য যেতে পারেনি, অথচ নিজ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সাথে অথবা আলাদাভাবে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে—এদের অবদানকে বিশেষ প্রশিক্ষন প্রাপ্তদের অবদানের সাথে তুলনা শুধু কঠিন কাজই নয়, বরং নিষ্প্রয়োজনীয়। আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতিটি বাঙালী যারা দেশের অভ্যন্তরে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তহবিল ও খবরাখবর সংগ্রহ করেছে—আশ্রয় দিয়েছে এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের এক নিরাপদ ঘাঁটি থেকে আর এক ঘাঁটিতে পথ দেখিয়ে সতর্কভাবে নিয়ে গেছে, তাঁদের সুমহান অবদান পরিমাপ দুঃসাধ্য ব্যাপার।

পাকিস্তানী শত্রুবাহিনীর হাতে অত্যাচারিত হওয়া অথবা মৃত্যুর ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে যে অসংখ্য মা-বোনেরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়ে রেখে যত্ন করেছে, রান্নাকরে খাইয়েছে, রাতের পর রাত জেগে পাহারা দিয়েছে সুদীর্ঘ ন'মাস, তাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়। অথবা সেই অসংখ্য মা-বোন এবং আরো অনেকে যারা যুদ্ধ করতে পারেনি, যারা অসহায়, কিন্তু বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে আমাদের স্বাধীনতা এবং বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করে; তাঁরাওতো এই মহান বিজয়ে সাধ্যমত অবদান রেখে গেছেন।

এই বৃহৎ জনগোষ্ঠির অবদানকে ছোট করে দেখার চেষ্টা লজ্জাজনক, অমার্জনীয় এবং ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে নীতি বিরুদ্ধ। সাড়ে সাত কোটি মানুষের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কোনদিনই আসতে পারতোনা। এটাই সত্য।

পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালীদের অবস্থাও ছিল করুন। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তাদেরকে পরিবার পরিজনসহ বন্দী শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তানীরা এসব ক্যাম্পে বন্দী ও তাদের পরিজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে।

অনেকের ওপর পাকিস্তানীরা চালায় অচিন্তনীয় নির্যাতন। পাকিস্তানীদের কাছ থেকে গালি এবং অবমাননাকর উক্তি শোনা ছিলো বন্দী জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। বন্দী শিবিরে বাঙালীদের চিকিৎসার সব সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেয়া হয়। জিনিসপত্র বিশেষ করে স্বর্ণালঙ্কার পানির দামে বিক্রী করে দিতে বাঙালীদের বাধ্য করা হয়। সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে বন্দী শিবিরে বাঙালীরা লুকিয়ে, প্রহরীদের ঘুষ দিয়ে ঔষধপত্র, শিশুদের জন্য দুধ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস কিনে আনতো। এ ছাড়া বাঙালীদের কোন উপায়ই ছিলোনা। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে মুক্ত কোন দেশে যাওয়া বাঙালীদের জন্য ছিলো অসম্ভব ব্যাপার। তবু পালাবার চেষ্টা করেছিলো অনেকেই। কেউ পালাতে পেরেছিলো, কেউ বা ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিলো। সেখানেও তাদের ওপর চালানো হয় অবর্ণনীয় অত্যাচার। পাকিস্তানে বন্দী বাঙালীরা এমনিভাবে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়েছিলো। তাঁরাও চেয়েছিলো বাংলার স্বাধীনতা আর সেই স্বাধীনতার স্বপ্নে তারা নীরবে সহ্য করেছে সব অত্যাচার আর নিপীড়ন। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার কিছু সংখ্যক ব্যক্তি পাকিস্তান থেকে ফিরে আসা বাঙালীদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও বৈষম্যমূলক আচরণ করলো। সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থে এই অন্যায় আচরণ যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গঠনের কাজকে ব্যাহত করলো। যার ফলে সমাজ ও জাতি হয়ে পড়ে আরো দ্বিধাবিভক্ত।

স্বাধীনতার জন্য এদেশের মানুষ দীর্ঘ বাইশ বছর সংগ্রাম করেছে। সুদীর্ঘ ন'মাসের রক্তাক্ত যুদ্ধে হারিয়েছে ৩০ লক্ষ দেশপ্রেমিক বাঙালীকে। এখনও রাতের নিঃসঙ্গ নির্জনতায় এদেশের লক্ষ লক্ষ মা-বোনেরা সেই সব আপনজনের স্মরণে চোখের পানি ফেলে, যারা আমাদের স্বাধীনতা, সুখ আর শান্তির জন্য করে গেছে চরম আত্মত্যাগ।

এই যুদ্ধের একটা গৌরবময় অধ্যায় জুড়ে রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্ব মানব সমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন। আর এই সমর্থনের পেছনে রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের অমূল্য অবদান। পাকিস্তানীরা ধ্বংসযজ্ঞ আর গণহত্যার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিলো। সামান্য যা কিছু চিহ্ন তারা মুছে ফেলতে পারেনি তা থেকেই পৃথিবীর মানুষ এই গণহত্যার ভয়াবহতা এবং ব্যাপকতা কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেছিলো। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এইসব বিদেশী সাংবাদিক অত্যন্ত প্রতিকূল এবং বিপজ্জনক পরিবেশের মধ্যে গণহত্যার খবরাখবর সংগ্রহ করে বিশ্বের মানুষকে সে খবর পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁদের এই অবদান বাংলার মানুষ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে যুগ যুগ ধরে।

বারো

এ যুদ্ধের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিদেশী শিল্পীদের অবদান। ভারতের বিশিষ্ট সেতার বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও সরোদ বাদক ওস্তাদ আলী আকবর খান-এর নাম উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্যের জনপ্রিয় গায়ক জর্জ হ্যারিসন "বাংলা-দেশ কনসার্ট" নামে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান করেন। এই সঙ্গীতানুষ্ঠান পশ্চিমা জগতে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে ওঠে উল্লেখযোগ্য ভাবে। এমনি অবদান রেখেছিলেন আর একজন ইউরোপীয় গায়ক, জন বেইজ। ভারতের বিভিন্ন শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাও ছিলো উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি জনসমর্থন গড়ে তুলেছিলেন একনিষ্ঠভাবে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ফরাসী চিন্তাবিদ আঁদ্রে মালরো'র নাম উল্লেখযোগ্য। মুক্তি-কামী বাংলার মানুষের ওপর যে অত্যাচার, নিপীড়ন, হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছিলো তাতে তিনি এতই বিচলিত হয়ে পড়েন যে, সত্তুর বৎসরের আঁদ্রে মালরো পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন।

এই গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের সত্যনিষ্ঠ বাস্তব তথ্যচিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি এ গ্রন্থ পাঠে মুক্তিযুদ্ধের প্রচলিত কিছু অবাস্তব ও অসত্য কল্প-কাহিনী সম্পর্কে পাঠক এবং জনসাধারণ সঠিক ধারণা লাভ করবেন এবং এভাবেই একদিন মুক্তিযুদ্ধের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

প্রতিটি সেক্টরে যুদ্ধের প্রকৃতি এবং ধারা ছিলো অভিন্ন। তাই যে কোন এক সেক্টরের যুদ্ধের ধারা এবং সমস্যাবলীর বিবরণ থেকে অন্যান্য সেক্টরের যুদ্ধের গতি প্রকৃতি অনুধাবন অসম্ভব নয়।

মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে আমি গভীরভাবে সম্পৃক্ত, একাত্ম ছিলাম। তাই গ্রন্থের কোন কোন ক্ষেত্রে জীবন-চরিত বা আত্ম-কথার স্পর্শ বর্তমান।

গ্রন্থের কলেবরের জন্য অনেক বীরত্বপূর্ণ গাথাই উল্লেখ সভব হলো না। একই কারণে অনেক মুক্তিযোদ্ধার কথা, বিদেশী সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ—যাঁরা আমাদের যুদ্ধে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের কথাও আলাদাভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হলোনা বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬

রফিকুল ইসলাম

সূচী

১	প্রারম্ভ	১
২	গোপন সাংকেতিক বার্তা	৪
৩	শোষণ আর বঞ্চনার ইতিহাস	৯
৪	রাজনৈতিক বিস্ফোরণ	২৮
৫	এক নতুন ইতিহাসের জন্ম	৩৪
৬	পূর্ব-প্রস্তুতি	৫২
৭	চরম আঘাতের সেই রাত	৬২
৮	সশস্ত্র প্রতিরোধ	৮৬
৯	ঘেরাও	৯৫
১০	সরবরাহের অভাব	১০০
১১	চট্টগ্রাম শহরে চূড়ান্ত লড়াই	১০৩
১২	ভারতের সাথে যোগাযোগ	১০৭
১৩	কুষ্টিয়ার যুদ্ধ	১১৫
১৪	কুমিল্লা পরিকল্পনা	১২০
১৫	জয়দেবপুর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১২৫
১৬	প্রথম বাংলাদেশ সরকার	১৩২
১৭	যুদ্ধের বিস্তৃতি	১৪২
১৮	পশ্চিম ফ্রন্টে বিপর্যয়	১৪৭
১৯	প্রার্থনা	১৫০
২০	প্রান্তসীমায়	১৫৩
২১	রামগড় ভস্মীভূত	১৫৫
২২	শুভপুর সেতুর যুদ্ধ	১৬২
২৩	বেলুনিয়া থেকে পশ্চাদপসরণ	১৬৫
২৪	তিক্ত-অন্তর্দ্বন্দ্ব	১৬৯
২৫	বিলম্বিত কনফারেন্স	১৭৮
২৬	যুদ্ধের পরিবর্তিত গতি	১৯১

২৭	শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ভূমিকা	২০৫
২৮	সীমাহীন দুঃখের দেশ	২১২
২৯	অপারেশন জ্যাকপট	২২০
৩০	কোনঠাসা	২৩৩
৩১	গেরিলা যোদ্ধা	২৩৮
৩২	যুদ্ধের মুখোমুখি	২৪১
৩৩	হতবুদ্ধি ইয়াহিয়া	২৪৬
৩৪	অঘোষিত যুদ্ধ শুরু	২৫০
৩৫	যুদ্ধ পরিকল্পনা	২৫৫
৩৬	স্বাধীনতার চূড়ান্ত লড়াই	২৬৭
৩৭	পরিশেষ	৩০৫
	পরিশিষ্ট :	৩১১

ক. টীকা ও তথ্য-নির্দেশ

খ. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সামরিক অফিসারগণের নাম

গ. নির্ঘণ্ট

ঘ. ছবি এবং অন্যান্য দলিল পত্র

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র
Bangladesh Liberation War Library & Research Centre
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

বইয়ের মূল অংশে সামরিক ও গেরিলা তৎপরতার বিবরণ এবং রাজনৈতিক অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সশস্ত্র তৎপরতার বিবরণের বর্ণনা যেন জনগণের রাজনৈতিক বোধ ও মুখ্য ভূমিকা থেকে আমাদের দৃষ্টিকে সরিয়ে না নেয়। কেবল মাত্র সামরিক ও গেরিলা তৎপরতার আলোকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্মকথা অনুধাবন সম্ভব নয়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সুদীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক সংগ্রামই হলো স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সঠিক মূল্যায়ন ও পরিমাপ করতে হলে আমাদের লক্ষ কোটি মানুষের স্বাধীনতার চেতনার উৎসে যেতে হবে। অনুধাবন করতে হবে সেই সব মানুষের মুক্তির স্বপ্ন---যা যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় সযত্নে লালিত এবং বাহিত হয়ে চলেছে মহান বিজয়ের পথে—অবিস্মরণীয় ত্যাগ আর তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে।

যদিও সশস্ত্র সংগ্রাম স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি অংগ; সামগ্রিকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধ এত বিশাল, ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহ যে সকল স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু দেশের নয়, মানব ইতিহাসে চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়। তাই বইটি পড়ার সময় স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয়ঃ

'স্বাধীনতার যুদ্ধ কোন সামরিক অভিযান নয়–স্বাধীনতা যুদ্ধ জনগণের। জনগণের অংশ গ্রহণ ব্যতীত কোন বিজয় সূচিত হয় না। জনগণ ব্যতীত কোন স্বাধীনতা আসতে পারে না।'

১
প্রারম্ভ

লাখো মানুষের হৃদয়ে গাঁথা বিজয় আর বেদনার এ এক অবিস্মরণীয় কাহিনী। বঙ্গোপসাগরের উত্তরে সুন্দর ছোট্ট একটি দেশ। বহুদূর থেকে সমুদ্রের সন্ধানে এসে সে দেশের প্রান্তসীমায় যেন থেমে আছে ধ্যান-গম্ভীর হিমালয় পর্বতমালা। দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না বিজড়িত ছোট ছোট গ্রাম, সবুজ শ্যামলিমা, পাখির কলকাকলি, খাল-বিল, নদী-নালা আর সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের দেশ। সে দেশের উত্তরে পর্বতমালা আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে ভারতবর্ষ পূর্ব সীমান্তে এসে মিশে গেছে ব্রহ্মদেশের সীমানায়।

অথচ সুন্দর সম্ভাবনাময় সে দেশের মানুষের জীবনে সুখ ছিলো না। দু'শ বছর তারা ইংরেজ শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হলো। তারপর ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হলো, এলো পাকিস্তান। কিন্তু হাজার মাইলের ব্যবধানে পশ্চিম পাকিস্তান একই দেশের অংশ হলেও শোষণ চালালো এদেশে ইংরেজের মতই। এমনিভাবে অত্যাচারিত এবং শোষিত হয়ে এদেশের মানুষের মনে এক তীব্র বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে দিনের পর দিন। সে বিক্ষোভের আগুন জ্বলতে থাকে দু' দশকেরও বেশি সময় ধরে। তারপর একদিন সে বিক্ষোভ আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়লো।

নিষ্ঠুর হত্যা আর অত্যাচারের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের দীর্ঘকালের সঞ্চিত বিক্ষোভকে দমন করতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো এদেশের মানুষের ওপর। কিন্তু সেটা ছিলো তাদের অবাস্তব দুরভিলাষ, ইতিহাসের গতিকে রুদ্ধ করার এক ব্যর্থ প্রয়াস।

তারপর শুরু হলো এক ভয়াবহ যুদ্ধ। চিন্তাশীল প্রাণী হিসাবে মানুষের ব্যর্থতা এবং দেওলিয়াপনার প্রমাণ যদি যুদ্ধের মধ্যেই পাওয়া যায়, তাহলে এই যুদ্ধ ছিলো ঠিক তাই। কিন্তু তবু এখানে একটা বিরাট পার্থক্য ছিলো। মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, বিশ্বাসঘাতকতার এমন দুঃখজনক ঘটনার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। মানুষেরই সৃষ্ট ইতিহাসের এক অকল্পনীয় বিষাদময় গণহত্যায়

লক্ষ লক্ষ জীবনের সুখ-স্বপ্ন, জীবনের সব আলো মুহূর্তের ফুৎকারে নিভে গেলো এক অশুভ শক্তির নির্মম আক্রোশে।

কিন্তু সেই বিষাদময় ঘটনাই এই ইতিহাসের একমাত্র অংশ নয়। এই যুদ্ধ ছিলো মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রাম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানবাত্মার এবং শাশ্বত সত্যের চিরন্তন বিজয়ের বিস্ময়কর প্রতীক হিসাবে এ যুদ্ধ চিরউজ্জ্বল-চিরভাস্বর হয়ে থাকবে অনন্তকাল।

পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এই যুদ্ধের জন্য সমস্ত প্রস্তুতিই নিয়েছিলো অত্যন্ত সুস্থ মস্তিষ্কে। তাদের কাছে মানুষের জীবনের মূল্য ছিলো পরিসংখ্যানের রূপরেখার কিছু তত্ত্ব, তার বাইরে আর কিছুই নয়। সেই প্রস্তুতি ছিলো সব চাইতে ঘৃণ্য গণহত্যার জন্য এবং পরিণতি ছিলো পাকিস্তানের ধ্বংস আর এই ধ্বংসের সাথে এক তিক্ত ও রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ' নামে এক সম্ভাবনাময় নতুন রাষ্ট্রের জন্ম। সেই ভয়াবহ যুদ্ধে সভ্যতার বেদীমূলে বাংলার কত মানুষ যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তা আজ আর বলা সম্ভব নয়। হয়তো কেউ কোনদিন বলতে পারবেও না।

মানুষের এই চরম নির্যাতনের মুহূর্তে বৃহৎ শক্তির উদাসীনতা মানব-ইতিহাসে এক গ্লানিকর অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। সংগ্রামের সংকটজনক সেই মুহূর্তগুলোতে অনেক বৃহৎ শক্তি মানুষকে যেন বুঝাতে চাইলো—স্বাধীনতা কেবল কয়েকটি দেশের বিশেষ অধিকার মাত্র—ন্যায় বিচার দুর্বলের এক অসহায় কান্না, আর নৈতিকতা দূর অতীতের অর্থহীন জীবন-দর্শন।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, সমকালীন ঘটনাবলীকে ইতিহাসের ধাঁচে ঢেলে সাজানো যথেষ্ট কঠিন কাজ। আর সে কাজে ইতিহাসের প্রয়োজনীয় দলিল ও নথিপত্র যদি না থাকে তাহলে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো আরও সহজতর হয়। অনেকের ভূমিকাকে ছোট করার উদ্দেশ্যেই হোক, অথবা কোন ব্যক্তির ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করার উদ্দেশ্যেই হোক, সত্যের এই বিকৃতি মানব-ইতিহাসে নতুন কিছু নয়।

এ দেশের ইতিহাস সেই বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা নাও পেতে পারে। সত্যকে ইতিমধ্যেই অনেক বিকৃত করা হয়েছে। ঘটনার বর্ণনা এবং তার বিশ্লেষণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। তবুও সবশেষে সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, সত্যই বেঁচে থাকবে।

সেই মহান ইতিহাস রচনা এক দুরূহ পরিকল্পনা। কারণ, ইতিহাসের পরিধি বহুদূর ব্যপ্ত। তবুও সব বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে কোন একদিন কেউ সেই মহান ইতিহাস রচনায় সফল হবেন—এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

সেই ইতিহাসের গণ্ডি ছাড়িয়ে, এমনকি মানুষের অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্যের সীমানা ছাড়িয়েও জন্ম নিয়েছে সাহস আর আত্মত্যাগের কাহিনী। জন্ম নিয়েছে শাশ্বত সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গীকরণ আর দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির মৃত্যুঞ্জয়ী অনেক নতুন গাঁথা।

সেইসব কাহিনী, সেইসব গাঁথা যুগ যুগ ধরে বলা হবে আগামী দিনের মানুষকে—যেন কোনদিন ওরা অনুভব করে মধুর একটা শব্দ 'স্বাধীনতা'র জন্য কেন এত রক্ত দিতে হলো। অনাগত ভবিষ্যতের সেইসব মানুষের জন্যই মুক্তির বেদনাময় এই কাহিনী।

২
গোপন সাংকেতিক বার্তা

দিগন্তের শেষ প্রান্ত ছুঁয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে সূর্য ডুবে গেলে নেমে আসে রাত্রির অন্ধকার, আর এক অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। বাতাসে বারুদের গন্ধ, চারিদিকে গুজব, প্রতিটি মুহূর্ত চরম উত্তেজনায় ভরা এবং এক অজানা আশঙ্কায় আমরা উদগ্রীব। এমনি ছিলো ১৯৭১-এর ২৪শে মার্চের রাত।

শহরের মাঝখানে রেলওয়ের পাহাড়ে আমি একাকী এসে দাঁড়ালাম। রাত তখন ন'টা। পাহাড়ের উপরে এক দোতলা কাঠের বাংলো[১] থেকে আমি একটু আগেই টেলিফোনে দু'টি 'মেসেজ'[২] পাঠিয়েছি ইপিআর হেড-কোয়ার্টার হালিশহরে। আমার গোপন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দু'টো 'মেসেজ'ই ইপিআর অয়্যারলেসের মাধ্যমে উত্তরে শুভপুর থেকে দক্ষিণে টেকনাফ পর্যন্ত সব ইপিআর পোস্টে পাঠিয়ে দেয়া হবে। প্রথম 'মেসেজ'টি ছিলো "আমার জন্য কিছু কাঠের ব্যবস্থা করো" এবং এর সাথে সাথে আমার দ্বিতীয় 'মেসেজ'টি ছিলো "আমার জন্য কিছু কাঠ নিয়ে আস।"

দু'টো 'মেসেজ'ই পশ্চিম পাকিস্তানীদের সন্দেহ করার মত কিছুই ছিলো না। কিন্তু 'মেসেজ' দু'টো পাঠাবার পর আমি যখন একাকী মেঘমুক্ত রাতের আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালাম, তখন একটা অজানা আশঙ্কায় আমি মুহূর্তের জন্য বুঝি শিহরিত হয়ে উঠেছিলাম। এটা কি একটা বিদ্রোহের আবেগময় বহিঃপ্রকাশ মাত্র! আমি কি একটা অসম্ভব কিছু করার চেষ্টা করছি! যা অবশ্যম্ভাবী তা হতেই হবে, সেটা শুধু সময়ের ব্যাপার।

আমার চিন্তায় বাধা পড়ে। একটা বেবী ট্যাক্সি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠে আমার কাছে এসে থামলো। নেমে এলেন দু'জন বাঙালী সামরিক অফিসার —একজন লেঃ কর্ণেল এবং অপরজন মেজর। আমরা সেই বাংলোর সামনে একটা বিরাট জাম গাছের নিচে গিয়ে বসলাম।

"তোমার এখন এ ধরনের কিছু করা উচিত নয়" অত্যন্ত চাপাস্বরে লেঃ কর্ণেল আমাকে বললেন।

"কেন?" আমি জানতে চাইলাম।

"ওরা আমাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক কোন ব্যবস্থা নিতে সাহস পাবে না। বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে তারা এমন কিছু করতে পারে না।"

"কিন্তু তারা বিশ্বজনমতের ব্যাপারে কোন পরোয়াই করে না। তাছাড়া আমরা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁচেছি যে, আমরা আর কোনভাবেই ওদেরকে বিশ্বাস করতে পারি না।"

কিছুক্ষণ দু'জনেই নিশ্চুপ, গভীর চিন্তায় মগ্ন রইলেন। লেঃ কর্নেল একটা কাতায় ঝুলানো তাঁর আহত বাম হাতটি দেখছিলেন বার বার। মেজর একটা সিগারেট ধরালেন। পাশের কাঠের বাংলো থেকে কিছু চা এবং খাবার এলো। কিন্তু আমরা কিছুই খেতে পারলাম না। উৎকণ্ঠা আমাদের সমস্ত ক্ষুধাই যেন নষ্ট করে দিয়েছিলো।

"দেখ", লেঃ কর্ণেল আবার বললেন, "রাজনৈতিকভাবে আলোচনা চলছে এবং আমরা শুনতে পাচ্ছি কাল অথবা পরশুর মধ্যেই এ ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তি হতে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তুমি এমন কিছু করতে পারো না যা এই রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে।"

"মনে করুন আমি যদি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকি?"

"সেটা হবে বিদ্রোহ, বিপ্লব—তুমি যা-খুশি তাই একে বলতে পারো। তুমি যদি বিজয়ী হও ভাল কথা, কিন্তু তুমি যদি জয়লাভ করতে না পারো তাহলে তোমার ভাগ্যে কি আছে তুমি নিশ্চয়ই জান।"

"কিছুটা বিপদের ঝুঁকি তো আমাদের নিতেই হবে" আমি যুক্তি দেখালাম।

"আমাদের এখন সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করার সময় এসেছে, ওরা আমাদের আঘাত করার আগেই ওদেরকে আঘাত করতে হবে। এটা হতে হবে এখনই এবং এই মুহূর্তে। তা না হলে আর কোনদিনই পারবো না। আমরা যদি ওদের আগে আঘাত করতে ব্যর্থ হই, তাহলে ওরা আমাদের হত্যা করবে; ওরা এক ভয়াবহ গণহত্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।"

"অতখানি আশঙ্কা করার কিছু নেই, ওরা অমন চরম ব্যবস্থা নেবে না", মেজর বললেন।

"আমিও তাই মনে করি। তুমি তোমার লোকজনকে সংগ্রামে অবতীর্ণ করা থেকে এখন বিরত রাখ," লেঃ কর্ণেল বললেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি আবার সেই টেলিফোনে গেলাম। হালিশহরে ফোন করে ইপিআর সৈন্যদের আমার দ্বিতীয় 'মেসেজ'টি বাতিল করার জন্য নির্দেশ

দিলাম। আমার লোকজনকে বললাম, এই বাতিল আদেশ সাময়িক। তাছাড়া আমার প্রথম 'মেসেজ'টি বাতিল না করে অপরিবর্তিত রাখলাম।

"ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে এদের বিশ্বাস করে আপনারা কি ভুল করছেন না?" আমি আবার লেঃ কর্ণেল ও মেজরকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম, "ওরাতো আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।"

"তা সত্ত্বেও তুমি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে যে চরম ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিয়েছো, এমন একটা ব্যবস্থা নেয়া যায় না", লেঃ কর্ণেল বললেন।

"কিন্তু আমরা যদি একটু বুঝে-সুঝে এই ঝুঁকিটুকু না নিই, তাহলে হয়তো আমরা এর চেয়েও বিরাট এক বিপদ ডেকে আনবো"—আমি আবার তাঁদের বুঝাবার চেষ্টা করলাম, "তাদের মতলব সম্পর্কে আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কেন তারা বাঙালী বিগ্রেডিয়ার মজুমদারকে বদলিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী বিগ্রেডিয়ার আনসারীকে এনেছে, কেন তারা নির্বিচারে জেটিতে আমাদের বাঙালীদের হত্যা করছে, কেন 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র এবং গোলা-বারুদ নামাতেই হবে? শত্রু কোথায়? শত্রু কি আমরা নই? আপনারা কি মনে করেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রত্যেক রাতে বিমানে করে ওরা অন্য কিছু না এনে শুধু কমলা আর মাল্টা আনছে?" আমি কিছুটা বিদ্রুপের সুরেই কথাগুলো বললাম।

তারপর এক অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে কিছুটা সময় কাটলো। আমি প্রায় নিশ্চিত ভেবে নিয়েছিলাম যে, এদের সাথে আমার আলোচনা করা বৃথা। কারণ, সেনাবাহিনীর কঠিন শৃঙ্খলার নিগড়ে বাঁধা যে কোন অফিসারের পক্ষে সশস্ত্র বিপ্লব অচিন্তনীয় ব্যাপার—যদি না ঘটনার মারাত্মক অবনতি তাঁকে সেই ধরনের চরম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে। তাই এ দু'জন অফিসার আমাকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে আনতে চাইছিলেন। তাঁরা চিন্তা করেছিলেন তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই দু'জনেই আমার মতো একটা চরম ব্যবস্থা নেয়ার পক্ষে ছিলেন না; কারণ, এতে শুধু যে তাঁদের চাকুরী জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাই নয়, এমনকি তাঁদের প্রাণদণ্ডও হতে পারে। দুজন অফিসারই যথেষ্ট মেপে মেপে কাজ করতে চাইছিলেন।

লেঃ কর্ণেল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "রফিক, তুমি তো জান কি কারণে আমরা এতটা সতর্কতার সাথে চলতে চাচ্ছি। তুমি তোমার ইপিআর সৈন্যদের নিয়ে যেভাবে অস্ত্র ধারণ করতে চাইছো, তা শুধু তোমার একার জন্যই বিপজ্জনক নয়, বরঞ্চ বাঙালী অফিসারদের সেনাবাহিনীতে চাকুরীর ভবিষ্যতও সংকটময় করে তুলবে। ফলে তারা সবসময়ই সেনাবাহিনীর প্রতিটি বাঙালী

আওয়ামী লীগারকে সন্দেহের চোখে দেখবে। এ অবস্থায় শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আমরা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারি না। আর তুমি যদি একাকী যাও, তাহলে হয়তো তুমি কৃতকার্য নাও হতে পারো।"

"আমি বিজয়ী হবো। চট্টগ্রামে পাকিস্তানীদের সংখ্যা মাত্র শ' তিনেকের মতো হবে। আমার অধীনে ইপিআর-এ প্রায় পনের শ' বাঙালী সৈনিক আছে। এদের নিয়ে আমি বেশকিছু সময়ের জন্য চট্টগ্রাম দখল করে রাখতে পারবো। এই সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বন্ধু দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে পারবেন"—আমি তাঁদের পুনরায় বুঝাবার চেষ্টা করলাম।

"তা সত্ত্বেও তোমাকে সংযত হতে হবে। আমি আশাবাদী, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে" লেঃ কর্ণেল নিচু গলায় আমাকে বললেন।

"আমাদের অনুপস্থিতি সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে, চলুন আমরা যাই" মেজর কর্ণেলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

আমি শেষ প্রচেষ্টায় আবার বললাম, "আপনারা তাদের প্রথম আঘাত হানার সুযোগ দিচ্ছেন।"

"ভাবনার কিছু নেই, ওরা এমন কিছু করবে না।"

"সেটা ছাড়া আর অন্য কিছুই হতে পারে না। তারা চরম ব্যবস্থা নেবেই", আমি চাপাস্বরে কিছুটা আক্রোশে বলে উঠলাম, কিন্তু বেবী ট্যাক্সির ইঞ্জিনের আওয়াজে আমার সেই চাপা আক্রোশ ওঁরা হয়তো শুনতে পেলেন না। তীব্র অসন্তোষে আমি একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়লাম। "এখন থেকে আমি সম্পূর্ণ একা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার ইপিআর-এর সৈন্যদের সহায়তায় কিছু করে যাবো, জনগণ আমাদের সাথে নিশ্চয়ই সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন"—আমি স্বগতোক্তি করলাম।

তখনও রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে পোর্ট এলাকা থেকে গুলীর আওয়াজ আসছিলো। কিন্তু আমি পোর্ট এলাকা থেকে এতদূরে যে, বাঙালীদের মুমূর্ষু চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমি রেলওয়ে পাহাড় ছেড়ে চলে এলাম। রাত গভীর হয়ে এসেছে। আমার কানে তখনও বাজছে ওদের দু'জনার আশ্বাসবাণী, "তারা কোন চরম ব্যবস্থা নেবে না।"

"পৃথিবীতে এমন কোন জঘণ্য কাজ নেই যা এরা করতে পারে না" আমি আমার ডাইরীতে সেই রাতে লিখলাম, "এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে প্রথমে আঘাত না হানার জন্য আমাদের এই ব্যর্থতার দায়িত্ব ওরা কোনদিনই এড়াতে পারবে না।"

কি আশ্চর্য, তার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। সে ছিলো ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ-এর রাত। সেই দু'জন অফিসারের একজন লেঃ কর্ণেল এম. আর. চৌধুরীকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বন্দী করলো। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানীদের যে বিশ্বাস করেছিলেন ২০ বালুচ রেজিমেণ্টের সৈন্যরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে সেই বিশ্বাসের জবাব দিলো। অন্য একজন অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান রাত সাড়ে এগারোটায় যাচ্ছিলেন চট্টগ্রাম পোর্টে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নামিয়ে ক্যাণ্টনমেণ্টে আনার কাজে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাহায্য করার জন্যে। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংকের নিউমার্কেট শাখার ম্যানেজার জনাব কাদের আমার অনুরোধে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেণ্টের ডিউটি অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে আমার বিদ্রোহ ঘোষণা এবং সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার খবরটা জানালেন। তিনি তাঁদের আরও জানালেন যেন ৮ম বেঙ্গল রেজিমেণ্টের সবাই আমাদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান এই খবর পেয়েই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন জিয়াউর রহমানকে ফিরিয়ে আনতে, তিনি ততক্ষণে ষোলশহর ছেড়ে চট্টগ্রাম পোর্টের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।

৩

শোষণ আর বঞ্চনার ইতিহাস

বাঙালীরা একদিন নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারক ছিলো এবং আপন শ্রমের ফল নিজেরাই ভোগ করতো। কিন্তু সে কাহিনী এতো দূর অতীতের যে, এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব তারা প্রায় বিস্মৃত হতে বসেছিলো। কয়েক পুরুষ ধরে এই অঞ্চলের জনগণ ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসনে অবহেলিত এবং নিষ্পেষিত হলেও স্বাধীনতার স্বপ্ন তাদের মন থেকে কোনদিনই মুছে যায়নি। বহুবার তারা বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিবারের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় শাসক শ্রেণী হয়েছে রোষান্বিত এবং জনগণের জন্য এসেছে অধিকতর দুর্দশা।

পরিশেষে ১৯৪৭-এর আগষ্টে ভারত এবং পাকিস্তান এই দু'টি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করে ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করলো। বার শ' মাইল ভারতীয় ভূ-খণ্ডের দুই প্রান্তে পূর্ব এবং পশ্চিম অংশ নিয়ে গঠিত হলো পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানে ছিলো বাঙালীদের আধিপত্য আর পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবীদের। তবে উভয় অংশেই মুসলমানরা ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। একমাত্র ধর্ম ছাড়া দুই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে আর কোন মিল ছিলো না। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যতীত অনিশ্চিত এবং দুর্বল ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত দুই অংশের শিথিল বন্ধনযুক্ত এমন একটি রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে কিনা সে বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদগণ সন্দিহান ছিলেন। জনৈক চিন্তাবিদ এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"বাইরের চেহারায় শক্ত-সমর্থ দেখা গেলেও এর ভেতর রয়েছে·····কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি। পাকিস্তান একটি জাতি নয়, বড় জোর একটি রাষ্ট্র। এর অধিবাসীদের জাতিগত উদ্ভব, মুখের ভাষা, সভ্যতা কিংবা মানসিকতা—কোনদিক থেকেই এক জাতি গঠনের ঐতিহাসিক যুক্তি নেই। একমাত্র হিন্দুদের আধিপত্যের ভয় ছাড়া এদের আর কোন অভিন্ন স্বার্থ নেই। শুধু এই ভয় থেকেই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। রাজধানী করাচীসহ পশ্চিম

পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গ এই দুই অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে—যেমন গৃহযুদ্ধের পর লুইসিয়ানা এবং মেরিল্যাণ্ড বেটন রুজ-কে রাজধানী করে তাদের একটি নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। আসলে এর অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। পাকিস্তানের দুটি অংশ শুধু বার শ' মাইল ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা বিভক্তই নয়, এছাড়াও রয়েছে মানুষের মুখের ভাষা, জাতি-সভ্যতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। পূর্ববঙ্গের চেয়ে ইরান অথবা ইরাকের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে অধিক সাদৃশ্য থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানকে মধ্য-প্রাচ্যের অন্তর্গত মনে করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। পক্ষান্তরে, মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হিন্দু অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গের সাথে ভারতের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রভেদ খুবই কম এবং এ কারণে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার প্রতি পূর্ববঙ্গবাসীদের আকর্ষণও বেশী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রধান শ্রমিক সংগঠন একসময় কলকাতা থেকে পরিচালিত হতো। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি ভাষার যে কোন একটি ভাষায় কথা বলে এমন একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে বাংলা ভাষাভাষী পূর্ব-বঙ্গবাসীর সাথে আলাপ পরিচয় করা সম্ভব নয়। করাচীর কোন রাজনীতিবিদ পূর্ববঙ্গবাসীদের উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব ভাষায় বক্তৃতা করতে সক্ষম, এমন রাজনীতিবিদকে দুর্লভ রাজনৈতিক প্রতিভার অধিকারী বলতে হবে। অবশ্য পাকিস্তানের মতো অদ্ভূত রাষ্ট্রের স্রষ্টা জিন্নাহ এই বাস্তব সত্য কখনও স্বীকার করেননি। আজও করাচীর খুব কমসংখ্যক রাজনীতিকই এই সত্য স্বীকার করেন।

একমাত্র অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতৃত্বই সমাধান দিতে পারতো পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তার। সেধরনের বুদ্ধিদীপ্ত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি করাচীতে নেই। কাজেই, কোন অলৌকিক শক্তি কিংবা এ ধরনের অন্য কোনকিছু ব্যতীত ধর্মীয় গোঁড়ামির পুনরুজ্জীবন কিভাবে পাকিস্তানের ভবিষ্যতকে নিশ্চিত করবে তা ভাবা কষ্টকর।[৩]

পাকিস্তান সৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের মুক্তির কোন আশা দেখা গেলো না। তাই তাদের উল্লাসেরও কোন কারণ ছিলো না। হওয়ার মধ্যে শুধু প্রভু বদল হলো; আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে ঘৃণ্য ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার রক্ষক পরিবর্তন হলো মাত্র।

এই নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টির শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব বাঙলাকে শোষণ করতে থাকে। চাকুরী, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি—প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাকিস্তানীরা বাঙালীদের ওপর দমননীতি চালানো শুরু করে।

চাকুরী এবং রিক্রুটমেণ্টের ক্ষেত্রে যে বিরাট বৈষম্য তা নিচের সারণী থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৪]

	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস	৮৪%	১৬%
পররাষ্ট্র বিভাগের চাকুরী	৮৫%	১৫%
বিদেশী দূতাবাস প্রধান (সংখ্যা)	৬০	৯
সেনাবাহিনী	৯৫%	৫%
সামরিক অফিসার : জেনারেল পদমর্যাদা	১৬	১
নৌবাহিনী (টেকনিক্যাল)	৮১%	১৯%
নৌবাহিনী (নন-টেকনিক্যাল)	৯১%	৯%
বিমানবাহিনীর বৈমানিক	৮৯%	১১%
সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা	৫০০,০০০	২০,০০০
পাকিস্তান এয়ারলাইনসের সদস্য সংখ্যা	৭,০০০	২৮০
পি. আই. এ'র ডাইরেক্টর	৯	১
পি. আই. এ'র এরিয়া ম্যানেজারের সংখ্যা	৫	নাই
রেলওয়ে বোর্ডের ডাইরেক্টরের সংখ্যা	৭	১

সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে বৈষম্যও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে নিচের সারণী থেকে।

	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
জনসংখ্যা	৫ কোটি ৫০ লক্ষ	৭ কোটি ৫০ লক্ষ
ডাক্তারের সংখ্যা	১২,৪০০	৭,৬০০
হাসপাতালের বেড সংখ্যা	২৬,০০০	৬,০০০
গ্রামীণ চিকিৎসা কেন্দ্র	৩২৫	৮৮
পৌর সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র	৮১	৫২

সংস্কৃতি, মানসিকতা এবং বর্ণের ক্ষেত্রে এই দুই জনগোষ্ঠির মধ্যে পার্থক্য এতোই প্রকট এবং দুস্তর ছিলো যে, কোনক্রমেই খাপ খাওয়ানো সম্ভব ছিলো না। অবশ্য এই দুই জনগোষ্ঠির চিন্তাধারার পার্থক্য নিরসনে আন্তরিকভাবে তেমন চেষ্টাও কখনো করা হয়নি। যতই দিন যেতে লাগলো পশ্চিম পাকিস্তানী-দের বৈষম্যমূলক আচরণও ততই বাড়তে থাকলো। সম-অধিকার ও মর্যাদা

থেকে বঞ্চিত পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানীদের কলোনীতে পরিণত হলো। সশস্ত্র বাহিনী, অফিস, আদালত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সবকিছুই পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়ন্ত্রণে। শোষিত, বঞ্চিত পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে দেখা দিলো হতাশা ও ক্ষোভ। ক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠি ক্রমান্বয়ে ফুঁসে উঠতে লাগলো। ইতিহাসের গতিধারা হলো আরো বেগমান।

পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বাস, এ কারণে ঢাকাতেই পাকিস্তানের রাজধানী হওয়া উচিত ছিলো কিন্তু তা না হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে হলো রাজধানী। করাচীকে রাজধানী শহরে পরিণত করতে এর উন্নয়নকল্পে সেই সময় খরচ হলো ২০ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানকেও এর হিস্সা বহন করতে হলো। এর পর করাচীকে পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের হাতে তুলে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানেরই ইসলামাবাদকে আরেকটি নতুন রাজধানী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ব্যয় হলো আরও ২০ কোটি টাকা। নিয়মমাফিক পূর্ব পাকিস্তানকে এবারও এর হিস্সা বহন করতে হলো। বাঙালীদের শান্ত রাখার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার ঢাকায় দ্বিতীয় রাজধানী নির্মাণের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করলেন। এটা ছিলো নিছক লোক দেখানো ব্যাপার—কেননা, কেন্দ্রীয় সরকারের সকল দফতরই ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে। সামরিকবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, সামরিক একাডেমী, পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক, পাকিস্তান ইণ্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্স, ন্যাশন্যাল ব্যাংক, বীমা কোম্পানী সমূহ, ন্যাশন্যাল শিপিং কর্পোরেশন, পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন সংস্থা, সকল বিদেশী মিশন এবং অন্যান্য এজেন্সী—সবকিছুর সদর দফতরই পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলো।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই বৈষম্য ছিলো আরো প্রকট। এই বৈষম্য এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিলো যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের বিনিময়েও যেন পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়ন নিশ্চিত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের কাঁচামাল সরবরাহের বাজারে পরিণত হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, ১৯৬৭ সালে পশ্চিমাংশের লোকদের মাথাপিছু আয় পূর্বাঞ্চলীয়দের চাইতে ৩২% বেশী ছিলো। ১৯৭০-এ এই বৃদ্ধি ৬০%-এ দাঁড়ায়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি উপনিবেশসুলভ শোষণের মহিমায় দুই অংশের লোকদের আয়ের মধ্যে ব্যবধান ১০ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যায়। পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য চাউল আর পশ্চিম পাকিস্তানীদের গম। লক্ষণীয়ঃ পশ্চিম পাকিস্তানে এক মণ চাউলের বাজার দর ছিলো ২০ টাকা এবং পূর্বাঞ্চলে ৫০ টাকা। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি মণ গমের মূল্য ছিলো ১২ টাকা এবং পূর্বাঞ্চলে ৩৫ টাকা। এ থেকেই দেখা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানীদের মাথাপিছু আয় যখন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে তখনও

সেখানে প্রধান খাদ্যদ্রব্যের দাম তুলনামূলকভাবে কম রাখা হয়েছে। অন্যদিকে পূর্বাঞ্চলে মাথাপিছু আয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে অথচ প্রধান খাদ্যের দাম এখানে সব সময়ই বেশী থেকেছে।

পূর্বাঞ্চলকে পরিকল্পিত উপায়ে শোষণ করা হয়েছে। এই শোষণ চলেছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সম্পদ বণ্টনের মাধ্যমে—যার নিয়ন্ত্রক ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানীরা। বৈষম্যের তালিকা দিয়ে বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচিত হতে পারে, তবে সার কথা হচ্ছেঃ পূর্বাঞ্চলের প্রতি সুপরিকল্পিত উপায়ে শোষণের চিহ্ন এমন নগ্নভাবে ফুটে উঠেছিলো যে, এই এলাকার মানুষের পক্ষে আর বেশী দিন চুপ করে থাকা সম্ভব ছিলো না। বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আয় হতো পূর্বাঞ্চল থেকে (সমগ্র পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ৬০%-এর অধিক)। অথচ এখানে বৈদেশিক আমদানীর পরিমাণ রাখা হতো শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ। পূর্বাঞ্চল থেকে অর্জিত বৈদেশিক লেন-দেনের উদ্বৃত্ত অংশ পশ্চিম অংশের বৈদেশিক লেন-দেনের ঘাটতি পূরণে ব্যয় করা হতো। এ কারণে স্বাভাবিকভাবে পূর্ব থেকে পশ্চিমাঞ্চলে ক্রমাগত সম্পদ স্থানান্তরিত হয়। জনৈক কর্মকর্তার হিসাবমতে ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৮ এই ২০ বছরে প্রায় ২৬০০ কোটি টাকা এইভাবে পশ্চিমে পাচার হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানী ব্যয় নির্বাহের জন্য পূর্বাঞ্চলের বৈদেশিক বাণিজ্য আয়ের এই সুপরিকল্পিত স্থানান্তর পশ্চিমের শিল্পোন্নয়নকে দ্রুততর করে তোলে এবং তা করা হয় পূর্বাঞ্চলের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে। ইস্পাত, তৈল-শোধনাগার, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতির মতো শিল্প ও বৃহৎ প্রকল্পে মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলাকে একই ভাবে অবহেলা ও শোষণ করা হয়। এমনকি ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃষিখাতে পশ্চিমাঞ্চলের বরাদ্দ ছিলো পূর্বাঞ্চলের বরাদ্দের দ্বিগুণ। পরে এই ব্যবধান আরো বেড়ে যায়। ১৯৭০—এর ২০শে অক্টোবর প্রদত্ত শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা এবং ওই সময়ের আরও কয়েকটি বক্তৃতা-বিবৃতিতে এই অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেনঃ

"মাত্র ২৪টি পরিবার আজ জাতির সমগ্র শিল্প সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী অধিকার করে রেখেছে, ব্যাঙ্কিং সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমা সম্পদেরও শতকরা ৭৫ ভাগ তাদের দখলে। এইভাবে এদেশে এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক শোষণ চলেছে। গত ২০ বছরে সরকারের মোট রাজস্ব ব্যয়ের ১৫০০ কোটি টাকা (মোট পরিমাণের এক পঞ্চমাংশ মাত্র) পূর্ব বাঙলায় খরচ করা হয়েছে, আর পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে ৫০০০ কোটি টাকা।

একই সময়ে মোট উন্নয়নে ব্যয়ের মধ্যে ৩০০০ কোটি টাকা (অর্থাৎ মোট পরিমাণের এক তৃতীয়াংশ মাত্র) পূর্ব বাঙলায় খরচ হয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হয়েছে ৬০০০ কোটি টাকা। এই ২০ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে ১৩০০ কোটি টাকা। অথচ পশ্চিম পাকিস্তান এই সময়ে ৩০০০ কোটি টাকারও বেশি পণ্য আমদানী করেছে। পূর্ববঙ্গে আমদানীর জন্য যা খরচ হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে হয়েছে তার তিনগুণ। পশ্চিম পাকিস্তান মোট ২০০০ কোটি টাকা আমদানী খাতে ব্যয় করেছে। এই অর্থের পরিমাণ হচ্ছে তার নিজস্ব রফতানী আয়ের চেয়ে ৫০০ কোটি টাকা বেশি। এই অতিরিক্ত ৫০০ কোটি টাকা পূর্ব বাঙলার আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা এবং মোট প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের ৮০ শতাংশেরও বেশি অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়।

দীর্ঘ ২২ বছর পরও সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে একই ধরনের দুঃখজনক অবস্থা বিরাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে বাঙালীদের সংখ্যা ছিলো শতকরা ১৫ ভাগের কম এবং দেশরক্ষা সার্ভিসে ১০ ভাগেরও কম। এই ধরনের বৈষম্যের কারণে বাঙলার অর্থনীতি আজ ভেঙ্গে পড়েছে। অধিকাংশ গ্রামে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান। বুভুক্ষু মানুষকে বাঁচানোর জন্য প্রায় ১৫ লাখ টন চাউল আমদানী করতে হয়েছে—এদিকে মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে হু হু করে এবং এতে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাঙলার গরীব মানুষ। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশি। পূর্ব বাঙলায় এক মণ মোটা চাউলের মূল্য ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে ২০ থেকে ২৫ টাকা। পূর্ববাঙলায় এক মণ গমের দামও ২০ থেকে ২৫ টাকা অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে ১৫ থেকে ২০ টাকা। পূর্ব বাংলায় সরিষার তেলের সের ৫ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে আড়াই টাকা। করাচীতে একভরি সোনার দাম ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা আর ঢাকায় ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকা। এক দেশ হলেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলায় সোনা আনার ক্ষেত্রে শুল্ক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এইসব অবিচার ও বৈষম্য হচ্ছে গত ২২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনারই ফলাফল।[৫]

পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে এই অর্থনৈতিক শোষণই যেন যথেষ্ট ছিলো না। তাই বাঙালীদেরকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্যও তারা উঠে-পড়ে লাগলো। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। এছাড়া মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল

আলাম, জসীমউদ্দীন এবং জীবনানন্দ দাশের মতো কবি-সাহিত্যিকরা বাংলা ভাষার প্রাচীন ঐশ্বর্য ভাণ্ডারকে আরো নতুন নতুন সম্পদে ভরে তুলেছেন।

শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাঙালী সংস্কৃতি অবশ্যই পশ্চিম পাকিস্তানের মিশ্র সংস্কৃতির চাইতে উন্নততর ছিলো। বাঙালী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যধারার এই উৎকর্ষ পশ্চিম পাকিস্তানীরা সহ্য করতে পারেনি। নানা পন্থা উদ্ভাবন করে তারা বাঙালী সংস্কৃতির প্রাধান্য খর্ব করতে চেয়েছে। এ প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের এককালীন গভর্ণর মালিক ফিরোজ খান নুনের একটি ঘৃণ্য মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়, সুতরাং তারা প্রকৃত মুসলমান নয়।[৬] এই কথার জবাবে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান বলেছিলেন, "মুসলিম লীগের (পাঞ্জাবী নিয়ন্ত্রিত) নেতা মনে করেন যে, আমরা অধীনস্থ প্রজার জাত এবং তারা বিজয়ী রাজার জাত।[৭] প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব খানের লেখাতেও একই ধরনের মনোভাব লক্ষণীয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিলো, "ওদের মধ্যে নীচু জাতের দুর্বলতা তাই মানসিকভাবে ওদের পক্ষে নতুন পাওয়া স্বাধীনতার চাহিদার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।" পক্ষান্তরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রশস্তি গেয়েছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন সেই দলের। তাঁর ভাষায়, "অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে এতো বিপুল সংখ্যক জাতিসত্তার মিশ্রণ ঘটেছে যে, পৃথিবীতে এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। ভারত উপমহাদেশের প্রবেশদ্বারের নিকটে বলে বার বার আক্রমণ-কারীরা এ পথ দিয়ে আসা-যাওয়ার সময় প্রতিবারই তাদের কিছু না কিছু চিহ্ন রেখে গেছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর এই মিশ্র প্রতিক্রিয়া, ভাষাগত বিভিন্নতা থাকা সত্বেও এখানকার জনগণের ধ্যান-ধারণা, মানসিকতা ও সংস্কৃতিতে একটা মিলনাত্মক ভাব বিরাজমান।"[৮]

পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীদের জাতিসত্তা এবং সংস্কৃতির ওপর আঘাত করার ফলেই এঁরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। গণপরিষদে বাঙালী সদস্যদের বাংলায় বক্তৃতা করতে দেয়া হয়নি। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে বিরোধী দলীয় বাঙালী সদস্য শ্রী ধীরেন দত্ত এর প্রতিবাদ করেছিলেন।[৯] পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান ঘোষণা করেছিলেন "পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে অবশ্যই এর উপযুক্ত ইসলামী রাষ্ট্রভাষা থাকতে হবে। এবং সেই ভাষা হবে একমাত্র উর্দু।"[১০]

একটি জাতির জন্য একটিমাত্র ভাষার কথা বলে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ধূয়া তোলা হলো। ১৯৪৮-এর মার্চে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ এম. এ. জিন্নাহ ঢাকায় ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সেদিন অকুতোভয় বাঙালী ছাত্রসমাজ সাথে সাথে এ কথার প্রতিবাদ করেছিলেন আর সেই সাথে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হলো। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মর্যাদাদানের দাবিতে আন্দোলন ক্রমান্বয়ে প্রবলতর হয়ে উঠলো। পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার এই আন্দোলন দমন করার জন্য কোন চেষ্টা বাকি রাখেননি। তারা এমনকি এই ফতোয়াও দিলেন যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা অনৈসলামিক তো বটেই, রাষ্ট্রবিরোধীও। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে মুসলিম লীগের সদস্য ব্যতীত অন্যান্য বাঙালী রাজনৈতিক নেতা বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জোর দাবি জানালেন। সেইসাথে তাঁরা সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনে বাঙালীদের সমপ্রতিনিধিত্বের দাবি জানালেন। এইসব দাবির কথা শুনে ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ তারিখে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে এক বিবৃতিতে এই বলে শাসালেন যে, আমাদেরকে অবশ্যই এই প্রাদেশিকতাকে চিরদিনের জন্য খতম করতে হবে।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের দাবিতে ছাত্ররা ঢাকায় এক গণবিক্ষোভের আয়োজন করলেন। বাঙালীদের এই ন্যায় সঙ্গত দাবি দমনে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী অস্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করলো। বিক্ষোভ-কারীদের ওপর পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলী চালালো। এতে প্রায় ২০ জন নিহত ও ১০০ জন আহত হলো। শহীদের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হলো। কিন্তু আন্দোলন স্তব্ধ হলো না। আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়লো। বাঙালীরা পরিষ্কার বুঝতে পারলো যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাদের ওপর সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করতে বদ্ধপরিকর। ১৯৫২ সালের রক্তপাতের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়েছিলো, একথা সেদিন খুব কম লোকেই বুঝতে পেরেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পাকিস্তানের মাটিতে বাঙালী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটলো।

বাঙালীদের অব্যাহত আন্দোলনের মুখে ১৯৫৪ সালের ৭ই মে পাকিস্তান সরকার পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর দাবির কাছে নতি স্বীকার করলেন। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে ঐ দিন গণপরিষদে একটি প্রস্তাব পাস হলো। বিষয়টি পরে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হলো ১৯৫৬ সালে। বাঙালীদের ভাগ্য নির্ধারণী এই রাজনৈতিক টানাপোড়নের শুরুতেই পাকিস্তান

মুসলিম লীগের একটি অংশ বেরিয়ে এলে ১৯৪৯ সালের জুন মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে ভাষা আন্দোলন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো। বিশেষ করে নবীন বংশধরদের হৃদয়ে এর প্রভাব গভীরভাবে রেখাপাত করলো—যা থেকে ক্রমানুয়ে অঙ্কুরিত হয়ে উঠলো জাতীয়তাবাদী চেতনা।

১৯৫৪ সালের মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। বিরোধী দলগুলো এ. কে. ফজলুল হক, এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন করলেন। নির্বাচক মণ্ডলীর সামনে তাঁরা ২১ দফা কর্মসূচী নিয়ে হাজির হলেন। মূলতঃ এই কর্মসূচী ছিলো বাঙালীদের অধিকার এবং আশা-আকাঙ্খা পূরণেরই প্রতিশ্রুতি।

নির্বাচনে জনগণ বিপুল ভোটে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের পক্ষে রায় ঘোষণা করেন। ১৯৫৪ সালের ৩রা এপ্রিল জনাব এ. কে. ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়।

করাচীর কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের এই বিজয়কে মেনে নিতে পারলেন না। তাঁরা ২১ দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন প্রতিরোধে সংকল্পবদ্ধ হলেন।

কয়েকটি অসত্য রিপোর্টের ভিত্তিতে পাকিস্তান সরকার এ. কে. ফজলুল হককে দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করলেন। অভিযোগ করা হলো তিনি নাকি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছেন। জনাব ফজলুল হক প্রকাশ্যে এই অভিযোগ খণ্ডন করলেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর কথায় কানই দিলেন না। কেন্দ্রের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিলো বাঙালীপন্থী মন্ত্রিসভাকে কাজ না করতে দেয়া। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা সচিব ইসকান্দার মীর্জাকে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্ণর করে পাঠানো হলো। ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে তিনি আইনসভা ভেঙ্গে দিলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করলেন এবং প্রদেশে গভর্ণরের শাসন জারি করলেন। বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড় চললো। শেরে বাংলা ফজলুল হক সহ তাঁর মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্যকে গৃহবন্দী করে রাখা হলো। সংবাদপত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ (সেন্সরশীপ) আরোপ করা হলো। সভা-সমিতি বিক্ষোভ সব কিছু নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো, যুক্তফ্রন্টের অফিস দেয়া হলো তালাবদ্ধ করে। নির্যাতন ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার জন্য মিলিটারী ও পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া হলো। এই-ভাবে পাকিস্তান সরকার চক্রান্ত করে গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক পন্থায়

নিজেদের পছন্দমতো সরকার গঠন করার জন্য পূর্বাঞ্চলের গণমানসের ইচ্ছাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেয়া হলো।

পাকিস্তানের ইতিহাস রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের ইতিহাস। ১৯৫১ সালের অক্টোবরে এক সময়ের পাঞ্জাবী সিভিল সার্ভেন্ট গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হলেন। ১৯৫৩ সালের এপ্রিলে লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলীতে নিহত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের খাজা নাজিমুদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হলো। এরপর পার্লামেণ্টে জনাব নাজিমুদ্দীনের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা থাকা সত্ত্বেও গভর্ণর জেনারেল তাঁকে অনাবশ্যকভাবে বরখাস্ত করলেন এবং তাঁর স্থলে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী করলেন।

১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে গণপরিষদে গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা খর্ব করে কয়েকটি বিল পাস হবার কারণে অক্টোবরে গোলাম মোহাম্মদ ঐ পরিষদ ভেঙ্গে দিলেন। গণ-পরিষদের বিলুপ্তির পর কেন্দ্রে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হলো। প্রতিভাধরদের মন্ত্রিসভা (কেবিনেট অব টেলেণ্টেস) নামেই এই মন্ত্রি সভা খ্যাত। নতুন মন্ত্রিসভায় ইস্কান্দার মীর্জাকে অন্যতম মন্ত্রি হিসাবে নেওয়া হলো। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের ইতিহাসে এবারই প্রথম সামরিক বাহিনীর একজন জেনারেল আইয়ুব খানকে দেশরক্ষা মন্ত্রি হিসাবে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হলো। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর প্রধান মন্ত্রিত্বে নবগঠিত এই মন্ত্রিসভা ছিলো আসলে একটি পুতুল সরকার। কেননা এ সরকার শুধু গভর্ণর জেনারেলের নিকটই দায়ী ছিলো।

১৯৫৫ সালের আগষ্টে ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে গোলাম মোহাম্মদ অবসর নিলেন। ইস্কান্দার মীর্জা অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল হলেন। পরের মাসেই তিনি হলেন গভর্ণর জেনারেল। আগস্টেই বগুড়ার মোহাম্মদ আলী পদত্যাগ করলে পাঞ্জাবের আরেকজন সাবেক সিভিল সার্ভেণ্ট চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী হয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। আইয়ুব খান মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়লেন।

১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর স্থলে প্রধানমন্ত্রি হলেন এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী। এর ঠিক এক বছর পর ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে সোহ্‌রাওয়ার্দীকে বাদ দিয়ে সে জায়গায় আই. আই. চুন্দ্রীগড়কে বসানো হলো। চুন্দ্রীগড় ক্ষমতায় রইলেন মাত্র ৫৯ দিন। তাঁকে সরিয়ে ক্ষমতায় আনা হলো মালিক ফিরোজ খান নুনকে।

এদিকে ১৯৫৮ সালের ৩১শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর এ. কে. ফজলুল হক আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করলেন এবং এর কিছু পরেই ইস্কান্দার মীর্জা জনাব ফজলুল হককে বরখাস্ত করলেন।

আতাউর রহমানের জায়গায় এলেন আবু হোসেন সরকার। কিন্তু মাত্র ১২ ঘণ্টা পর আবু হোসেন সরকারকে বাদ দেওয়া হলো। ১৯৫৮ সালের জুনে আবার আবু হোসেন সরকারকে ক্ষমতাসীন করা হলো মাত্র ৪ দিনের জন্য। ক্ষমতায় রাখা-না-রাখার এইসব ত্বরিত ঘটনা ছিলো কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রেরই ফল।

পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছিলো ১৯৪৯ সালে। এ উদ্দেশ্যে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিলো। কয়েক দফা খসড়া রচনা ও সংশোধনের পর শেষ পর্যন্ত একটি শাসনতন্ত্র প্রণীতও হলো। কথা ছিলো ১৯৫৪-এর ২৫শে ডিসেম্বর এটি গৃহীত হবে। কিন্তু তার মাস তিনেক আগে অক্টোবরেই গোলাম মোহাম্মদ গণ-পরিষদ ভেঙ্গে দিলেন এবং শাসনতন্ত্র পাসের বিষয়টি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাক্সবন্দী হয়ে রইলো। অবশ্য এই শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীর সন্তুষ্ট হওয়ার মতো তেমন কিছু ছিলো না। কেন্দ্রের সব কিছুতে ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব ছিলো বাঙালীদের গণতান্ত্রিক অধিকার, কিন্তু উল্লিখিত খসড়া শাসনতন্ত্রে এবিষয়ে কোন নিশ্চয়তা ছিলো না।

এরপর ১৯৫৬-এর জানুয়ারিতে খসড়া শাসনতন্ত্রটি প্রকাশিত হলো। ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ বিতর্ক ও আলোচনাদি সম্পন্ন হলো এবং ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চে সে শাসনতন্ত্র জারি করা হলো। নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম প্রেসিডেণ্ট হলেন ইস্কান্দার মীর্জা। আগেই বলা হয়েছে, শাসনতন্ত্রে বাঙালীদের মৌলিক দাবী-দাওয়ার কোন নিশ্চয়তা ছিলো না। বৈষম্য দূরীকরণের তো কোন কথাই নেই। ১৯৫৫ সালে মারীতে এক বৈঠকে উভয় অঞ্চলের নেতাদের ঐক্যমত অনুযায়ী যে যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিলো তাও শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। দুই অংশের মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্যের কারণগুলো দূর করার জন্য নেতৃবৃন্দ এই বৈঠকে বসেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৯৫৬ সালে যখন পূর্ববঙ্গে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন ছিলো এবং কেন্দ্রে জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময়ে ন্যাপের জনাব মহিউদ্দীন আহমদ প্রথম প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব পেশ করেন।

নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন হওয়ার কথা ছিলো ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে কিন্তু তা আবার ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত মূলতবী হয়ে গেলো। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জা সারা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করলেন এবং জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। শাসনতন্ত্র বাতিল করা হলো। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে বরখাস্ত করে আইন পরিষদসমূহ ভেঙ্গে দেওয়া হলো। এইসব পদক্ষেপ অর্থাৎ নির্বাচন পিছিয়ে

দেওয়া, সামরিক আইন জারি করা ইত্যাদি সব কিছুই ছিলো বাঙালীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধাদানের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবী নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক চক্রান্তেরই অংশবিশেষ।

সেই সময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আওয়ামী লীগ যে একটা অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসাবে প্রাধান্য লাভ করতে পারতো এবং কেন্দ্র ও পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠনে এই দলের প্রাধান্য থাকতো, সে কথা ভালভাবেই বোঝা গিয়েছিলো। কাজেই শুধু বাঙালীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধাদানের জন্যই পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তান সরকার নামমাত্র অজুহাতে সামরিক আইন জারি করে নির্বাচন মুলতবী করে দিলো।

বিভিন্ন ছল-ছুতায় প্রায় সকল রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করে দিয়ে আইয়ুব তাঁর নিজের রাজনৈতিক দর্শন জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চাইলেন। প্রেসিডেন্টসিয়াল আদেশ, অধ্যাদেশ, সামরিক আইন বিধি ইত্যাদি নিবর্তনমূলক অনেক আইন তিনি চালু করলেন। রাজনৈতিকভাবে বিরোধী এবং তাঁর সাথে আপোষ-রফায় অনিচ্ছুক ব্যক্তিদেরকে নির্মুল করাই ছিলো এসব পদক্ষেপের উদ্দেশ্য। জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে বন্দী অথবা অযোগ্য ঘোষণা করা হলো এবং তাঁদের সকল প্রকার তৎপরতায় বিধিনিষেধ আরোপিত হলো।

সভা-সমিতি ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো। রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো। ১৯৫৮ সালে জারীকৃত সামরিক আইন অনির্দিষ্ট কালের জন্য অব্যাহত রাখায় সকলের মনে সন্দেহ এবং আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠলো। ১৯৬২ সাল নাগাদ অবশ্য রাজনৈতিক দৃশ্যপটের সব কিছুই শান্ত ছিলো। সেই সময় প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনীতিবিদ জনাব এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী গোপনে সামরিক আইনের অবসান ঘটিয়ে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা প্রত্যার্পনের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছিলেন। ফলস্বরূপ, ১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি আইয়ুবের নির্দেশে তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। এই গ্রেফতার আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে গতি সঞ্চার করলো। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ঢাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ধর্মঘটের আয়োজন করে। সেদিন পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের কয়েক দফা সংঘর্ষও ঘটলো। প্রতিবারই আন্দোলন দমাতে গিয়ে সরকার তার পশুশক্তি প্রয়োগ করেছে এবং প্রতিবারই ছাত্রসমাজ আরও দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে জোরদার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এভাবে একবার বিক্ষোভ কিংবা ধর্মঘট হলে তা পরবর্তী বিক্ষোভের পথ উন্মুক্ত করে দিতো এবং প্রতিবারই আন্দোলন হতো আরো সংগঠিত, আরো দুর্বার। এই

ছাত্র আন্দোলন একটা সামগ্রিক রাজনৈতিক রূপরেখায় পরিণতি লাভ করে সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়লো।

ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের মুখে ১৯৬২ সালের ১৯শে আগস্ট আইয়ুব খান জনাব সোহরাওয়ার্দীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। এবছরই আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব জনাব শরিফকে চেয়ারম্যান করে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করা হলো। রিপোর্টটিতে শুধু মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের জন্য উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ রাখা হয়েছিলো। এহেন অগণতান্ত্রিক শিক্ষা সংকোচন নীতি সম্বলিত রিপোর্টটিকে ছাত্ররা প্রত্যাখ্যান করলো। আসলে শিক্ষার সুযোগ থেকে বাঙালীদের বঞ্চিত করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। পাকিস্তানীরা মনে করেছিলো বাঙালীদের অশিক্ষিত রাখতে পারলে এদেশে উপনিবেশসুলভ শাসন অব্যাহত রেখে বাঙালীদেরকে চিরকালই শোষণ করা যাবে।

ছাত্রদের প্রবল বিরোধিতার ফলে রিপোর্টের সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধন করার জন্য সরকার জনাব হামুদুর রহমানকে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন ভাইচার্ম এবং পরে আইয়ুব খানের উপদেষ্টা) চেয়ারম্যান করে আরেকটি নতুন কমিশন গঠন করলেন। জনাব রহমান যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর কাজ শেষ করে সরকারের কাছে তাঁর সুপারিশ পেশ করলেন। কিন্তু ছাত্ররা সেসব সুপারিশও প্রত্যাখ্যান করলো এবং সারা বছরই আন্দোলন অব্যাহত রাখলো। ১৭ই সেপ্টেম্বরে সরকারের পুলিশ বাহিনীর সাথে ছাত্রদের গুরুতর সংঘর্ষ ঘটলো। ঢাকার রাজপথ বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা কার্যত যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নিলো। ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের লাঠি চার্জ, টিয়ার গ্যাস ও গুলী বর্ষণের ফলে বেশ কিছু লোক প্রাণ হারালো, আহত হলো অনেক।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের সব আন্দোলনেরই নেতৃত্ব দিয়েছিলো ছাত্রসমাজ এবং পরিশেষে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৬২ সালে ছাত্রসমাজ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে আরেকটি কাজ করেছিলো এবং তা হচ্ছে তারা এই আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতাদেরও ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছিলো। ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ৯ জন রাজনীতিবিদ ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ে সামরিক আইন তুলে নেয়ার ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে প্রথমবারের মতো একটি বিবৃতি দান করেন। বিবৃতিতে তাঁরা আইয়ুব খান আরোপিত অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র বাতিল করে নতুন গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবিও জানালেন।

গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য জি-হুজুর গোছের একজন বিশ্বস্ত লোকের খোঁজ করলেন। খোঁজ খবরের পর আবদুল মোনেম খানকে পাওয়া গেলো এবং তাঁকেই করা হলো পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর। মোনেম খানের প্রথম কাজ হলো আইয়ুব বিরোধী গণ আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য ছাত্রদের ঐক্যে কিভাবে ভাঙ্গন ধরানো যায় তার ব্যবস্থা করা। ফলশ্রুতিতে মোনেম খানের সঙ্গে এন. এস. এফ. (ন্যাশনাল স্টুডেণ্টস ফেডারেশন)-এর সরাসরি যোগাযোগ ঘটলো। ১৯৫৭ সালে গঠিত এই স্টুডেণ্টস ফেডারেশনকে ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি হওয়ার সময় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। এন. এস. এফ. মোনেম খানের আশীর্বাদে ১৯৬২ সালে পুনর্জীবন লাভ করলো।

মোনেম খান এন. এস. এফ-এর কুখ্যাত সদস্যদের বাছাই করে একটি অ্যাকশন গ্রুপ গঠন করলেন। মোনেম খানের পৃষ্ঠপোষকতা, আর্থিক সাহায্য দান এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তায় গ্রুপটিকে পূর্ব পাকিস্তানের সকল প্রকার জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হলো। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলো। ছাত্র নামধারী এই সব বাছাইকৃত সদস্যের জঘন্য ও অপরাধমূলক তৎপরতা এবং কুকর্মের ফলে সংগঠন হিসাবে এন. এস. এফ. হয়েছিলো কালিমালিপ্ত এবং ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসে সংযোজিত হয়েছে এক কলংকজনক অধ্যায়।

১৯৬৩ এবং ৬৪ সালে সারা বছরই রাজনৈতিক আন্দোলন অব্যাহত থাকে। পূর্বাঞ্চলের এই ঘনায়মান প্রতিরোধ আন্দোলন নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে আইয়ুব প্রশাসন এবং মোনেম খানকে দিয়ে গঠিত পূর্ব পাকিস্তানের পুতুল সরকার কত যে ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করেছে তার ইয়ত্তা নেই। ১৯৬৪ সালে ঢাকাসহ পূর্বাঞ্চলের কোন কোন এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। প্রশাসন-যন্ত্রের একটি অংশের দ্বারা আয়োজিত এই দাঙ্গার উদ্দেশ্য ছিলো পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু-বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলে আইয়ুব-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনকে দুর্বল করা। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, বাঙালী মুসলমানরা কিন্তু এই দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করেনি, বরং তারা সংখ্যালঘুদের জানমাল রক্ষা করার জন্য সর্বতোভাবে কাজ করেছিলো। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় অংশগ্রহণ না করার ফলে পাকিস্তান সরকারের চরেরা বাঙালী মুসল-মানদের পাকিস্তান বিরোধী বলে আখ্যায়িত করলো। নেপথ্যে থেকে পাকিস্তান সরকারের প্ররোচনায় বিপথগামী বিহারীরাই এই দাঙ্গা শুরু করে। পরবর্তীকালে পাকিস্তান সরকার দাঙ্গায় বিরোধিতা করার জন্য বাঙালী মুসলমানদের, বিশেষ

করে বুদ্ধিজীবীদের পেছনে এই সব বিহারীকে লেলিয়ে দেয়। এদের হাতে বিশিষ্ট বাঙালী বুদ্ধিজীবী আমীর হোসেন প্রাণ হারান। অবশ্য সমগ্র জনগোষ্টির প্রতিরোধের ফলে দাঙ্গা আর বিস্তার লাভ করতে পারেনি। স্বল্পকালের মধ্যেই তা থেমে গিয়েছিলো।

আইয়ুব খান এবং তাঁর বশংবদ মোনেম খানের বিরুদ্ধে বাঙালীদের ঘৃণা কতখানি তুঙ্গে ছিলো ১৯৬৪ সালের আরেকটি ঘটনায় তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোনেম খানের কাছ থেকে ছাত্ররা সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে অস্বীকার করে সমাবর্তন অনুষ্ঠান বয়কট করলো।

এই সময় আইয়ুব খান "মৌলিক গণতন্ত্র" নামে এক ধরনের নতুন গণতন্ত্রের প্রচলন করলেন। এই গণতন্ত্র দ্বারা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনসাধারণের পূর্ণ অংশ গ্রহণের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হলো। এই ব্যবস্থা রাজনীতি সচতেন বাঙালী-দের মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি।

১৯৬২ সালেই আইয়ুব খান দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সব দিক থেকে নিজের ক্ষমতা সংহত করার পরই তিনি এই পদক্ষেপ নেন। পাকিস্তানের ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যালটের মাধ্যমে যাতে তাঁর পক্ষে আস্থা প্রকাশ করতে পারে তার নিশ্চিত ব্যবস্থাও তিনি করলেন। ১৯৬২ সালের জুন মাসেই আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র চালু হয়ে গেলো।

জনগণের সার্বিক প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করাই ছিলো এই শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রেসিডেণ্ট সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন। তিনি যা খুশি তাই করতে পারবেন এবং এজন্য তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। ক্রমান্বয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, আজীবন পাকিস্তানের শাসক থাকার জন্যই আইয়ুব খান চেষ্টা করে চলেছেন এবং সেইভাবে তিনি ক্ষেত্রও প্রস্তুত করেছেন। এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধবাদীদের কিভাবে নিশ্চিহ্ন করতে হবে তিনি সে পদক্ষেপও ইতিমধ্যে নিয়ে ফেলেছেন।

আইয়ুবী নির্যাতনের প্রধান শিকার ছিলো পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ। বাঙালী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের ওপর নির্যাতনের মাত্রা ছিলো সর্বাধিক। আইয়ুব খানের দশ বছরের শাসনামলে প্রায় সময়ই শেখ মুজিবুর রহমানকে হয় জেলে থাকতে হয়, না হয় তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে দমিয়ে রাখা হয়।

আইয়ুব খানের আমলে পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়ন ঘটেছিলো সন্দেহ নেই। পূর্বাঞ্চলে যে সব শিল্পকারখানা স্থাপন করা হয় তার অধিকাংশেরই মালিক ছিলো

অবাঙালী। আসলে এই অঞ্চলকে পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত পণ্যের বাজারে পরিণত করা হয়েছিলো। পূর্বাঞ্চল বৈদেশিক মুদ্রা আয় থেকেও ছিলো বঞ্চিত। সবদিক থেকেই এখানে শোষণ চালানো হচ্ছিলো অব্যাহত গতিতে। আবার বাঙালী যখনই তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার কথা তুলেছে তখনই তাদেরকে দেশ-দ্রোহী, পাকিস্তানের শত্রু, ভারতের দালাল ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করা হয়েছে।

আইয়ুব খানের আমলে শিল্পোন্নয়ন এবং সাময়িক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সত্ত্বেও তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত থাকে এবং ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরে এটা আরও সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। অদূরদর্শী একজন একনায়কের কর্মফলে গোটা জাতিকে আকস্মিক এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হলো। শেষে তাসখন্দে গিয়ে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে আইয়ুব খানকে রক্ষা পেতে হয়।

পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্বাঞ্চলকে কার্যত সর্ব শক্তিমান স্রষ্টার করুণার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো। এ কারণে শেখ মুজিবুর রহমান দাবি জানালেন, পূর্ব পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। পূর্বাঞ্চলে একটি মাত্র পদাতিক ডিভিশন অবস্থান করছিলো। এটিও প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, গোলাবারুদ রসদপত্রে পূর্ণ শক্তিতে সজ্জিত ছিলো না। এখানে বিমান বাহিনী এবং নৌ-বাহিনীর কিছু ছিলো না বললেই চলে।

পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব শাসনের বিরোধিতার কারণ এবং প্রকৃতি ছিলো ভিন্নতরো। পশ্চিম পাকিস্তানে বিরোধিতার প্রাথমিক কারণ ছিলো মূলত ক্ষমতার লড়াই। আর পূর্বাঞ্চলে এর সূত্রপাত হয়েছিলো অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক নির্যাতন থেকে। জাতিগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আধি-পত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা বাঙালীদেরকে আরও বেশি করে ক্ষুব্ধ করে। আইয়ুব খান নিজেও বাঙালীদেরকে 'ওদের মধ্যে নিচু জাতের দুর্বলতা বিদ্যমান' বলে কটাক্ষ করতে দ্বিধা করেননি।

১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিখ্যাত ৬-দফা কর্মসূচী পেশ করেন। বাঙালীদের স্বাধিকার এবং দুই প্রদেশের মধ্যকার সমস্যাবলী সমাধানের আইনানুগ ও সাংবিধানিক পথনির্দেশ সম্বলিত ৬-দফা কর্মসূচীকে সকল স্তরের বাঙালী স্বাগত জানালো। এই কর্মসূচীর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত অব্যাহত সমর্থন দেখে আইয়ুব খান বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। ক্রোধোন্মত্ত আইয়ুব খান শেখ মুজিবসহ বিপুলসংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মীকে গ্রেফতার করলেন। এর প্রতিবাদে সারা

পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল আহূত হলো ১৯৬৬ সালের ৭ই জুনে। হরতালের দিন অন্ততঃ ১০ জন নিহত এবং বহুসংখ্যক আহত হলেন। আওয়ামী লীগের শত শত কর্মীকে গ্রেফতার করা হলো। সরকারের সকল প্রকার অত্যাচার-নির্যাতন সত্ত্বেও পূর্বাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন—তথা ৬-দফার আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলো। এই সময়ে সামরিক জান্তা সুদূরপ্রসারী একটি ষড়যন্ত্রের জাল বুনলেন।

১৯৬৮ সালের জানুয়ারীতে আইয়ুব সরকার ঘোষণা করলেন যে, ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার একটা চক্রান্ত উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং প্রতিরক্ষা সার্ভিসের কয়েকজন সদস্যসহ বেশ কিছু বাঙালী এর সাথে জড়িত। কয়েকদিন পর শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' নামে একটি জঘন্য মামলার কথা প্রকাশ করা হলো। শেখ মুজিবকে দমন এবং বাঙালীদের কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজিয়েছেন তা জনসাধারণের বুঝতে দেরি হলো না। সাজানো অভিযোগে অভিযুক্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের বিচার প্রহসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। ১৯৬৮-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে সামরিক বাহিনী ও পুলিশের হাতে অন্ততঃ এক শ' বাঙালী প্রাণ হারালেন, শত শত লোক আহত অথবা সামরিক বাহিনী বা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন। ঊনসত্তরের ফেব্রুয়ারীতে জনতার অপ্রতিরোধ্য দাবির মুখে আইয়ুব খান বাধ্য হলেন এই মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যকে শর্তহীনভাবে মুক্তি দিতে।

ইতিমধ্যে সারা পাকিস্তানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিও সোচ্চার হয়ে ওঠে। আইয়ুব খান তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে অব্যাহত বিক্ষোভের মুখে সংকট নিরসনের আশায় রাজনৈতিক নেতাদের এক সম্মেলন আহ্বান করলেন।

১৯৬৯ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারীতে গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। এ সময় শর্তহীনভাবে সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিব ছিলেন বাঙালীদের অবিসংবাদিত নেতা এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতীক। এই বৈঠকেও শেখ মুজিব তাঁর আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং এক ইউনিট ভেঙ্গে দেওয়ার দাবির কথা পুনর্ব্যক্ত করলেন। কিন্তু শেখ মুজিবের দাবিগুলো সম্পর্কে গোল টেবিল বৈঠকে ঐক্যমত হলো না।

এদিকে ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্বাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এতই তীব্র হয়ে উঠলো যে, আইয়ুব খান তা দমিয়ে রাখতে পারলেন না। ১৯৬৯-এর ২৫শে মার্চ হতাশা ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আইয়ুব খান প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া

খানের কাছে ক্ষমতা তুলে দিলেন। সাথে সাথে সারা দেশে আবার সামরিক আইন জারি হয়ে গেলো এবং রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো। মনে হলো, পাকিস্তান সেনাবাহিনী যেন দেশ শাসন করার ইজারা নিয়ে নিয়েছে।

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা লাভ করেই দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য নিরসনে যথাসাধ্য চেষ্টা চালানোর এবং এলাকা নির্বিশেষে পরিকল্পিত উন্নয়নের হিস্সা সমবণ্টনের ভিত্তিতে প্রতিটি পাকিস্তানীর কাছে পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন।

১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। অক্টোবরে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারন করা হলো। অবশ্য পরবর্তীতে তা ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়।

কিন্তু ইয়াহিয়া খানও তাঁর পূর্বসূরীদের মতো কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কোনভাবে আওয়ামী লীগ একবার ক্ষমতায় যেতে পারলে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীদের আর শোষণ করতে পারবে না। এতদ্সত্ত্বেও তিনি বাঙালীদের কেন যে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তখন বুঝা না গেলেও প্রথম থেকেই তিনি যে ছলনা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন তা পরে প্রমাণিত হলো। কোন অবস্থাতেই যাতে বাঙালীপন্থী কোন দল ক্ষমতায় আসতে না পারে সে ব্যাপারে তিনি সতর্ক থাকলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক দলগুলোরও পূর্ণ সমর্থন লাভ করলেন।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়ার আগে তিনি জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারে সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইলেন। জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কতখানি সম্ভাবনা রয়েছে তা নির্ণয়ের জন্যে সামরিক এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। গোপনে নির্দেশ বিশেষ করে অবাঙালী অফিসারদের কাছে পাঠানো হয়। বাঙালীদের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ এবং আওয়ামী লীগের প্রতি বিরূপ মনোভাবের কারণে সেই সকল অফিসার 'পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ৪০ শতাংশের বেশি আসন লাভের আশা করতে পারে না' বলে পক্ষপাতদুষ্ট রিপোর্ট প্রদান করেই আনন্দ বোধ করলেন। অবশ্য কিছুসংখ্যক বাঙালী অফিসারও আওয়ামী লীগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের চাকুরীতে পশ্চিম পাকিস্তানী উর্ধ্বতন অফিসারদের কাছ থেকে সুবিধা প্রাপ্তির আশায় অনুরূপ রিপোর্ট পাঠালেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর উপদেষ্টাদের কাছে এইসব রিপোর্ট ছিলো পরিতুষ্টির উৎস। তাঁরা মনে করতেন আওয়ামী লীগ ৫০ শতাংশ আসন

পেলেও বাকি ৫০ শতাংশকে প্রয়োজনবোধে হুমকি প্রদর্শন করে পশ্চিম পাকিস্তান পন্থী দলে যোগদান করানো অথবা সমর্থন জানাতে বাধ্য করা যাবে এবং এভাবেই জাতীয় দৃশ্যপটে পশ্চিমাঞ্চলের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন থাকবে।

কিন্তু ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল ইয়াহিয়া খানের সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে দিলো। সব রকমের বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দল পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনে জয়ী হলেন।

নির্বাচনের কিছু আগে ১২ই নভেম্বর ইতিহাসের এক প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগে পূর্ব পাকিস্তান বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস দশ লাখ বাঙালীর জীবন ছিনিয়ে নিলো, হাজার হাজার মানুষকে করলো আশ্রয়-হীন এবং শত শত মানুষ হলো সর্বস্বান্ত। এই বিরাট জাতীয় দুর্যোগে ইয়াহিয়া সরকারের ভূমিকা দুর্গত জনগণের প্রতি 'নিষ্ঠুর উদাসীনতাই প্রমাণ করলো। যে মুহূর্তে বিশ্বের সব দেশ দুঃস্থদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে এগিয়ে এলো, সে মুহূর্তে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বলতে গেলে কিছুই করা হলো না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পৃথিবীর সব দেশেই নৌবাহিনীর জাহাজ অন্যান্য জলযান, স্থলবাহিনী বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার, পরিবহন বিমান ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ইয়াহিয়া সরকার প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও ৩০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া দুর্গত মানুষ এবং মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য এর কোনটিই ব্যবহার করেননি। অথচ কয়েকটি বিদেশী বাণিজ্য জাহাজ বেশ কিছু ভাসমান লোককে উদ্ধার করে। আর পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে মৌখিক সান্ত্বনার বাণীটুকুও পাওয়া গেলো না। ইয়াহিয়া সরকার এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের এ দুঃখজনক ভূমিকার কথা যুগ যুগ ধরে বাঙালীরা স্মরণ রাখবে।

ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত দুর্গত এলাকা ঘুরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন। বিপুলসংখ্যক বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে সেই বিরাট সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান গুরুতর জাতীয় দুর্যোগকালে বাঙালীদের দুরবস্থার প্রতি পাকিস্তান সরকারের চরম উদাসীনতার বিবরণ তুলে ধরলেন। কঠোর সমালোচনায় উপায় না দেখে অবশেষে ঘটনার ১৩ দিন পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দুর্গত এলাকা সফর করলেন। সেদিন এটাই প্রমাণিত হয়েছিলো যে, বাঙালীদের দুঃখ-দুর্দশায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের কিছুই আসে যায় না। ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিলো বাঙালীদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের চরম অবজ্ঞা ও উদাসীনতার বিরুদ্ধে সেই রুদ্ররোষেরই বহিঃপ্রকাশ।

৪
রাজনৈতিক বিস্ফোরণ

পূর্ব পাকিস্তান ধীরে ধীরে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত কাটিয়ে উঠছিলো। বিপদের সময় বাঙালীদের প্রতি ইয়াহিয়া সরকারের ঔদাসীন্য বাঙালীদের মনে গভীর সন্দেহের উদ্রেক করলো। এতদসত্ত্বেও তারা স্বপ্ন দেখছিলো এক সুন্দর ভবিষ্যতের। এই প্রথম তারা নিজেদের পছন্দ করা একটি সরকার পেতে যাচ্ছিলো, এ ব্যাপারে আশংকাও ছিলো প্রচুর। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কি বাঙালীদের সরকার গঠন কিংবা সরকার পরিচালনা করতে দেবে? তারা কি ক্ষমতা হস্তান্তর বিলম্বিত কিংবা জনগণের রায়কে নস্যাৎ করার জন্য কোন অজুহাত খুঁজবে না?

১৯৭০-এর ১৯শে ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন, ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে এবং এ বিষয়ে কোন আপোষ নেই।[১২] পক্ষান্তরে পাকিস্তান পিপলস পার্টির জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ২০শে ডিসেম্বর ঘোষণা করলেন যে, তাঁর দলের মতামত ছাড়া কোন শাসনতন্ত্র তৈরী হতে পারবে না এবং এও বললেন যে, "জাতীয় রাজনীতির ব্যাপারে একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতাই সবকিছু নয়।[১৩] জনাব ভুট্টো যে ৬-দফা কর্মসূচীর বিরোধিতা করলেন এতে আর সন্দেহ রইলো না। তিনি ঘোষণা করলেন, "প্রয়োজনবোধে দুই পাকিস্তান এবং দুই প্রধানমন্ত্রীও হতে পারে"।

এরপর ২৭শে ডিসেম্বর জনাব ভুট্টো আবার হুমকি দিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাদের ইচ্ছামতো শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য চাপ দিলে তিনি সরে দাঁড়াবেন এবং সে ক্ষেত্রে সম্ভাব্য পরিণতির জন্য পিপলস পার্টি দায়ী থাকবে না।[১৪] সম্ভাব্য পরিণতি বলতে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসীর আশা-আকাংখার প্রতি ভুট্টোর এই ধরনের উক্তি ও হুমকির শক্তি এবং সাহসের উৎস কি তখন কেউ তা নির্ণয় করতে পারেননি। জনাব ভুট্টো কি তখন সেই ভয়াবহ পরিণতির জন্য সামরিক জান্তার সময় ও সুযোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে চলছিলেন? পাকিস্তানের প্রতারণাপূর্ণ ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনাবলী, পূর্বাঞ্চলে গণহত্যার

স্পষ্ট যে, সেনাবাহিনীর সাথে ভুট্টোর যোগসাজশের কথাই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে থাকিয়া কিংবা ভুট্টো দুজনের কেউই এর দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না।

প্রকৃত ১৯৭১-এর জানুয়ারী থেকেই গণহত্যার প্রস্তুতি শুরু হয়। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে সেনাবাহিনীর নবম এবং ষোড়শ ডিভিশনকে সদা প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এই দুটো ডিভিশন ছিলো সংরক্ষিত অভ্যন্তরীণকারী বাহিনী। বাঙালীদেরকে সন্দেহমুক্ত রেখে পূর্বাঞ্চলে সৈন্য সমাবেশকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটানো আবশ্যক ছিলো।

জানুয়ারীর মাঝামাঝির দিকে ইয়াহিয়া খান তাঁর কয়েকজন সিনিয়র স্টাফ অফিসার সমভিব্যহারে শেখ মুজিবের সংগে আলোচনার উদ্দেশ্যে ঢাকা সফর করলেন। ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মৌলিক ইস্যু থেকে আওয়ামী লীগ সরে যেতে পারবে না। তবু তারা এমন একটা ভাব দেখালেন যে, "রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের উদ্দেশ্যে সদিচ্ছাপূর্ণ আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।" চূড়ান্ত আঘাত হানার লক্ষ্যে পূর্বাঞ্চলে সৈন্য সমাবেশের জন্য এই ধরনের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যাদের সময় ক্ষেপণের প্রয়োজন ছিলো। ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করার সময় বললেন যে, আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে "পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী"[১৫] হিসাবে অভিহিত করতেও দ্বিধা করলেন না। মজার ব্যাপার যে, ঢাকা থেকে তিনি হাঁস শিকারের নাম করে সরাসরি ভুট্টোর লারকানাস্থ গৃহভবনে গিয়ে উঠলেন।[১৬] অন্যান্য জেনারেল ছাড়াও এখানে তিনি সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল হামিদ খান এবং তাঁর প্রধান স্টাফ অফিসার এসিস্টেন্ট চীফ অফ স্টাফ জেনারেল পীরজাদার সাথে মিলিত হলেন। লারকানায় তাঁরা সেদিন কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, কি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন হয়তো কোনদিনই সেসব কথা জানা যাবে না। কিন্তু হাঁস শিকারের নামে এই প্রতারণামূলক সফর থেকে ঘটনাপ্রবাহ ধীরে ধীরে উপমহাদেশের এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে গড়িয়ে চললো।

জানুয়ারীর শেষদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে আলোচনার জন্য ভুট্টো ঢাকা এলেন। ঢাকা অবস্থানকালে বাঙালী জাতিসত্তার সংগ্রামের প্রতীক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারেও তিনি পুষ্পস্তবক অর্পণ করলেন। এটা ছিলো তাঁর বাঙালী অনুভূতিকে কাজে লাগাবার একটি রাজনৈতিক চাল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো নিজের জন্য একটি বড় পদ বাগানো এবং ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের ইস্যু থেকে আওয়ামী লীগকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করা। ভুট্টোকে অবশ্য খালি হাতেই ফিরে যেতে হলো। সংখ্যালঘুর খামখেয়ালী দাবির কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠরা নতিস্বীকার

স্বীকার করে কি করে? এবার ভুট্টো চূড়ান্ত পদক্ষেপের দিকে এগুতে লাগলেন। শেষ চ্যালেঞ্জ প্রদানের আগে পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর সপক্ষে জনমত সৃষ্টির প্রয়োজন ছিলো। চমৎকার এক সুযোগও এসে গেলো তাঁর সামনে।

৩০শে জানুয়ারী ভারতের একটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই হয়। তথাকথিত "জম্মু ও কাশ্মীর মুক্তিফ্রন্টের" কয়েকজন সদস্য বিমানটি লাহোরে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে তা বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান এই ঘটনার নেপথ্যে প্রকৃত উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। তিনি একে শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অন্তরায় সৃষ্টির লক্ষ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট অবাঞ্ছিত ঘটনা বলে অভিহিত করলেন।[১৭] পক্ষান্তরে ভুট্টো এই ঘটনার প্রতি সমর্থন জানালেন এবং ছিনতাইকারীদের সকল প্রকার সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানীদের ভারতবিরোধী অনুভূতি কাজে লাগালেন এবং অনেকাংশে সফলও হলেন। ছিনতাইয়ের ঘটনাটি সামরিক জান্তারও কাজে লাগলো।

যাহোক, ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন, ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। এবং দু'দিন পর ১৫ই ফেব্রুয়ারী পেশোয়ারে ভুট্টো ঘোষণা করলেন, শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আওয়ামী লীগ তাঁর পার্টির মত গ্রহণ না করলে তাঁর দল পরিষদের অধিবেশন বর্জন করবে। ভুট্টো ভাল করেই জানতেন যে, ৬-দফার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নমনীয় হওয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং তিনি চরম অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য এই ইস্যুটিকেই বেছে নিলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভুট্টো এ পর্যন্ত হুমকি দিলেন যে, খাকী পোশাক অথবা সাদা পোশাকধারী যেই হোন না কেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেউ ঢাকা গেলে তিনি নিজ দায়িত্বেই যাবেন।[১৮]

এই ধরনের মন্তব্যের পরেও সেদিন খাকী পোশাকধারীরা কেন নিশ্চুপ ছিলেন তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে সিনিয়র আর্মি অফিসারগণ জাতীয় পরিষদের পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যরা যেন অধিবেশন বয়কট করেন তা বোঝানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

এদিকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান "ক্ষমতা হস্তান্তর বিলম্বিত করার ষড়যন্ত্র চলছে"[১৯] বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। অন্যান্য বাঙালী নেতাও একই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন।

এই সময় একটা গুজব রটে যে, যেহেতু জেনারেল হামিদ জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে ওয়াদাবদ্ধ নন কাজেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জেনারেল হামিদ

খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করছেন। আসলে এই ধরনের পদক্ষেপের কোন প্রয়োজনই ছিলো না, কারণ অচলাবস্থা সৃষ্টির ব্যাপারে ইয়াহিয়ার জন্য ভুট্টোই যথেষ্ট ছিলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভুট্টোর এক দীর্ঘ বৈঠক হয়। আলোচনা থেকে বেরিয়ে এসে ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেন, পিপলস পার্টির অংশ গ্রহণ ছাড়া প্রণীত কোন শাসনতন্ত্র তিনি চালু হতে দেবেন না।[২০]

এই সময় ভুট্টো অধিবেশন বয়কটের সমর্থনে তাঁর পার্টির পরিষদ সদস্যদের কাছ থেকে পদত্যাগ পত্র সংগ্রহ করতে থাকেন; যদিও যে আইন কাঠামো আদেশ (লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার) অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে নির্বাচিত সদস্যদের পরিষদে আসন গ্রহণের আগে পদত্যাগ করার সুযোগ ছিলো না। ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে সাহায্য করার জন্য আইন কাঠামো আদেশের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করে একটি সামরিক বিধি জারি করলেন।[২১]

এই সংশোধনী ঘোষণা করা হলো ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দিনের আলোচনার পরেই। ঘটনাপ্রবাহের কি আশ্চর্য মিল!

ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান হঠাৎ করে তাঁর বেসামরিক মন্ত্রিসভা বাতিল করে দিলেন। এরপর তিনি তাঁর গভর্ণরবৃন্দ এবং সামরিক আইন প্রশাসকদের নিয়ে গোপন বৈঠক করলেন।[২২] বেসামরিক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যাপারে ইয়াহিয়া খান সন্তোষজনক তেমন কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। হতবাক বাঙালীরা এসব ঘটনা সতর্কতার সাথে প্রত্যক্ষ করছিলো। যতই দিন যাচ্ছিলো তাদের মনে সন্দেহ ততই ঘনীভূত হচ্ছিলো।

২২শে ফেব্রুয়ারী সেনাবাহিনীর রাওয়ালপিণ্ডিস্থ সদর দফতরে সিনিয়র জেনারেলদের নিয়ে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন যার ফল বাঙালীদের জন্য তো বটেই পাকিস্তানের জন্যও মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনে।[২৩] সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ক্ষমতা কিছুতেই বাঙালীদের হাতে দেওয়া যাবে না, তাদের অবশ্যই পশ্চিম পাকিস্তানের নির্দেশ মানতে হবে। জেনারেলগণ উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনবোধে যে কোন শক্তিই—তা যত জঘন্যই হোক না কেন—প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

জেনারেলগণ মনে করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন মুষ্টিমেয় রাজনীতিবিদের সৃষ্টি এবং আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য কয়েক হাজার বাঙালী নিধনই যথেষ্ট। ভুট্টোও মার্চে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিকের কাছে একই ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন—"স্বায়ত্তশাসনের ইস্যুটি মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী কর্তৃক প্রণীত। ঢাকাসহ সারা পূর্ব পাকিস্তানের কয়েক হাজার বাঙালী শেষ করতে পারলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।" এমনকি জানা যায়, চিফ্‌স

খান ইয়াহিয়া খানকে বলেছিলেন, "এক সপ্তাহের সময় দিন পূর্ব পাকিস্তানে আমি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবো।" শুধু পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর এডমিরাল আহসান এবং পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড প্রধান ও সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব নিরপরাধ লোককে হত্যা করতে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সে সময় সরকারের নীতি নির্ধারকদের স্তরে সুস্থ মস্তিষ্কের লোকদের কোন স্থান ছিলো না। ফলে এই দু'জন অফিসারকেই তাঁদের পদ থেকে অপসারিত হতে হয়। গভর্ণর আহসানের বেসামরিক বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এক বৈঠকের পর সদম্ভে ঘোষণা করলেন, "আমরা জানি কিভাবে বাঙালীদের শাসন করতে হবে।"

২৬শে ফেব্রুয়ারী করাচীতে ভুট্টোর সাথে ইয়াহিয়ার আরেক দফা বৈঠক হয়।[২৪] দু'দিন পরে ভুট্টো জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার জন্য দাবি জানান। ভুট্টো অন্যদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মৌলিক ইস্যু সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আরো আলোচনার জন্যই অধিবেশন মুলতবী রাখা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই হুমকিও দিলেন, তাঁর দাবী মানা না হলে "পশ্চিম পাকিস্তানের খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।"[২৫] লক্ষণীয় বিষয় যে, ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর এ ধরনের হুমকিতে কিছু মনে করলেন না।

২৮শে ফেব্রুয়ারী রাতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে পি. আই. এ-র একটি বোয়িং বিমানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রথম সৈন্যদল ঢাকা এসে পৌঁছলো। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য সেনানিবাস থেকে ট্যাংকগুলো ঢাকায় নিয়ে আসা হলো এবং আনার পরপরই ট্যাংকগুলোতে সফ্‌ট-ট্র্যাক লাগিয়ে শহরের রাস্তায় চলাচলের উপযোগী করে তোলা হলো।

এরপর থেকে প্রতিরাতে বিমানযোগে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্বাঞ্চলে সৈন্য আনয়ন নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। ভারতীয় বিমান ছিনতাই ঘটনার পর নয়াদিল্লী কর্তৃপক্ষ তাদের আকাশ সীমা দিয়ে পাকিস্তানী বিমানের উড্ডয়ন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই ঘুরে আসতে হতো, ফলে দুই অংশের বিমান পথের দূরত্ব দাঁড়িয়েছিলো চার হাজার মাইলেরও বেশি। শান্তিকালীন সময়ে এই বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করে নিয়মিত নৈশ ফ্লাইটে দলে দলে সৈন্য আনয়নের ব্যবস্থা করা দু' একদিনে সম্ভব নয়। নিয়মিত ও ব্যাপকহারে এই ধরনের সৈন্য প্রেরণের জন্য দীর্ঘকালীন প্রস্তুতি, প্রশাসনিক এবং রণকৌশলগত আয়োজনের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রেরক ও গ্রাহক কেন্দ্রেরও নির্ভুল প্রস্তুতি থাকতে হয়। সময়ের হিসাবে দেখা যায় যে, খারিয়ান ও কোয়েটা সেনানিবাস থেকে যে সব সৈন্য

এখানে এসেছিলো তারা রওনা হবার নির্দেশ পেয়েছিলো অন্ততঃ দু' থেকে তিন সপ্তাহ আগে। বিমানে সৈন্য পাঠাতে ন্যূনপক্ষে দু' সপ্তাহ সময় প্রয়োজন হিসাব করলেও এইসব ইউনিট অবশ্যই ১৩ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ ইয়াহিয়া খান যেদিন ৩রা মার্চে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের ঘোষণা করেছিলেন তার আগে পশ্চিম পাকিস্তান ত্যাগের নির্দেশ পেয়েছিলো।

পরের ঘটনাগুলো যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটির পর একটি ঘটে যেতে লাগলো। এগুলো ছিলো বিশ্বাসঘাতকতা, অবিশ্বাস ও মারাত্মক ভ্রান্তিজনিত পদক্ষেপ ও প্রতি-পদক্ষেপ। দেখে মনে হয় যেন কোন নাটকের দৃশ্যের পট-পরিবর্তনে ঘটনাপ্রবাহ গড়িয়ে চললো সেই চূড়ান্ত ও অবশ্যম্ভাবী ২৫শে মার্চের (১৯৭১) রাতের দিকে।

৫

এক নতুন ইতিহাসের জন্ম

জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রায় সবকিছু ঠিকঠাক। ঢাকায় আসার পথে ইয়াহিয়া খান তখন করাচীতে। ১৯৭১-এর ১লা মার্চ সোমবার বেলা ১টায় রেডিওতে হঠাৎ ইয়াহিয়া খানের কণ্ঠ শোনা গেলো। প্রচারিত হলো তাঁর সেই ঘৃণ্য বিবৃতি: "পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের নেতাদের দুঃখজনক মতবিরোধের কারণে পরবর্তী তারিখ ঘোষণা না করা পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা হলো।"

এ দাবীটি ছিল ভুট্টোর। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সঙ্গে পর্যন্ত কোন আলোচনা না করে অত্যন্ত অনুগতভাবে ভুট্টোর সে দাবী মেনে নিলেন। অবশ্য আলোচনার কোন প্রয়োজনও ছিলো না, কেননা, এই অচলাবস্থা ছিলো ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মিলিত চক্রান্তেরই ফল।

হাজার মাইল দূরে পূর্ব পাকিস্তানে সেদিন এ বিবৃতির প্রতিক্রিয়া পাকিস্তানের ভিত্তি কাঁপিয়ে দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন, "এটা নীরবে সহ্য করা যায় না। ষড়যন্ত্রকারীদের সুবুদ্ধি ফিরে না এলে ইতিহাস তার নিজস্ব পথেই চলবে।"[২৬]

প্রতিবাদের বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ে গোটা পূর্ব পাকিস্তান যেন ডুবে গেলো।

আওয়ামী লীগ ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করলো এবং ৭ই মার্চ গণসমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেবেন বলে ঘোষণা কর হলো। বাঙালীরা ষড়যন্ত্রকারীদের সঠিকভাবেই সনাক্ত করতে পেরেছিলো পেরেছিলো বলেই তারা এবার ঐক্যবদ্ধ হলো। এ ঐক্য ছিলো আপামর গণমানুষের। ইতিহাসে এর আগে এমন ঐক্য আর দেখা যায়নি। বাঙালীরা যে-কোন চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলো। ঢাকা প্রচারপত্রে ছেয়ে গেলো: ৬-দফা নয়, ১ দফা চাই (অর্থাৎ স্বাধীনতা)। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের এবং সারা পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারণের দাবীদার। অন্যান্য প্রচারপত্রে আরো কঠোর

স্বাধীনতার জন্য বাঙালীদের ঐক্য জোরদার করার এবং বাঙালী নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় পাঞ্জাবী বিশ্বাসঘাতকদের সাথে আপোষ না করার আহ্বান জানানো হয়।

১লা মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন ভেঙ্গে পড়লো। শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন। জনগণের সমর্থনে এগিয়ে এলেন বাঙালী সরকারী কর্মচারীগণও।[২৭] বিক্ষুব্ধ বাঙালীদের উপর গুলী চালাবার আদেশ অমান্য করে ইপিআর এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যরাও জনতার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে গোটা বাঙালী জাতির সরাসরি সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। ২রা মার্চ ঢাকায় সৈন্যরা ২ জন বিক্ষোভকারীকে হত্যা করলো। এর পর এলো চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানের পালা।

৩রা মার্চ ১৯৭১। সকালের দিকে একটি মিছিল জাতীয়তাবাদী শ্লোগান দিতে চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে এগিয়ে গেলো। মিছিলটি অবাঙালী অধ্যুষিত অয়্যারলেস কলোনীর কাছে পৌঁছাতেই অজ্ঞাত পরিচয় কিছু লোক মিছিলকারীদের ওপর রাইফেলের গুলী বর্ষণ করলো। এতে কয়েকজন নিহত ও আহত হলো। পার্শ্ববর্তী বাঙালী বস্তিগুলোতে এ সময় আগুন ধরিয়ে দিলে বেশ কয়েকজন জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হলো। মুহূর্তে এই ঘটনার খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং নগরবাসী রোষে ফেটে পড়লো। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটলো। বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য ইপিআর তলব করা হলো। বেলা ৯টার দিকে আমি অয়্যারলেস কলোনীতে পৌঁছলাম। ইতিমধ্যে নগরীর অন্যান্য অবাঙালী এলাকা—ইস্পাহানী কলোনী, আমবাগান কলোনী, কুলসী কলোনী এবং সর্দারনগর—থেকে মারাত্মক দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর আসতে থাকলো।

অয়্যারলেস কলোনীতে পুলিশ বাহিনীসহ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জনাব শামসুল হককে আমি দেখলাম। ২০ বালুচ রেজিমেণ্টের সৈন্যরা সেখানে ডিউটি দিচ্ছে দেখে আমি বিস্মিত হলাম।

জনাব হককে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে এখানে সৈন্যদের সাহায্য চেয়েছে?

তিনি অনুচ্চ স্বরে বললেন, কেউ না। এখানে অনেক লোককে খুন করা হয়েছে। আহত কয়েকজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

"সকলেই কি বাঙালী"? আমি প্রশ্ন করি।

"হ্যাঁ। এখানকার কোন এক বাড়ী থেকে অবাঙালীরা প্রথমে মিছিলের উপর রাইফেলের গুলী চালায়। তারপর তারা মিছিলকারীদের আক্রমণ করে।"

"আমরা কি কাউকে গ্রেফতার করেছি?"

"এখনও করিনি। সৈন্যরা প্রায় ১০০ জন নিরপরাধ বাঙালীকে ধরে নিয়ে গেছে।"

পাশ দিয়ে তখন ২০ বালুচ রেজিমেণ্টের একজন পশ্চিম পাকিস্তানী মেজর তাঁর সৈন্যদের নিয়ে হেঁটে চলে যাবার সময় আমার এবং আমার সেনাদের দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে গেলেন।

এ সবই ছিলো সীমাহীন ঘৃণা ও বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ। বাঙালীদের জীবন ওদের কাছে ছিলো মূল্যহীন ও তুচ্ছ। কিন্তু সে সময়ে এসব বিষয়ে কিছু চিন্তা করার কিংবা ভেবে দেখার অথবা নিছক প্রতিবাদ জানানোর সময় ছিলো না।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেলো, নিহত-আহত বাঙালী সকলেই বুলেটে আঘাতপ্রাপ্ত। বলা বাহুল্য সে সময়ে বেসামরিক লোকদের রাইফেল রাখার অধিকার ছিলো না। ২০ বালুচ রেজিমেণ্টের সৈন্যরা সাধারণ নাগরিকের পোশাকে অবাঙালীদের সঙ্গে বসবাস করছে বলে আমরা আগেই সংবাদ পেয়েছিলাম। আরও জানা যায় যে, ছদ্মবেশী সৈন্যরা সকলেই রাইফেলে সজ্জিত। ৩রা মার্চের ঘটনা সেসব খবরের সত্যতাই প্রমাণ করে।

পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী ইয়াহিয়া খানকে কিছুটা সচকিত করে তুললো বলে মনে হয়। বাঙালীদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ যে এতো প্রচণ্ড রূপ নেবে তা ইয়াহিয়া খান আঁচ করতে পারেননি। তিনি বাঙালীদের শান্ত করার প্রচেষ্টায় ১০ই মার্চ ঢাকায় সকল রাজনৈতিক নেতার একটি বৈঠক ডাকলেন। আসলে ইয়াহিয়া খান আরও সময় কাটাতে চাইছিলেন। বিভিন্ন ঘটনায় এটাই প্রমাণ হয় যে, সমর শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাঁর তখনও সময়ের দরকার ছিলো। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং বৈঠকের মাধ্যমে তিনি জনগণকে ধোঁকা দিয়ে নিজ স্বার্থ উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এবার তাঁর প্রথম টোপ ব্যর্থ হয়ে গেলো। শেখ মুজিবুর রহমান আলোচনার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। বাংলাদেশের অন্যান্য রাজনীতিকও আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না। ততদিনে পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলাদেশ' নামেই পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। শেখ মুজিব বললেন, "যে মুহূর্তে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আমার লোককে হত্যা করা হচ্ছে, রাজপথে শহীদের রক্ত শুকায়নি সেই অবস্থায় এই আলোচনার আমন্ত্রণ রূঢ় পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। যখন সামরিক সমাবেশ অব্যাহত রয়েছে, অস্ত্রের ভাষায় কথা বলা হচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে কোন আলোচনা বৈঠকের আহ্বান প্রকৃতপক্ষে তোপের মুখে আহূত বৈঠকেরই নামান্তর।[২৮]

একই দিন শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের প্রতি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে গণবিরোধী সরকারকে সহযোগিতা না করার এবং রাজস্ব কিংবা

খাজনা না দিবার নির্দেশ দিলেন।[২৯] তিনি দাবী জানালেন, সৈন্যবাহিনীকে অবশ্যই ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং ৭ই মার্চের আগে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।[৩০]

এদিকে সমর শক্তি বৃদ্ধি অব্যাহত গতিতে চলছিলো। এমনকি ৩রা মার্চ ইয়াহিয়া খান আলোচনা সভা আহ্বানের দিনও ২২ বালুচ রেজিমেণ্টের একটি ব্যাটালিয়ান বিমানযোগে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এই রেজিমেণ্টকে গোপনে ঢাকায় পিলখানাস্থ ইপিআর সদর দফতরে পাঠানো হয়। এবং পরদিন থেকেই তারা ইপিআর-এর পোশাকে পর্যবেক্ষণ ডিউটি শুরু করে।

চট্টগ্রামের দাঙ্গা বিধ্বস্ত বিভিন্ন এলাকা ঘুরে আমি আমার সারসন রোডের বাসায় ফিরে এলাম। এসেই আমি চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং আওয়ামী লীগের একজন প্রখ্যাত ও বিশ্বস্ত সদস্য আমার বিশিষ্ট বন্ধু ডাঃ জাফরকে আমার বাসায় ডাকলাম।

"জাফর ভাই, আমাদের মুক্তির জন্য প্রস্তুতি নেয়া উচিত নয় কি?" আমি তাঁকে প্রশ্ন করি।

কিছুক্ষণ তিনি একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর আমার দিকে একটু ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, "পাঞ্জাবীদের সাথে বাস করা আর সম্ভব নয়। ওরা আমাদেরকে ওদের অধীনস্থ উপনিবেশের অধিবাসী মনে করতে চায়, প্রয়োজনে ওরা বল প্রয়োগ করছে। আজ সকালের ঘটনা থেকে এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।"

"তাহলে আসুন আমরা একসাথে কাজ করি। এই পরিস্থিতিতে আমি অবশ্য নিশ্চিত নই—সশস্ত্র বাহিনীর অন্যরা আমাদের সাথে যোগ দেবে কিনা, কিন্তু আমার অধীনে আমার অনুগত ইপিআর বাহিনীর প্রায় ১৫০০ বাঙালী সৈনিক রয়েছে। আমি তাদেরকে দিয়ে চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্ততঃ একমাস মুক্ত রাখতে পারবো। এই সময়ের মধ্যে আপনাদের দলকে অবশ্যই বন্ধু ভাবাপন্ন দেশগুলো থেকে সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে।"

"আমি আপনার সঙ্গে একমত। আমি আমাদের দলের চট্টগ্রাম শাখার সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করবো।" ডাঃ জাফর জবাব দিলেন।

৫ই মার্চ ডাঃ জাফর আওয়ামী লীগের চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি জনাব এম. আর. সিদ্দিকী ও আমার মধ্যে এক গোপন বৈঠকের আয়োজন করেন। এর আগের দিনও সৈন্যদের প্ররোচনায় অবাঙালী-বাঙালীদের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। সকল ঘটনাতে বাঙালীদেরকেই চরম মূল্য দিতে হয়। হতাহতের সংখ্যা এবং ধ্বংসলীলার পরিমাণ বেড়ে চলে। দুর্বৃত্তদের আগুনে আরো অনেক বাঙালীর ঘর-দুয়ার পুড়ে ছাই হয়ে যায়, অনেক লোক জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হলো।

একই দিন (৫ই মার্চ) সৈন্যরা ঢাকার কাছে টঙ্গীতে বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর গুলী চালালে নিহত হয় দুজন আর আহত হয় পনরজন। এর প্রতিবাদে ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ লোকের সমাবেশে বক্তাগণ ৭ই মার্চের রেসকোর্স ময়দানের জনসভার ধারা বিবরণী সরাসরি ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করার দাবী জানান। পূর্বাঞ্চলে নজীরবিহীন সেই গণ-অভ্যুত্থানের মুখে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান যখন ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তখন পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো এবং ইয়াহিয়ার মধ্যেও বৈঠক চলছিলো।

ঐ তারিখের রাতে রংপুর, সৈয়দপুর, রাজশাহী এবং অন্যান্য শহরে কারফিউ জারি করা হলো। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের অধিকার আদায়ে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ। প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছিলো যে, তাদের লক্ষ্য অর্জনে আরও রক্ত দিতে হবে। এই পরিস্থিতিতে আমি সেই রাতেই জনাব সিদ্দিকীর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমি তাঁকে বললাম, "যে-কোন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। শোষণ ও অবিচার থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের অবশ্যই সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। শত্রু আঘাত হানার আগেই তাদেরকে অকস্যাৎ আঘাত হানার উপরই আমাদের সাফল্য নির্ভর করছে।"

"কিন্তু তার আগে সেনাবাহিনীর আসল অভিপ্রায় সম্পর্কে আমাদের নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। নেতার (শেখ মুজিব) চূড়ান্ত অনুমোদন না নিয়ে কোন কিছু করা আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না।"

বৈঠকে আমরা ডাঃ জাফরের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার সিদ্ধান্ত নিই। জনাব সিদ্দিকী এ বিষয়ে নেতার সাথে আলোচনা করবেন আশ্বাস দিলেন। আমি যখন তাঁর বাসা ত্যাগ করলাম তখন গভীর রাত।

এদিকে ইয়াহিয়া খান বাঙালীদের মোকাবিলা করার জন্য আরও অধিক সৈন্য ও সমর-সম্ভার সমাবেশে মনোনিবেশ করেছিলেন। জনসাধারণ সৈন্যদের জন্য কিছু সরবরাহ করতে, এমনকি তাদের কাছে কিছু বিক্রি করতেও অস্বীকার করলেন। ফলে সেনাবাহিনীকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনীত রসদের উপরই ভরসা করতে হয়। ঘৃণা ও বিদ্বেষের মাত্রা তখন তুঙ্গে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে পাকিস্তানের বিভক্তির কাজ ততক্ষণে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। সবাই আশা করছিলো ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। তা সত্য হলে পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়ার সকল কৌশল ভেস্তে যাবে। তাই পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য ইয়াহিয়া আরেকটি টোপ ফেললেন। ৬ই মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে তিনি ২৫শে মার্চ, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের নতুন তারিখ

ঘোষণা করলেন।[৩১] ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য ছিলো ৭ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করা থেকে শেখ মুজিবকে নিবৃত্ত করা।

এদিকে গণবিক্ষোভ অবশ্য অব্যাহত রইলো। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের গেট ভেঙ্গে ৩৫০ জন বন্দী পালিয়ে গেলো। নিরাপত্তা রক্ষীরা এখানে গুলী বর্ষণ করলে ৭জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হলো।

একই দিন (৬ই মার্চ) পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের পদ থেকে ভাইস এড-মিরাল আহসানকে সরিয়ে লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে নিযুক্ত করা হলো।[৩২] টিক্কা খান লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের কাছ থেকে সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতাও গ্রহণ করলেন।

"বালুচ হত্যাকারী" হিসাবে এর আগে পশ্চিম পাকিস্তানেই টিক্কার কুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশে তিনি নির্মম ভাবে এক অভ্যুত্থান পর্যুদস্ত করেছিলেন। বিক্ষোভ থামাতে গিয়ে টিক্কা খান অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় শত শত নিরস্ত্র বালুচকে হত্যা করেছিলেন। নারী-পুরুষ-শিশুর প্রাণ সংহার তার এতটুকু বাধেনি বলে তিনি "বুচার অব বালুচিস্তান" বা বালুচিস্তানের কসাই উপাধি অর্জন করেছিলেন।

এরূপ একজন কুখ্যাত লোককে গভর্ণর এবং সামরিক আইন প্রশাসকের সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগ করায় সবাই বুঝতে পারলেন—সামনে দুঃসময়। তাঁর নিয়োগে স্বাভাবিকভাবে এখানে ব্যাপক প্রতিকূল প্রতি-ক্রিয়া দেখা গেলো। পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জনাব বি. এ. সিদ্দিকী গভর্ণর হিসেবে টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বী-কৃতি জানালেন।[৩৩] বাঙালীরা টিক্কা খানকে এভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

ঐ তারিখ সন্ধ্যায় (৬ই মার্চ) আমি আমার হালিশহরের কার্যালয়ে একটি গোপন বৈঠক ডাকলাম। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ডিউটির ব্যাপারে ইপিআর-এর জে. সি. ও এবং এন. সি. ও-দের সাথে আলাপ-আলোচনা করার উপলক্ষ করে এ সভা ডাকা হয়েছিলো। আমরা সতর্কতার সাথে অবাঙালী ইপিআর সেনাদের উপস্থিতি এড়াতে পেরেছিলাম। তাদেরকে আমার কার্যালয় থেকে দূরে রাখা হয়েছিলো। বৈঠককালে ইপিআর-এ আমার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বাঙালী জে. সি. ও এবং এন. সি. ও-দের সঙ্গে আমি পৃথকভাবে কথা বললাম। আমি প্রথমেই তাদেরকে বললাম: "পাকিস্তানীদের আঘাত হানার জন্য তৈরী হোন, আপনার কমাণ্ডের প্রতিটি সশস্ত্র অবাঙালী সদস্যের তালিকা তৈরী করুন, তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন এবং আমার গোপন সাংকেতিক বার্তা পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিরস্ত্র করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। যখন যেভাবে বলা হবে সেভাবেই কাজ করতে

হবে, এমনকি সেখানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিন।" প্রত্যেককেই আমি বললাম, "আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ডিউটি সম্পর্কে আপনাদের নিশ্চয়ই সবকিছু জানা আছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন, সে সব বিষয়েই আমাদের কথা হয়েছে।"

তাঁরা সকলেই আমার কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেভাবে কাজ করেছিলেন। কেউ কেউ তাঁদের অবাঙালী সহকর্মীদের এমন কথাও বলেছিলেন যে, "এই অ্যাডজুটেণ্ট ভদ্রলোক আমাদের খাটিয়ে মারছেন। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ডিউটির ব্যাপারে তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক আদেশ নির্দেশের জ্বালায় আমরা অস্থির।"

সে সময়ে ইপিআর-এ শতকরা ৮০ ভাগ বাঙালী এবং ২০ ভাগ অবাঙালী ছিল। সারা পূর্ব পাকিস্তানে এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিলো প্রায় ১৫ হাজার। সেনাবাহিনীর অফিসারগণ দু-তিন বছরের জন্য ডেপুটেশনে এসে এ বাহিনী পরিচালনা করতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারের গোপনীয় নীতি অনুযায়ী ইপিআর-এর অফিসারদের শতকরা ৯০টি পদই পশ্চিম পাকিস্তানীদের দিয়ে পূরণ করা হতো। এইসব অফিসার শুধু অবাঙালী সেনাদের স্বার্থই দেখতেন। আর বাঙালী সেনারা তাদের স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা থেকেও ছিলো বঞ্চিত। পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনেক সময় তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে অবাঙালীরা ওপরে উঠে যেতো। ছুটি-ছাটা কিংবা বাসা-বাড়ীর সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারেও অবাঙালীদের অগ্রাধিকার দেয়া হতো। শুধু কঠিন কোন দায়িত্ব কিংবা দুর্গম এলাকার ডিউটিতে বাঙালীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো। বছরের পর বছর এই ধরনের ব্যবহারে বাঙালী সেনারা স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। ফলে কোথাও বাঙালী অফিসার নিয়োগকে তারা 'আল্লাহর দান' বলে মনে করতো। সুযোগ পেলেই তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা, তাদের প্রতি অবিচারের কথা বলতো। সবশেষে সবাই শুধু একটি অনুরোধই করতো: "স্যার, আপনিও তো বাঙালী, আমাদের জন্য কিছু করুন স্যার।"

জে. সি. ও এবং এন. সি. ও-দের সবাই বেশ শংকাগ্রস্ত, এটা আমি লক্ষ্য করলাম। একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকা আমাদের সবাইকে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিলো। জাতীয় পর্যায়ে যেসব জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো সে সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে সকলকে বিস্তৃতভাবে বললাম।

অদূর ভবিষ্যতে সবচাইতে খারাপ কি ঘটতে পারে সে সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করলাম। আমি জানতে পারলাম আমাদের সেনারা খবরাখবর সংগ্রহের জন্য আওয়ামী লীগের কর্মীদের সাথে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করেছে এবং আশু করণীয় বিষয়ে নির্দেশ চেয়েছে। এতে আমি মোটেও বিস্মিত হইনি। কারণ

আমরা সবাই সম্ভাব্য বিপদের আঁচ করতে পেরেছিলাম। এমতাবস্থায় আমি তখন তাদেরকে নিম্নোক্ত দায়িত্বগুলো পালনের নির্দেশ দিলাম :

১. যে কোন ঘটনার জন্য সতর্ক এবং প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যও তৈরী থাকতে হবে। আকস্মিক হামলায় শুধু আত্মরক্ষা করলেই চলবে না, সাধ্যমত আমাদের লোকদের জীবন বাঁচাতে হবে।

২. ইপিআর-এর অস্ত্রাগার এবং বেতার কেন্দ্রগুলোর ওপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।

৩. সব যানবাহন আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

৪. আমার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন ফিল্ড সিকিউরিটি ডিটাচমেণ্ট (গোয়েন্দা ইউনিট)-কে পোর্ট, বিমান বন্দর এবং নৌবাহিনীর সদর দফতর এলাকায় সকল কার্যকলাপের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব দেওয়া হলো। বেসামরিক অবাঙালীদের ওপরও নজর রাখতে বলা হলো।

৫. ঢাকার এবং সম্ভব হলে অন্যান্য ইপিআর সেক্টরের সঙ্গে নিয়মিত তথ্য বিনিময়ের জন্য যোগাযোগ রাখতে হবে।

৬. অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে অবাঙালী সেনাদের হাতিয়ার থেকে ফায়ারিং পিন সরিয়ে ফেলতে হবে। আক্রমণের সময় এলেই আঘাত করার চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হবে। দুটি সাংকেতিক বার্তায় এই নির্দেশ প্রদান করা হবে। বার্তা দুটি আপাত দৃষ্টিতে অর্থহীন। দায়িত্বশীল ও বিশ্বস্ত সিনিয়র বাঙালী এন. সি. ও এবং জে. সি. ও-দের এর গুঢ় অর্থ জানিয়ে দিলাম :

ক. "আমার জন্য কিছু কাঠের ব্যবস্থা করো" : এর অর্থ ছিলো আধ ঘণ্টার মধ্যে পরবর্তী আদেশ এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো।

খ. আমার জন্য কিছু কাঠ আনো : দ্বিতীয় 'মেসেজ'টির অর্থ ছিলো বিপক্ষের সবাইকে গ্রেফতার, প্রয়োজনবোধে খতম করে পূর্ব নির্ধারিত শহরের বিভিন্ন যুদ্ধাবস্থানের দিকে অগ্রসর হও।

ইয়াহিয়া ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি শান্ত করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু তা হলো না। চট্টগ্রামে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দুর্গত এলাকাগুলো পরিদর্শন করে লোকদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে শান্ত থাকতে বললেন। অবাঙালী এলাকাসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইপিআর ও পুলিশ মোতায়েন করা হলো।

পরের দিন ৭ই মার্চ, ঢাকায় সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত প্রায় দশ লাখ লোকের জনসমুদ্রে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দান করলেন। এ দিনটি

হবে, এমনকি সেখানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিন।" প্রত্যেককেই আমি বললাম, "আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ডিউটি সম্পর্কে আপনাদের নিশ্চয়ই সবকিছু জানা আছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন, সে সব বিষয়েই আমাদের কথা হয়েছে।"

তাঁরা সকলেই আমার কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেভাবে কাজ করেছিলেন। কেউ কেউ তাঁদের অবাঙালী সহকর্মীদের এমন কথাও বলেছিলেন যে, "এই অ্যাডজুটেণ্ট ভদ্রলোক আমাদের খাটিয়ে মারছেন। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ডিউটির ব্যাপারে তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক আদেশ নির্দেশের জ্বালায় আমরা অস্থির।"

সে সময়ে ইপিআর-এ শতকরা ৮০ ভাগ বাঙালী এবং ২০ ভাগ অবাঙালী ছিল। সারা পূর্ব পাকিস্তানে এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিলো প্রায় ১৫ হাজার। সেনাবাহিনীর অফিসারগণ দু-তিন বছরের জন্য ডেপুটেশনে এসে এ বাহিনী পরিচালনা করতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারের গোপনীয় নীতি অনুযায়ী ইপিআর-এর অফিসারদের শতকরা ৯০টি পদই পশ্চিম পাকিস্তানীদের দিয়ে পূরণ করা হতো। এইসব অফিসার শুধু অবাঙালী সেনাদের স্বার্থই দেখতেন। আর বাঙালী সেনারা তাদের স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা থেকেও ছিলো বঞ্চিত। পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনেক সময় তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে অবাঙালীরা ওপরে উঠে যেতো। ছুটি-ছাটা কিংবা বাসা-বাড়ীর সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারেও অবাঙালীদের অগ্রাধিকার দেয়া হতো। শুধু কঠিন কোন দায়িত্ব কিংবা দুর্গম এলাকার ডিউটিতে বাঙালীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো। বছরের পর বছর এই ধরনের ব্যবহারে বাঙালী সেনারা স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। ফলে কোথাও বাঙালী অফিসার নিয়োগকে তারা 'আল্লাহর দান' বলে মনে করতো। সুযোগ পেলেই তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা, তাদের প্রতি অবিচারের কথা বলতো। সবশেষে সবাই শুধু একটি অনুরোধই করতো: "স্যার, আপনিও তো বাঙালী, আমাদের জন্য কিছু করুন স্যার।"

জে. সি. ও এবং এন. সি. ও-দের সবাই বেশ শংকাগ্রস্ত, এটা আমি লক্ষ্য করলাম। একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকা আমাদের সবাইকে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিলো। জাতীয় পর্যায়ে যেসব জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো সে সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে সকলকে বিস্তৃতভাবে বললাম।

অদূর ভবিষ্যতে সবচাইতে খারাপ কি ঘটতে পারে সে সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করলাম। আমি জানতে পারলাম আমাদের সেনারা খবরাখবর সংগ্রহের জন্য আওয়ামী লীগের কর্মীদের সাথে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করেছে এবং আশু করণীয় বিষয়ে নির্দেশ চেয়েছে। এতে আমি মোটেও বিস্মিত হইনি। কারণ

আমরা সবাই সম্ভাব্য বিপদের আঁচ করতে পেরেছিলাম। এমতাবস্থায় আমি তখন তাদেরকে নিম্নোক্ত দায়িত্বগুলো পালনের নির্দেশ দিলাম :

১. যে কোন ঘটনার জন্য সতর্ক এবং প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যও তৈরী থাকতে হবে। আকস্মিক হামলায় শুধু আত্মরক্ষা করলেই চলবে না, সাধ্যমত আমাদের লোকদের জীবন বাঁচাতে হবে।

২. ইপিআর-এর অস্ত্রাগার এবং বেতার কেন্দ্রগুলোর ওপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।

৩. সব যানবাহন আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

৪. আমার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন ফিল্ড সিকিউরিটি ডিটাচমেণ্ট (গোয়েন্দা ইউনিট)-কে পোর্ট, বিমান বন্দর এবং নৌবাহিনীর সদর দফতর এলাকায় সকল কার্যকলাপের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব দেওয়া হলো। বেসামরিক অবাঙালীদের ওপরও নজর রাখতে বলা হলো।

৫. ঢাকার এবং সম্ভব হলে অন্যান্য ইপিআর সেক্টরের সঙ্গে নিয়মিত তথ্য বিনিময়ের জন্য যোগাযোগ রাখতে হবে।

৬. অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে অবাঙালী সেনাদের হাতিয়ার থেকে ফায়ারিং পিন সরিয়ে ফেলতে হবে। আক্রমণের সময় এলেই আঘাত করার চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হবে। দুটি সাংকেতিক বার্তায় এই নির্দেশ প্রদান করা হবে। বার্তা দুটি আপাত দৃষ্টিতে অর্থহীন। দায়িত্বশীল ও বিশ্বস্ত সিনিয়র বাঙালী এন. সি. ও এবং জে. সি. ও-দের এর গুঢ় অর্থ জানিয়ে দিলাম :

ক. "আমার জন্য কিছু কাঠের ব্যবস্থা করো" : এর অর্থ ছিলো আধ ঘণ্টার মধ্যে পরবর্তী আদেশ এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো।

খ. আমার জন্য কিছু কাঠ আনো : দ্বিতীয় 'মেসেজ'টির অর্থ ছিলো বিপক্ষের সবাইকে গ্রেফতার, প্রয়োজনবোধে খতম করে পূর্ব নির্ধারিত শহরের বিভিন্ন যুদ্ধাবস্থানের দিকে অগ্রসর হও।

ইয়াহিয়া ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি শান্ত করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু তা হলো না। চট্টগ্রামে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দুর্গত এলাকাগুলো পরিদর্শন করে লোকদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে শান্ত থাকতে বললেন। অবাঙালী এলাকাসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইপিআর ও পুলিশ মোতায়েন করা হলো।

পরের দিন ৭ই মার্চ, ঢাকায় সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত প্রায় দশ লাখ লোকের জনসমুদ্রে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দান করলেন। এ দিনটি

হবে, এমনকি সেখানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিন।" প্রত্যেককেই আমি বললাম, "আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ডিউটি সম্পর্কে আপনাদের নিশ্চয়ই সবকিছু জানা আছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন, সে সব বিষয়েই আমাদের কথা হয়েছে।"

তাঁরা সকলেই আমার কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেভাবে কাজ করেছিলেন। কেউ কেউ তাঁদের অবাঙালী সহকর্মীদের এমন কথাও বলেছিলেন যে, "এই অ্যাডজুটেণ্ট ভদ্রলোক আমাদের খাটিয়ে মারছেন। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ডিউটির ব্যাপারে তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক আদেশ নির্দেশের জ্বালায় আমরা অস্থির।"

সে সময়ে ইপিআর-এ শতকরা ৮০ ভাগ বাঙালী এবং ২০ ভাগ অবাঙালী ছিল। সারা পূর্ব পাকিস্তানে এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিলো প্রায় ১৫ হাজার। সেনাবাহিনীর অফিসারগণ দু-তিন বছরের জন্য ডেপুটেশনে এসে এ বাহিনী পরিচালনা করতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারের গোপনীয় নীতি অনুযায়ী ইপিআর-এর অফিসারদের শতকরা ৯০টি পদই পশ্চিম পাকিস্তানীদের দিয়ে পূরণ করা হতো। এইসব অফিসার শুধু অবাঙালী সেনাদের স্বার্থই দেখতেন। আর বাঙালী সেনারা তাদের স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা থেকেও ছিলো বঞ্চিত। পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনেক সময় তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে অবাঙালীরা ওপরে উঠে যেতো। ছুটি-ছাটা কিংবা বাসা-বাড়ীর সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারেও অবাঙালীদের অগ্রাধিকার দেয়া হতো। শুধু কঠিন কোন দায়িত্ব কিংবা দুর্গম এলাকার ডিউটিতে বাঙালীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো। বছরের পর বছর এই ধরনের ব্যবহারে বাঙালী সেনারা স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। ফলে কোথাও বাঙালী অফিসার নিয়োগকে তারা 'আল্লাহর দান' বলে মনে করতো। সুযোগ পেলেই তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা, তাদের প্রতি অবিচারের কথা বলতো। সবশেষে সবাই শুধু একটি অনুরোধই করতো: "স্যার, আপনিও তো বাঙালী, আমাদের জন্য কিছু করুন স্যার।"

জে. সি. ও এবং এন. সি. ও-দের সবাই বেশ শংকাগ্রস্ত, এটা আমি লক্ষ্য করলাম। একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকা আমাদের সবাইকে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিলো। জাতীয় পর্যায়ে যেসব জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো সে সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে সকলকে বিস্তৃতভাবে বললাম।

অদূর ভবিষ্যতে সবচাইতে খারাপ কি ঘটতে পারে সে সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করলাম। আমি জানতে পারলাম আমাদের সেনারা খবরাখবর সংগ্রহের জন্য আওয়ামী লীগের কর্মীদের সাথে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করেছে এবং আশু করণীয় বিষয়ে নির্দেশ চেয়েছে। এতে আমি মোটেও বিস্মিত হইনি। কারণ

আমরা সবাই সম্ভাব্য বিপদের আঁচ করতে পেরেছিলাম। এমতাবস্থায় আমি তখন তাদেরকে নিম্নোক্ত দায়িত্বগুলো পালনের নির্দেশ দিলাম :

১. যে কোন ঘটনার জন্য সতর্ক এবং প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যও তৈরী থাকতে হবে। আকস্মিক হামলায় শুধু আত্মরক্ষা করলেই চলবে না, সাধ্যমত আমাদের লোকদের জীবন বাঁচাতে হবে।

২. ইপিআর-এর অস্ত্রাগার এবং বেতার কেন্দ্রগুলোর ওপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।

৩. সব যানবাহন আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

৪. আমার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন ফিল্ড সিকিউরিটি ডিটাচমেণ্ট (গোয়েন্দা ইউনিট)-কে পোর্ট, বিমান বন্দর এবং নৌবাহিনীর সদর দফতর এলাকায় সকল কার্যকলাপের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব দেওয়া হলো। বেসামরিক অবাঙালীদের ওপরও নজর রাখতে বলা হলো।

৫. ঢাকার এবং সম্ভব হলে অন্যান্য ইপিআর সেক্টরের সঙ্গে নিয়মিত তথ্য বিনিময়ের জন্য যোগাযোগ রাখতে হবে।

৬. অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে অবাঙালী সেনাদের হাতিয়ার থেকে ফায়ারিং পিন সরিয়ে ফেলতে হবে। আক্রমণের সময় এলেই আঘাত করার চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হবে। দুটি সাংকেতিক বার্তায় এই নির্দেশ প্রদান করা হবে। বার্তা দুটি আপাত দৃষ্টিতে অর্থহীন। দায়িত্বশীল ও বিশ্বস্ত সিনিয়র বাঙালী এন. সি. ও এবং জে. সি. ও-দের এর গুঢ় অর্থ জানিয়ে দিলাম :

ক. "আমার জন্য কিছু কাঠের ব্যবস্থা করো" : এর অর্থ ছিলো আধ ঘণ্টার মধ্যে পরবর্তী আদেশ এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো।

খ. আমার জন্য কিছু কাঠ আনো : দ্বিতীয় 'মেসেজ'টির অর্থ ছিলো বিপক্ষের সবাইকে গ্রেফতার, প্রয়োজনবোধে খতম করে পূর্ব নির্ধারিত শহরের বিভিন্ন যুদ্ধাবস্থানের দিকে অগ্রসর হও।

ইয়াহিয়া ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি শান্ত করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু তা হলো না। চট্টগ্রামে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দুর্গত এলাকাগুলো পরিদর্শন করে লোকদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে শান্ত থাকতে বললেন। অবাঙালী এলাকাসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইপিআর ও পুলিশ মোতায়েন করা হলো।

পরের দিন ৭ই মার্চ, ঢাকায় সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত প্রায় দশ লাখ লোকের জনসমুদ্রে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দান করলেন। এ দিনটি

ছিলো বহু আকাঙ্খিত দিন। সবাই স্বাধীনতার ঘোষণা আশা করছিলো। সব বেতার কেন্দ্র থেকে এই ভাষণ প্রচার করার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে সরকার তা বাতিল করলেন। শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়ার জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সেনাবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর সৈন্যরা যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করছিলো। সভাস্থল তাক করে গোলন্দাজ বাহিনীর কামানগুলো বসানো হয়েছিলো। কামানের গোলাবর্ষণের নির্দেশ দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ হেলিকপ্টার আকাশে উড়তে থাকে। ইয়াহিয়া খান একটি মাত্র অজুহাত খুঁজছিলেন, একটু উস্কানি পেলেই তিনি আঘাত হানবেন।

৭ই মার্চ, ১৯৭১ সাল। আগেই ঘোষণা করা হয়েছিলো শেখ মুজিবুর রহমান এই সভায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার নির্দেশ দেবেন। সভা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই অকুতোভয় জনতা মিছিল করে রমনা রেসকোর্স ময়দানের দিকে যেতে থাকে। শত শত মিছিল, অগণিত মিছিল। মিছিলে সমাজের সকল স্তরের লোক—কৃষক, শ্রমিক, রিকশাচালক, গাড়ীর ড্রাইভার, ছাত্র, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, সরকারী চাকুরে এমনকি সাদা পোশাকে ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ। নারী পুরুষ এবং বৃদ্ধ-যুবক-শিশু সকলেরই যেন একটি মাত্র গন্তব্য-স্থল—রেসকোর্স ময়দান। হাতে তাদের নানা ধরনের ব্যানার, বাঁশের লাঠি এবং এক নতুন পতাকা। সবুজ পটভূমিতে লাল সূর্যের মাঝে সোনালী রঙে বাংলা-দেশের মানচিত্র অঙ্কিত পতাকা প্রায় সকলের হাতে শোভা পাচ্ছিলো।

তাদের শ্লোগানে শ্লোগানে চারদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠছিলো। বেলা সাড়ে তিনটার মধ্যে ময়দান লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো। লাখো মানুষের কণ্ঠে সাগর-গর্জনের ন্যায় ধ্বনিত হতে থাকলো "জয় বাংলা"। কি যে যাদু মাখা ছিলো এই শ্লোগানে! এর ইন্দ্রজালিক শক্তির পরিধি নিরূপণের ক্ষমতা বুঝি আর কারো নেই।

গণ-অভ্যুত্থানের সময় এবং যুদ্ধকালে এ শ্লোগান বাঙালীদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিলো। জীবন বাজী রেখে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এর উদ্দীপনা উক্তির তুলনা ছিলো না। তাই "জয় বাংলা" জয়ধ্বনি আমাদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সেদিনের সভায় শেখ মুজিবের দেয়া এ ভাষণ বাঙালী জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ। গভীর আবেগ, নির্ভুল যুক্তি এবং ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ-পূর্ণ এ ভাষণে অকুতোভয় শেখ মুজিব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন:

"আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।

কিন্তু ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও যশোরের রাজপথ আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়—তারা বাঁচতে চায়। তারা অধিকার পেতে চায়। নির্বাচনে আপনারা ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়ী করেছিলেন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য। আশা ছিল জাতীয় পরিষদ বসবে—আমরা শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এই শাসনতন্ত্রে মানুষ তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের বুকের আর্তনাদের ইতিহাস, রক্তদানের করুণ ইতিহাস, নির্যাতিত মানুষের কান্নার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি করে আইয়ুব খান দশ বছর আমাদের গোলাম ক'রে রাখলো। ১৯৬৬ সালে ৬-দফা দেয়া হলো এবং এরপর এ অপরাধে আমার বহু ভাইকে হত্যা করা হলো। ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া খান এলেন। তিনি বললেন, তিনি জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন, শাসনতন্ত্র দেবেন—আমরা মেনে নিলাম। তার পরের ঘটনা সকলেই জানেন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা হলো—আমরা তাঁকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার অনুরোধ করলাম। কিন্তু মেজরিটি পার্টির নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার কথা শুনলেন না। শুনলেন সংখ্যালঘু দলের ভুট্টো সাহেবের কথা। আমি শুধু বাংলার মেজরিটি পার্টির নেতা নই—সমগ্র পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা। ভুট্টো সাহেব বললেন মার্চের প্রথম সপ্তাহে ডাকতে। তিনি মার্চের তিন তারিখে অধিবেশন ডাকলেন।

আমি বললাম, তবু আমরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যাবো এবং সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি ন্যায্য কথা বলে আমরা তা' মেনে নেবো, এমনকি তিনি যদি একজনও হন।

জনাব ভুট্টো ঢাকা এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনা হলো। ভুট্টো সাহেব বলে গেছেন, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়; আরো আলোচনা হবে। মওলানা নূরানী, মওলানা মুফতি মাহমুদসহ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য পার্লামেণ্টারী নেতা এলেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হলো—উদ্দেশ্য ছিলো আলাপ-আলোচনা ক'রে শাসনতন্ত্র রচনা করবো। তবে তাঁদের আমি জানিয়ে দিয়েছি, যে, ৬-দফা পরিবর্তনের কোনো অধিকার আমার নেই, এটা জনগণের সম্পদ।

কিন্তু ভুট্টো হুমকি দিলেন। তিনি বললেন, এখানে এসে ডবল জিম্মী হতে পারবেন না। পরিষদ কসাইখানায় পরিণত হবে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী

সদস্যদের প্রতি হুমকি দিলেন যে, পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিলে রক্তপাত করা হবে, তাদের মাথা ভেঙ্গে দেয়া হবে। হত্যা করা হবে। আন্দোলন শুরু হবে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত। একটি দোকানও খুলতে দেয়া হবে না।

তা' সত্ত্বেও পঁয়ত্রিশজন পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্য এলেন। কিন্তু পয়লা মার্চে ইয়াহিয়া খান পরিষদের অধিবেশন বন্ধ ক'রে দিলেন। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে, বলা হলো আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্যই কিছু করা যায়নি।

এরপর বাংলার মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো। আমি শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য হরতাল ডাকলাম। জনগণ আপন ইচ্ছায় পথে নেমে এলো।

কিন্তু কি পেলাম আমরা? বাংলার নিরস্ত্র জনগণের ওপর অস্ত্র ব্যবহার করা হলো। আমাদের হাতে অস্ত্র নাই। কিন্তু আমরা পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনে দিয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সে অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার নিরীহ মানুষদের হত্যা করার জন্য। আমার দুঃখী জনতার ওপর চলছে গুলী। আমরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যখনই দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে চেয়েছি, তখনই ষড়যন্ত্র চলেছে—আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ইয়াহিয়া খান বলেছেন, আমি নাকি দশই মার্চ তারিখে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে চেয়েছি—তাঁর সাথে টেলিফোনে আমার আলাপ হয়েছে। আমি তাঁকে বলেছি—আপনি দেশের প্রেসিডেণ্ট। ঢাকায় আসুন, দেখুন, আমার গরীব জনসাধারণকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে; আমার মায়ের কোল কিভাবে খালি করা হয়েছে। আমি আগেই বলে দিয়েছি, কোন গোলটেবিল বৈঠক হবে না, কিসের গোলটেবিল বৈঠক, কার গোলটেবিল বৈঠক? যারা আমার মা-বোনের কোল শূন্য করেছে, তাদের সাথে বসবো আমি গোলটেবিল বৈঠকে?

৩রা তারিখে পল্টনে আমি অসহযোগের আহ্বান জানালাম। বললাম, অফিস-আদালত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করুন। আপনারা মেনে নিলেন।

হঠাৎ আমার সঙ্গে বা আমার দলের সঙ্গে আলোচনা না ক'রে এক জনের সঙ্গে পাঁচ ঘণ্টা বৈঠকের পর ইয়াহিয়া খান যে বক্তৃতা করেছেন, তাতে সমস্ত দোষ আমার ও বাংলার মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। দোষ করলেন ভুট্টো, কিন্তু গুলী করা হলো আমার বাংলার মানুষকে—আমরা গুলী খাই, দোষ আমাদের, আমরা বুলেট খাই, দোষ আমাদের।

ইয়াহিয়া সাহেব অধিবেশন ডেকেছেন কিন্তু আমার দাবী, সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, হত্যার

তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা ক'রে দেখবো পরিষদে বসবো কি বসবো না। এ দাবী মানার আগে পরিষদে বসার কোন প্রশ্নই ওঠে না, জনগণ আমাকে সে অধিকার দেয়নি। রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি, শহীদের রক্ত মাড়িয়ে ২৫ তারিখে পরিষদে যোগ দিতে যাবো না।

ভাইয়েরা আমার, 'আমার উপর বিশ্বাস আছে?' (লাখো জনতা হাত উঠিয়ে 'হ্যাঁ' বলেন)। 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না ; মানুষের অধিকার চাই।' প্রধান-মন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে আমাকে নিতে পারেনি। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে নিতে পারেনি। আপনারা রক্ত দিয়ে আমাকে ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত ক'রে এনে-ছিলেন। সেদিন এই রেসকোর্সে আমি বলেছিলাম, রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করবো ; মনে আছে? আজো আমি রক্ত দিয়েই রক্তের ঋণ শোধ করতে প্রস্তুত।

আমি বলে দিতে চাই, আজ থেকে কোর্ট-কাচারী, হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। কোন কর্মচারী অফিসে যাবেন না—এ আমার নির্দেশ।

গরীবের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য রিক্সা চলবে, ট্রেন চলবে আর সব চলবে। ট্রেন চলবে তবে সেনাবাহিনী আনা-নেওয়া করা যাবে না। করলে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্য আমি দায়ী থাকবো না।

সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্টসহ সরকারী, আধা-সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো বন্ধ থাকবে। শুধু পূর্ব বাংলার আদান-প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলো দু'ঘণ্টার জন্য খোলা থাকবে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা যেতে পারবে না। বাঙালীরা বুঝে শুনে চলবেন। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বাংলাদেশের মধ্যে চালু থাকবে, তবে সাংবাদিকরা বহির্বিশ্বে সংবাদ পাঠাতে পারবেন।

এদেশের মানুষকে খতম করা হচ্ছে, বুঝে শুনে চলবেন, দরকার হ'লে সমস্ত চাকা বন্ধ ক'রে দেয়া হবে। আপনারা নির্ধারিত সময়ে বেতন নিয়ে আসবেন। বেতন যদি না দেয়া হয়, যদি একটি গুলী চলে তা' হ'লে বাংলার ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল—যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। রাস্তা ঘাট বন্ধ ক'রে দিতে হবে। আমরা তাদের ভাতে মারবো—পানিতে মারবো। আমি যদি হুকুম দেবার জন্য নাও থাকি, যদি আমার সহকর্মীরা না থাকেন, আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ কিছু বলবে না। গুলী চালালে আর ভালো হবে না। সাতকোটি মানুষকে আর দাবাতে পারবা না। বাঙালীরা যখন মরতে শিখেছে—তখন কেউ তাদের দাবাতে পারবে না।

শহীদের ও আহতদের পরিবারের জন্য আওয়ামী লীগ সাহায্য কমিটি করেছে। আমরা সাহায্যের চেষ্টা করবো। আপনারা যে যা পারেন দিয়ে যাবেন।

সাত দিনের হরতালে যে সব শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছেন, কারফিউর জন্য কাজ করতে পারেননি—শিল্প মালিকেরা তাদের পুরো বেতন দিয়ে দেবেন।

সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা' মানতে হবে। কাউকে যেন অফিসে দেখা না যায়। এদেশের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ থাকবে। আপনারা আমার উপর ছেড়ে দেন—আন্দোলন কিভাবে করতে হয়, তা' আমি জানি।

কিন্তু হুঁশিয়ার, একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদের মধ্যে শত্রু ঢুকেছে, ছদ্মবেশে তারা আত্মকলহের সৃষ্টি করতে চায়। বাঙালী-অবাঙালী, হিন্দু-মুসলমান সবাই আমাদের ভাই, তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।

রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র যদি আমাদের আন্দোলনের খবর প্রচার না করে তবে কোন বাঙালী রেডিও এবং টেলিভিশনে যাবেন না।

শান্তিপূর্ণভাবে ফয়সালা করতে পারলে ভাই ভাই হিসাবে বাস করার সম্ভাবনা আছে, তা' না হ'লে নেই। বাড়াবাড়ি করবেন না, মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

আমার অনুরোধ, প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায় ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। হাতে যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। মনে রাখবেন রক্ত যখন দিয়েছি, আরও দেবো, তবু এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শাআল্লাহ্; এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। প্রস্তুত থাকবেন, ঠাণ্ডা হ'লে চলবে না। আন্দোলন ও বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন, আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লে তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। কারণ, শৃঙ্খলা ছাড়া কোন জাতি সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে না। জয় বাংলা।"[৩৪]

শেখ মুজিবের ভাষণে সম্ভবতঃ এই কথাগুলোই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিলো:

১. আমি যদি হুকুম দেবার জন্য না থাকি, যদি আমার সহকর্মীরা না থাকেন, আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

২. খাজনা-ট্যাক্স সব কিছু বন্ধ করে দেবেন।

৩. এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তিনি কি তাঁর ভাষণে দেশ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জনগণকে স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি? ইয়াহিয়া খানের ঘোষিত

জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের নতুন তারিখ সম্পর্কে শেখ মুজিব শর্ত আরোপ করে দাবী জানালেন :

ক. অবিলম্বে সামরিক আইন তুলে নিতে হবে।

খ. সকল সৈন্য ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

গ. অসামরিক লোকদের ওপর গুলী বন্ধ করতে হবে। আগে যে সব গুলী চলেছে তার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

ঘ. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

ঙ. সামরিক সমাবেশ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

৮ই মার্চ থেকে সংগ্রাম এক সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করলো। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রদত্ত এ নির্দেশ তখন সকলেই অনুসরণ করেছিলেন। নির্দেশগুলো ছিলো :

ক. সরকারকে কেউ খাজনা-ট্যাক্স দেবেন না।

খ. সচিবালয়, সরকারী ও আধাসরকারী অফিসসমূহ, হাইকোর্ট ও অন্যান্য কোর্টে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করতে হবে। তবে পরিস্থিতি সাপেক্ষে সময়ে সময়ে উল্লিখিত দফতরগুলোর কোন কোন শাখাকে ধর্মঘট থেকে অব্যাহতি দেয়া হতে পারে।

গ. রেলওয়ে ও পোর্ট গুলোতে কাজ চলবে। তবে মানুষ মারার জন্য সৈন্য কিংবা সমরসম্ভার পরিবহন করা হলে রেলওয়ে কিংবা বন্দরের কর্মীরা সহযোগিতা করবেন না। রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রে আওয়ামী লীগের সকল বিবৃতি এবং আন্দোলনের বিস্তারিত খবরাখবর প্রচার করতে হবে, না করা হলে এই সংস্থায় কর্মরত বাঙালী কর্মচারিগণ কাজ করবেন না।

ঘ. শুধু স্থানীয় এবং আন্তঃজেলা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু থাকবে।

ঙ. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

চ. ব্যাংকসমূহ স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পয়সা পাঠাতে পারবে না।

ছ. প্রতিদিন ঘরে ঘরে কালো পতাকা ওড়াতে হবে।

জ. ওপরে যেসব সেক্টরের নাম করা হয়নি সেগুলোর ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হলো ; তবে পরিস্থিতি সাপেক্ষে এর যে-কোনটিতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ধর্মঘট ঘোষণা করা হতে পারে।

ঝ. প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা এবং জেলা পর্যায়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে।

সব শেষে শেখ মুজিব সরকারী অফিসারদেরকে তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে বললেন।

ইতিমধ্যে বিদেশী নাগরিকরা ঢাকা ত্যাগ করতে শুরু করলো। ৮ই মার্চ দশ হাজারেরও বেশী প্রবাসী বাঙালী লণ্ডনে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার দাবী জানালেন।

৯ই মার্চ থেকে জেনারেল টিক্কা খান সামরিক আইন প্রশাসকের পদে নিযুক্ত হলেন। এদিন বিকেলে পল্টন ময়দানের এক জনসভায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আন্দোলনের ১৪-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করলেন। রাজশাহীতে আবার কারফিউ জারি করা হলো। এদিন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব উথাণ্ট ঢাকাস্থ জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধিকে জাতিসংঘ কর্মচারীদের পরিবারবর্গকে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। জাপান এবং পশ্চিম জার্মানী সরকারও তাদের নাগরিকদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য ভাড়া করা বিমান পাঠানোর কথা ঘোষণা করলেন। ঐ দিনে ঢাকার সায়েন্স লেবরেটরী থেকে কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য খোয়া গেলো।

পরের দিন অর্থাৎ ১০ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে বললেন, 'কোন অশান্ত এলাকা থেকে নিজ কর্মচারীদের সরিয়ে নিলেই জাতিসংঘের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। আজ আমরা গণহত্যার হুমকির মুখোমুখি। এই হুমকি এদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৌলিক অধিকার—তথা জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদ লংঘনের হুমকি।'

এই দিন নারায়ণগঞ্জ জেলখানা থেকে ৪০ জন কয়েদী বেরিয়ে গেলো। নিরাপত্তা রক্ষীরা গুলী চালালে একজন কয়েদী নিহত এবং ২৫ জন আহত হলো। পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারিগণ শেখ মুজিবের প্রতি তাঁদের পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করলেন।

এ সময়ে পাকিস্তানী জেনারেল মিঠ্ঠা খান চট্টগ্রামে এলেন। তিনি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে (বাঙালী) এম. ভি. সোয়াত থেকে অস্ত্র খালাস করতে বললেন। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তাকে বললেন, "এটা করতে গেলে জনগণ মারমুখী হয়ে বাধা দেবে।"

"তা দিক। যত রক্তই ঝরুক, আমরা পরোয়া করি না।" সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল জবাব দিলেন। ১১ই মার্চ গুজব রটে যে ইয়াহিয়া খান শিগগিরই পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসছেন। জেলের গেট ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলো বরিশালে। এখানেও নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলীতে ২ জন নিহত, ২০ জন আহত হলো। ৪০ জন কয়েদী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠলো। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে জনগণ স্বাধীনতা অর্জনে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। কার্যতঃ তখন পূর্বাঞ্চলে সরকার

ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদগণ তাঁকে সমর্থন জানালেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভায় তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করার আহ্বান জানালেন। লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সকলেই আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করলেন।

১২ই মার্চ এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান পাকিস্তান সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানের গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের অদূরদর্শিতার কারণে যদি পূর্বাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তা হবে তাদের জন্য অমার্জনীয় অপরাধ। এদিকে, পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের বাঙালী সদস্য এবং পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসের সদস্যবৃন্দও শেখ মুজিব ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করলেন। তারা আওয়ামী লীগের ত্রাণ তহবিলে এক দিনের বেতন প্রদানের কথা ঘোষণার মাধ্যমে তাঁদের অকৃত্রিম সমর্থনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণেই জনগণকে করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন, সুতরাং পরবর্তী পদক্ষেপের পালা বর্তালো ইয়াহিয়া খানের।

এই পর্যায়ে বাঙালী নেতার সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য পাকিস্তানের কয়েকজন নেতা ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ করলেন। ১৩ই মার্চে আবার এদের এক বৈঠক হয়, অবশ্য পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং কাইয়ুম মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এতে যোগ দেননি। ভুট্টোর নীতি ভিন্নতর ছিলো এবং তিনি নিঃসন্দেহে ইয়াহিয়ার বুদ্ধিদাতা ছিলেন।[৩৫]

সরকারী এবং আধাসরকারী অফিসার কর্মচারীদের অব্যাহত ধর্মঘটের মুখে ১৪ই মার্চ সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ ১১৫ নং সামরিক আইন আদেশ জারি করলেন। নতুন আদেশে প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে যে সকল বেসামরিক কর্মচারী বেতন নেন, তাঁদেরকে ১৫ই মার্চ বেলা ১০টার মধ্যে কাজে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশে বলা হয়, যাঁরা কাজে যোগ দেবেন না তাদেরকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হবে। এই পদক্ষেপকে অনেকেই উস্কানিমূলক নির্বোধের কাজ বলে মন্তব্য করলেন।

১৫ই মার্চ কর্মচারীরা সামরিক আইন আদেশটি অমান্য করে এর বিরুদ্ধে মিছিল বের করলেন। এই সময়ে আরেকটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটলো। পাকিস্তান সরকার চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে আগত খাদ্যশস্য বোঝাই একটি জাহাজকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়।[৩৬]

কাজটি শুধু উস্কানিমূলকই ছিলো না; এটা ছিলো পূর্বাঞ্চলের জনগণের প্রতি পাকিস্তান সরকারের চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। এই পরিস্থিতিতে ১৪ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন:

"বাঙালীদের স্বাধীনতার উদ্যোগ কেউ দমাতে পারবে না।"[৩৭]

ইয়াহিয়া খানের সামরিক জান্তার অনুসৃত নীতি দু' অংশের জনগণকে একের প্রতি অপরকে বৈরী করে তোলে এবং ক্রমান্বয়ে দু' প্রদেশ দ্রুত বিস্তর ব্যবধানে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

পূর্বাঞ্চলে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি করা হচ্ছিলো এবং এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া খান অজুহাত দেখান যে, সীমান্ত বরাবর ভারতীয় সমর শক্তি বৃদ্ধির কারণেই এটা করা হচ্ছে। এ অজুহাত যে চরম মিথ্যা ছিলো সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম। সি-১৩০ পরিবহন বিমান এবং পি আই এ'র বোয়িং বোঝাই করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে সব সৈন্য আনা হচ্ছিলো তাদের কিন্তু প্রতিরক্ষার কাজে সীমান্ত এলাকায় যেতে দেখা গেলো না।

চট্টগ্রামে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ইপিআর'এর গোয়েন্দা ইউনিট থেকে খবর পাওয়া গেল যে, রাতে নৌ বাহিনীর সদর দফতর থেকে একটি বেসামরিক জীপে করে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ শহরে নিয়ে গিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী অবাঙালীদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। আমার গোয়েন্দারা একাজের হোতা হিসাবে নৌ বাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তানী লেফটেন্যান্ট তাজ এবং চট্টগ্রাম কমান্ডে কার্যরত মেজর (অবঃ) রিজভীকে সনাক্ত করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিশেষ কমান্ডো ইউনিটের সৈন্যদের দু' কিংবা তিন জনের দলে ভাগ হয়ে অবাঙালীদের সাথে বাস করতে দেখা যায়। এ প্রস্তুতি কিসের জন্য এবং কাদের বিরুদ্ধে তা আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম।

এদিকে, আমাদের প্রস্তুতিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে বিভিন্ন স্থানে যে সব সৈন্যদল মোতায়েন করা হয়েছিলো তাদের সর্বশেষ তালিকা সংগ্রহ করা হলো। প্রতিটি দলে বাঙালী ও অবাঙালীদের সংখ্যা কত তারও বিস্তারিত বিবরণ এই সব তালিকায় ছিলো। অয়্যারলেস সেটগুলো দূরবর্তী ফাঁড়িগুলোর সাথে স্বাভাবিক দু' ঘণ্টার স্থলে আধঘণ্টা অন্তর যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকলো। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন কোম্পানী এবং প্লাটুন গঠন করে নিম্নপদের সকল কমান্ডারকে আমি নিজে তাঁদের দায়িত্ব এবং অবস্থান সম্পর্কে সব কিছু বুঝিয়ে দিলাম। চট্টগ্রাম নগরীতে তখন ইপিআর সেনা সংখ্যা ছিলো প্রায় ৬ শতের মতো। এ সংখ্যা তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট ছিলো। অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং যোগাযোগ

স্থাপনের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মৌখিকভাবে সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হলো। সকলকে সব কিছু মনে রাখতে বললাম এবং আমার চূড়ান্ত নির্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরুর কথা বলে দিলাম।

এই সময় আমি আমার একজন লোককে ইপিআর সদর দফতরে পাঠালাম। তাঁর মাধ্যমে ঢাকার ইপিআর-এর বাঙালী সৈনিকদেরকে সতর্ক থাকতে এবং যে কোন সম্ভাব্য পরিস্থিতির জন্য তৈরী হতে বলা হয়। ইপিআর-এর ঢাকা দফতরে কার্যরত ক্যাপ্টেন দিলওয়ারের কাছে আমি ছোট্ট চিরকুট পাঠাই। চিরকুটে তাঁকে সবচাইতে সিনিয়র বাঙালী আর্মী অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের চেষ্টা করতে বলি। সংবাদবাহক চট্টগ্রাম ফিরে এলে সিগারেটের ভিতরের কাগজে দিলওয়ারের লেখা জবাবী চিরকুটটি পেলাম। চিরকুটটিতে লেখা ছিলো : "বড় কর্তার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।.....অনিচ্ছুক।"

৬

পূর্ব-প্রস্তুতি

দেশে মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য ভুট্টোর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠলো। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানেও তাঁর নিজের পার্টি এবং কাইয়ুম মুসলিম লীগ ছাড়া অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ তাঁকে তীব্রভাবে সমালোচনা করলেন। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ, ভুট্টোর খেলা তখনো শেষ হয়নি।

১৪ই মার্চ ভুট্টো প্রত্যেক প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে আলাদাভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে দাবী জানালেন;[৩৮] ভুট্টোর এই দাবীতে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দও নিন্দা জ্ঞাপন করলেন। ইয়াহিয়া খান অবশ্য এতে উদ্বিগ্ন হলেন না। নতুন দাবীটি বিতর্কিত বিষয় ছিলো। ইয়াহিয়া খানও বিতর্ক চাইছিলেন যাতে আলোচনার দীর্ঘসূত্রিতায় আরো সময় পাওয়া যায় এবং তা ছিলো তাঁর জন্য অত্যন্ত জরুরী। ১৫ই মার্চ শেখ মুজিবের সঙ্গে আরো আলোচনার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া খান ঢাকা এলেন।[৩৯] সামরিক বাহিনীর পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে সঙ্গে নিয়ে এলেন আরো কয়েকজন জেনারেলকে।

ইয়াহিয়া খান সব কিছুই বেশ ধীরেসুস্থে করছিলেন এবং শেখ মুজিবের সাথে দেখা করার ব্যাপারেও তেমন তাড়া দেখাননি। পরদিন শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। এ বৈঠক আড়াই ঘণ্টা ধরে চললো। বৈঠক শেষে সাংবাদিকরা শেখ মুজিবকে আলোচনার পরিবেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলো কিনা প্রশ্ন করলে তিনি তার জবাবে বললেন, আমাকে আর প্রশ্ন করবেন না।[৪০]

১৬ই মার্চ 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র নিচের বিবৃতিটি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হলো:

"পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, জোহা হল, মনুজান হল, যশোর এবং রংপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম এবং ঢাকার ফার্মগেট দ্বিতীয় রাজধানী ও কচুক্ষেত এলাকায় পাশবিক অত্যাচার চালায়। অনেক লোক

খুন হয়েছে এবং স্ত্রীলোক পর্যন্ত ওদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে অবশ্যই এসব সৈন্য ফিরিয়ে নিতে হবে।[৪১]

১৭ই মার্চ শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়ার আর এক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠক এক ঘণ্টা চললো। বৈঠক শেষে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের মুজিব জানালেন, 'আলোচনা চলবে।' বৈঠকে যে কোন অগ্রগতি হয়নি তা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিলো। জনগণ ইয়াহিয়াকে আর বিশ্বাস করতে পারছিলো না। এই সময়ে অনেকে ইয়াহিয়ার এইসব বৈঠক এবং আলোচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রকাশ্যেই সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। ভুট্টোর যোগসাজশে পশ্চিম পাকিস্তানে বসে সামরিক জান্তা গণহত্যার পরিকল্পনা নিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় সময় কাটাচ্ছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছিল।

ঢাকায় যখন আলোচনা চলছিলো ভুট্টো তখন করাচীতে বসে গরম গরম বিবৃতি দিয়ে উত্তেজনা জিইয়ে রাখছিলেন। তিনি হুমকি দিলেন তাঁর মতামত ছাড়া কোন ফয়সালা হলে তা প্রতিরোধ করা হবে।[৪২] ইয়াহিয়া কিন্তু এসব বিবৃতি গায়েই মাখলেন না। স্পষ্টই বোঝা গেলো যে, ভুট্টোর এসব হুমকির লক্ষ্য আদৌ ইয়াহিয়া নন।

আমার একজন বিশ্বস্ত অফিসার ক্যাপ্টেন হারুন ছিলেন ইপিআর-১৭ উইং-এর সদর দফতর কাপ্তাইয়ে। আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা এবং করণীয় সম্পর্কে কিছু বলার জন্য মার্চের প্রথম সপ্তাহে তাঁকে আমার বাসভবনে আসতে বললাম। আমি তাঁকে শেষবারের মতো প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেই মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে। তখনই আমি তাঁকে গোপনীয় সাংকেতিক বার্তার অর্থ জানিয়ে দেই।

কাপ্তাই এলাকার সকল অপারেশনের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত ছিলো এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী পরে চট্টগ্রামে আমার সাথে যোগ দেয়ার কথা ছিলো। আমার সমর দফতর স্থাপন করা হয়েছিলো চট্টগ্রাম রেলওয়ে হিল এলাকায়।

১৭ই মার্চ আমি চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর তরুণ বাঙালী অফিসারদেরকে পূর্বাপর ঘটনা এবং আমার প্রস্তাবিত কর্মপন্থা অবহিত করার জন্য সারসন রোডস্থ আমার বাসায় আমন্ত্রণ জানালাম।

সন্ধ্যার ঠিক পরে ক্যাপ্টেন অলি, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান এবং লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন বেবী ট্যাক্সিতে এলেন। সে সময় আমি আমার বাসার লনে পায়চারী করতে করতে কোন্ কথা দিয়ে কথা শুরু করবো এবং কি পরামর্শ দেবো সে সম্পর্কেই ভাবছিলাম। কিছুক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন হারুন, ডাঃ জাফর এবং জনাব কায়সারও এলেন। ডাঃ জাফরের সাথে আগেই কথা হয়েছিলো যে, প্রথমে আমরা আমার বাসায় মিলিত হবো। তারপর যে যার পথে শহর

থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান জনাব আলমের বাসায় গিয়ে পুনরায় মিলিত হবো। জনাব আলমকে একথা আগেই বলা ছিলো। আমাদের বৈঠক সম্পর্কে পুরাপুরি গোপনীয়তা রক্ষার জন্যই এরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

আগত অফিসারদের আমি জানাই তাদের সাথে আমার গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা আছে এবং আলম সাহেবের বাসায় গিয়ে তাঁরা কথা বলতে রাজী কিনা। অফিসাররা সম্মতি জানালেন, তারপর ডাঃ জাফর, জনাব আতাউর রহমান কায়সার এবং আমি একটি গাড়ীতে আর ক্যাপ্টেন অলি, হারুন, খালেকুজ্জামান এবং মবিন ক্যাপ্টেন হারুনের ভক্স ওয়াগনে জনাব আলমের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। সেখানে এঁদের সাথে আমার প্রায় আধ ঘণ্টা কথা হলো। ডাঃ জাফর এবং জনাব কায়সার বাড়ীর চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন। আমি তাঁদেরকে বললাম, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালীদের ওপর হামলা চালানোর জন্য শক্তি সঞ্চয় করছে। প্রস্তুতি পূর্ণ হলেই তারা আঘাত হানবে। ওদেরকে আঘাত হানার জন্যে আমরা তৈরী না হলে ওরা আমাদের সবাইকে হত্যা করবে। এমতাবস্থায় আমাদের কি সশস্ত্র আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়া উচিত নয়? ওদের আগেই আমাদের আক্রমণ করা দরকার।

অফিসাররা আমার সঙ্গে একমত হলেন। ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে অফিসাররা অবহিত দেখে আমি খুশী হলাম। আমি তাঁদেরকে বললাম, প্রায় ১৫০০ বাঙালী ইপিআর সেনা নিয়ে আমি প্রস্তুত রয়েছি এবং ঠিক সময়ে ওদের ওপর আঘাত হানবো। আমি মনে করি আপনারাও খবর পাবার সাথে সাথে আপনাদের সৈন্যদল নিয়ে আমার সাথে যোগ দেবেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, যেহেতু ডাঃ জাফরের পক্ষে চিকিৎসক হিসাবে আমাদের সাথে যে-কোন সময় দেখা করা সম্ভব হবে এবং তাতে কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না। কাজেই তাঁর মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হবে। এরপর রাত সাড়ে দশটায় বৈঠক শেষ করে আমরা যার যার বাসায় ফিরে এলাম।

ঢাকার প্রেসিডেণ্ট হাউসে ইয়াহিয়ার তখন কার্যতঃ বন্দীদশা। বিরাট সশস্ত্র রক্ষীদল ছাড়া তিনি চলাফেরা করতে পারেন না। পূর্ব পাকিস্তানে তখন শেখ মুজিবের কিংবা তার দলের নির্দেশ ছাড়া কিছুই চলছিলো না, কোন কাজই হচ্ছিলো না। আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলীই ছিলো তখন দেশের সর্বোচ্চ আইন। ইয়াহিয়ার কর্তৃত্ব প্রহসনে পরিণত হয়েছিলো।

১৮ই মার্চ আমি জনাব সিদ্দিকীর বাসায় তাঁর সাথে দেখা করলাম এবং সেনাবাহিনীর যে-কোন তৎপরতা প্রতিরোধে আমাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে শেখ মুজিবকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানালাম।

ওই দিনই আমি মেজর জিয়াউর রহমান এবং লেঃ কর্ণেল এম. আর. চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ও প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করলাম। তরুণ অফিসারদের আমি আগে যে সব পরামর্শ দিয়েছি খোলা-খুলিভাবে তাও তাঁদেরকে জানালাম। উপযুক্ত সময়ে শত্রুর ওপর আগেই আঘাত হানতে তাঁরা আমার সঙ্গে যোগ দিতে রাজী আছেন সেকথাও বললাম। এরূপ পরিস্থিতিতে আমার মূল পরিকল্পনা গোপন রেখে আমি তাঁদেরকে জানালাম, চট্টগ্রাম বিমান বন্দর, নৌবাহিনীর সদর দফতর, পোর্ট, টেলিফোন একচেঞ্জ এবং বেতার কেন্দ্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বাঙালী ইপিআর সেনাদের দিয়ে এগুলো আমি দখল করে রাখতে পারবো। আমি তাঁদেরকে আরো বললাম যে, ক্যান্টনমেন্ট দখল করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব। কারণ, সেখানে তাঁদেরকে শুধু ২০ বালুচ রেজিমেন্টের মোকাবিলা করতে হবে। এই একটি মাত্র পশ্চিম পাকিস্তানী ইউনিট তখন ক্যান্টনমেন্টে ছিলো যার সৈন্যসংখ্যা ছিলো আনুমানিক তিন শ'য়ের মতো। অপর পক্ষে সেনানিবাসের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে ছিল ২০৩০ বাঙালী সৈন্য। লেঃ কর্নেল চৌধরী এই কেন্দ্রেরই সবচেয়ে সিনিয়র বাঙালী অফিসার ছিলেন। তাঁর পক্ষে ২০০০ বাঙালী সেনা নিয়ে সহজেই ২০ বালুচ রেজিমেন্টকে নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব ছিলো। ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ৩৩০ বাঙালী সৈন্যের পক্ষেও রেজিমেন্ট-সেন্টারের সৈন্যদের সহায়তায় এগিয়ে আসা সম্ভব ছিলো। মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন ৮ ইস্ট বেঙ্গলের সব চাইতে সিনিয়র অফিসার। তাঁদেরকে আরও বললাম, ক্যান্টনমেন্টের এই কাজের জন্য প্রয়োজনবোধে যথাসময়ে ইপিআর এর একটি কোম্পানী তাঁদের সাহায্যে পাঠানো যেতে পারে। পাক সেনাদের সমর-আয়োজনের প্রশ্নে তাঁরা আমার সাথে একমত হলেন, সেকারণে আমাদের দিক থেকে কোন সশস্ত্র কার্যক্রম গ্রহণ করা ঠিক হবে কি না সেবিষয়ে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তবে তাঁরা কথা দিলেন, যদি কিছু ঘটেই, তবে তাঁরা জনগণের সাথেই থাকবেন, পাক সেনাদের সঙ্গে নয়।

পরিস্থিতি কিন্তু এর চাইতেও ঘোলাটে ছিলো। ঢাকায় রাজনৈতিক আলোচনা দুঃখজনকভাবে মন্থর গতিতে এগুচ্ছিলো। ১৮ই মার্চ ভুট্টো করাচী থেকে সাফ জানিয়ে দিলেন আলোচনার জন্য তিনি ঢাকা গেলেও কোন ফল হবে না।[৪৩] এইদিন শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে কোন বৈঠক হলো না।

জনগণের মধ্যে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছিলো। তারা দলে দলে মিছিল করে শেখ মুজিবের ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে এসে তাঁর এবং আন্দোলনের সাথে একাত্মতা

ঘোষণা করতে থাকলো। কিন্তু সকলের মধ্যে ছিলো একটি উদ্বেগাকুল প্রশ্ন, "কি হচ্ছে, এর পর কি হবে?"

পাকিস্তানের সামরিক সরকার বুঝতে পেরেছিল যে, ইপিআর এবং পুলিশ বাহিনীই হবে এই অঞ্চলের লোকের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রধান উৎস। এও পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে কোন সামরিক কার্যক্রমে ইপিআর এবং পুলিশ অস্ত্র ধরবে না। কয়েকটি ঘটনায়ও একথার প্রমাণ মেলে। একটি ঘটনায় বাঙালী ইপিআর নায়েব-সুবেদার আহসান উল্লাহ বাঙালী বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলী চালাতে অস্বীকার করে এবং পরে, আরেক জন নায়েব-সুবেদার সালেক উদ্দিনও একই ভাবে অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনার পরে তাঁদের দু'জনকেই গ্রেফতার করা হয় এবং ২৫শে মার্চের পর পাক বাহিনী তাঁদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইপিআর-এর এই স্বাধীনতাকামী এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় শেখ মুজিব মুগ্ধ হয়ে শুধু ইপিআর এবং পুলিশ বাহিনীর ওপর আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব ন্যাস্ত করার দাবী জানান।

১৯শে মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয় বেলা ১১টায়। বৈঠক শেষে আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, "সবচাইতে ভাল কিছুর আশা করছি এবং সবচাইতে খারাপের জন্যও প্রস্তুত রয়েছি।"[৪৪] সম্ভবতঃ এই জবাবের অর্থ ছিলো আলোচনায় আরো অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ঐ দিন সন্ধ্যায় ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা এবং শেখ মুজিবের উপদেষ্টা জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং ডঃ কামাল হোসেনের মধ্যে দু' ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলে। ঢাকায় যখন এ আলোচনা চলছিলো তখন ২২ মাইল দূরে জয়দেবপুরে পাক সেনাবাহিনীর একটি দলের সাথে বাঙালীদের মুখোমুখি একটি সংঘর্ষ ঘটলো।[৪৫]

ঢাকা ব্রিগেডের কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব ৬ জন অফিসার এবং ৭০ জন সৈন্য নিয়ে জয়দেবপুর যাচ্ছিলেন। জানা যায়, চীনা সহযোগিতায় নির্মিত অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী প্রহরারত ইপিআর এর একটি দলকে নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা সেখানে যাচ্ছিলেন। খবর পেয়ে জনসাধারণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। ব্রিগেডিয়ার তখন অস্ত্রের মুখে বেসামরিক লোকদের সহায়তায় ব্যারিকেডগুলো সরিয়ে এগুতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে বিক্ষুব্ধ জনতা আরো দৃঢ়তর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে জাহানজেব তাঁর সৈন্যদেরকে গুলী বর্ষণের নির্দেশ দেন। এই ঘটনায় দু'জন নিহত ও পাঁচজন আহত হয় বলে সরকার স্বীকার করেন। বেসরকারী হিসাব অনুযায়ী

এখানে সেদিন আনুমানিক ১৫০ জন নিহত হয় বলে জানা যায়। পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে বাঙালীদের মনোভাবের কথা জানা থাকা সত্ত্বেও সেদিন ব্রিগেড কমাণ্ডার সশস্ত্র দল নিয়ে কেন জয়দেবপুরের দিকে যাচ্ছিলেন সে ব্যাখ্যা অবশ্য কেউই দেননি।

একই দিন বেঙ্গল রেজিমেণ্টের কিছুসংখ্যক সৈন্য একটি বেডফোর্ড গাড়ীতে টাঙ্গাইল থেকে জয়দেবপুর আসছিলো। পথে বিক্ষুব্ধ জনতা তাদেরকে থামিয়ে কয়েকজন সৈন্যকে আটক করে এবং ৪টি রাইফেল ও কয়েকটি স্টেনগান ছিনিয়ে নেয়।

পরের দিন কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা এলেন। ভুট্টোও ইয়াহিয়া খানের আমন্ত্রনের জবাবে ঘোষণা করলেন, তিনি ইয়াহিয়া খানের জবাবে সন্তুষ্ট এবং শিগগীরই ঢাকা আসছেন। 'সন্তুষ্ট' বলতে তিনি কি বোঝাতে চাইলেন তা গোপন রাখা হলো। এদিন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল হামিদকে ঢাকায় দেখা গেলো। এরপর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সেনানিবাসে ঘোরাঘুরি শুরু করেন। একই দিন চট্টগ্রামে নিযুক্ত সকল আর্মী অফিসারের এক বৈঠক হলো সার্কিট হাউসে। এখানে সভাপতিত্ব করেন রেজিমেণ্টাল সেণ্টার কমাণ্ডার এবং চট্টগ্রাম সেক্টরে ৪ঠা মার্চে নিযুক্ত সহকারী সামরিক আইন প্রশাসক ব্রিগেডিয়ার মজুমদার। আমাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বললেনঃ "এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, আর্মী অফিসাররা পর্যন্ত এখন পরস্পরকে অবিশ্বাস করছেন। লক্ষ্য করেছি, কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার তাঁদের বাঙালী পরিচারকদের বদলী করেছেন। কয়েকজন বাঙালী অফিসারও একটু ব্যবস্থা নিয়েছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক। সেনাবাহিনীতে আঞ্চলিকতাবাদের কোন স্থান নেই।"

তাঁর কথা সত্যি। একারণেই, জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বাঙালী স্টাফ অফিসারকে সরিয়ে সেখানে পাকিস্তানপন্থী অফিসারকে বসানো হলো। বৈঠক চলাকালে সবাই একদিকে ব্রিগেডিয়ারের ভাষণ শুনছিলেন এবং অন্যদিকে একে অন্যের প্রতি সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে দূরত্ব এত বেড়ে গিয়েছিলো যে, সেতুবন্ধন আর সম্ভব ছিলো না।

বৈঠকের কিছু পরেই ২০ বালুচ রেজিমেণ্টের কমাণ্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল ফাতমী আমাকে চা পানের আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি বললেন, "দেখুন, আমরা সবাই একটি ঐক্যবদ্ধ সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি থাকা উচিত নয়।" অয়্যারলেস কলোনী এলাকার ঘটনা নিয়ে আমাদের

মধ্যে যে কথা কাটাকাটি হয়েছিলো, বুঝলাম তিনি সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করছেন। সেদিন চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সামনে আমি তাঁকে অভিযুক্ত করে বলেছিলাম, তিনি সাদা পোশাকে ছদ্মাবরণে তাঁর সৈন্যদের দিয়ে বাঙালীদের খুন করাচ্ছেন।

কর্ণেল ফাতমী একটি ব্রিফকেস খুললেন, ব্রিফকেসটি ১০০ টাকার নোটের বাণ্ডিলে ভর্তি ছিলো। মুখে শ্লেষের হাসি ফুটিয়ে তিনি বললেন, শুনেছি, "আপনাদের শেখ মুজিব নাকি নির্দেশ দিয়েছেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোন টাকা বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না।" আমার জবাব দেয়ার আগেই তিনি আবার বললেন: "ওসব কথায় আমাদের কিছুই এসে যায় না। দেখুন, এই টাকা আমি বাড়ীতে পাঠাচ্ছি।"

সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কোরের বাঙালী অফিসার কর্ণেল কাদির তখন তেল ও গ্যাস উন্নয়ন সংস্থায় ডেপুটেশনে ছিলেন। ঐদিন রাতে গোপনে আমি কর্ণেল কাদিরের বাসভবনে গেলাম ডাঃ জাফরও আমার সঙ্গে ছিলেন। আমার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে কর্ণেল স্থির কণ্ঠে বললেন, "আপনার জিনিস রেডী। ট্রেইণ্ড লোকও পাওয়া যাবে।" এর আগে তাঁর কাছ থেকে কিছু বিস্ফোরক এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজন লোক সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করেছিলাম।

২০শে মার্চ চট্টগ্রামের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ দোকান থেকে অস্ত্রশস্ত্র গুলী ইত্যাদি সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। আসলে ঢাকায় সামরিক আইন সদর দফতরের নির্দেশেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো। এতে লোকের মনে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হলো। ২১শে মার্চের ভোরে অন্দরকিল্লার দোকানগুলো থেকে অস্ত্র সরানোর জন্য পুলিশ পাঠানো হলো। ক্ষুব্ধ জনতা তাঁদের বাধা দিলো। কোন অবস্থাতেই তারা এ গুলো সরাতে দিলো না। এরপর এইভাবে একটা রফা হয় যে, দোকানগুলো ডবল তালা লাগিয়ে সিল করা অবস্থায় থাকবে। একটি চাবি থাকবে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে একজন আওয়ামী লীগ নেতার কাছে, আরেকটি চাবি থাকবে জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কাছে।

২১শে মার্চ ভুট্টো ঢাকা পৌঁছার দু' ঘণ্টা পরেই ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁর গোপন আলোচনা শুরু হলো। আলোচনা দু'ঘণ্টা চললো। এর আগে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সঙ্গে এক ঘণ্টা ধরে এক অনির্ধারিত বৈঠক করলেন। পরদিন ২২শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান, ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর মধ্যে এক যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। আলোচনার ফলাফল হলো আরেক দফা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী। প্রেসিডেণ্ট হাউস থেকে এক ঘোষণায় বলা হলো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্যমত সৃষ্টির জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন বলে

প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের উভয় অংশের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনা করে ২৫শে মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[৪৬] ঐক্যমত বলতে যে কি বোঝান হলো তা অবশ্য রহস্যাবৃতই থেকে গেলো। রাজনৈতিক কুজ্ঝটিকা সৃষ্টির কাজ তখন সম্পূর্ণ। আগেই বলেছি, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল হামিদ ২০শে মার্চ এখানে আসার পর থেকেই এক ক্যান্টনমেন্ট থেকে অন্য ক্যান্টনমেন্টে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর যেন তখন নিঃশ্বাস ফেলারও সময় ছিলো না।

২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসের স্বাভাবিক অনুষ্ঠান বাতিল করা হলো এবং ইয়াহিয়া খান একটা মীমাংসার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত আছেন এরূপ ভান করলেন। বাইরের কেউই অবশ্য জানতে পারছিলেন না যে, আসলে কি ধরনের আলোচনা চলছে এবং তার অগ্রগতিই বা কতখানি। ফলে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় এগুচ্ছিলো।

২৩শে মার্চ রাতে ডাঃ জাফরকে নিয়ে আমি আবার জনাব সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা করলাম। ঢাকায় কি হচ্ছে এবং আলোচনার অগ্রগতিইবা কতখানি তা জানার জন্য আমরা উদগ্রীব ছিলাম। জনাব সিদ্দিকীকে কালবিলম্ব না করে ঢাকা যাবার অনুরোধ জানালাম এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তাঁর সদর দফতর চট্টগ্রামে স্থাপন করার অনুরোধ জানাতে বললাম। প্রয়োজনবোধে চট্টগ্রামকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আমার ইপিআর সেনারা যে প্রস্তুতি নিয়েছে সেকথাও তাঁকে অবহিত করতে অনুরোধ করলাম। জনাব সিদ্দিকী নেতাকে আমার অনুরোধগুলো জানাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

গভীর রাতে তাঁর বাসভবন থেকে যখন আমরা বেরুলাম তখন কুয়াশার পাতলা আবরণে সারা শহর ছেয়ে গেছে। পরদিন সকালেই জনাব সিদ্দিকী নেতার সঙ্গে দেখা করার জন্য ঢাকা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

এদিকে আরেক ঘটনা ঘটলো। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 'এম.ভি. সোয়াত' নামের একখানি জাহাজ এসে পৌঁছলো। চট্টগ্রামে সামরিক সমাবেশ না গড়ে তোলার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের দাবী সত্ত্বেও অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বোঝাই এই জাহাজের আগমন অবশ্যই একটা বড় রকমের উস্কানিমূলক তৎপরতা ছিলো। বন্দরের শ্রমিকরা এই জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করতে অস্বীকৃতি জানালো। এসব অস্ত্রশস্ত্র বাঙালীদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হবে মনে করে তারা প্রতিরোধ গড়ে তুললো। শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, জাহাজ থেকে মালামাল খালাস করা হবে, তবে তা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যেতে দেয়া হবে না। বন্দরের ট্রানজিট ক্যাম্পেই রাখা হবে।

২৪শে মার্চ জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা হেলিকপ্টারে চট্টগ্রাম পৌঁছলেন। পশ্চিম পাকিস্তানী ব্রিগেডিয়ার আনসারী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। বিকেলে জেনারেল খাদেম ব্রিগেডিয়ার মজুমদারসহ ঢাকা ফিরলেন। চট্টগ্রামের দায়িত্বে রেখে গেলেন ব্রিগেডিয়ার আনসারীকে। অস্ত্র খালাসের ঘটনাটি বাঙালী ব্রিগেডিয়ার নরম হাতে নিয়ন্ত্রণ করায় পাকিস্তানীরা খুশী হতে পারেনি। এইসব অস্ত্রশস্ত্র ব্যতিরেকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত নতুন সৈন্যরা ছিলো শক্তি-হীন। এজন্যই ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে সরানো হয়। তাঁর অপসারণ এবং সাথে সাথে ব্রিগেডিয়ার আনসারীকে নিয়োগ ছিলো নাটকীয় এবং বিরল ঘটনা। সমগ্র বিষয়টির গুরুত্ব আমাদের আরো চিন্তায় ফেলে দিলো। ব্রিগেডিয়ার আনসারীর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ২৪শে মার্চ সোয়াত থেকে অস্ত্র খালাস করা শুরু হলো। ডক শ্রমিকরা আগে এ কাজ করতে অস্বীকার করেছিলো বলে ইস্ট-বেঙ্গল রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের নবাগতদের এ দায়িত্ব দেয়া হলো। এতে চট্টগ্রামের লোকেরা আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। বন্দর থেকে কাণ্টনমেণ্ট পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় তারা ব্যারিকেড সৃষ্টি করলো। সাথে সাথে রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য সৈন্য নিয়োগ করা হলো। বিক্ষুব্ধ জনতার একটি দল এ সময় বন্দরের দিকে এগোতে থাকে। ইতিপূর্বে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিলো সেনা-বাহিনী তা বাতিল করে দেয়। মিছিলে লোকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। "যে কোন মূল্যে অস্ত্র নামাতেই হবে" বলে ব্রিগেডিয়ার আনসারী হুংকার ছাড়লেন। শুধু তাই নয়, অবশেষে জেটি এলাকা পাক বাহিনীর গণহত্যার প্রথম পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হলো। সেদিন পাক সেনাদের গুলীতে কতজন মারা গিয়েছিলো, কতজন আহত হয়েছিলো, হয়তো তার সঠিক সংখ্যা কখনও জানা যাবে না।

গণহত্যার মুহূর্ত এতো ঘনিয়ে আসছিলো যে, ব্রিগেডিয়ার আনসারীকে যে-কোন মূল্যে কাজ শেষ করতে হচ্ছিলো। উত্তেজনা তখন তুঙ্গে, গুজব তখন দাবানলের মতো। এমনকি আমার ব্যাটম্যান ইপিআর সিপাই সাত্তার আতংক-গ্রস্ত কণ্ঠে বললো, "ওরা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে, স্যার।"

২৪শে মার্চ-এর দিবাগত রাতে আমি গেলাম আমার প্রস্তাবিত সেই সমর-দফতর রেলওয়ে হিলে। জনাব হকের টেলিফোনে আমি হালিশহরে আমার সেনাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলাম এবং সাংকেতিক বার্তা দুটি অয়্যারলেসে সকল ইপিআর সেনাদলের কাছে পৌঁছে দিতে বললাম। বার্তা পেলো কিনা তা জানার জন্য যখন আমি অপেক্ষা করছিলাম, তখন একটি বেবী ট্যাক্সি পাহাড়ের পথ বেয়ে উঠে আমার কাছাকাছি থামলো। আমি তখন বড় একটা গাছের নিচে বসা। আমার বাঁদিকে নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে কর্ণফুলী নদী। সামনে

আগ্রাবাদ এবং বন্দর এলাকা। দূরে বিশাল সাগর। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এম. এ. চৌধুরী এবং মেজর জিয়াউর রহমান বেবী ট্যাক্সি থেকে নেমে এলেন। তাঁদের সঙ্গে আমার কথা হলো—মত বিনিময় হলো। 'ওরা এক ভয়াবহ গণহত্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে'—আমার এ কথার জবাবে সেদিন তাঁরা বলেছিলেন, 'অতখানি আশংকা করার কিছু নেই, ওরা অমন চরম ব্যবস্থা নেবে না।' তারা আমাকে বিদ্রোহমূলক কিছু না করার পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! মাত্র ২৪ ঘণ্টা পরেই নেমে এলো ২৫শে মার্চের ভয়াবহ কালোরাত। ২৪শে মার্চের রাতে শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা আঘাত হানতে পারিনি বলেই হয়তো আমাদের অনেক বেশী মূল্য দিতে হলো। সৃষ্টি হলো পৃথিবীর জঘন্যতম গণহত্যার ইতিহাস।

৭

চরম আঘাতের সেই রাত

২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সাল। বৃহস্পতিবার।

অন্যান্য দিনের মতো সকাল ৭টায় আমি আমার অফিসে গেলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি পশ্চিম পাকিস্তানী মেজর ইকবাল বসে আছেন। তিনি আমাকে দেখেই বললেন, "মিঃ রফিক, আপনাকে দারুণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। অনেক খাটুনি গেছে আপনার ওপর দিয়ে। কক্সবাজার গিয়ে কয়েকদিন বিশ্রাম নিন না কেন? ইচ্ছা হলে আজই যেতে পারেন। আমি কমাণ্ডিং অফিসারকে বলে দেব।"

এটা ঠিক, গত কয়েক বছরের মধ্যে আমি কোন ছুটি নেইনি। বিশ্রামের আমার খুবই প্রয়োজন ছিলো। তবু মেজর ইকবালের সেদিনের অস্বাভাবিক পীড়াপীড়ি আমার ভালো লাগলো না, বরং আমার সন্দেহকে আরও ঘনীভূত করলো। তাঁকে আমি শান্ত গলায় জবাব দিলাম, "ধন্যবাদ স্যার। কিন্তু স্যার, আপনি তো জানেন গত জানুয়ারী থেকে সব ছুটি বাতিল করা হয়েছে।"

ওকথা বাদ দিন। আমি কমাণ্ডিং অফিসারকে বুঝিয়ে বলতে পারবো। আমার বিশ্বাস, তিনি ছুটি মঞ্জুর করবেন।" মেজর ইকবাল তবু বলে চললেন।

মেজর ইকবাল যে কমাণ্ডিং অফিসারের একজন প্রিয়পাত্র তা আমরা সবাই জানতাম। আমাকে চট্টগ্রাম শহরের বাইরে এবং আমার সৈন্যদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার জন্য মেজর ইকবালের এ প্রচেষ্টা আমাকে ভাবিয়ে তুললো। আমি তাঁর কথায় তাল না দিয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য বললাম, "আপনি বোধকরি জানেন, গতকাল পোর্ট এলাকায় জনতার ওপর সৈন্যরা গুলী চালিয়েছে, অনেক লোক মারা গেছে।"

'অনেক নয়'—যেন তেমন কিছুই ঘটেনি এমন ভাব দেখিয়ে তিনি বললেন, "মাত্র একজন কিংবা, দু'জন আহত হয়েছে।"

এরপর তিনি মুখে কৌতূহলোদ্দীপক হাসি ফুটিয়ে বললেন, "শুনলাম শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক পদক্ষেপের প্রতিবাদে আগামী ২৭শে মার্চ হরতাল ডেকেছেন।"

"আমি এখনো শুনিনি, তবে পোর্ট এলাকায় যে সৈন্যরা এলোপাতাড়ি গুলী চালিয়েছে তার শব্দ আমাদের অফিসে বসেও শোনা গেছে।"

সেদিন বেলা ২টায় আমি ইপিআর সদর দফতর ত্যাগ না করা পর্যন্ত মেজর ইকবাল সারাক্ষণ আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করলেন।

ইয়াহিয়ার সাথে মীমাংসায় পৌঁছে গেছে বলে এ সময়ে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে। তবে নির্ভরযোগ্য কোন মহল থেকে এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলো না। সরকারী বেতারে একটা রাজনৈতিক ফয়সালার আভাস দেয়া হয়। কিন্তু এ খবরের ওপরও নির্ভর করা গেলো না। বাসা থেকে সেই মুহূর্তে আমি আমার সদর দফতরে টেলিফোন করে সকল সৈন্যকে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলাম। তারপরে বাড়ীর লনে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলাম।

এই দিন (২৫শে মার্চ) বেলা ১১টায় সেনাবাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে মেজর জেনারেল জানজুয়া, মেজর জেনারেল মিঠ্ঠা খান, মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ এবং আরো একজন জেনারেল (সম্ভবতঃ জেনারেল ওমর) রংপুর গেলেন। সে সময় রংপুরে ২৩ ব্রিগেডের কমাণ্ডে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার আবদুল আলী মালিক। তিনি হেলিপ্যাডে জেনারেলদের অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁদেরকে সরাসরি তাঁর বাসভবনে নিয়ে গেলেন। এ সময়ে ১৪শ ডিভিশন সদর দফতরের কর্ণেল স্টাফের হাতে একটি সিল করা প্যাকেট ছিলো, অন্যরা ছিলেন খালি হাতে। মাত্র কয়েক মিনিট পর তাঁরা হেলিপ্যাডে ফিরে এসে রংপুর ত্যাগ করলেন। ফেরার সময় কারো হাতে আর সিল করা প্যাকেটটি দেখা গেলো না। ব্রিগেডিয়ারের বাসভবনে সে প্যাকেটটি তাঁকে দেয়া হয়েছিলো।

হেলিকপ্টার চলে যাবার পর ব্রিগেডিয়ার আবদুল আলী মালিক ব্রিগেড সদর দফতরে বিভিন্ন ইউনিট কমাণ্ডারদের এক সম্মেলন ডাকলেন। সকল ইউনিট কমাণ্ডারই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। শুধু ইপিআর-এর প্রতিনিধি ছিলেন বাঙালী ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ। তিনি ১০ম উইংয়ের সহকারী কমাণ্ডার ছিলেন। বোধ হয় সম্মেলনে একজন বাঙালী অফিসারের উপস্থিতি ব্রিগেডিয়ারের মনঃপুত ছিলো না। তাই তিনি নওয়াজিশকে সরাসরি বলে দিলেন, "নওয়াজিশ, এখানে আপনার উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু সেনাবাহিনীর ব্যাপারে আলাপ করবো। সুতরাং এখানে অযথা আপনার সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। তার চাইতে বরং আপনি শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখুন।"

নওয়াজিশ ব্রিগেড সদর দফতর ত্যাগ করলেন, কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে শুধু হেলিপ্যাডে এবং সদর দফতরে দেখা সন্দেহজনক দৃশ্যগুলো ঘুরপাক খেতে থাকলো।

রংপুর থেকে হেলিকপ্টার রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লা ক্যান্টনমেণ্ট ঘুরে বিকালে ঢাকা ফিরে এলো। ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ইয়াহিয়ার প্রধান আলোচনাকারী এম. এম. আহমদ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেণ্ট হাউস ত্যাগ করলেন বিকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে। গোপনে তিনি বিমানযোগে ঢাকা থেকে সরাসরি করাচী চলে গেলেন। সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে প্রেসিডেণ্টের ঢাকা ত্যাগের খবর প্রথম জানা গেলো।

শহরের বিভিন্ন স্থানে ইপিআর সৈন্যরা ডিউটিতে ছিলো। 'মীমাংসা হয়ে গেছে' এই অজুহাত দেখিয়ে এক নির্দেশে বলা হলো, ইপিআর সেনাদের আর ডিউটি দেয়ার দরকার নেই।

তাদেরকে অস্ত্রাগারে অস্ত্রও জমা দিতে বলা হলো। এসব নির্দেশে ইপিআর সদস্যদের মনে সন্দেহ দেখা দিলেও তাদের আর কিছু করার ছিলো না। ইতিমধ্যে ২২ বালুচ রেজিমেণ্টের সৈন্যরা পিলখানার প্রায় সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দিয়েছিলো।

ঐদিন বেলা ২টার দিকে ২২ বালুচ রেজিমেণ্টের একটি কোম্পানী খেলার পোশাকে পিলখানা এলাকার চারদিক ঘুরে দেখলো। তারা এমন ভাব দেখালো যেন এটা তাদের নিয়মিত শরীর চর্চারই অংশ। আসলে চারিদিক ঘুরে তারা পিলখানার ভেতরে ইপিআর সেনাদের অবস্থান দেখে রাখছিলো যাতে রাতে সঠিকভাবে লক্ষ্যস্থলের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে।

পূর্বের নির্দেশ অনুযায়ী সন্ধ্যার মধ্যে সকল ইপিআর সেনা তাদের অস্ত্র অস্ত্রাগারে জমা দিয়ে দিলো। ২২ বালুচ রেজিমেণ্ট নীরবে ইপিআর সিগন্যাল যোগাযোগ কেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়ে নিলো এবং অবাঙালী সিগন্যাল সেনাদের ডিউটিতে নিয়োজিত করলো। গেটেও এই রেজিমেণ্টের সেনাদের ডিউটি দেয়া হলো এবং পিলখানার ভিতরে প্রবেশ কিংবা সেখান থেকে বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হলো।

আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে এমন একটা গুঞ্জন ঢাকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। যে-কোন সময় কারফিউ হতে পারে আশঙ্কায় লোকজন দ্রুত ঘরে ফিরতে শুরু করলো। এরূপ অবস্থায় লোকজন কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো এবং সামরিক আইন আরো কঠোর হতে পারে, কারফিউ অমান্য করলে এলোপাতাড়ি গুলী চলতে পারে ইত্যাদি আশঙ্কায় শঙ্কিত বোধ করলো; কিন্তু তাদের সামনে যে গণহত্যা ঘনিয়ে আসছে এতোদূর কেউ ধারণা করতে পারলো না। বিভিন্ন ঘাঁটিতে নিযুক্ত শুধু সিনিয়র পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক অফিসার ছাড়া এ পরি-

কল্পনার কথা আর কারো জানার উপায় ছিলো না। গণহত্যার নীলনক্সা সিল করা প্যাকেটে করে বিশেষ হেলিকপ্টারযোগে জেনারেলরা ঢাকা থেকে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেন। এ নীল নক্সার নির্দেশনামায় গণহত্যার খুটিনাটি বিবরণ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ ছিলো এবং তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন চীফ অব জেনারেল স্টাফ জেনারেল হামিদ খান এবং চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছিলেন ইয়াহিয়া খান। প্রত্যেক ক্যান্টনমেন্টে সিলকরা প্যাকেট পৌঁছার পর থেকেই ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়ে যায়।

চট্টগ্রামে বেলা ৪টা ৩০ মিনিটের দিকে ডাঃ জাফর আমার বাসায় এলেন। লনে বসে আমরা সম্ভাব্য সবকিছু নিয়ে আলোচনা করলাম। কিন্তু তখনো ঢাকার কোন নির্ভরযোগ্য খবর আমরা পাইনি। রাত ৮টার দিকে ডাঃ জাফর ঢাকার কোন সংবাদ এসেছে কিনা জানার জন্য আওয়ামী লীগ অফিসের দিকে গেলেন। আমি আমার এক বন্ধু ক্যাপ্টেন মুসলিম উদ্দিনকে নিয়ে অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগেই রাতের খাবার খেয়ে নেয়ার জন্য বাসার ভিতরে গেলাম। খাওয়া কেবল শুরু করেছি, এমন সময় একজন আওয়ামী লীগ কর্মীসহ ডাঃ জাফর আবার ফিরে এলেন। রাত তখন ৮টা ৩০ মিনিট।

"মনে হচ্ছে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গোপনে করাচী চলে গেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা ট্যাংক নিয়ে শহরের দিকে বেরিয়ে পড়েছে বলে খবর এসেছে।" তারা দু'জনই উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় এতো উত্তেজিত ছিলো যে তাদের মুখ দিয়ে যেন কথা সরছিলো না।

"আপনি কি সত্যি সংবাদ বলছেন?"—তবু আমি ডাঃ জাফরকে জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ। ঢাকা থেকেই আমরা এ খবর পেয়েছি। খবর পেয়েই আমাদের দল জনাব সিদ্দিকীর বাসায় রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে জনাব সিদ্দিকী আমাদেরকে অবিলম্বে আপনাকে ঢাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে বলেছেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন।" এতগুলো কথা বলে উভয়ে একটু থামলেন এবং গভীর আশা নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। তাঁদের দুজনকেই বিষণ্ন দেখাচ্ছিলো। আমি শুনতে পেলাম, কে যেন খুব নীচু গলায় বললো, "এবার আপনার পালা।"

তখনও আমার হাত ভাতের থালায়। মুহূর্তের জন্য আমি গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম। ওদিকে আগ্রহী আগন্তুকদের স্থির দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ।

সেনাবাহিনী ট্যাংক নিয়ে শহরের দিকে বেরিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই তারা ভয়ানক কিছু ঘটাবে। সব চাইতে খারাপ কিছুর কথাই এখন আমাদের ভাবা

উচিত। ওরা মার্চ থেকেই ওরা নির্বিচারে বাঙালীদের হত্যা করছে। শুধু ২৪শে মার্চ চট্টগ্রাম পোর্টে ২০ জনেরও বেশী লোক নিহত হয়েছে। আরো খবর পেয়েছিলাম বাংলাদেশের সর্বত্রই ওদের হত্যাকাণ্ড চলছে—ঢাকা, খুলনা, যশোর, রংপুর, সৈয়দপুর, রাজশাহীসহ আরো অনেক জায়গায় গুলী চলেছে। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায়ও এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রাম ইপিআর-এর দুটি অয়্যারলেস সেটই ঢাকায় পিলখানার সাথে যোগাযোগ করতে পারছিলো না। এমন কোন দিন ঘটেনি। সন্দেহ আগে থেকেই গভীরতর হয়ে উঠছিলো।

এসব দ্রুত আমার মানসপটে ভেসে উঠলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থেকে জেনেছি, ওদেরকে কোন জায়গায় একবার লেলিয়ে দেয়া হলে হেন নৃশংসতা নেই যা ওরা করতে পারে না। ইয়াহিয়ার আকস্মিক ঢাকা ত্যাগ, আলোচনা ব্যর্থ হওয়া এবং ক্যান্টনমেণ্ট থেকে সেনাবাহিনীর বের হওয়া—সব কিছু মিলিয়ে একটা বেপরোয়া হত্যালীলার সুস্পষ্ট আভাস পাচ্ছিলাম। আরো আশংকা করছিলাম, সামরিক বাহিনীর বাঙালী সৈন্যরাও ওদের হাত থেকে নিস্তার পাবে না।

এ সময় নিজের ভেতর থেকেই আমি যেন এক অলৌকিক সাহস অনুভব করলাম। মনে হলো আমার ভেতর থেকে কে যেন আমাকে বলছে আমার নিজের জীবন এবং আমাদের অন্যান্যের জীবন রক্ষার জন্য এ পশুশক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এরপর আমি 'হয় স্বাধীনতা অর্জন না হয় ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যু' এধরণের এক চরম সিদ্ধান্ত নিলাম। ডাঃ জাফরকে বললাম: "আমাদের জনগণকে মুক্ত করার জন্য পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে আমি আমার ইপিআর সেনাদের নিয়ে যুদ্ধ করবো। আপনারা ষোল শহরে এবং ক্যান্টনমেণ্টে গিয়ে বাঙালী সৈন্যদের আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলুন। তারপর রেলওয়ে হিলে আমার সদর-দফতরে দেখা করবেন।"

খাওয়া থেকে উঠেই আমি হালি শহরে ইপিআর সদর দফতরে ফোন করলাম। সেখানে বাঙালী জেসিও'রা আমার নির্দেশের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তাঁদেরকে বললাম, "এক্ষুণি সব ফাঁড়িতে দ্বিতীয় সাংকেতিক বার্তাটি পাঠিয়ে দিন। অস্ত্রাগার নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। পাকিস্তানী সৈন্যদের রুম থেকে বের হতে দেবেন না। নৌ-বাহিনী সদর দফতরের দিক থেকে হামলা হতে পারে। সেদিকে প্রতিরক্ষামূলক কিছু সৈন্য মোতায়েনের ব্যবস্থা করুন। আমি আসছি।"

এরপর আমার পরিচারক সাত্তারকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র আমার এক বন্ধুর বাসায় সরিয়ে রাখতে এবং সব সময়ের জন্য টেলিফোনের কাছে থাকতে বললাম। আমার পুরোনো পাচক আহমদ সরল মনে জিজ্ঞেস করে, "স্যার,

কিছুই তো খেলেন না। রান্না কি ভালো হয়নি?" আমি কিছু বলার আগেই দেখি, সাত্তার তাকে রান্নাঘরের দিকে সরে যেতে বলছে। সৈনিক হিসাবে সে বুঝতে পেরেছিলো, আমরা ভয়ংকর কিছু একটা করতে যাচ্ছি।

রাত তখন ৮টা ৪৫ মিনিট। আমি শেষবারের মতো আমার সারসন রোডস্থ বাসভবন ত্যাগ করলাম। আমার সামনে তখন এক নূতন স্বপ্ন—অন্যান্যের মত এ স্বপ্ন আমিও লালন করে এসেছি দীর্ঘ দিন থেকে। এ স্বপ্ন ছিলো অনিশ্চয়তায় ভরা। "যুদ্ধে কি অন্যান্য সৈনিক আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন? শেখ সাহেব কি ঢাকা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবেন? আমি কি কোনদিন মুক্ত মানুষ হতে পারবো? স্বাধীন জাতি দেখার সৌভাগ্য কি আমার হবে না?" এই ধরনের নানা প্রশ্ন আমার মাথার মধ্যে অবিরাম ঘুরপাক খেতে লাগলো।

বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে তখন স্নিগ্ধ বাতাস বইছিলো। আমাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল অয়্যারলেস কলোনীর দিকে আমাদের গাড়ী ছুটে চললো। আমার পাশে ড্রাইভার কালাম এবং পেছনের সিটে দু'জন রক্ষী। তীব্র উত্তেজনায় সবাই ঠোঁট কামড়াচ্ছিলো। রাস্তা জনমানবশূন্য। আমাদের গাড়ী যতই অয়্যারলেস কলোনীর কাছাকাছি এগোচ্ছিলো, উত্তেজনা ততই বাড়ছিলো। একটা সরু রেল ক্রসিংয়ের ওপর আসতেই জীপ একটু লাফিয়ে উঠলে আমার চিন্তায় ছেদ পড়লো। আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। এখান থেকে আমি অয়্যারলেস স্টেশনের এ্যানটেনা দেখতে পাচ্ছিলাম। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অয়্যারলেস ষ্টেশনের চারদিক ছিলো কাঁটা তারে ঘেরা। যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে সেজন্য আমি ড্রাইভারকে গাড়ী আস্তে চালাতে বললাম। আমাদের এখানকার সাফল্য ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তামূলক ডিউটিতে নিযুক্ত ইপিআর-এর একটি প্লাটুনের মোকাবিলা করতে হবে আমাদের ৪ জনকে—ওদেরকে নিরস্ত্র করতে হবে। আমার রেকর্ড অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন হায়াত এবং সুবেদার হাসমত এই প্লাটুনের কমাণ্ডে ছিলেন। বাকী সেনারা সবাই ছিলো বাঙালী। আমাদের জানামতে এখানে আরো তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ছিলো। অনুরূপভাবে নগরীর অন্যান্য এলাকাতেও ইপিআর প্লাটুন অবস্থান করছিলো। তবে অয়্যারলেস কলোনীর এই প্লাটুনটিই শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারের কমাণ্ডে ডিউটিরত ছিলো।

গেটে পৌঁছুতেই প্রহররত শান্ত্রী জীপ থামিয়ে দিলো। বাঙালী শান্ত্রী প্রহররত ছিলো। সে আমার জীপটি ভেতরে যাবার অনুমতি দিলো। আমরা ক্যাপ্টেন হায়াতের রুমের সামনে গিয়ে জীপ থামালাম। সেখানেও একজন শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছিলো।

সাবধানে আমি হায়াতের কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মারাত্মক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, হয় সফল হবো, না হয় আমার মাথা ভেদ করে একটা বুলেট বেরিয়ে যাবে। শেষেরটি সত্যি হলে চট্টগ্রামের ইপিআর সেনা পরিচালনা করতে আর কোন বাঙালী অফিসার থাকবে না। এই চিন্তা আমাকে কিছুটা বিহ্বল করে তুললো ক্ষণিকের জন্য।

আমি খুব আস্তে দরজায় নক করলাম এবং বন্ধু সুলভ গলায় বললাম, "হ্যালো হায়াত, ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি?"

"এই কেবল শুয়েছি স্যার।" আমার গলার স্বর চিনতে পেরে সে আলো জ্বাললো। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে আমি দেখলাম বালিশের তলা থেকে কি যেন একটা নিয়ে সে তার শোবার পোশাকের নিচে রাখছে। দরজা খোলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আমি অবার জিজ্ঞেস করলাম, "সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো?"

"সব ঠিকঠাক হ্যায়", জবাব দিয়েই সে দরজা খুললো।

"প্লিজ, ভেতরে আসুন স্যার, এবং···"

তার কথা শেষ না হতেই আমি স্টেনগান তার বুকের ওপর ধরে বললাম, "আমি দুঃখিত হায়াত, তোমাকে গ্রেফতার করতে হচ্ছে।" হঠাৎ সে তার পিস্তল বের করার উদ্যোগ নিতেই ড্রাইভার কালাম দ্রুত এগিয়ে আসে এবং দুজনেই হায়াতের মাথায় আঘাত করি। সাথে সাথে আমরা তার হাত ও মুখ বেঁধে ফেললাম এবং টেলিফোনের তার কেটে দিলাম। তারপর পাশের ব্যারাকে ঘুমন্ত সুবেদার হাসমতকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালাম। সুবেদার হাসমত চোখ মুছতে মুছতে উঠে এসে স্যালুট দিয়ে দাঁড়াতেই কালাম এবং অন্য প্রহরীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাসমতকে আটক করে তার হাত ও মুখ বেঁধে ফেলা হলো।

হায়াতের রুমের সামনে দাঁড়ানো শান্ত্রীটি এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে এইসব অদ্ভুত ঘটনা দেখছিলো। হঠাৎ কি মনে করে সে একটি টিলার দিকে দৌড় দিলো। কালাম ফিসফিস কণ্ঠে বললে, "ও পশ্চিম পাকিস্তানী" এবং পর মুহূর্তেই একটি বুলেট সাঁ করে চলে গেলো। আমরা নীচু হয়ে বসে পড়লাম। ব্যারাকগুলো থেকে সৈন্যরা বেরিয়ে পড়তে লাগলো।

যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় আমি বললাম, শান্ত্রী ভুল করে গুলী ছুঁড়েছে। তারপর সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলাম। অন্য তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করলো। যে শান্ত্রী গুলী ছুঁড়েছিলো সে অস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেলো। এই প্লাটুন থেকে আমি ১০ জন সেনাকে রেলওয়ে হিলে আমার সম্ভাব্য সমর-দফতর রক্ষা করার জন্য পাঠালাম। অন্যদেরকে

হালিশহরে আমার সঙ্গে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিলাম। বিচ্ছিন্ন প্লাটুনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বিভিন্ন দিকে কয়েকজন বার্তাবাহককে পাঠালাম এবং চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য সবাইকে অবিলম্বে হালিশহরে আমার সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দিলাম।

অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে একটি দুঃসাধ্য কাজ সমাধা হলো। ড্রাইভার কালাম এবং দুজন প্রহরীকে ধন্যবাদ, তারা জীবন বিপন্ন করে একাজে সহায়তা করেছে।

অয়্যারলেস স্টেশন থেকে বেরিয়ে ঘড়ি দেখলাম, তখন রাত ৯টা ১০ মিনিট। "এবার জোরে চালাও" ড্রাইভার কালামকে বললাম। পেছনের সিটের প্রহরী দুজনকে বললাম, "খুব ভালো কাজ করেছো।" এটু হেসে ওরা জবাব দিলো, "ইনশাআল্লাহ, আমরা জিতবোই, স্যার।"

রাত সাড়ে ন'টায় আমরা হালিশহরে পৌঁছলাম। ড্রাইভার কালামকে সতর্ক করে আলো নিভিয়ে দিয়ে আস্তে চালাবার নির্দেশ দিলাম। হালিশহরে জেসিও এবং এনসিও'রা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো। তিনটি অস্ত্রাগারের সবকটিই আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিলো। বাঙালী সেনারা যারযার অস্ত্রাগারের সামনে অস্ত্র ও গুলীর জন্য সমবেত হয়েছে। মাত্র একমাস আগে আমরা থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলের পরিবর্তে বিপুল পরিমাণ চীনা হাতিয়ার ও গোলাবারুদ পেয়েছিলাম। এগুলো মিলিয়ে আমাদের মজুত ছিলো উদ্বৃত্ত, যা পরে খুবই কাজে লেগেছিলো।

আমার অফিস খোলাই ছিলো। অফিসের পাশেই একটি বিশ্রাম কক্ষ। কক্ষটির দরজা জানালার পর্দা ফেলে দিয়ে ৪ জন সশস্ত্র সৈন্যকে এখানে বসিয়ে রাখলাম। তারপরেই শুরু হলো নাটক।

হালিশহরের কাজটি ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ছিলো প্রায় ৩০০ পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআর সৈন্য। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো সিনিয়ার জেসিও এবং এনসিও। নিঃশব্দে এদের পরাভূত করতে হবে। কেননা আমার সদর দফতরের চারপাশের এলাকায় ছিলো অবাঙালীদের ঘন বসতি। এছাড়া বেশ কিছুসংখ্যক কমাণ্ডো সেসব অবাঙালীর সঙ্গে বসবাস করছে বলে আগেই খবর পেয়েছিলাম এবং কমাণ্ডো ও অবাঙালীরা সবাই ছিলো পুরাপুরি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। কাজেই এখানে কোন শব্দ হলে গোটা ব্যাপারটা পণ্ড হয়ে যাবে।

অস্ত্রাগার আমাদের কব্জায় থাকায় আমরা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলাম। শুধু একটি মাত্র বিপদ ছিলো, কেউ যদি গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয় তাহলে চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে কিংবা নৌবাহিনী সদর দফতর থেকে পাকিস্তানী বাহিনী আমাদের প্রচেষ্টা বানচাল করতে ছুটে আসতে পারে।

সাবধানে আমি হায়াতের কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মারাত্মক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, হয় সফল হবো, না হয় আমার মাথা ভেদ করে একটা বুলেট বেরিয়ে যাবে। শেষেরটি সত্যি হলে চট্টগ্রামের ইপিআর সেনা পরিচালনা করতে আর কোন বাঙালী অফিসার থাকবে না। এই চিন্তা আমাকে কিছুটা বিহ্বল করে তুললো ক্ষণিকের জন্য।

আমি খুব আস্তে দরজায় নক করলাম এবং বন্ধু সুলভ গলায় বললাম, "হ্যালো হায়াত, ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি?"

"এই কেবল শুয়েছি স্যার।" আমার গলার স্বর চিনতে পেরে সে আলো জ্বাললো। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে আমি দেখলাম বালিশের তলা থেকে কি যেন একটা নিয়ে সে তার শোবার পোশাকের নিচে রাখছে। দরজা খোলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আমি অবার জিজ্ঞেস করলাম, "সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো?"

"সব ঠিকঠাক হ্যায়", জবাব দিয়েই সে দরজা খুললো।

"প্লিজ, ভেতরে আসুন স্যার, এবং···"

তার কথা শেষ না হতেই আমি স্টেনগান তার বুকের ওপর ধরে বললাম, "আমি দুঃখিত হায়াত, তোমাকে গ্রেফতার করতে হচ্ছে।" হঠাৎ সে তার পিস্তল বের করার উদ্যোগ নিতেই ড্রাইভার কালাম দ্রুত এগিয়ে আসে এবং দুজনেই হায়াতের মাথায় আঘাত করি। সাথে সাথে আমরা তার হাত ও মুখ বেঁধে ফেললাম এবং টেলিফোনের তার কেটে দিলাম। তারপর পাশের ব্যারাকে ঘুমন্ত সুবেদার হাসমতকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালাম। সুবেদার হাসমত চোখ মুছতে মুছতে উঠে এসে স্যালুট দিয়ে দাঁড়াতেই কালাম এবং অন্য প্রহরীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাসমতকে আটক করে তার হাত ও মুখ বেঁধে ফেলা হলো।

হায়াতের রুমের সামনে দাঁড়ানো শান্ত্রীটি এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে এইসব অদ্ভুত ঘটনা দেখছিলো। হঠাৎ কি মনে করে সে একটি টিলার দিকে দৌড় দিলো। কালাম ফিসফিস কণ্ঠে বললে, "ও পশ্চিম পাকিস্তানী" এবং পর মুহূর্তেই একটি বুলেট সাঁ করে চলে গেলো। আমরা নীচু হয়ে বসে পড়লাম। ব্যারাকগুলো থেকে সৈন্যরা বেরিয়ে পড়তে লাগলো।

যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় আমি বললাম, শান্ত্রী ভুল করে গুলী ছুঁড়েছে। তারপর সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলাম। অন্য তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করলো। যে শান্ত্রী গুলী ছুঁড়েছিলো সে অস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেলো। এই প্লাটুন থেকে আমি ১০ জন সেনাকে রেলওয়ে হিলে আমার সম্ভাব্য সমর-দফতর রক্ষা করার জন্য পাঠালাম। অন্যদেরকে

হালিশহরে আমার সঙ্গে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিলাম। বিচ্ছিন্ন প্লাটুনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বিভিন্ন দিকে কয়েকজন বার্তাবাহককে পাঠালাম এবং চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য সবাইকে অবিলম্বে হালিশহরে আমার সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দিলাম।

অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে একটি দুঃসাধ্য কাজ সমাধা হলো। ড্রাইভার কালাম এবং দুজন প্রহরীকে ধন্যবাদ, তারা জীবন বিপন্ন করে একাজে সহায়তা করেছে।

অয়্যারলেস স্টেশন থেকে বেরিয়ে ঘড়ি দেখলাম, তখন রাত ৯টা ১০ মিনিট। "এবার জোরে চালাও" ড্রাইভার কালামকে বললাম। পেছনের সিটের প্রহরী দুজনকে বললাম, "খুব ভালো কাজ করেছো।" এটু হেসে ওরা জবাব দিলো, "ইনশাআল্লাহ, আমরা জিতবোই, স্যার।"

রাত সাড়ে ন'টায় আমরা হালিশহরে পৌঁছলাম। ড্রাইভার কালামকে সতর্ক করে আলো নিভিয়ে দিয়ে আস্তে চালাবার নির্দেশ দিলাম। হালিশহরে জেসিও এবং এনসিও'রা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো। তিনটি অস্ত্রাগারের সবকটিই আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিলো। বাঙালী সেনারা যারযার অস্ত্রাগারের সামনে অস্ত্র ও গুলীর জন্য সমবেত হয়েছে। মাত্র একমাস আগে আমরা থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলের পরিবর্তে বিপুল পরিমাণ চীনা হাতিয়ার ও গোলাবারুদ পেয়েছিলাম। এগুলো মিলিয়ে আমাদের মজুত ছিলো উদ্বৃত্ত, যা পরে খুবই কাজে লেগেছিলো।

আমার অফিস খোলাই ছিলো। অফিসের পাশেই একটি বিশ্রাম কক্ষ। কক্ষটির দরজা জানালার পর্দা ফেলে দিয়ে ৪ জন সশস্ত্র সৈন্যকে এখানে বসিয়ে রাখলাম। তারপরেই শুরু হলো নাটক।

হালিশহরের কাজটি ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ছিলো প্রায় ৩০০ পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআর সৈন্য। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো সিনিয়ার জেসিও এবং এনসিও। নিঃশব্দে এদের পরাভূত করতে হবে। কেননা আমার সদর দফতরের চারপাশের এলাকায় ছিলো অবাঙালীদের ঘন বসতি। এছাড়া বেশ কিছুসংখ্যক কমাণ্ডো সেসব অবাঙালীর সঙ্গে বসবাস করছে বলে আগেই খবর পেয়েছিলাম এবং কমাণ্ডো ও অবাঙালীরা সবাই ছিলো পুরাপুরি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। কাজেই এখানে কোন শব্দ হলে গোটা ব্যাপারটা পণ্ড হয়ে যাবে।

অস্ত্রাগার আমাদের কব্জায় থাকায় আমরা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলাম। শুধু একটি মাত্র বিপদ ছিলো, কেউ যদি গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয় তাহলে চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে কিংবা নৌবাহিনী সদর দফতর থেকে পাকিস্তানী বাহিনী আমাদের প্রচেষ্টা বানচাল করতে ছুটে আসতে পারে।

আমরা প্রথমে সমগ্র এলাকা ঘেরাও করে ফেললাম যাতে কোন পশ্চিম পাকিস্তানী পালাতে না পারে। এরপর শুরু হলো শত্রু সৈন্যদের গ্রেফতারের পালা।

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে অনেক বাঙালী জেসিও এবং এনসিও'কে সীমান্ত এলাকায় পাঠিয়ে চট্টগ্রামের ইপিআর সদর দফতরে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মোতায়েন করা হয়েছিলো। চট্টগ্রামের ইপিআর কমাণ্ডার ছিলেন লেঃ কর্ণেল আবদুল আজিজ শেখ। নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য ঢাকার নির্দেশে তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

এইসব বদলী ইত্যাদির ব্যাপারে প্রথমে আমি খুবই চিন্তিত হয়েছিলাম। পরে দেখলাম যে, এটা আমার পরোক্ষ উপকারেই লেগেছে। কারণ, এক জায়গায় এতগুলো শত্রু সৈন্য পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

আমি কৌশলে অস্ত্রাগারে বাঙালীদের মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম। দিনের বেলা আমি শুধু বাঙালী সেনাদের চুলকাটা, পোশাক ও আচরণ পরীক্ষা করে দেখতাম। এদেরকে সংশোধনের অছিলায় শাস্তি হিসাবে অস্ত্রাগার প্রহরার অতিরিক্ত ডিউটি দিতাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাতেই এই ডিউটি পড়তো। ফলে অস্ত্রাগারের কাছে আর কোন পশ্চিম পাকিস্তানীর থাকার দরকার হতো না। আমার এই ব্যবস্থা খুবই কাজে লেগেছিলো।

তখন রাত ১০টা। আমি আমার অফিসের বারান্দায় অস্থিরভাবে পায়চারী করছি। ভীষণ ক্ষুধাবোধ করছিলাম, উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছিলো। পানি চেয়ে পরপর দু' গ্লাস খেয়ে ফেললাম। সৈন্যদের ইতিমধ্যে অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয়ে গেলো। নৌ-বাহিনীর সদর দফতর থেকে কোন হামলা হলে তা প্রতিরোধ করার জন্য দু'টি প্লাটুন এর মধ্যেই সেদিকে পাঠানো হয়েছিলো। আমি পশ্চিম পাকিস্তানী সবচাইতে সিনিয়র জেসিও সুবেদার মেজর ইতবার-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

কোনরূপ সন্দেহ না করেই সুবেদার মেজর আমার অফিস রুমে প্রবেশ করলেন। আমি তাঁকে বসতে বললাম। তারপর বললাম, "সুবেদার-মেজর সাহেব; আপনিতো ঘুমাচ্ছিলেন। শহরে কি ঘটেছে জানেন কিছু?"

"না স্যার" সরলভাবেই তিনি জবাব দিলেন। আসলেও তিনি কিছুই জানতেন না। তিনি শুধু দেখেছেন যে, সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে এবং তিনি এটাকে আমার নেতৃত্বে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ডিউটির অঙ্গ বলে মনে করেছিলেন। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ গণহত্যা পরিকল্পনার কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করায় ব্রিগেডিয়ারের নিচের পদের খুব কমই এ ব্যাপার জানতে পারে।

মাত্র কয়েকজন লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল এ ব্যাপারে জানতে পেরেছিলেন। এ কড়াকড়ি গোপনীয়তা প্রকারান্তরে আমাদেরই কাজে লেগেছিলো।

সুবেদার-মেজর হঠাৎ চোখ কচলে দেখলেন পাশের বিশ্রাম কক্ষ থেকে চারজন সৈন্য বেরিয়ে এসে রাইফেলের বেয়োনেট তাঁর বুকের ওপর ধরেছে। আমি তখন দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, "সুবেদার-মেজর সাহেব, আপনাকে গ্রেফতার করা হলো। চিৎকারের কিংবা পালাবার চেষ্টা করলেই প্রাণ হারাবেন।"

তাঁর হাত বেঁধে বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। এভাবেই অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সকল পশ্চিম পাকিস্তানী জেসিওকে গ্রেফতারের পালা শেষ হলো। এ গোপনীয়তা রক্ষা না করলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যেতো। সে ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান সুদৃঢ় হবার আগেই পাকিস্তান সেনা-বাহিনী কিংবা নৌবাহিনীর লোকেরা আমাদের আক্রমণ করে বসতো।

এর কিছু পরেই ইপিআর সিগন্যাল কোম্পানীর দায়িত্বে নিয়োজিত অবাঙালী জেসিও সুবেদার মোবিনকে আমার কক্ষে ডাকলাম। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআর সেনারা কিছু একটা ঘটেছে বলে আঁচ করে ফেলে। কিন্তু নিরস্ত্র অবস্থায় তাদের আর কিছু করার ছিলো না। কেননা, গোটা এলাকা আমাদের সৈন্যরা আগেই ঘেরাও করে ফেলেছিলো।

সুবেদার অফিসে ঢুকতেই দেখি সে খুব আতঙ্কিত। ঠিক এ সময়ে মেজর ইকবালের টেলিফোন এলো। আমি রিসিভার তুলে ধরতেই ওপাশ থেকে তিনি বললেন, "হ্যালো রফিক, এতো রাতে ওখানে কি করছেন?"

"এখানকার গার্ডরা সতর্ক আছে কিনা, দেখতে এসেছি।"

"আচ্ছা।" মুহূর্তের জন্য তিনি থামেন, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করেন, "সুবেদার মোবিন কোথায়?"

"তিনি হয়তো রুমে ঘুমাচ্ছেন। কথা বলবেন তাঁর সাথে?"

"হ্যাঁ, দয়া করে টেলিফোনটা তাঁকে দিন না।"

"আমি এক্ষুনি তাঁর কাছে লোক পাঠাচ্ছি। তিনি এলেই আপনাকে ফোন করতে বলবো।" সন্দেহ নিরসনের জন্য আমি আরো কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ চালিয়ে যাই, সৈন্যরা "ডিউটি দিচ্ছে কিনা তা কয়েকটি জায়গায় দেখে এসেছি, সবকিছু ঠিক আছে।

এরপর হঠাৎ তাঁর প্রশ্ন শুনে ধাক্কা খেলাম। "কিন্তু ক্যাপ্টেন হায়াতের টেলিফোন কেউ ধরছে না কেন?"

"ওহ! ওর টেলিফোনটা খারাপ। এইমাত্র ওর ওখান থেকে এলাম। সুন্দর এক কাপ চা খাওয়ালো।"

আমরা প্রথমে সমগ্র এলাকা ঘেরাও করে ফেললাম যাতে কোন পশ্চিম পাকিস্তানী পালাতে না পারে। এরপর শুরু হলো শত্রু সৈন্যদের গ্রেফতারের পালা।

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে অনেক বাঙালী জেসিও এবং এনসিও'কে সীমান্ত এলাকায় পাঠিয়ে চট্টগ্রামের ইপিআর সদর দফতরে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মোতায়েন করা হয়েছিলো। চট্টগ্রামের ইপিআর কমাণ্ডার ছিলেন লেঃ কর্ণেল আবদুল আজিজ শেখ। নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য ঢাকার নির্দেশে তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

এইসব বদলী ইত্যাদির ব্যাপারে প্রথমে আমি খুবই চিন্তিত হয়েছিলাম। পরে দেখলাম যে, এটা আমার পরোক্ষ উপকারেই লেগেছে। কারণ, এক জায়গায় এতগুলো শত্রু সৈন্য পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

আমি কৌশলে অস্ত্রাগারে বাঙালীদের মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম। দিনের বেলা আমি শুধু বাঙালী সেনাদের চুলকাটা, পোশাক ও আচরণ পরীক্ষা করে দেখতাম। এদেরকে সংশোধনের অছিলায় শাস্তি হিসাবে অস্ত্রাগার প্রহরার অতিরিক্ত ডিউটি দিতাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাতেই এই ডিউটি পড়তো। ফলে অস্ত্রাগারের কাছে আর কোন পশ্চিম পাকিস্তানীর থাকার দরকার হতো না। আমার এই ব্যবস্থা খুবই কাজে লেগেছিলো।

তখন রাত ১০টা। আমি আমার অফিসের বারান্দায় অস্থিরভাবে পায়চারী করছি। ভীষণ ক্ষুধাবোধ করছিলাম, উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছিলো। পানি চেয়ে পরপর দু' গ্লাস খেয়ে ফেললাম। সৈন্যদের ইতিমধ্যে অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয়ে গেলো। নৌ-বাহিনীর সদর দফতর থেকে কোন হামলা হলে তা প্রতিরোধ করার জন্য দু'টি প্লাটুন এর মধ্যেই সেদিকে পাঠানো হয়েছিলো। আমি পশ্চিম পাকিস্তানী সবচাইতে সিনিয়র জেসিও সুবেদার মেজর ইতবার-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

কোনরূপ সন্দেহ না করেই সুবেদার মেজর আমার অফিস রুমে প্রবেশ করলেন। আমি তাঁকে বসতে বললাম। তারপর বললাম, "সুবেদার-মেজর সাহেব; আপনিতো ঘুমাচ্ছিলেন। শহরে কি ঘটেছে জানেন কিছু?"

"না স্যার" সরলভাবেই তিনি জবাব দিলেন। আসলেও তিনি কিছুই জানতেন না। তিনি শুধু দেখেছেন যে, সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে এবং তিনি এটাকে আমার নেতৃত্বে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ডিউটির অঙ্গ বলে মনে করেছিলেন। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ গণহত্যা পরিকল্পনার কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করায় ব্রিগেডিয়ারের নিচের পদের খুব কমই এ ব্যাপার জানতে পারে।

মাত্র কয়েকজন লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল এ ব্যাপারে জানতে পেরেছিলেন। এ কড়াকড়ি গোপনীয়তা প্রকারান্তরে আমাদেরই কাজে লেগেছিলো।

সুবেদার-মেজর হঠাৎ চোখ কচলে দেখলেন পাশের বিশ্রাম কক্ষ থেকে চারজন সৈন্য বেরিয়ে এসে রাইফেলের বেয়োনেট তাঁর বুকের ওপর ধরেছে। আমি তখন দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, "সুবেদার-মেজর সাহেব, আপনাকে গ্রেফতার করা হলো। চিৎকারের কিংবা পালাবার চেষ্টা করলেই প্রাণ হারাবেন।"

তাঁর হাত বেঁধে বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। এভাবেই অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সকল পশ্চিম পাকিস্তানী জেসিওকে গ্রেফতারের পালা শেষ হলো। এ গোপনীয়তা রক্ষা না করলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যেতো। সে ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান সুদৃঢ় হবার আগেই পাকিস্তান সেনা-বাহিনী কিংবা নৌবাহিনীর লোকেরা আমাদের আক্রমণ করে বসতো।

এর কিছু পরেই ইপিআর সিগন্যাল কোম্পানীর দায়িত্বে নিয়োজিত অবাঙালী জেসিও সুবেদার মোবিনকে আমার কক্ষে ডাকলাম। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআর সেনারা কিছু একটা ঘটেছে বলে আঁচ করে ফেলে। কিন্তু নিরস্ত্র অবস্থায় তাদের আর কিছু করার ছিলো না। কেননা, গোটা এলাকা আমাদের সৈন্যরা আগেই ঘেরাও করে ফেলেছিলো।

সুবেদার অফিসে ঢুকতেই দেখি সে খুব আতঙ্কিত। ঠিক এ সময়ে মেজর ইকবালের টেলিফোন এলো। আমি রিসিভার তুলে ধরতেই ওপাশ থেকে তিনি বললেন, "হ্যালো রফিক, এতো রাতে ওখানে কি করছেন?"

"এখানকার গার্ডরা সতর্ক আছে কিনা, দেখতে এসেছি।"

"আচ্ছা।" মুহূর্তের জন্য তিনি থামেন, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করেন, "সুবেদার মোবিন কোথায়?"

"তিনি হয়তো রুমে ঘুমাচ্ছেন। কথা বলবেন তাঁর সাথে?"

"হ্যাঁ, দয়া করে টেলিফোনটা তাঁকে দিন না।"

"আমি এক্ষুনি তাঁর কাছে লোক পাঠাচ্ছি। তিনি এলেই আপনাকে ফোন করতে বলবো।" সন্দেহ নিরসনের জন্য আমি আরো কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ চালিয়ে যাই, সৈন্যরা "ডিউটি দিচ্ছে কিনা তা কয়েকটি জায়গায় দেখে এসেছি, সবকিছু ঠিক আছে।

এরপর হঠাৎ তাঁর প্রশ্ন শুনে ধাক্কা খেলাম। "কিন্তু ক্যাপ্টেন হায়াতের টেলিফোন কেউ ধরছে না কেন?"

"ওহ! ওর টেলিফোনটা খারাপ। এইমাত্র ওর ওখান থেকে এলাম। সুন্দর এক কাপ চা খাওয়ালো।"

"ইয়ার। কভি হামকো ভি লে চলো চায়ে পিনেকে লিয়ে।" মেজর ইকবাল বললেন।

"কালকেই নিয়ে যাবো।"

এরমধ্যে চারজন সিপাই সুবেদার মোবিনকে বেঁধে ফেললো। বাইরের কেউ জানতেও পারলো না আমার রুমে কি ঘটছে। মেজর ইকবাল টেলিফোন রেখে দিলেন। আমি একটি বেয়োনেট চেয়ে নিয়ে সুবেদার মেজরের গলায় ধরে বললাম, "আমার অধীনে এতদিন কাজ করে নিশ্চয়ই বুঝেছেন আমি কেমন। এখনই মেজর ইকবালের সাথে আপনাকে কথা বলতে হবে—আমি যেভাবে বলবো ঠিক সেভাবে জবাব দিয়ে কথা না বললে মেরে ফেলবো। বুঝতে পারছেন?"

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার কথায় তিনি সম্মতি জানালেন। আমি ইকবালের নম্বরে ডায়াল করে সুবেদার মোবিনের কানের কাছে রিসিভার ধরলাম। ওপাশের কথা শোনার জন্য আমি মাথা নীচু করে রিসিভারের কাছে কান রাখলাম।

"হ্যালো স্যার, আমি সুবেদার মোবিন বলছি।"

"মোবিন সাহেব, আপনার কাছে আর কেউ আছে কি?" মেজর ইকবাল প্রশ্ন করেন। আমি মাউথ পিসে হাত চাপা দিয়ে মোবিনকে বলতে বললাম, 'বলুন এখানে কেউ নেই।' সুবেদার আমার নির্দেশ মত তাই বললেন।

"কিন্তু ক্যাপ্টেন রফিক তো ওখানে ছিলেন, কোথায় গেলেন তিনি।" এবারও আমি টেলিফোন চেপে ধরে তাঁকে যেভাবে বলতে বললাম তিনি সেভাবেই জবাব দিলেন, "ক্যাপ্টেন রফিক এইমাত্র সুবেদার মেজর এতবারকে নিয়ে কোথায় যেনো বেরিয়ে গেলেন।"

"কোই গড়বড়?"

"না স্যার। সব কুছ ঠিকঠাক হ্যায়।" সুবেদার মোবিন অত্যন্ত অনুগত জবাব দিলেন।

"বহুত আচ্ছা। আজ রাতের জন্য আপনিই ডিউটি অফিসার। টেলিফোনের পাশেই অপেক্ষা করবেন। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।"

"ঠিক হ্যায় স্যার..."

বিরাট একটা দুশ্চিন্তা কেটে গেলো। বন্দী সুবেদার মোবিনের প্রহরায় একজন বাঙালী জেসিওকে রাখা হলো যাতে সে আবার টেলিফোনে কিছু উল্টা-পাল্টা বলতে না পারে।

রাত ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে সিনিয়র বাঙালী জেসিও সুবেদার জয়নাল খবর দিলেন যে, কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে আমরা চট্টগ্রাম শহরে ইপিআর

এর সকল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য আটক করতে সক্ষম হলাম। সীমান্ত ফাঁড়িগুলোতেও আমার সাংকেতিক বার্তা দু'টি পৌঁছে গেছে বলে খবর পেলাম। বার্তা দুটি পেয়েই রাত ৮টা ৪০ মিনিট থেকে ৯টা ৩০ মিনিটের মধ্যে তারা সব ফাঁড়ির পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাভূত করেছে। পরে জানা গিয়েছিলো যে, কয়েকটি ইপিআর ফাঁড়িতে আগেই অর্থাৎ ২৪শে মার্চের দিবাগত রাতেই পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাভূত করা হয়। ২৪শে মার্চের রাতে যখন আমি দ্বিতীয় বার্তাটি স্থগিত রাখতে বলি, সে নির্দেশ পাওয়ার আগেই প্রথম নির্দেশ অনুযায়ী কয়েকটি ফাঁড়িতে বাঙালী সেনারা কাজ সমাধা করে ফেলে। পরে অবশ্য দ্বিতীয় বার্তাটি স্থগিত হয়ে গেলে তারা আর চট্টগ্রামের দিকে রওয়ানা হয়নি।

২৫শে মার্চের রাতে দ্বিতীয় বার্তার চূড়ান্ত নির্দেশ লাভের পর অনেক সেনাদলই চট্টগ্রামের দিকে রওয়ানা হয়ে পড়ে।

এদিকে চট্টগ্রাম শহরের বিচ্ছিন্ন প্লাটুনগুলো খবর পেয়ে লড়াই কেন্দ্রগুলোর দিকে এগোচ্ছিলো। শুধু বিমান বন্দরের প্লাটুনটির সঙ্গে যোগাযোগ করা গেলো না। এটা আমার জন্য খুবই বিপদের কারণ ছিলো। কেননা, পরিকল্পনা মোতাবেক শত্রুরা যাতে বিমান বন্দর ব্যবহার না করতে পারে তার দায়িত্ব ছিলো এই প্লাটুনের ওপর। এখান দিয়ে সৈন্য আনা-নেয়া বন্ধ করতে পারলে বিমান বন্দর, পোর্ট এবং নৌ-বাহিনীর সদর দফতরসহ সমগ্র এলাকায় আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সহজতর হতো। বিমান বন্দরের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ সাধারণত রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকতো। সৈন্যদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য আমি এক্সচেঞ্জ অপারেটরকে গোপনে চব্বিশ ঘণ্টা লাইন চালু রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু ২৫শে মার্চ সন্ধ্যার পরই নৌ-বাহিনীর সদর দফতরের সৈন্যরা গোপনে বিমান বন্দরে গিয়ে পুরো প্লাটুনের লোকদের গ্রেফতার করে ফেলে। ফলে এখানে আমাদের বড় একটা ক্ষতি হয়ে যায়।

উপকূলীয় বাঁধ বরাবর শত্রুসৈন্যের চলাচল প্রতিরোধ করার জন্য দু'টি প্লাটুনকে পাঠানো হলো। একটি কোম্পানী রেলওয়ে হিল প্রতিরক্ষার দায়িত্বে রইলো। প্রায় ১০০ সৈন্যকে দুই অথবা তিনজনের ছোট ছোট দলে ভাগ করে আগ্রাবাদ রোড এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকার মোড়ে মোড়ে লড়াইয়ের জন্য মোতায়েন করা হলো। বাকী সৈন্যদের হালিশহরেই সংরক্ষিত রাখা হলো—যাতে কোথাও বিপদ দেখা দিলে তারা সেদিকে যেতে পারে। রামগড়ের সৈন্যদের কাছে পাঠানো বার্তায় তাদেরকে ফেনী নদীর ওপর শুভপুর সেতু ধ্বংস করে সেখানে একটি কোম্পানীকে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থায় অবস্থান গ্রহণ

করতে এবং অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে প্রধান সড়ক দিয়ে চট্টগ্রামে চলে আসতে বলা হয়েছিলো।

হালিশহর ত্যাগের আগে বন্দীদের একটি ভবনে কঠোর প্রহরাধীনে রাখার এবং "শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ" করে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে আমি রেলওয়ে হিলের সদর দফতরে পৌঁছলাম। এখানে পৌঁছে নৌ-বাহিনীর সদর দফতর, পোর্ট এলাকা এবং বিমান বন্দরের ওপর আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে সীমান্ত এলাকার সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমি ভেবেছিলাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টাল সেণ্টার এবং ষোল শহরে মোতায়েন ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের বাঙালী সৈন্যরা ক্যাণ্টনমেণ্ট দখল করতে সক্ষম হবে। আগেই বলেছি, রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের কমাণ্ডে ছিলেন লেঃ কর্ণেল চৌধুরী এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গলে ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। এ দু জায়গায় বাঙালী সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো প্রায় ২০০০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ছিলো আনুমানিক ৪০০।

রাত তখন ১১টা ৩০ মিনিট। হঠাৎ ২০ বালুচ রেজিমেণ্টের সৈন্যরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের বাঙালী সৈন্যদের ওপর হামলা চালালো। অস্ত্রাগারের গার্ডদের হত্যা করে প্রথমে তারা সেগুলো দখল করে। অন্যান্য বাঙালী সৈন্য তখনও ঘুমিয়ে ছিলো। অস্ত্রাগার দখলের পরই পাকিস্তানী সৈন্যরা নির্বিচার হত্যালীলায় মেতে ওঠে। সে রাতে তারা এক হাজারেরও বেশী বাঙালী সৈন্যকে হত্যা করে। এরপর তারা বাঙালী সৈন্যদের আবাসিক কোয়ার্টারগুলোতে ঢুকে পড়ে এবং অস্ত্রের মুখে যাকে পায় তাকেই হত্যা করতে থাকে। নারী ও শিশুদের বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়।

এই হত্যালীলা থেকে যে সব বাঙালী সৈন্য জীবন রক্ষা করতে পেরেছিল তারা চারদিকে দৌড়াতে শুরু করে। কেউ কেউ আমার দফতরে এসে সেই লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ দেয়। অন্যরা ষোল শহরস্থ ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের দিকে ছুটে যায়। এই রেজিমেন্টের অধিকাংশ অফিসার এবং সকল সৈন্য ছিলো বাঙালী।

কিছু সংখ্যক সৈনিক ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে ষোল শহরে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে রাত প্রায় একটার দিকে যোগাযোগ করে সেনানিবাসে আক্রান্ত বাঙালী সৈনিক এবং তাদের পরিবারবর্গের প্রাণ রক্ষায় এগিয়ে যাবার জন্য তাদেরকে অনুরোধ জানায়। সেই ভয়াবহ রাতে বাঙালী অফিসার ক্যাপ্টেন এনাম সেনানিবাস থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে ক্যাপ্টেন এনাম সেনানিবাসের বিবরণ দিতে গিয়ে আমাকে বলেন, "রাত তখন সাড়ে এগারটা। ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈনিকরা হঠাৎ করেই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল

সেন্টারের অস্ত্রাগার এবং কোয়ার্টার গার্ডের ওপর হামলা চালিয়ে সেখানকার অধিকাংশ শান্ত্রিদের নির্মমভাবে হত্যা করে। একই সময় ২০ বালুচ রেজিমেন্টের অপর দল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের ইউনিট লাইনগুলোর ওপর হামলা চালিয়ে বিপুল সংখ্যক বাঙালী সৈন্যকে হত্যা করে। এমন কি তারা বাঙালী সৈনিকদের আবাসিক ভবনেও হামলা চালায়। অতর্কিত আক্রান্ত বাঙালী সৈনিক এবং তাদের পরিবারবর্গ ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চারদিকে ছুটাছুটি করতে থাকলে তাদের অধিকাংশই গুলীবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে। রাত সাড়ে এগারোটা থেকে তিনটার মধ্যে এক হাজারেরও বেশী বাঙালী সৈনিক এবং তাদের পরিবারের অসংখ্য সদস্য বুলেটের আঘাতে প্রাণ দিলেন।" ক্যাপ্টেন এনাম আরও বললেন, 'প্রথম হামলা শুরু হতেই তাদের কিছু সংখ্যক সৈনিক কোন রকমে পালিয়ে ষোল শহর পৌঁছায় এবং তারা ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।'

ক্যাপ্টেন এনাম পুরো ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বাকরুদ্ধ কন্ঠে বলেছিলেন, "৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে যদি আমাদের উদ্ধারের জন্য পাঠানো হতো, তাহলে সে রাতে অনেক বাঙালী সৈনিকই প্রাণে রক্ষা পেতেন। বালুচ রেজিমেন্টকে আক্রমণেরও দরকার ছিলো না, কেবলমাত্র তারা যদি সেনানিবাসের কাছে গিয়ে পাহাড়ের নিরাপদ অবস্থান থেকে বালুচ সৈনিকদের ওপর গুলীও ছুঁড়তো তাহলেও বালুচ রেজিমেণ্টের আত্মরক্ষার সুযোগে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের অধিকাংশ সৈনিকই পালাবার সুযোগ পেতো।" তাঁর বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নেই। ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের কয়েকজন অফিসার পরে অবশ্য বলেছিলেন, তাঁদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো তিন শ'য়ের মত। তাছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রও ছিলো না। তাই তারা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের সৈনিকদের রক্ষার্থে পুরো আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ২০ বালুচ রেজিমেণ্টের মোকাবিলা করাকে আত্মঘাতী কাজ বলে মনে করেছিলেন। বক্তব্যটি বিতর্কিত সুতরাং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের জন্য বিষয়টিকে ভবিষ্যতের ওপর ছেড়ে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ইতিমধ্যে রেলওয়ে হিলে প্রতিরক্ষায় আমার ইপিআর প্লাটুন গুলোকে সুসংগঠিত করে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে এই পাহাড়েরই একটি আবাসিক ভবনের নিচতলায় আমার সমর দফতর স্থাপন করলাম।

এই ভবনে রেলওয়ে অফিসারদের কয়েকটি পরিবার বাস করতেন। রেলওয়ে হিলে অবস্থান নিতেই সেখানকার অফিসার এবং তাদের পরিবারবর্গ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তাঁরা গাড়ি থেকে আমাদের জিনিসপত্র

নামাতে, পাহাড়ের উপর আত্মরক্ষামূলক ট্রেঞ্চ খুঁড়তে, নতুন টেলিফোন লাইন স্থাপন করতে এবং আমাদের সৈনিকদের খাবার তৈরীতে প্রভূত সাহায্য করেন।

আগেই কোথায় কোথায় ট্রেঞ্চ খুড়তে হবে তা দেখে রেখেছিলাম এবং কয়েকজন জেসিওকে স্থানগুলো গোপনে দেখিয়েছিলাম। সৈনিকরা যথাস্থানে ট্রেঞ্চ খুড়ছে কিনা তা দেখার জন্য রেলওয়ে হিলের চারদিক ঘুরলাম। পূর্ব নির্ধারিত পাহাড়ের ঢালে ৩" মর্টার স্থাপন করা হলো। রেলওয়ে হিলে আরও কয়েকটি ভবনে বহুসংখ্যক অফিসার ও তাদের পরিবারবর্গ বাস করতেন। রেলওয়ে হিলে অবস্থান গ্রহণের পরপরই আমরা রেলওয়ে অফিসারদের তাদের পরিবারবর্গকে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালাম। আমাদের কথামত অফিসারদের পরিবারবর্গকে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হলেও অধিকাংশ রেলওয়ে অফিসার এবং তাদের বয়স্ক পুত্র সন্তান ও পুরুষ আত্মীয়রা পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করার জন্য পাহাড়েই থেকে গেলেন। ইতিপূর্বে খবর পেয়েছিলাম চট্টগ্রামের সকল সীমান্তবর্তী ফাঁড়ির ইপিআর সৈনিকরা অবাঙালী সৈন্যদের নিরস্ত্র করে আমার সঙ্গে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য চট্টগ্রাম শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিকে কেবলমাত্র নৌ-সদর দফতর এবং সেনানিবাস ছাড়া সমগ্র চট্টগ্রাম শহর এলাকা, হালিশহরস্থ ইপিআর লাইন এবং ইপিআর সদর দফতর তখন আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। আমি ভেবেছিলাম ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের সৈনিকদের নিয়ে মেজর জিয়া এবং লেঃ কর্নেল চৌধুরী সেনানিবাস আক্রমণ করবেন এবং আক্রমণে নিশ্চয়ই তাঁরা সফলতা অর্জন করবেন। পাক সেনাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাত ৮টা ৩০ মিনিটে যখন আমি সারসন রোডের বাসভবন ত্যাগ করি তখনই ডাঃ জাফর এবং জনাব কায়সারকে বলেছিলাম ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টকে তাঁরা যেন খবরটি জানিয়ে দেন। তাঁরা আমার যুদ্ধ শুরু করার কথা এই রেজিমেণ্টকে জানিয়ে ছিলেন। বলা প্রয়োজন যে, ঐ রাতে হালিশহর এবং চট্টগ্রাম নগরীর অন্যান্য এলাকায় প্রায় ২ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ৫০০ অবাঙালী সৈনিক, জেসিও এবং কয়েকজন ইপিআর অফিসারকে আমরা নিরস্ত্র করতে পেরেছিলাম। আমার অধীনস্থ ইপিআর সৈনিক ও জেসিওদের সাহসিকতাপূর্ণ কার্যক্রমের পূর্ণ গোপণীয়তা এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্যই অবাঙালী সৈনিক ও অফিসারদের নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়েছিলো।

প্রাথমিক সাফল্যের পর রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে আমি ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের সৈনিকদের সাফল্যের খবর

শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম আর ভাবছিলাম, নিশ্চয়ই তারাও ২০ বালুচ রেজিমেণ্টকে ইতিমধ্যে নিরস্ত্র করতে পেরেছেন। প্রাথমিক সাফল্যের পর পরই সদর দফতর এবং বিমান বন্দর দখলের জন্যে আমি আমার সীমান্ত ফাঁড়ির ইপিআর সৈনিকদের আগমন অপেক্ষায় উন্মুখ ছিলাম।

ইত্যবসরে আমি বেতার কেন্দ্র, টেলিফোন একচেঞ্জ আক্রমণ ও দখল করার উদ্দেশ্যে আমার সৈন্যদের পাঠালাম। আমার এই রেলওয়ে হিল দফতরের ঠিক উল্টোদিকেই ছিলো নৌ-বাহিনীর যোগাযোগ কেন্দ্র। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা গেলো কয়েকজন পাকিস্তানী নৌ-সেনা ওখানে ঘোরাফেরা করছে। ঠিক এই সময়ে নৌ-বাহিনীর একটি গাড়ি আগ্রাবাদের দিকে এগিয়ে গেলো। আমার মর্টার জেসিও সুবেদার আইজুদ্দিন গাড়ি দেখেই তাঁর অবস্থান থেকে দৌড়ে এসে বললো, "স্যার, গাড়িতে কয়েকজন নৌ-সেনা রয়েছে। দেবো নাকি শেষ করে?"

আমি বললাম, "না, এখন নয়। এটা বোধহয় পর্যবেক্ষণ গাড়ী; রাস্তা পরিষ্কার আছে কিনা দেখার জন্য এসেছে। মনে হয় সৈন্যদের আরো বড় দল এই রাস্তায় আসবে। সেই লক্ষ্যবস্তুই হবে আমাদের জন্য উত্তম। এক সংগে অনেক লোককে পেয়ে যাবো।" একটু পরেই আরেকটি গাড়ি একই পথে চলে গেলো কিন্তু সৈন্যদের বড় দলটি আর এলো না। মিনিট দশেক পর দু'টি গাড়ীই ফিরে এলো এবং ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে চলে গেলো।

পরবর্তীকালে জানতে পেরেছিলাম, প্রথম গাড়িতে করে মেজর জিয়া পোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর কমাণ্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশে এম. ভি. সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে ক্যাণ্টনমেণ্টে আনার জন্য তিনি রওয়ানা হয়েছিলেন। স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংকের চট্টগ্রামস্থ নিউ মার্কেট শাখার ম্যানেজার জনাব কাদের যখন আমার বার্তা নিয়ে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের দফতরে যান তার আগেই মেজর জিয়া তাঁর কমাণ্ডিং অফিসারের আদেশে ষোলশহর থেকে বেরিয়ে পড়েন। রেজিমেণ্টের ডিউটি অফিসার আমার বার্তাটি পান। খবর পেয়েই ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে থামানোর জন্য পোর্টের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। ২৫শে মার্চের রাত তখন প্রায় সাড়ে ১১টা। ২০ বালুচ রেজিমেণ্টের সৈন্যরা এরই মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের ওপর হামলা চালায়। ৮ বেঙ্গল রেজিমেণ্টের সৈন্য ও অফিসারবৃন্দ তখনো এ খবর জানতে পারেননি। পূর্বে উল্লেখিত দ্বিতীয় গাড়িতে ছিলেন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান। আগ্রাবাদ পর্যন্ত গিয়ে মেজর জিয়াকে ব্যারিকেড পরিষ্কারের জন্য থামতে হয়। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান যখন আগ্রাবাদ পৌঁছেন তখন মেজর জিয়া সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যারিকেড পরিষ্কার করছিলেন। খালেকুজ্জামান

নামাতে, পাহাড়ের উপর আত্মরক্ষামূলক ট্রেঞ্চ খুঁড়তে, নতুন টেলিফোন লাইন স্থাপন করতে এবং আমাদের সৈনিকদের খাবার তৈরীতে প্রভূত সাহায্য করেন।

আগেই কোথায় কোথায় ট্রেঞ্চ খুড়তে হবে তা দেখে রেখেছিলাম এবং কয়েকজন জেসিওকে স্থানগুলো গোপনে দেখিয়েছিলাম। সৈনিকরা যথাস্থানে ট্রেঞ্চ খুড়ছে কিনা তা দেখার জন্য রেলওয়ে হিলের চারদিক ঘুরলাম। পূর্ব নির্ধারিত পাহাড়ের ঢালে ৩" মর্টার স্থাপন করা হলো। রেলওয়ে হিলে আরও কয়েকটি ভবনে বহুসংখ্যক অফিসার ও তাদের পরিবারবর্গ বাস করতেন। রেলওয়ে হিলে অবস্থান গ্রহণের পরপরই আমরা রেলওয়ে অফিসারদের তাদের পরিবারবর্গকে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালাম। আমাদের কথামত অফিসারদের পরিবারবর্গকে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হলেও অধিকাংশ রেলওয়ে অফিসার এবং তাদের বয়স্ক পুত্র সন্তান ও পুরুষ আত্মীয়রা পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করার জন্য পাহাড়েই থেকে গেলেন। ইতিপূর্বে খবর পেয়েছিলাম চট্টগ্রামের সকল সীমান্তবর্তী ফাঁড়ির ইপিআর সৈনিকরা অবাঙালী সৈন্যদের নিরস্ত্র করে আমার সঙ্গে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য চট্টগ্রাম শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিকে কেবলমাত্র নৌ-সদর দফতর এবং সেনানিবাস ছাড়া সমগ্র চট্টগ্রাম শহর এলাকা, হালিশহরস্থ ইপিআর লাইন এবং ইপিআর সদর দফতর তখন আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। আমি ভেবেছিলাম ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের সৈনিকদের নিয়ে মেজর জিয়া এবং লেঃ কর্নেল চৌধুরী সেনানিবাস আক্রমণ করবেন এবং আক্রমণে নিশ্চয়ই তাঁরা সফলতা অর্জন করবেন। পাক সেনাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাত ৮টা ৩০ মিনিটে যখন আমি সারসন রোডের বাসভবন ত্যাগ করি তখনই ডাঃ জাফর এবং জনাব কায়সারকে বলেছিলাম ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টকে তাঁরা যেন খবরটি জানিয়ে দেন। তাঁরা আমার যুদ্ধ শুরু করার কথা এই রেজিমেণ্টকে জানিয়ে ছিলেন। বলা প্রয়োজন যে, ঐ রাতে হালিশহর এবং চট্টগ্রাম নগরীর অন্যান্য এলাকায় প্রায় ২ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ৫০০ অবাঙালী সৈনিক, জেসিও এবং কয়েকজন ইপিআর অফিসারকে আমরা নিরস্ত্র করতে পেরেছিলাম। আমার অধীনস্থ ইপিআর সৈনিক ও জেসিওদের সাহসিকতাপূর্ণ কার্যক্রমের পূর্ণ গোপণীয়তা এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্যই অবাঙালী সৈনিক ও অফিসারদের নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়েছিলো।

প্রাথমিক সাফল্যের পর রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে আমি ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের সৈনিকদের সাফল্যের খবর

শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম আর ভাবছিলাম, নিশ্চয়ই তারাও ২০ বালুচ রেজিমেণ্টকে ইতিমধ্যে নিরস্ত্র করতে পেরেছেন। প্রাথমিক সাফল্যের পর পরই সদর দফতর এবং বিমান বন্দর দখলের জন্যে আমি আমার সীমান্ত ফাঁড়ির ইপিআর সৈনিকদের আগমন অপেক্ষায় উন্মুখ ছিলাম।

ইত্যবসরে আমি বেতার কেন্দ্র, টেলিফোন একচেঞ্জ আক্রমণ ও দখল করার উদ্দেশ্যে আমার সৈন্যদের পাঠালাম। আমার এই রেলওয়ে হিল দফতরের ঠিক উল্টোদিকেই ছিলো নৌ-বাহিনীর যোগাযোগ কেন্দ্র। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা গেলো কয়েকজন পাকিস্তানী নৌ-সেনা ওখানে ঘোরাফেরা করছে। ঠিক এই সময়ে নৌ-বাহিনীর একটি গাড়ি আগ্রাবাদের দিকে এগিয়ে গেলো। আমার মর্টার জেসিও সুবেদার আইজুদ্দিন গাড়ি দেখেই তাঁর অবস্থান থেকে দৌড়ে এসে বললো, "স্যার, গাড়িতে কয়েকজন নৌ-সেনা রয়েছে। দেবো নাকি শেষ করে?"

আমি বললাম, "না, এখন নয়। এটা বোধহয় পর্যবেক্ষণ গাড়ী; রাস্তা পরিষ্কার আছে কিনা দেখার জন্য এসেছে। মনে হয় সৈন্যদের আরো বড় দল এই রাস্তায় আসবে। সেই লক্ষ্যবস্তুই হবে আমাদের জন্য উত্তম। এক সংগে অনেক লোককে পেয়ে যাবো।" একটু পরেই আরেকটি গাড়ি একই পথে চলে গেলো কিন্তু সৈন্যদের বড় দলটি আর এলো না। মিনিট দশেক পর দু'টি গাড়ীই ফিরে এলো এবং ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে চলে গেলো।

পরবর্তীকালে জানতে পেরেছিলাম, প্রথম গাড়িতে করে মেজর জিয়া পোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর কমাণ্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশে এম. ভি. সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে ক্যাণ্টনমেণ্টে আনার জন্য তিনি রওয়ানা হয়েছিলেন। স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংকের চট্টগ্রামস্থ নিউ মার্কেট শাখার ম্যানেজার জনাব কাদের যখন আমার বার্তা নিয়ে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের দফতরে যান তার আগেই মেজর জিয়া তাঁর কমাণ্ডিং অফিসারের আদেশে ষোলশহর থেকে বেরিয়ে পড়েন। রেজিমেণ্টের ডিউটি অফিসার আমার বার্তাটি পান। খবর পেয়েই ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে থামানোর জন্য পোর্টের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। ২৫শে মার্চের রাত তখন প্রায় সাড়ে ১১টা। ২০ বালুচ রেজিমেণ্টের সৈন্যরা এরই মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের ওপর হামলা চালায়। ৮ বেঙ্গল রেজিমেণ্টের সৈন্য ও অফিসারবৃন্দ তখনো এ খবর জানতে পারেননি। পূর্বে উল্লেখিত দ্বিতীয় গাড়িতে ছিলেন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান। আগ্রাবাদ পর্যন্ত গিয়ে মেজর জিয়াকে ব্যারিকেড পরিষ্কারের জন্য থামতে হয়। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান যখন আগ্রাবাদ পৌঁছেন তখন মেজর জিয়া সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যারিকেড পরিষ্কার করছিলেন। খালেকুজ্জামান

মেজর জিয়াকে সর্বশেষ পরিস্থিতির কথা জানালে মেজর জিয়া ৮ বেঙ্গল রেজিমেণ্ট লাইনে ফিরে আসার এবং তাঁর অফিসারদের সঙ্গে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেন। উল্লেখ্য, মেজর জিয়াকে বহনকারী প্রথম গাড়িটি দেখেই নায়েব-সুবেদার আইজুদ্দিন উত্তেজিত হয়ে আক্রমণ করতে চেয়েছিলো। রেলওয়ে হিলের পাশের এই সড়কের অনেক খানি আমাদের এল.এম.জি. এবং রকেট লাঞ্চারের সুনির্দিষ্ট আওতার মধ্যেই ছিলো। আমরা ধৈর্য না ধরলে মেজর জিয়া এবং ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে বহনকারী গাড়ি দু'টি রকেট লাঞ্চারের গোলায় উড়ে যেতো। আরো বড় শিকারের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম বলেই অলৌকিকভাবে সেদিন তাঁরা দু'জন বেঁচে গিয়েছিলেন।

ইউনিট লাইনে ফিরে মেজর জিয়া এবং তাঁর অফিসাররা কমাণ্ডিং অফিসার সহ অবাঙালী অফিসারদের গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নেন। অবাঙালী অফিসারদের গ্রেফতার পর্ব শেষ হবার পরই তাঁদের কাছে ক্যাণ্টনমেণ্টের হত্যাকাণ্ডের খবর পৌঁছে।

৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের একজন অফিসার পরে স্বীকার করেছিলেন, "ক্যাণ্টনমেণ্টের ঘটনার ব্যাপারে মতদ্বৈত দেখা দেয়। রেজিমেণ্টের তরুন অফিসারদের কয়েকজন তখনই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের সৈনিকদের জীবন রক্ষায় ছুটে যেতে চান। অন্যরা ২০ বালুচ রেজিমেণ্টকে আক্রমণ করাকে আত্মঘাতী হবে বলে মত প্রকাশ করেন। এই মত পার্থক্যের ফলেই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এই পর্যায়ে ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে যাওয়া কিংবা ২০ বালুচ রেজিমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা বোকামি হবে। এরপর ঐ রাতেই আমরা ষোলশহর ত্যাগ করে পটিয়ার দিকে অগ্রসর হই।"

এদের এই পদক্ষেপ সম্পর্কে আমি আগে কিছুই জানতাম না। ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টাল সেণ্টারে যাঁকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম সেই ডাঃ জাফর ফিরে এলে সব জানতে পারলাম। কিছুটা অধৈর্য হয়ে ডাঃ জাফরকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি এদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি?"

"আপনার খবর তো ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টে পৌঁছে দিয়েছি। তবু তারা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি..."ডাঃ জাফর জবাব দিলেন।

"দয়া করে এক্ষুণি যান, গিয়ে ওদেরকে থামান। এখন সবকিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রণে। ওদের সাথে সম্মিলিতভাবে বাকী জায়গাগুলোও আমরা মুক্ত করতে পারবো। আজকের রাতই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।"

ঐ রাত ছিলো সকলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকায় ২৫শে মার্চ বিকাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের বাধ্যতামূলক বিশ্রাম নিতে বলা হয়। যানবাহনে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আগের রাতেই বোঝাই করা হয়েছিলো। ২৫শে মার্চ বিকাল ৫টায় গণহত্যা কার্যক্রমের জন্য ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডারদের চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হয়। সন্ধ্যার সাথে সাথেই ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্টে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধের পোশাক সজ্জিত সৈন্যরা যার যার অস্ত্রাগারের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়ায়। তাদেরকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ দেয়া হয়। কয়েকটি বিশেষ দলের হাতে পেট্রোলের টিন তুলে দেয়া হয়।

ইসলামের নামে এবং পাকিস্তানের নামে তাদেরকে উত্তেজিত করা হয়। বলা হয় যে, যত মানুষ মারতে পারবে, যে যত সম্পত্তি ধ্বংস করতে পারবে সে তত লুণ্ঠিত মালামালের বখরা পাবে, তার তত দ্রুত পদোন্নতি হবে। উপরোক্ত চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত ৮টা ৩০ মিনিটে সৈন্যরা ব্যারাক ছেড়ে বেরোতে থাকে। ৯টা ৩০ মিনিট নাগাদ তেজগাঁও বিমান বন্দরের কাছে প্রথম গুলীবর্ষণ শুরু হয়। এর আগে থেকেই জনসাধারণ ঢাকা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তোলে।

উত্তরে রংপুর এলাকায় ৩২ ফিল্ড রেজিমেণ্ট (আর্টিলারী) ততক্ষণে তাদের সৈয়দপুরের অবস্থানস্থল থেকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে রংপুর রেডিও স্টেশনের কাছে সুদৃঢ় ঘাঁটি গড়ে তোলে। এদিকে দশটার দিকে একজন পশ্চিম পাকিস্তানী কমাণ্ডিং অফিসারের নেতৃত্বে ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট রংপুরের মধ্য দিয়ে পথের বাধা সরাতে সরাতে বগুড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো।

ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ এইসব সৈন্য চলাচল সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন এবং তাঁর মনে হলো সাংঘাতিক কিছু একটা আসন্ন। চট্টগ্রামে আমার অবস্থান সুদৃঢ় করার পর যে বার্তাটি অয়্যারলেস মারফত ইপিআর-এর বিভিন্ন ফাঁড়িতে পাঠিয়েছিলাম, ক্যাপ্টেন নওয়াজিশও সে বার্তাটি পান। সাংকেতিক বার্তাটির অর্থ ছিল: "আমরা আরম্ভ করেছি। আপনিও শুরু করুন।"

ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ মনস্থির করে ফেলেন। বাঙালী ইপিআর সৈনিকদের নিয়ে তিনি রংপুর শহর থেকে বেরিয়ে পড়ে তিস্তা বাঁধ বরাবর অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর শহর ত্যাগের পর পরই পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা কারফিউ জারি করে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে।

ছোট জেলা শহর কুষ্টিয়ার লোকেরা ঐ রাতে যথারীতি শয্যা গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু যশোর ক্যাণ্টনমেণ্টের তৎপরতা ছিলো অস্বাভাবিক, সৈন্যরা ছিলো উত্তেজিত। ২৫শে মার্চের পূর্বেই সম্পূর্ণভাবে বাঙালীদের নিয়ে গঠিত

১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টকে যশোর ক্যাণ্টনমেণ্টের অদূরে মহড়ার নামে চৌগাছা নামক স্থানে এনে রাখা হয়। ক্যাণ্টনমেণ্টের ভেতরে বাঙালী সৈন্যদের একটি সুসংগঠিত ব্যাটালিয়ান তাদের অস্বাভাবিক সামরিক অভিযানে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে বলে পশ্চিম পাকিস্তানী সিনিয়র অফিসাররা মনে করেছিলো।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যার পর পরই ২৭ বালুচ রেজিমেণ্টের একটি ব্রাম্যমান মেকানাইজড কোম্পানী ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ ২৭ বালুচ রেজিমেণ্টের ডেণ্টা কোম্পানী কুষ্টিয়া পুলিশ স্টেশনের সামনে চলে আসে। পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে নিরস্ত্র করার পর তারা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে এবং কোন ঘোষণা ছাড়াই তারা কারফিউও জারী করে।[৪৭]

কুমিল্লা সেনানিবাসের দৃশ্যও ছিলো অভিন্ন। ৫৩ ব্রিগেড কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের অনুসন্ধানের অজুহাতে ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের কিছু অংশকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কিছু অংশকে শমসেরনগর অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন।[৪৮] ২৫শে মার্চ বেলা ১১টা নাগাদ এই রেজিমেণ্টের একটি অংশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং অপর অংশ শমসেরনগর পৌঁছেই বুঝতে পারে ভারতীয় অনুপ্রবেশের সংবাদ ভুয়া।[৪৯] কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল করে ফেলেছেন। কোন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ছাড়াই তাঁর পশ্চিম পাকিস্তানী ইউনিটগুলো সকল বাঙালী ও তাদের পরিবার পরিজনকে বন্দী করে ফেলে। রাত সাড়ে ১০টার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনার পদাতিক ও গোলন্দাজ ইউনিটগুলো ক্যাণ্টনমেণ্ট ছেড়ে কুমিল্লা শহরে প্রবেশ করে ও থানা হেড-কোয়ার্টারসহ শহরের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালায় এবং কারফিউ জারী করে।

পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন অসুস্থ পুলিশ অস্বাভাবিক গোলা-গুলীর শব্দে বাইরে আসে এবং বারান্দা থেকে কি ঘটছে তা বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই মেশিনগানের একঝাঁক গুলীতে এই অসুস্থ পুলিশ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর গুলীবর্ষণ বন্ধ করে পাকিস্তানী সৈন্যরা পৈশাচিক উল্লাসে পুলিশ লাইনে ঢুকে পড়ে। অসুস্থ পুলিশ লোকটিকে ওখানে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে দেখে একজন পাক সেনা বেয়োনেট চার্জ করে তার জীবন নিস্পন্দ করে দেয়। চট্টগ্রাম থেকে রাত সাড়ে ৯টার দিকে আমি কাপ্তাইয়ে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন হারুনের কাছে একটি টেলিফোন কল বুক করলাম। তাঁকে আমি লড়াই শুরু করতে এবং সত্বর চট্টগ্রামে আমার সঙ্গে যোগ দেয়ার কথা বলতে চেয়েছিলাম। অপারেটর কাপ্তাই উইং হেড কোয়ার্টারে লাইন ঠিকই দিয়েছিলো কিন্তু ক্যাপ্টেন হারুন টেলিফোন ধরতেই তা কেটে গেলো। এদিকে

আমার অনুরোধে জনাব এম. আর. সিদ্দিকীও ক্যাপ্টেন হারুনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন। ৯টা ৪৫ মিনিটের দিকে তিনি টেলিফোনে হারুনকে পেয়ে যান এবং বলেন, "ক্যাপ্টেন রফিক যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন এবং তিনি এই সাংকেতিক বার্তাটি আপনাকে জানাতে বলেছেন: আমার জন্য কিছু কাঠ নিয়ে আস।" এ বার্তার অর্থ হারুন জানতো। ইত্যবসরে আমার হালি শহর সদর দফতর থেকে অয়্যারলেসে যে বার্তাটি পাঠানো হয়েছিলো একজন বাঙালী সিগনাল অপারেটর দৌড়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন হারুনকে তা দেখিয়েছিলেন। টেলিফোন ও অয়্যারলেস মেসেজ পাওয়ার পর পরই ক্যাপ্টেন হারুন তাঁর বিশ্বস্ত বাঙালী সৈনিকদের নিয়ে প্রথমে অস্ত্রাগার দখল করেন এবং সকল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের আটক করে তাঁর ইপিআর সৈন্য ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রসহ আমার সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য চট্টগ্রামের পথে রওয়ানা হন।[৫০]

ঢাকায় কারফিউর আশংকায় রাত ১০টার মধ্যে রাস্তাঘাট জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে। প্রধান প্রধান সড়কে ব্যাপক সৈন্য চলাচল শুরু হয়। উত্তেজিত ঢাকার মানুষ মনে করেছিলো যে, বোধ হয় কঠোর সামরিক আইন তাদের ওপর বলবৎ করা হচ্ছে। কিন্তু রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ যখন চতুর্দিক থেকে কামান, ট্যাংক এবং রাইফেলের অবিরাম গোলাগুলী শুরু হলো, তখন তারা চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেলো।[৫১] এক অজানা আশংকায় সবাই তখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো।

নগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিপুল সংখ্যক বিদেশী সাংবাদিক অবস্থান করছিলেন। তাঁরা জানতেন, ইয়াহিয়া খান গোপনে প্রেসিডেন্ট হাউস ত্যাগ করেছেন এবং ভুট্টোও ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। চতুর্দিকে গুলীবর্ষণ শুরু হলে সাংবাদিকেরা মনে করেছিলেন, ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলনের মতো বোধহয় কারফিউ ভঙ্গ করা হয়েছে। সাংবাদিকদের কেউ কেউ শেখ মুজিবুর রহমানকে টেলিফোন করে ঘটনা কি তা জানতে চেষ্টা করলেন।

১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ সব টেলিফোন অচল হয়ে যায় এবং দেখতে দেখতে রাতের আকাশ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে, সমগ্র নগরী তখন জ্বলতে থাকে অনির্বাণ শিখার মতো জ্বলজ্বল করে।

৩১ ফিল্ড রেজিমেণ্ট আর্টিলারীকে বিশেষ উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় রাজধানী এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছিলো। বেশ কিছুদিন ধরেই এই ইউনিটটি পূর্বাঞ্চলে অবস্থান করছিলো। জানুয়ারীতে ভারতীয় বিমান ছিনতাই ঘটনার পর থেকে ইয়াহিয়া সরকার সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য সমাবেশের ধুয়া তুলে অধিকাংশ বাঙালী

ইউনিটকে সীমান্ত এলাকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য অবাঙালী আর্মী ইউনিটের মতো ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট তার পূর্বস্থানেই অবস্থান করতে থাকে।

এই ইউনিট থেকে কামান বসানোর সম্ভাব্য স্থান, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির জন্যে কোন অফিসার কখনো বাইরে বেরোয়নি। পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি নির্মান কিংবা সম্ভাব্য লক্ষ্যস্থান নির্ধারণের জন্যও এই ইউনিটের কাউকেই চেষ্টা করতে দেখা যায়নি। অথচ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এইসব নিয়মিত কার্যক্রম পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে বছরে তিন থেকে চারবার অনুশীলন করতে হয়।

অবশ্য ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহ থেকে অন্যান্য পাকিস্তানী ইউনিটের মতো এই ইউনিট ঢাকার মানচিত্র সংগ্রহ করতে শুরু করে। আর্টিলারীর প্রয়োজন মোতাবেক এই মানচিত্রগুলো বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছিলো।

ইষ্টার্ণ কমাণ্ড হেড কোয়ার্টারে লক্ষ্যস্থলগুলোর একটি অতি গোপন তালিকাও প্রণয়ন করা হয়। তালিকায় পিলখানার ইপিআর সদর দফতর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস সমূহ এবং পুরাতন শহরে হিন্দু প্রধান এলাকার নাম ছিলো। ২৫শে মার্চ রাত ১২টার দিকে প্রধান লক্ষ্যস্থলগুলোর উপর আর্টিলারী শেল পড়তে শুরু করে। কামানের গোলায় সারা শহর কেঁপে ওঠে। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট চতুর্দিকে ছুটতে থাকে। জনসাধারণ খাটের নীচে আশ্রয় নেয়। শিশুরা ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে, কিন্তু তাদের কান্নার আওয়াজ তলিয়ে যায় বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্রের বিকট উচ্চ শব্দে। বৃদ্ধরা নফল নামাজ শুরু করে দেন, কেউ পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াত আরম্ভ করেন। কিন্তু করলে কি হবে? এক অচিন্তনীয় হত্যার নেশায় পাকিস্তানীরা তখন উন্মাদ হয়ে পড়েছিলো।

রাত তখন দেড়টা। একটি ট্যাংক, একটি সাঁজোয়া সৈন্যবাহী যান এবং সৈন্য বোঝাই একটি ট্রাক ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকার দিকে অগ্রসর হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনের সামনে পৌঁছে যায়। পৌঁছেই সকল সৈন্য কিছুক্ষণ বাড়িটির দিকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমান তখন চিৎকার করে তাদের বল্লেন, "তোমরা আমাকে গ্রেফতার করতে পারো, কিন্তু গুলী থামাও।"[৫২] সৈন্যরা প্রার্থিত ব্যক্তিকে পেয়ে খুশী হলো। তারা শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে সেনানিবাসে নিয়ে গেলো এবং সেখান থেকে তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

ইতিমধ্যে নগরের বিভিন্নস্থানে কামানের গোলা ছোঁড়া শুরু হয়। ট্রাক ভর্তি সৈন্যরা পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দিকে অগ্রসর হয়। হোটেল ইণ্টারকণ্টিনেণ্টালের কাছে ১০ থেকে ১৫ জনের একটি

বিক্ষুব্ধ বাঙালী দল উদ্ধত মুষ্টি তুলে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতে থাকে। সৈন্যরা সে ভাষা বোঝেনি তাই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের একঝাঁক গুলী দিয়ে তারা শ্লোগানের জবাব দেয়। পাকিস্তানী সৈন্যের ছোট একটি দল গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে দৈনিক 'দি পিপ্‌ল' পত্রিকার অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। বস্তুতঃ পিলখানার ইপিআর সদর দফতর এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন ব্যতীত ঢাকায় পাকিস্তানী সৈন্যদের কোন বাধারই সম্মুখীন হতে হয়নি। এই দুটি স্থানেই বাঙালী সৈনিকরা পাকিস্তানীদের তীব্রভাবে প্রতিরোধ করেছিলো। ইয়াহিয়া বাহিনীর প্রথম হামলায় এখানে কোন কাজ হয়নি, বরং হামলাকারীদেরই বিপুল সংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়। পাক সমর নায়করা এই অবস্থায় এ দুটি স্থানে পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে ট্যাংক প্রেরণ করে। পরদিন ভোর পর্যন্ত উভয় স্থানে তুমুল সংঘর্ষ হয়। পিলখানা এবং রাজারবাগে বিপুল সংখ্যক বাঙালী সৈনিক ও পুলিশ হতাহত হয়। তাদের গোলাবারুদের মজুত যায় ফুরিয়ে। পাকসেনারা চতুর্দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে। ট্যাংকের শেল এবং ফ্লেম থ্রোয়ারের আগুনে পুলিশ ব্যারাকগুলোতে আগুন ধরে যায়। পরিবার পরিজন ও শিশুসহ অনেকেই জীবন্ত দগ্ধ হয়। খুব স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিই সেদিন পালাতে পেরেছিলো।

অনেক চেষ্টার পর পাকিস্তানী সেনারা স্থানদুটি দখল করে কেবলমাত্র স্বল্প সংখ্যক গুরুতর আহত ব্যক্তিকেই বন্দী করতে সক্ষম হয়। অবশিষ্ট সবাই ৬ ঘণ্টারও অধিক সময়ের মরণপন লড়াইয়ে জীবন বিসর্জন দেয়।

পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের সৈন্যদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিষ্কার করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ বন্ধ হয়ে যায়। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী তাদের গ্রামের বাড়ীতে চলে যায়। ছাত্রাবাসগুলোতে তখনো যারা ছিলো তাদের অধিকাংশই ছিলো পরীক্ষার্থী। গোলাগুলীর আওয়াজে তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। জেগে দেখে সৈন্যরা ইতিমধ্যেই তাদের ঘিরে ফেলেছে। কয়েকজন ছাত্র অন্ধকারে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী বস্তি এলাকায় আশ্রয় নিলেও বাকী ছাত্রদের সৈন্যরা খুঁজে খুঁজে নির্মমভাবে গুলী করে হত্যা করে। নারী-পুরুষ ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সৈন্যদের বলা ছিলো হত্যার ব্যাপারে যেন কোন বৈষম্য কিংবা বাছ বিচার না করা হয়। তাদের চোখে প্রতিটি বাঙালীই ছিলো চরম শত্রু। প্রথম ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বিপুল সংখ্যক অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান নিহত হন।

বস্তি এলাকার লোকেরাই সামরিক অভিযানে সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন রাজনৈতিক আন্দোলন, বিক্ষোভ কিংবা জনসভা এইসব মানবেতর জীবন

যাপনকারী মানুষের অংশ গ্রহণ ছাড়া সফল হতে পারেনি। অথচ স্মরণ কালের মধ্যে এদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হতে দেখা যায়নি।

তবু প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে প্রতিটি আন্দোলন অথবা বিক্ষোভের ঝড় তাদের মাথার ওপর দিয়েই বয়ে যায়। হাবিব ছিলো বস্তিবাসীদেরই একজন। স্ত্রী আর পাঁচটি সন্তানের ক্ষুধার অন্ন জোগাতে তাকে দৈনিক ৯/১০ ঘণ্টা করে রিক্সা চালাতে হতো। মার্চ মাসটা তার খুব ভাল যায়নি। কারণ, হরতাল ও ধর্মঘটে তার আয় গিয়েছিলো কমে। তবু হাবিব এক সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতো। শেখ মুজিবুর রহমানের দলকে ভোট দিয়ে সে ভেবেছিলো শীঘ্রই তার ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। ২৬শে মার্চ ভোরে পাকিস্তানী সৈন্যরা বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিলে হাবিবের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বুলেটের আঘাত নিয়ে হাবিব পালাতে পারলেও তার স্ত্রী আর সন্তানেরা অন্যান্য অনেকের মতোই লেলিহান অগ্নি শিখার শিকারে পরিণত হতে হয়।

দীর্ঘ ন' মাসের নিষ্ঠুরতম ট্রাজেডীর এই ছিলো শুরু। এই ট্রাজেডী ছিলো মানুষ নামধারী একটি শ্রেণীরই সৃষ্টি। তাই তো একজন পাকিস্তানী অফিসার বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে বুক ফুলিয়ে বলতে পেরেছিলো, "আমরা যে কোন কারণে যে কোন লোককে হত্যা করতে পারি এবং তার জন্য কারোর কাছেই আমাদের জবাবদিহি করতে হয় না।" এটা একটা অকপট স্বীকৃতি।

২৬শে মার্চ সকাল ৮টায় বেতার ঘোষণায় শোনা গেলো, পূর্ব পাকিস্তানকে টিক্কা খানের অনুগ্রহের ওপর ছেড়ে দিয়ে ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানে পৌঁছে গেছেন। সকাল সাড়ে ৮টায় ভুট্টোও বিপুল সংখ্যক সৈন্যের কড়া প্রহরায় পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে ঢাকা বিমান বন্দরের দিকে যাত্রা করেন।[৫৬] জন মানবশূন্য রাজপথে কেবলমাত্র ট্যাংক এবং সৈন্যরা চলাচল করতে থাকে এবং কাউকে দেখা মাত্রই তারা গুলী চালাতে থাকে। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে যে সব বিদেশী সাংবাদিক ছিলেন তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়। সেনাবাহিনীর একজন কর্ণেল সাংবাদিকদের আভাস দেন, "এমন বিপদজনক ও রক্তক্ষয়ী ঘটনার মধ্যে আপনাদের থাকা ঠিক হবে না।" দুপুরের মধ্যে পুরাতন ঢাকায় সৈন্যদের পদচারনা শুরু হয়। এখানকার দায়িত্ব ছিলো অরেকটি রেজিমেণ্টের ওপর (১৮ পাঞ্জাব)। অগ্রবর্তী দলটি গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে এই এলাকায় প্রবেশ করে। যারাই পালাবার চেষ্টা করেছে তারাই বুলেট বিদ্ধ হয়েছে। কয়েকটি স্থানে বাঙালীদের সার বেধে দাঁড় করিয়ে গুলী করে হত্যা করা হয়। অগ্রবর্তী সেনা দলের পেছনেই ছিলো ছোট সেনা দল। তাদের হাতে ছিলো পেট্রোলের টিন ও ফ্লেম থ্রোয়ার। হানা-

দারদের ছোট ছোট দলগুলো নিরীহ জনসাধারণের বাড়ীঘর ও দোকানপাটে আগুন দিতে দিতে অগ্রসর হতে থাকে। চারদিকে শুধু নিরস্ত্র বাঙালীদের আর্তচিৎকার। পাকিস্তান রক্ষায় গর্বিত হানাদার বাহিনী মুমূর্ষু বাঙালীদের কাতর আর্তনাদের মধ্যে দিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যায়। ২৬শে মার্চের সন্ধ্যা নাগাদ ঢাকা প্রায় জন-শূন্য হয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো-ছিটানো লাশগুলো পঁচতে থাকে, আর সেই নগরীর প্রহরায় নিযুক্ত ঘাতকের দলকে শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে ছুটতে দেখা যায় শিকারের সন্ধানে। বিদেশী সাংবাদিকদের বিমান বন্দরে নিয়ে যাবার জন্য রাত সাড়ে আটটায় সেনাবাহিনীর গাড়ী এসে হোটেল ইণ্টারকণ্টিনেণ্টালের সামনে থামে। সকালে পিআইএ'র বোয়িং যোগে তাদের সবাইকেই ত্যাগ করতে হলো পূর্ব পাকিস্তান।

৮

সশস্ত্র প্রতিরোধ

চট্টগ্রাম, ২৬শে মার্চ। রাত দু'টার দিকে অদ্ভুত ধরনের এক অপরিচিত ব্যক্তি আমার ট্যাকটিক্যাল হেড কোয়ার্টারে উপস্থিত হলেন। বিরাট লম্বা চওড়া লোকটিকে প্রথম দর্শনে বাঙালী বলেই মনে হয় না। ভদ্রলোক বললেন, "একটা বিদেশী শক্তি আপনাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে ইচ্ছুক।"

"কি ধরনের সাহায্য?" আমি জানতে চাইলাম।

"অবশ্যই সামরিক সাহায্য।"

"আপনার কথার নিশ্চয়তা কি?"

"ইচ্ছা হলে আমার সঙ্গে কক্সবাজার যেতে পারেন। সেখান থেকে আপনাকে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানেই সংশ্লিষ্ট দেশের প্রতিনিধির সাথে আপনি বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন।"

"রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কথা না বলে আমার কাছে এসেছেন কেন?"

"সামরিক প্রয়োজনের বিষয়টি তাঁরা বুঝবেন না।"

"কিন্তু এই মুহূর্তে আমিতো এ জায়গা ছাড়তে পারিনা। যুদ্ধ পরিচালনা করার মতো আর কোন অফিসার বর্তমানে এখানে নেই।"

"আপনি গেলেই ভালো হতো"—লোকটি পীড়াপীড়ি করতে থাকেন।

"দুঃখিত। আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি বরং রাজনৈতিক নেতাদের সাথে দেখা করুন।"

ভদ্রলোক প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন—"তাহলে বেতার কেন্দ্রে চলুন না। রেডিওতে ভাষণ দেবেন।"

"আপনি বুঝছেন না কেন? আমিই এখানে একমাত্র অফিসার, এই মুহূর্তে এই স্থান ত্যাগ করতে পারিনা। ইচ্ছা করলে আপনি একটি টেপ রেকর্ডার আনতে পারেন এবং আমি বক্তৃতা টেপ করে দিলে সেটা রেডিওতে প্রচার করতে পারেন।"

আগন্তুক লোকটি আমাকে নিয়ে যাবার জন্য তারপরও পীড়াপীড়ি করলেন। এই পীড়াপীড়িতে লোকটি সম্পর্কে আমার সন্দেহ ঘনীভূত হলো। এটা

পাকিস্তানীদের ফাঁদ হওয়াও বিচিত্র নয়। পরিশেষে তিনি ব্যর্থ হয়ে চলে গেলেন এবং বলে যান রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি নিয়ে তিনি আসবেন। কিন্তু তিনি আর আসেননি। পরে সন্দেহজনক তৎপরতার জন্যে লোকটিকে দুলাহাজারার কাছে বাঙালীরা মেরে ফেলে। মৃত্যুর আগে ব্যক্তিটি অবশ্য বাঙালী সৈন্যদের অপর একটি দলকে কক্সবাজার নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই নিয়ে যাওয়ার অর্থ ছিলো লড়াইয়ের স্থান থেকে বাঙালী সৈনিকদের দূরে সরিয়ে দেয়া।

যাহোক, আমার দফতরে টেলিফোনে খবর এলো যে পাকিস্তানী সেনারা নৌ-ঘাঁটি থেকে অগ্রসর হয়ে হালিশহরে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। ইপিআর ট্রুপস এই আক্রমণ প্রতিহত করে। শত্রুদের প্রচুর হতাহত হয়। পাকিস্তানীরা হালিশহরে কোন বাধা আশা করেনি। সংগঠিত প্রতিরোধ মোকাবিলার জন্য তারা প্রস্তুতই ছিলো না। তাদের অগ্রবর্তী দলটি হালিশহরের প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যূহের সম্মুখীন হতেই আমাদের সৈনিকরা পাকিস্তানীদের লক্ষ্য করে গুলী চালালো। পাকিস্তানীরা ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়ে। বহু সংখ্যক হতাহত হলো। অবশেষে তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো। এ সময়ে অপর এক টেলিফোনে জানলাম, ৮০ থেকে ১০০টি যানের বিরাট একটি কনভয় কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামের পথে রওয়ানা হয়েছে। কুমিল্লা থেকে মেজর বাহার চট্টগ্রাম টেলিফোন অপারেটরকে একথা জানালে সে তৎক্ষণাৎ আমাকে তা অবহিত করে। সংবাদ পাওয়ার পরপরই আমি পাকিস্তানী কলামটিকে এ্যামবুশ করার জন্যে একজন জেসিও'র নেতৃত্বে হালিশহর থেকে এক কোম্পানী সৈন্য পাঠালাম। হালকা মেশিন গান এবং ভারী মেশিন গান ছাড়াও কোম্পানীটির সাথে ছিলো ৩" মর্টার ও রকেট লাঞ্চার। অপারেশনাল কমাণ্ডার সুবেদার মুসা যাত্রার প্রাক্কালে আমাকে টেলিফোন করে বললেন, "আমাদের সাফল্যের জন্য দোয়া করবেন স্যার।"

"সকল দেশবাসী আপনাদের জন্য দোয়া করছে। যুদ্ধ চালিয়ে যান, মাতৃভূমিকে মুক্ত করুন।" আমার গলার স্বর ছিলো আবেগে উদ্বেলিত।

কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামগামী শত্রু পক্ষে ছিলো ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেণ্ট ও ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারদের একটি অংশ এবং তাদের সঙ্গে ১২০ মিলিমিটার মর্টারবাহী একটি দল। ২৬শে মার্চ রাত ১টার দিকে তারা চট্টগ্রামের পথে কুমিল্লা ক্যাণ্টনমেণ্ট ত্যাগ করে। কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব এক'শ মাইলের কিছু বেশী। তাদের পথে বহু সংখ্যক কালভার্ট এবং ছোট ছোট সেতু ছিলো। সৈন্য চলাচলের বাধাদানের জন্যে পূর্বেই জনসাধারণ এগুলোর অধিকাংশই ভেঙ্গে ফেলেছিলো। তাই পাকিস্তানী কলামটিকে অনেক ক্ষেত্রে মূল রাস্তা ছেড়ে

ঘুরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হচ্ছিলো। একই সাথে ফিল্ড ইঞ্জিনীয়ারের সৈনিকরা সেতুগুলো মেরামতও করে চলছিলো। যাহোক, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শুভপুর সেতুর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে রাখা হয়েছিলো। কুমিল্লাস্থ ৫৩ ব্রিগেড কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি নিজেই সমগ্র কলামের নেতৃত্বে ছিলেন। শুভপুর সেতু মেরামত করতে সময় লাগবে দেখে ব্রিগেড কমাণ্ডার পদাতিক সেনাদের নিয়ে নদী পার হয়ে চট্টগ্রামের পথে রওয়ানা হলেন এবং পিছনে রেখে গেলেন মর্টার এবং ইঞ্জিনিয়ার ইউনিটকে । তাদের বলে গেলেন সেতু মেরামত করেই তারা যেন অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে যোগ দেয়। সূর্য তখন অস্তপ্রায়। ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি এবং তার বাহিনী চট্টগ্রাম থেকে ১৪ মাইল দূরে কুমিরায় পৌঁছে গেলেন।

এদিকে ইপিআর সেনারা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে রাস্তার পূর্বপাশের একটি উঁচু জায়গায় অ্যামবুশ করে বসেছিলো। রাস্তার পশ্চিমে কিছু দূরেই সাগর। উঁচু জায়গাটি থেকে রাস্তা এবং সাগর বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো। বড় সেতু-গুলোর কষ্টসাধ্য বাধা পেরিয়ে আসতে পেরে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি খুব খুশী ছিলেন। কারণ, সেতুগুলো পুরোপুরি ধ্বংস হলে তাদের পক্ষে সেতু পার হওয়া সম্ভব হতো না। সমস্যার মুহূর্তে কুমিরায় পৌঁছে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে, আর মাত্র মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই চট্টগ্রামের পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন এবং তারপরই নামতে পারবেন বাঙালীদের শায়েস্তা করতে। কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি জীবনের সর্ববৃহৎ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন। ইপিআর সেনাদের অ্যামবুশে তিনি এবং তার প্রায় অর্ধেক সৈন্য দিশেহারা হয়ে পড়লো।

এই অ্যামবুশে পাক সেনাদের হতাহতের খবর পরে পাওয়া গিয়েছিলো। লাইট মেশিনগানের ঝাঁক ঝাঁক গুলীর শিকার হয়েছিলেন ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেণ্টের কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল শাহপুর খানসহ প্রায় ৭০ জন পাকসেনা। আহত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত যানবাহনের সংখ্যাও ছিলো প্রচুর। ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি জীবন বাঁচাবার জন্যে তখন প্রাণপনে ছুটছিলেন পাহাড়ের দিকে। কয়েক জন সঙ্গীও তাঁকে অনুসরণ করলো। ভীত সন্ত্রস্ত সৈনিকরা হাতিয়ার, যানবাহন এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ফেলেই প্রাণপণে ছুটছিলো। শত্রু পক্ষের পিছনের অংশ যারা আমাদের অস্ত্রের আওতার বাইরে ছিলো তারা সঙ্গে সঙ্গেই সুবিধা জনক স্থানে অবস্থান নিয়ে পালটা গুলী বর্ষণ শুরু করলো। এক ঘণ্টারও বেশী সময় এই গুলী বিনিময় চললো। ইতিমধ্যে পাকিস্তানীদের মর্টার বহর শুভপুর সেতু অতিক্রম করে তাদের অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে যোগ দিলো। এই সময়

আমাদের সেনারা প্রায় ৩ মাইল সরে এসে পরবর্তী অবস্থানে প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। এই ভয়াবহ সংঘর্ষে ইপিআর এর ৫ জন গুরুতরভাবে আহত হয়।

কুমিরায় শত্রুর বিরুদ্ধে ইপিআর সেনাদের এই অ্যামবুশ ছিলো আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে প্রথম সরাসরি আক্রমণ। কুমিরার ঘটনার গুরুত্ব এতই সুদূরপ্রসারী ছিলো যে এই ঘটনা পাকিস্তানী সৈন্যদের চট্টগ্রামে অবাধে কিছু করার মূল পরিকল্পনা ব্যাহত করে দেয়। চট্টগ্রামে শত্রুদের লোকবল পর্যাপ্ত ছিলো না বলে কুমিল্লা থেকে লোকবল বৃদ্ধিই ছিলো একমাত্র ভরসা। এই অ্যামবুশের পরেই আমরা একটি অয়্যারলেস বার্তা শুনে ফেলি। চট্টগ্রামের জনৈক কমাণ্ডার ঢাকায় ৯৪ ডিভিশনের কর্ণেল স্টাফ হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি বলছিলেন আমাদের অনেক লোক হতাহত হয়েছে। সীতাকুণ্ডের দক্ষিণে বাকী সৈন্যরা আটকা পড়ে আছে। বিমানে সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ করছি। জরুরী ভিত্তিতে বিমানে করে হতাহতদের সরাবার ব্যবস্থা করা দরকার।[৫৪]

কুমিরায় আমারও কিছু লোক হতাহত হয়েছিলো। আমারও প্রয়োজন ছিলো নূতন সৈন্যের, অস্ত্র এবং গোলাবারুদের। সেই মুহূর্তে সীমান্ত এলাকা থেকে যে সব ইপিআর সৈন্য আসছিলো তারাই ছিলো আমার প্রধান ভরসা।

২৬শে মার্চ ভোর নাগাদ ক্যাপ্টেন হারুন শহরের পাঁচ মাইলের মধ্যে এসে পড়লেন। তাঁর সৈন্যরা উচ্চ কণ্ঠে "জয়বাংলা" শ্লোগান দিতে দিতে আসছিলো। কিন্তু শহরের উপকণ্ঠে এসেই থামতে হলো তাদেরকে। কয়েকজন সৈন্যকে শহর ছেড়ে কালুরঘাট সেতুর দিকে যেতে দেখা গেলো। কিছুক্ষণের জন্য ক্যাপ্টেন হারুন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন "শত্রুরা কি তাহলে পুরোপুরি শহর দখল করে ফেলেছে?" এই ভাবনা তাঁকে কিছুটা হতবুদ্ধি করে দেয়। পরে দেখা গেলো যে এরা বেঙ্গল রেজিমেণ্টাল সেণ্টার এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের লোক। তারা সবাই পটিয়ার দিকে যাচ্ছিলো। শহরে ঢোকার আগে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি কালুরঘাট ব্রিজ পেরিয়ে মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাঁকে কালুরঘাট এলাকাতেই থাকতে বলা হলো। ফলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শহরের যুদ্ধে আমার সঙ্গে যোগ দেয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হলো না।

কক্সবাজারে ইপিআর কোম্পানীর কমাণ্ডার ছিলেন সুবেদার মফিজ। তিনি দুটি ইপিআর কোম্পানী নিয়ে আমার সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য কক্সবাজার ত্যাগ করেছিলেন। তাকেও কালুরঘাট এলাকায় থামিয়ে সেখানেই আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করতে বলা হয়। তিনি পরে আমাকে বললেন, "আপনার সাথে

যোগ দিতে পারিনি, এটা আমার ত্রুটি ছিলো না। মেজর জিয়া আমাকে কালুর-ঘাটে থামিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে আপনার নির্দেশের কথা জানালে তিনি আমাকে জানান শহরে কেউ নেই। অবশ্য পরে দেখা গেলো আপনি তখনো শহরে যুদ্ধ করে চলেছেন।"

আমরা তখনো শহর ছাড়িনি। বিভিন্ন জায়গায় প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছিলো। কিন্তু ঘটনাবলী শহরের পরিস্থিতিকে যে দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো তা মোটেই আমার জন্য অনুকূল ছিলো না।

কক্সবাজার এবং কাপ্তাই থেকে যে সৈন্যরা আসছিলো কালুরঘাট ব্রিজের কাছে তাদের থামিয়ে দেয়া হচ্ছিলো। কুমিরায় প্রধান সড়ক বরাবর প্রচণ্ড সংঘর্ষের দরুন রামগড়ের সৈন্যরা আসতে পারছিলো না। শহরে যে ক'জন সৈন্য ছিলো শুধু তাদের সম্বল করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিলো না। নৌ-বাহিনীর সদর দফতর এবং পোর্ট মুক্ত করার পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো।

বেলা ৯টা নাগাদ অনেক উঁচু দিয়ে শহরে হেলিকপ্টার ঘোরাঘুরি শুরু করলো। কয়েক জায়গায় জনসাধারণ সেগুলোর দিকে বন্দুকের গুলী ছুঁড়লো। বিরাটকায় সি-১৩০ বিমানগুলো ঢাকা থেকে সৈন্য আনতে থাকলো। অসহায় ভাবে তবু আমরা সেই অবস্থান আকড়ে রইলাম। আমাদের প্রচেষ্টা ছিলো, ক্যান্টনমেন্ট এবং নৌ-বাহিনীর সদর দফতর থেকে শত্রুদের বেরোতে না দেয়া। কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের অধিকাংশ সৈন্য নিহত হওয়ায় এবং ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্ট শহর ত্যাগ করায় ওদিক দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের বেরোনো সহজতর হয়ে উঠেছিলো। ঘটলোও তাই। ট্যাংকের ছত্রছায়ায় ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়লো।

নৌ-বাহিনীর সদর দফতরের পাকিস্তানী সৈন্যরা অবশ্য তখনো আটকা অবস্থায়। সমগ্র আগ্রাবাদ রোডের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ছিলো ইপিআর সৈন্যদের দখলে। হালিশহরের কাছে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম বলে শত্রু পক্ষের একটি লোকের পক্ষেও চলাচল করা সম্ভব ছিলো না। এমনিভাবে ওদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা আমরা অনেকখানি ব্যাহত করতে পেরেছিলাম।

২৬শে মার্চ সকালে ডাঃ জাফর, জনাব কায়সার এবং আওয়ামী লীগের আরো কয়েকজন আমার সৈন্যদের জন্য রেলওয়ে হিলে চা ও রুটি নিয়ে এলেন। আমাকে কক্সবাজার যাওয়ার জন্য সেই অপরিচিত ব্যক্তিটি যে টোপ ফেলেছিলেন তার কথা ডাঃ জাফরকে জানালাম। ডাঃ জাফরকে আরও বললাম যে, চট্টগ্রাম শহর থেকে কক্সবাজার যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

আমার ভাষণ রেডিওতে প্রচারের জন্য টেপ রেকর্ডার নিয়ে ফিরে আসার কথা বলে সেই অপরিচিত আগন্তুক চলে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি আর ফিরে না আসায় আমার সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে যায়। টেলিফোনে আমি সর্বজনাব হান্নান, জহুর আহমদ চৌধরী এবং এম. আর. সিদ্দিকীর সঙ্গে আলোচনা করলাম। তাঁদেরকে একথাও বললাম যে, চট্টগ্রাম শহরে আমরা যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি একথা রেডিওতে প্রচার করা দরকার। সেই অনুসারে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ একটি খসড়া ঘোষণা তৈরী করে দিলেন এবং সেটি চূড়ান্তভাবে সংশোধন করে দিলেন ডাঃ জাফর। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাত থেকে বাঙালীদের জীবন বাঁচানোর জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে আবেদনই ছিলো ঘোষণাপত্রটির মূল বক্তব্য।

বাঙালীদের হাতে যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যও ঘোষণায় আহবান জানানো হয়। এই ঘোষণাটি চট্টগ্রাম রেডিও ট্রান্সমিটিং সেন্টার কালুরঘাটস্থ (স্বাধীন বাঙলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র) থেকে ২৬শে মার্চ বেলা প্রায় আড়াইটায় "জাতির নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে" চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব এম. এ. হান্নান পাঠ করে শোনান। কালুরঘাটের ১০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন ট্রান্সমিটারটির স্পষ্ট প্রচার ক্ষমতা ছিলো প্রায় ৬০ মাইল ব্যাসার্ধ পর্যন্ত। তাই দেশের অবশিষ্ট অংশের জনসাধারণের অধিকাংশই কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের এই প্রথম ঘোষণা পরিষ্কারভাবে শুনতে পাননি। রেডিওর এই সীমাবদ্ধতার কারণে ২৬শে মার্চ জনাব হান্নানের প্রথম ঘোষণা, ২৭শে মার্চ মেজর জিয়ার ঘোষণা এবং পরে অপর কয়েকজনের ঘোষণাও স্পষ্টভাবে শোনা যায়নি। এমন কি প্রথম দিন অনেকেই রেডিওর কার্যকর আওতার মধ্যে থেকেও জনাব হান্নানের ভাষণ শুনতে পাননি। কারণ, সাধারণতঃ দুপুর আড়াইটায় অনেকেই রেডিও খোলেন না। তাছাড়া সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে যারা খুলেছিলেন, তারা ঢাকার খবর শোনার জন্যই রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র অধীর আগ্রহে শুনছিলেন। বস্তুতঃ সেদিন আমাদের হাতে আদৌ কোন বেতার কেন্দ্র না থাকলেও ইতিহাসের গতিধারা, আপন পথেই চলতো। সমগ্র দেশের বাঙালীরা তখন পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। চট্টগ্রামে ২৫শে মার্চ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে আমরা লড়াই শুরু করি। পাকিস্তানীরা রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে গণহত্যা শুরু করে এবং অন্যদিকে ২৬শে মার্চ থেকেই দেশের বাকী অংশে শত্রুর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হওয়ার পরই চট্টগ্রাম থেকে বেতার ঘোষণা প্রচারিত হয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, শত্রুর বিমান হামলায় ধ্বংস হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ থেকে ৩০শে মার্চের মধ্যে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কর্মসূচীর প্রথম সূত্রপাত হয়।

যোগ দিতে পারিনি, এটা আমার ত্রুটি ছিলো না। মেজর জিয়া আমাকে কালুর-ঘাটে থামিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে আপনার নির্দেশের কথা জানালে তিনি আমাকে জানান শহরে কেউ নেই। অবশ্য পরে দেখা গেলো আপনি তখনো শহরে যুদ্ধ করে চলেছেন।"

আমরা তখনো শহর ছাড়িনি। বিভিন্ন জায়গায় প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছিলো। কিন্তু ঘটনাবলী শহরের পরিস্থিতিকে যে দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো তা মোটেই আমার জন্য অনুকূল ছিলো না।

কক্সবাজার এবং কাপ্তাই থেকে যে সৈন্যরা আসছিলো কালুরঘাট ব্রিজের কাছে তাদের থামিয়ে দেয়া হচ্ছিলো। কুমিরায় প্রধান সড়ক বরাবর প্রচণ্ড সংঘর্ষের দরুন রামগড়ের সৈন্যরা আসতে পারছিলো না। শহরে যে ক'জন সৈন্য ছিলো শুধু তাদের সম্বল করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিলো না। নৌ-বাহিনীর সদর দফতর এবং পোর্ট মুক্ত করার পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো।

বেলা ৯টা নাগাদ অনেক উঁচু দিয়ে শহরে হেলিকপ্টার ঘোরাঘুরি শুরু করলো। কয়েক জায়গায় জনসাধারণ সেগুলোর দিকে বন্দুকের গুলী ছুঁড়লো। বিরাটকায় সি-১৩০ বিমানগুলো ঢাকা থেকে সৈন্য আনতে থাকলো। অসহায় ভাবে তবু আমরা সেই অবস্থান আকড়ে রইলাম। আমাদের প্রচেষ্টা ছিলো, ক্যান্টনমেন্ট এবং নৌ-বাহিনীর সদর দফতর থেকে শত্রুদের বেরোতে না দেয়া। কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের অধিকাংশ সৈন্য নিহত হওয়ায় এবং ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্ট শহর ত্যাগ করায় ওদিক দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের বেরোনো সহজতর হয়ে উঠেছিলো। ঘটলোও তাই। ট্যাংকের ছত্রছায়ায় ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়লো।

নৌ-বাহিনীর সদর দফতরের পাকিস্তানী সৈন্যরা অবশ্য তখনো আটকা অবস্থায়। সমগ্র আগ্রাবাদ রোডের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ছিলো ইপিআর সৈন্যদের দখলে। হালিশহরের কাছে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম বলে শত্রু পক্ষের একটি লোকের পক্ষেও চলাচল করা সম্ভব ছিলো না। এমনিভাবে ওদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা আমরা অনেকখানি ব্যাহত করতে পেরেছিলাম।

২৬শে মার্চ সকালে ডাঃ জাফর, জনাব কায়সার এবং আওয়ামী লীগের আরো কয়েকজন আমার সৈন্যদের জন্য রেলওয়ে হিলে চা ও রুটি নিয়ে এলেন। আমাকে কক্সবাজার যাওয়ার জন্য সেই অপরিচিত ব্যক্তিটি যে টোপ ফেলেছিলেন তার কথা ডাঃ জাফরকে জানালাম। ডাঃ জাফরকে আরও বললাম যে, চট্টগ্রাম শহর থেকে কক্সবাজার যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

আমার ভাষণ রেডিওতে প্রচারের জন্য টেপ রেকর্ডার নিয়ে ফিরে আসার কথা বলে সেই অপরিচিত আগন্তুক চলে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি আর ফিরে না আসায় আমার সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে যায়। টেলিফোনে আমি সর্বজনাব হান্নান, জহুর আহমদ চৌধরী এবং এম. আর. সিদ্দিকীর সঙ্গে আলোচনা করলাম। তাঁদেরকে একথাও বললাম যে, চট্টগ্রাম শহরে আমরা যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি একথা রেডিওতে প্রচার করা দরকার। সেই অনুসারে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ একটি খসড়া ঘোষণা তৈরী করে দিলেন এবং সেটি চূড়ান্তভাবে সংশোধন করে দিলেন ডাঃ জাফর। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাত থেকে বাঙালীদের জীবন বাঁচানোর জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে আবেদনই ছিলো ঘোষণাপত্রটির মূল বক্তব্য।

বাঙালীদের হাতে যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যও ঘোষণায় আহবান জানানো হয়। এই ঘোষণাটি চট্টগ্রাম রেডিও ট্রান্সমিটিং সেন্টার কালুরঘাটস্থ (স্বাধীন বাঙলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র) থেকে ২৬শে মার্চ বেলা প্রায় আড়াইটায় "জাতির নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে" চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব এম. এ. হান্নান পাঠ করে শোনান। কালুরঘাটের ১০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন ট্রান্সমিটারটির স্পষ্ট প্রচার ক্ষমতা ছিলো প্রায় ৬০ মাইল ব্যাসার্ধ পর্যন্ত। তাই দেশের অবশিষ্ট অংশের জনসাধারণের অধিকাংশই কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের এই প্রথম ঘোষণা পরিষ্কারভাবে শুনতে পাননি। রেডিওর এই সীমাবদ্ধতার কারণে ২৬শে মার্চ জনাব হান্নানের প্রথম ঘোষণা, ২৭শে মার্চ মেজর জিয়ার ঘোষণা এবং পরে অপর কয়েকজনের ঘোষণাও স্পষ্টভাবে শোনা যায়নি। এমন কি প্রথম দিন অনেকেই রেডিওর কার্যকর আওতার মধ্যে থেকেও জনাব হান্নানের ভাষণ শুনতে পাননি। কারণ, সাধারণতঃ দুপুর আড়াইটায় অনেকেই রেডিও খোলেন না। তাছাড়া সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে যারা খুলেছিলেন, তারা ঢাকার খবর শোনার জন্যই রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র অধীর আগ্রহে শুনছিলেন। বস্তুতঃ সেদিন আমাদের হাতে আদৌ কোন বেতার কেন্দ্র না থাকলেও ইতিহাসের গতিধারা, আপন পথেই চলতো। সমগ্র দেশের বাঙালীরা তখন পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। চট্টগ্রামে ২৫শে মার্চ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে আমরা লড়াই শুরু করি। পাকিস্তানীরা রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে গণহত্যা শুরু করে এবং অন্যদিকে ২৬শে মার্চ থেকেই দেশের বাকী অংশে শত্রুর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হওয়ার পরই চট্টগ্রাম থেকে বেতার ঘোষণা প্রচারিত হয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, শত্রুর বিমান হামলায় ধ্বংস হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ থেকে ৩০শে মার্চের মধ্যে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কর্মসূচীর প্রথম সূত্রপাত হয়।

যোগ দিতে পারিনি, এটা আমার ত্রুটি ছিলো না। মেজর জিয়া আমাকে কালুর-ঘাটে থামিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে আপনার নির্দেশের কথা জানালে তিনি আমাকে জানান শহরে কেউ নেই। অবশ্য পরে দেখা গেলো আপনি তখনো শহরে যুদ্ধ করে চলেছেন।"

আমরা তখনো শহর ছাড়িনি। বিভিন্ন জায়গায় প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছিলো। কিন্তু ঘটনাবলী শহরের পরিস্থিতিকে যে দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো তা মোটেই আমার জন্য অনুকূল ছিলো না।

কক্সবাজার এবং কাপ্তাই থেকে যে সৈন্যরা আসছিলো কালুরঘাট ব্রিজের কাছে তাদের থামিয়ে দেয়া হচ্ছিলো। কুমিরায় প্রধান সড়ক বরাবর প্রচণ্ড সংঘর্ষের দরুন রামগড়ের সৈন্যরা আসতে পারছিলো না। শহরে যে ক'জন সৈন্য ছিলো শুধু তাদের সম্বল করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিলো না। নৌ-বাহিনীর সদর দফতর এবং পোর্ট মুক্ত করার পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো।

বেলা ৯টা নাগাদ অনেক উঁচু দিয়ে শহরে হেলিকপ্টার ঘোরাঘুরি শুরু করলো। কয়েক জায়গায় জনসাধারণ সেগুলোর দিকে বন্দুকের গুলী ছুঁড়লো। বিরাটকায় সি-১৩০ বিমানগুলো ঢাকা থেকে সৈন্য আনতে থাকলো। অসহায় ভাবে তবু আমরা সেই অবস্থান আকড়ে রইলাম। আমাদের প্রচেষ্টা ছিলো, ক্যান্টনমেন্ট এবং নৌ-বাহিনীর সদর দফতর থেকে শত্রুদের বেরোতে না দেয়া। কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের অধিকাংশ সৈন্য নিহত হওয়ায় এবং ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্ট শহর ত্যাগ করায় ওদিক দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের বেরোনো সহজতর হয়ে উঠেছিলো। ঘটলোও তাই। ট্যাংকের ছত্রছায়ায় ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়লো।

নৌ-বাহিনীর সদর দফতরের পাকিস্তানী সৈন্যরা অবশ্য তখনো আটকা অবস্থায়। সমগ্র আগ্রাবাদ রোডের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ছিলো ইপিআর সৈন্যদের দখলে। হালিশহরের কাছে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম বলে শত্রু পক্ষের একটি লোকের পক্ষেও চলাচল করা সম্ভব ছিলো না। এমনিভাবে ওদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা আমরা অনেকখানি ব্যাহত করতে পেরেছিলাম।

২৬শে মার্চ সকালে ডাঃ জাফর, জনাব কায়সার এবং আওয়ামী লীগের আরো কয়েকজন আমার সৈন্যদের জন্য রেলওয়ে হিলে চা ও রুটি নিয়ে এলেন। আমাকে কক্সবাজার যাওয়ার জন্য সেই অপরিচিত ব্যক্তিটি যে টোপ ফেলেছিলেন তার কথা ডাঃ জাফরকে জানালাম। ডাঃ জাফরকে আরও বললাম যে, চট্টগ্রাম শহর থেকে কক্সবাজার যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

আমার ভাষণ রেডিওতে প্রচারের জন্য টেপ রেকর্ডার নিয়ে ফিরে আসার কথা বলে সেই অপরিচিত আগন্তুক চলে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি আর ফিরে না আসায় আমার সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে যায়। টেলিফোনে আমি সর্বজনাব হান্নান, জহুর আহমদ চৌধরী এবং এম. আর. সিদ্দিকীর সঙ্গে আলোচনা করলাম। তাঁদেরকে একথাও বললাম যে, চট্টগ্রাম শহরে আমরা যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি একথা রেডিওতে প্রচার করা দরকার। সেই অনুসারে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ একটি খসড়া ঘোষণা তৈরী করে দিলেন এবং সেটি চূড়ান্তভাবে সংশোধন করে দিলেন ডাঃ জাফর। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাত থেকে বাঙালীদের জীবন বাঁচানোর জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে আবেদনই ছিলো ঘোষণাপত্রটির মূল বক্তব্য।

বাঙালীদের হাতে যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যও ঘোষণায় আহবান জানানো হয়। এই ঘোষণাটি চট্টগ্রাম রেডিও ট্রান্সমিটিং সেন্টার কালুরঘাটস্থ (স্বাধীন বাঙলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র) থেকে ২৬শে মার্চ বেলা প্রায় আড়াইটায় "জাতির নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে" চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব এম. এ. হান্নান পাঠ করে শোনান। কালুরঘাটের ১০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন ট্রান্সমিটারটির স্পষ্ট প্রচার ক্ষমতা ছিলো প্রায় ৬০ মাইল ব্যাসার্ধ পর্যন্ত। তাই দেশের অবশিষ্ট অংশের জনসাধারণের অধিকাংশই কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের এই প্রথম ঘোষণা পরিষ্কারভাবে শুনতে পাননি। রেডিওর এই সীমাবদ্ধতার কারণে ২৬শে মার্চ জনাব হান্নানের প্রথম ঘোষণা, ২৭শে মার্চ মেজর জিয়ার ঘোষণা এবং পরে অপর কয়েকজনের ঘোষণাও স্পষ্টভাবে শোনা যায়নি। এমন কি প্রথম দিন অনেকেই রেডিওর কার্যকর আওতার মধ্যে থেকেও জনাব হান্নানের ভাষণ শুনতে পাননি। কারণ, সাধারণতঃ দুপুর আড়াইটায় অনেকেই রেডিও খোলেন না। তাছাড়া সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে যারা খুলেছিলেন, তারা ঢাকার খবর শোনার জন্যই রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র অধীর আগ্রহে শুনছিলেন। বস্তুতঃ সেদিন আমাদের হাতে আদৌ কোন বেতার কেন্দ্র না থাকলেও ইতিহাসের গতিধারা, আপন পথেই চলতো। সমগ্র দেশের বাঙালীরা তখন পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। চট্টগ্রামে ২৫শে মার্চ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে আমরা লড়াই শুরু করি। পাকিস্তানীরা রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে গণহত্যা শুরু করে এবং অন্যদিকে ২৬শে মার্চ থেকেই দেশের বাকী অংশে শত্রুর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হওয়ার পরই চট্টগ্রাম থেকে বেতার ঘোষণা প্রচারিত হয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, শত্রুর বিমান হামলায় ধ্বংস হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ থেকে ৩০শে মার্চের মধ্যে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কর্মসূচীর প্রথম সূত্রপাত হয়।

চট্টগ্রামে পাকিস্তানীদের সাহায্যার্থে বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য ২৬শে এবং ২৭শে মার্চ ঢাকা থেকে বিমান যোগে চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে এসে পৌঁছায়। বিমান বন্দর থেকে পাকসেনারা আগ্রাবাদ এলাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পাকসেনাদের অপর একটি গ্রুপ হালিশহর ইপিআর সদর দফতরের দিকে অগ্রসর হয়। হালিশহরে আমার ইপিআর বাহিনী আগে থেকেই শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যুহ গড়ে তুলেছিলো।

কুমিরার সংঘর্ষ মারাত্মক হয়ে পড়ে। ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির সৈন্যদের মনোবল এতই ভেঙ্গে পড়েছিলো যে তাদের পক্ষে আর সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিলো না। এই সময় হেলিকপ্টার যোগে জেনারেল মিঠ্ঠা খান কুমিল্লায় উপস্থিত হন এবং সৈন্যদের প্ররোচিত করার উদ্দেশ্য এক জঘন্য মিথ্যা ভাষণে বললেনঃ "হিন্দুদের প্ররোচনায় বাঙালীরা তোমাদের অফিসার, সৈন্য এবং তাদের পরিবার পরিজনকে হত্যা করে চলেছে। তোমরা তাদের রক্ষা না করলে তারা সকলেই প্রাণ হারাবে। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে সামনে এগিয়ে যাও। খুনের বদলে খুন। ইসলাম এবং পাকিস্তানকে তোমরা রক্ষা করো।" প্রতিশোধ গ্রহণের এই তীব্র হলাহল পাকিস্তানী সৈনিকদের মনে ব্যাপক জিঘাংসা সৃষ্টি করে।

মূল সড়ক পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব না হওয়ায় ব্রিগ্রেডিয়ার শফি পাহাড়ের ভেতর দিয়ে একটি কলামকে সেনানিবাসে ২০ বালুচ রেজিমেণ্টের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেন। অপর কলামকে উপকূল রেখা বরাবর অগ্রসর হয়ে বাঁধের উপর তড়িৎ অবস্থান গ্রহণকারী আমাদের সৈন্যদের ঘিরে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। মাঝেমাঝেই উভয় পক্ষে গুলী বিনিময় চলছিলো। সংঘর্ষ এলাকা থেকে জনসাধারণ ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকলেও এলাকার তরুণেরা আমাদের সৈনিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে খাবার এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে থাকে। এমন কি তারা হতাহতদের নিরাপদ স্থানে সুচিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে থাকে। সৌভাগ্যের বিষয় ছিলো তাদের অনেকেই শত্রু সেনাদের কাছাকাছি থেকে তাদের প্রতিটি অবস্থানের খবরাখবর আমাদেরকে সরবরাহ করে চলছিলো।

উপকূল বরাবর শত্রু সেনাদের অগ্রসর হওয়ার খবর পেয়েই আমরা অরেকটি অ্যামবুশের আয়োজন করি। পাকিস্তানীরা আমাদের অ্যামবুশে পড়ে যায়। এই দ্বিতীয় অ্যামবুশেও শত্রু সেনাদের অনেকে হতাহত হয়। ভীত পাকিস্তানীরা তাদের মৃত সঙ্গীদের ফেলেই নানা দিকে দৌড়াতে থাকে। অনেকেই পথ ভুলে গ্রামগুলোতে ঢুকে পড়লে নিরস্ত্র বিক্ষুব্ধ জনতার হাতেই প্রাণ হারায়।

ইতিমধ্যে আমার ইপিআর কোম্পানীর গোলাবারুদ প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে। অপর দিকে হালিশহর সদর দফতরেও বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করার মত গোলা-বারুদ আর তেমন ছিলো না। এই পরিস্থিতিতে আমি কুমিরার কোম্পানীকে পেছনে সরে শহরের উপকণ্ঠে নতুন প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিতে বললাম। স্থানটি হালিশহরে আমাদের অবস্থানের নিকটেই ছিলো। আমরা তীব্রভাবে গোলাবারুদ এবং নতুন সৈন্যের প্রয়োজনীয়তার অভাব অনুভব করি। অথচ সেই মুহূর্তে এগুলো সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ছিলো। এদিকে রাঙ্গামাটি থেকে আগত ইপিআর সেনারা ক্যাণ্টনমেণ্টের অদূরে বাধাগ্রস্ত হয়, এবং রামগড় এলাকার অপর দু'টি ইপিআর কোম্পানীও মূল সড়ক পথ ধরে অগ্রসর হতে পারছিলো না। এসময় আমার সামনে দুটি বিকল্প পথই খোলা ছিলো। হয় ক্যাণ্টনমেণ্টের অস্ত্রাগার দখল করা অথবা সরবরাহের জন্য ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করা। অন্যসব সম্ভাবনা ব্যর্থ হলে চূড়ান্ত পন্থা হিসাবে শেষেরটিই বিবেচনা করা যায় বলে মনে করলাম। আমি প্রথম পন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেই এবং তখনই রাম-গড়ের একটি কোম্পানীকে মাঠের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে ক্যাণ্টনমেণ্টের পেছনে অবস্থানকারী আমাদের সেনাদের সঙ্গে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিলাম। অপর কোম্পানীটিকে শুভপুর সেতু এলাকায় শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলতে বললাম যাতে সড়ক পথে কুমিল্লা থেকে নতুন কোনো পাক সৈন্য চট্টগ্রামে আসতে না পারে।

২৬শে মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৮ টার দিকে নৌ-বাহিনীর যোগাযোগ ঘাঁটিতে পাক সৈন্যদের আনাগোনা লক্ষ্য করা গেলো। রেলওয়ে পাড়াড়ে আমার ট্যাকটিক্যাল হেড কোয়ার্টার থেকে পাশের একটা মসজিদে তাদের আনাগোনা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো। কয়েকজন বেসামরিক ব্যক্তিও তাদের সঙ্গে মসজিদে যোগ দেয়। এই সময়ই হালকা মেশিনগান নিয়ে অবস্থানকারী আমার একজন সিপাই যে মুহূর্তে ট্রেঞ্চ থেকে মাথা তুললো অমনি একটি বুলেট তাকে আঘাত করলো। গুলীটি আসে মসজিদের দিক থেকে। সাথে সাথে শত্রুরা আমাদের অবস্থানের ওপর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহায্যে ব্যাপকভাবে গুলী চালাতে শুরু করে। একই সঙ্গে সাগরের দিক থেকে নৌ-বাহিনীর ভারী কামানগুলো আমাদের ওপর গোলা বর্ষণ শুরু করলো। কামানের গোলা আমাদের চতুর্দিকে পড়তে থাকে। বিস্ফোরিত গোলার মারাত্মক টুকরোগুলো ভয়াবহরূপে চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শত্রুদের একটি দল টাইগার পাস ঘাঁটি থেকে আক্রমণ চালায়। অবশ্য এই আক্রমণ সাথে সাথেই প্রতিহত করা হলো। কিছুক্ষণ পর অপর দিক থেকেও হামলা হতে থাকে। তবে দুটি হামলাই সামনের দিক

থেকে আসছিলো বলে ওরা তেমন সুবিধা করতে পারেনি। বরং পাকিস্তানীরা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। সামনে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়ে তারা পিছু হটে গিয়ে তাদের সুদৃঢ় ঘাঁটি থেকে আমাদের অবস্থানের ওপর অবিরাম গুলী বর্ষণ করতে থাকলো।

অনুরূপভাবে আমাদের হালিশহর অবস্থানের ওপরও কয়েক দফা হামলা হলো। কিন্তু প্রতিবারই শত্রুসেনারা হটতে বাধ্য হলো। ২৬শে এবং ২৭শে মার্চের মধ্যবর্তী রাতকে মনে হচ্ছিলো এ রাত যেন আর পোহাবে না। গুলীর শব্দে, গোলার বিস্ফোরণে সমস্ত শহর কেঁপে কেঁপে উঠছিলো বারংবার।

এ সময় আমার অবস্থানের পেছনেই ট্যাংকের আওয়াজ পেলাম। অন্য কোনো ভাবে আমাদের অবস্থান দখল করতে না পেরে শত্রুরা ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে ট্যাংক নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলো। রেলওয়ে হিলে আমাদের অবস্থান শত্রু দ্বারা ঘেরাও আসন্ন হয়ে উঠলো। অথচ কোনো ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র আমাদের ছিলো না।

প্রায় দু' ঘণ্টা পর কামানের গোলাবর্ষণ একটু কমে এলো। এ সময় একজন আহত সৈনিককে আমার কমাণ্ড পোস্টে নিয়ে আসা হলো। সে ছিলো বয়সে তরুণ। কাদামাটি লাগা কাপড় চোপড় রক্তে ভেজা। বুলেট তার বুকে বিদ্ধ হয়েছিলো। দারুণ কষ্টে নিঃশ্বাস টানতে গিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলো, "কখন আমার মৃত্যু হবে?" তার দৃষ্টিতে ছিলো সারা বিশ্বের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। এরপর সে আর কিছু বলতে পারেনি। আরো অনেকের মতই নিভৃত যন্ত্রণায় সেও আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেলো।

কিন্তু কোনো মানব জীবনের এই ধরনের বিয়োগান্ত ঘটনা ইয়াহিয়া খানের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেনি। "আমি তাদের (বাঙালীদের) উপযুক্ত শিক্ষা দেব" —তাঁর এই হুংকার রাতেই রেডিওতে শোনা গেলো। এই শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর ঘাতক বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন বাঙালীদের বিরুদ্ধে।

১

ঘেরাও

ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে নৃশংস অভিযানের প্রাথমিক সাফল্যে উৎফুল্ল ইয়াহিয়া তাঁর বাহিনীকে ব্যাপক গণহত্যার ছাড়পত্র প্রদান করেন। পাকসেনারা তাদের অভিযান এলাকাগুলোতে প্রাণী বলতে যা কিছু পেয়েছে তাই নিধন করেছে এবং এসব ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে অবলীলাক্রমে। কিন্তু তবুও লোক এবং অস্ত্রবলে বলীয়ান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু এই প্রতিরোধ অব্যাহত রাখা ছিলো দুঃসাধ্য, কারণ অস্ত্র চালনায় জনসাধারণের একদিকে যেমন কোন ট্রেনিং ছিলোনা তেমনি তাদের অস্ত্রগুলোও ছিলো পুরোনো আমলের। এদিকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত আমাদের বাঙালী সৈনিকেরা যেখানেই সংগঠিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছেন সেখানেই শুরু হয়েছে কামান, ট্যাংক আর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রদ্বারা শত্রু পক্ষের সম্মিলিত আক্রমণ। এই ধরনের বারংবার হামলার মোকাবিলা করতে গিয়ে আমাদের গোলাবারুদের মজুতে টান পড়ে।

এই অবস্থায় রেলওয়ে হিলের অবস্থান ত্যাগ করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলো। তখন চারদিকেই শত্রু সেনা। ক্রমাগত ৮ ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর কামানগুলো আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে আমাদেরকে ব্যস্ত রাখে। এই সঙ্কটময় অবস্থায় আমি আমার সৈন্যদের কোতয়ালী থানা এলাকার দিকে সরে যেতে নির্দেশ দিই এবং সেখান থেকে ক্যান্টনমেন্টের পেছনে সকলকে একত্র হতে বলি। গুলীবর্ষণের ছত্রছায়ায় যখন সকলেই স্থান ত্যাগ করে চলে যায় তারপরই আমি ঘাঁটি ত্যাগ করার জন্য পা বাড়াই। একজন তরুণ কলেজ ছাত্রও আমার সঙ্গে ছিলো। আমরা চলছিলাম, কিন্তু মুখে কোনো কথা ছিলোনা। সমস্ত সকালটি ছিলো কুয়াশাচ্ছন্ন। বিমূঢ় বিষণ্ণতায় সমস্ত শহর যেনো আচ্ছন্ন। রাস্তাঘাট ছিলো জনমানব শূন্য, মনে হচ্ছিলো মৃতের নগরী। শত শত বছর পরে মাটির তলা থেকে খুঁড়ে যেনো নগরটিকে আবিষ্কার করা হয়েছে। দূরে বন্দরে জাহাজের মাস্তুল, ক্রেন, ওধারে অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রাম

সব কিছুই একটির পর একটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে পিছন ফিরে তাকাতেই সাঁ করে একটি বুলেট আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেলো। সাথে সাথে আমরা নীচু হয়ে চলার গতি বাড়িয়ে দেই।

কদমতলী রেলক্রসিংয়ের কাছে নৌ-সেনাদের দু'টি ট্রাক এ সময় অন্ধকারের মধ্যে অপেক্ষা করছিলো। আমি নিঃশঙ্কচিত্তে সামনে এগোচ্ছিলাম। কোনো দেশ কি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না? বহির্জগতের কোনো দেশ কি জানে না বাংলাদেশে এখন কি ঘটছে? আমাদের বেতার ঘোষণা কি তারা শুনেছে? এমনি নানা কথার ভীড় আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। কদমতলীর কাছাকাছি এসে এসব কথা ভাবতে ভাবতে যখনই রাস্তা পেরোতে গেছি তখনই দুটি গাড়ীর হেড লাইটের তীব্র আলোয় আমার চোখ ঝলসে যায়। দুটি গাড়ী থেকেই সৈন্যরা লাফিয়ে নামতে থাকে। আমি সামনে একটি প্রাচীর দেখে সেটি পার হওয়ার জন্য দৌড় দেই। শত্রুসৈন্যরাও গুলী বর্ষণ শুরু করে। একটি গুলী এসে আমার ডান হাতে ধরা স্টেনগানে লাগলে প্রচণ্ড ধাক্কায় সেটি ছিটকে পড়ে। আমি মুহূর্তে দেয়ালের উপর লাফিয়ে উঠে প্রচণ্ড বেগে ওপাশে গিয়ে পড়ি। তারপর লাফিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে আবার কখনো দৌড়ে চলতে থাকি। পেছনে শুনতে থাকি নৌ-সেনাদের এলোপাথাড়ি গুলীবর্ষণের শব্দ। তাদের দুঃখ, শিকার তাদের হাতছাড়া হয়ে গেলো।

আমার বাম উরুতে তখন ভয়ানক যন্ত্রনা হচ্ছিলো, ভীষণ রক্ত ঝরছিলো এবং ট্রাউজারের একটি অংশ হাটু পর্যন্ত ছিঁড়ে ঝুলছিলো। দেয়াল থেকে লাফিয়ে পড়ার সময়ই বোধহয় কিছুতে লেগে এই জখম হয়েছে। কোতোয়ালী থানায় পৌঁছে দেখি, আমার লোকেরা সবাই সেখানে জড়ো হয়েছে। তিন ইঞ্চি মর্টারগুলো তখন আমাদের জন্য বোঝা হয়ে পড়েছিলো। কারণ ওগুলোর কোনো শেল অবশিষ্ট ছিল না। পেট্রোলের অভাবে আমাদের কয়েকটি গাড়িও ফেলে আসতে হলো। আমি টেলিফোনে জনাব সিদ্দিকীকে মর্টারগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ীসহ কাউকে পাঠাতে বললাম এবং সৈন্যদেরকে পূর্ব পরিকল্পিত জায়গায় গিয়ে প্রস্তুত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলাম। আমাদের আশা ছিলো সেখান থেকে ক্যান্টনমেন্টের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করতে পারবো।

আমাদের ভিন্ন রাস্তায় অগ্রসর হতে হলো। ক্যান্টনমেন্ট ও শহরের মধ্যবর্তী প্রধান শহরটি তখন শত্রুকবলিত। আমরা কিছু লোক গাড়িতে এবং কিছু লোক পায়ে হেঁটে গন্তব্য স্থলের দিকে রওয়ানা হলাম। চকবাজারের কিছু সামনে

শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছতেই দেখলাম আমার একজন ইপিআর সেপাই পায়ে হেঁটে শহরের দিকে ফিরছে।

"ওদিকে কোথায় যাচ্ছো?" আমি চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম। বিষণ্ণ কণ্ঠে সে জবাব দিলো, "আপনার কাছেই স্যার।" সে আরো বললো, "আপনি ক্যাণ্টনমেণ্টের পেছনের এলাকায় গিয়ে আমাদেরকে একত্র হওয়ার জন্য বলে-ছিলেন। কিন্তু একজন অফিসার অন্যপথ দিয়ে সৈন্যদেরকে নিয়ে কালুরঘাট সেতুর দিকে চলে গেছেন।" আমি আবার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম, "কোন অফিসার?"

"আমি তাঁর নাম জানিনা স্যার।"

জনাব হান্নান এবং ডাঃ জাফরকে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম মেজর জিয়াউর রহমান আমার সেনাদের কালুরঘাট সেতুর দিকে নিয়ে গিয়েছেন। আমি আওয়ামী-লীগ নেতাদের অনুরোধ করলাম তাঁরা যেন জিয়াকে বলেন, আমার সৈন্যদের ছেড়ে দিতে, যাতে ওরা শহরে আমার সাথে যোগ দিতে পারে। তদনুসারে ডাঃ জাফর, জনাব হান্নান, নগর আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব মান্নান, জনাব কায়সার এবং আরো কয়েকজন কালুরঘাটের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। গোম-দণ্ডী স্টেশনের কাছে তাঁরা মেজর জিয়া, মেজর শওকত এবং অন্য কয়েকজন অফিসারের সাক্ষাত পান। আমার সাথে শহরের লড়াইয়ে অংশ নেয়ার জন্য তাঁরা জিয়াকে আমার সৈন্যদের ছেড়ে দিতে বলেন। মেজর জিয়া জবাব দেন যে, তাঁর সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের পরই তিনি আমার সঙ্গে যোগ দেবেন। আওয়ামী লীগ নেতারা ফিরে এসে আমাকে সব কথা জানালেন। অবশ্য মেজর জিয়া এবং তাঁর সংগের অন্য অফিসাররা শহরের লড়াইয়ে আর আসতে পারেননি।

সেদিন অপরাহ্নে আবার আমি কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাকে মেজর জিয়ার সংগে যোগাযোগ করতে বললাম। এবার আমরা অনুরোধ জানালাম তিনি যেন এসে সংগ্রামরত সৈন্যদের পক্ষে বেতারে কিছু বলেন। অনুরুদ্ধ হয়ে ঐদিন বিকেলে (২৭শে মার্চ) তিনি মদনঘাটস্থ রেডিও স্টেশনে আসেন এবং "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" থেকে এক ভাষণ দেন।

ভাষণে তিনি নিজেকে "রাষ্ট্রপ্রধান" বলে উল্লেখ করলেন। সেই মুহূর্তের মানসিক অবস্থা ও উত্তেজনায় অসাবধানতাবশত এই ভুলটি হয়ে গেলো। এতে করে ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হলো। জনাব সিদ্দিকী তৎক্ষণাৎ আমার সাথে যোগাযোগ করে বললেন, "এই ঘোষণা আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্রকে বিপন্ন করে তুলবে। জনগণের অভ্যুত্থান না বলে একে সামরিক অভ্যুত্থান বলে পৃথিবীর মানুষ ভুল বুঝতে পারে।" আওয়ামী লীগ নেতারা

আবার মেজর জিয়ার কাছে গেলেন। এরপর মেজর জিয়া এক সংশোধিত বেতার ভাষণে জাতির নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেওয়ার কথা উল্লেখ করলেন।

মদনঘাটস্থ স্বাধীন বাংলা বেতারে নানা ধরনের অব্যবস্থা ছিলো। বেতার কেন্দ্রটি প্রহরা দিচ্ছিলো ইপিআর সৈন্যরা। চট্টগ্রাম রেডিওর বাঙালী প্রকৌশলী এবং অন্যান্য কর্মচারিগণ কেন্দ্রটির সব কিছু পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রের আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম কিংবা কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণ করার মতো কেউ ছিলেন না।

অবস্থা এমন ছিলো যে, যে-কেউ এই রেডিও থেকে বক্তৃতা দিতে পারতেন। এমন কি এক অতি উৎসাহী ব্যক্তি আমাদের সবাইকে লালদীঘি ময়দানে জমায়েত হওয়ার কথা ঘোষণা করে ফেললেন। আমরা অবশ্য ঘোষণাটি বাতিল করে দেই। তা না করলে পাকিস্তান বিমান বাহিনী এমন সুন্দর এক জায়গায় এক সাথে অনেকগুলো শিকারের ওপর হামলা চালাবার সুযোগ পেয়ে যেতে পারতো।

ঢাকা থেকে তখনও বিমান বোঝাই করে সৈন্য আনা হচ্ছিলো। প্রধানতঃ কমিল্লার ৫৩ ব্রিগেড থেকে এবং অন্যান্য স্থান থেকেও পাক সৈন্যরা চট্টগ্রামের পথে এগিয়ে আসছিলো। শহরের ওপর দিয়ে হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছিলো। এদিকে বাংলাদেশের পতাকার বিক্রি বেড়ে গেলো বহুগুণ। সর্বত্র নীল আকাশের নীচে নতুন জাতীয় পতাকা উড়তে দেখা গেলো। কিন্তু ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে শত্রু সৈন্যরা বেরিয়ে সবাইকে সেগুলো নামিয়ে ফেলতে বাধ্য করতে লাগলো। যদিও প্রকৃত পক্ষে প্রতিটি বাঙালীর হৃদয়ে গ্রথিত বাংলাদেশের পতাকার ছাপ তারা কোনো দিনই মুছে ফেলতে পারেনি।

ক্যাণ্টনমেণ্টের অদূরে ইপিআর সৈন্যরা আমার কথা অনুযায়ী নতুন সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করছিলো। আমার সৈন্যদের কালুরঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একথা তারা তখনো জানতে পারেনি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক থেকে ক্যাণ্টনমেণ্টের ওপর যে হামলা পরিচালনার পরিকল্পনা আমি ইতিপূর্বে করেছিলাম তা ভেস্তে গেলো।

এমতাবস্থায় আমি অস্ত্র এবং গোলাবারুদের জন্যে ভারতে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। ভাবলাম, ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করে ভারতে একবার যেতে পারলে সেখান থেকে নিশ্চয়ই অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং জরুরী জিনিসপত্র সংগ্রহ করা যাবে এবং এরপর রামগড় থেকে কিছু সৈন্য নিয়ে এসে ক্যাণ্টনমেণ্ট আক্রমণ করতে পারবো। অস্ত্রের জন্য ভারতে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আমি আমার সৈন্যদেরকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার নির্দেশ

দিলাম। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের সাথে প্রাথমিকভাবে আলোচনা করে রাখার জন্য অয়্যারলেসে রামগড়ে একটি বার্তা পাঠালাম। আমার ভারত পৌঁছানোর পর আলোচনা শুরু করতে যাতে দেরী না হয় সেজন্যই আগে থেকে আমি এ ব্যবস্থা করলাম।

এই দিন কর্ণফুলীর মোহনায় পোর্ট এলাকায় এবং আরেকটু দূরে সাগরের ওপর অনেক শকুন উড়তে দেখা গেলো। পোর্ট এলাকায় পাকিস্তান সেনাদের ধ্বংস লীলায় নিহত বাঙালীদের মৃতদেহগুলোর সন্ধানেই বোধহয় শকুনগুলো উড়ে বেড়াচ্ছিলো। শান্তির প্রতীক সাদা পাখার গাংচিলগুলোর একটিও সেদিন চোখে পড়লো না।

১০

সরবরাহের অভাব

২৮শে মার্চ ভোর নাগাদ শত্রুপক্ষ ক্যান্টনমেন্ট এবং নৌ-বাহিনীর ঘাঁটির মধ্যবর্তী প্রধান সড়কের টাইগার পাস এলাকা দখল করে নেয় এবং নগরীর কেন্দ্রস্থলে সার্কিট হাউসে তাদের সদর দফতর স্থাপন করে। কুমিরায় যে শত্রুদলটিকে আমরা প্রতিহত করেছিলাম তারাও এসে ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। আমাদের সেখানকার সৈন্যরা সরে এসে হালিশহরের প্রধান প্রতিরক্ষা-ব্যূহে অবস্থান নেয়। হালিশহরে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ দুভাবে কাজে লেগে-ছিলো। (প্রথমত) এই প্রতিরক্ষা ছিলো বিমান বন্দর, নৌ-বাহিনীর সদর দফতর এবং পোর্ট এলাকায় শত্রুদের জন্য আসার পথে হুমকিস্বরূপ। (দ্বিতীয়ত) শত্রুদের প্রধান অংশে আঘাত পরিচালনার জন্যও দৃঢ় ঘাঁটি হিসাবে এটা কাজে লাগা-চ্ছিলো। পথিমধ্যে ইপিআর সৈনিকদের কালুরঘাটে আটকানো না হলে পোর্ট, বিমানবন্দর এবং নৌ-বাহিনীর সদর দফতর আক্রমণ এবং দখল করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো এবং তাহলেই সমস্ত যুদ্ধের গতিধারা পাল্টে যেতো। পোর্ট এলাকা থেকে শত্রু সৈন্যরা দিনের বেলায় কয়েকবারই আগ্রাবাদ রোড পরিষ্কার করে টাইগার পাস দিয়ে নৌ-ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু তীব্র প্রতিরোধের মুখে প্রত্যেকবারই তাদেরকে পিছু হটতে হয়। শত্রুরা হয়তো মরিয়া হয়ে অগ্রসর হলে সড়কটি দখল করতে পারতো। কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় এই ধরনের সংঘর্ষে লোকক্ষয় ছিলো অবশ্যম্ভাবী। লোকক্ষয় এড়ানোর জন্যেই তারা সাময়িকভাবে এই প্রচেষ্টা স্থগিত রেখে কুমিল্লা থেকে অগ্রসরমান সৈন্যদের দেওয়ান হাট উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

দামপাড়া পুলিশ লাইনের বাঙালী পুলিশরাও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শত্রু সৈন্যদের প্রতিরোধ করছিলো। কিন্তু যুদ্ধের পুরো ট্রেনিং এবং অভিজ্ঞতা না থাকায় তারা বেশীক্ষণ টিকতে পারেনি। সংঘর্ষে বহু বাঙালী পুলিশ হতাহত হয়। শত্রুদের ক্রমাগত চাপের মুখে বাঙালী পুলিশদের স্থানটি পরিত্যাগ করতে হয়।

পরদিন ২৯শে মার্চ। সকালে শত্রু সেনারা আগ্রাবাদ রোড অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং একটি দলকে তারা মাদার বাড়ী ও আইস ফ্যাক্টরী সড়ক হয়ে নিউ মার্কেটের দিকে পাঠিয়ে দেয়। নিউমার্কেটে অবশ্য আমাদের লোক ছিলো না। তবে আমি এক প্লাটুন শক্তি সম্পন্ন একটি দলকে (প্রায় ৩০ জন) ঐ এলাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান কোর্টভবন দখলে রাখার জন্য পাঠিয়েছিলাম।

শত্রুদের আরেকটি দল স্টেডিয়ামের বিপরীত দিকের নৌ-ভবন থেকে বেরিয়ে পি. আই. এ অফিসের নিকটবর্তী একটি লেনের মধ্য দিয়ে ডিসি হিলের দিকে এগোতে থাকে। কয়েকজন পথচারী তাদের সামনে পড়লে পাকিস্তানীরা তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরপর একস্থানে থেমে তারা যুদ্ধ প্রস্তুতি নেয় এবং দ্রুত গতিতে পাহাড়ের উপর উঠে সমগ্র এলাকাটি বিনা বাধায় দখল করে নেয়। কোর্ট বিল্ডিং-এ তখন আমাদের সৈন্যরা পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য অপেক্ষমান। তারা গভীরভাবে সাহায্যের প্রত্যাশা করছিলো এবং সাহায্য পেলেই যে কোন মূল্যে তারা শত্রুদের প্রতিরোধ করতে পারতো।

এইদিন বিকালে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি জাকির হোসেন রোডে একটি অ্যাম্বুলেন্স পাঠাবার জন্য মেডিকেল কলেজে ফোন করেন। এ পর্যন্ত মেডিকেল কলেজ আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল। কলেজের নিকটেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রবর্তক হিলে আমাদের কিছু সৈনিক মোতায়েন ছিলো। আমাদের আহত সৈনিকদের নিয়ে মেডিকেল কলেজের ডাক্তার, নার্স এবং ছাত্রছাত্রীরা সকলেই দিন রাত ব্যস্ত ছিলেন।

পূর্ব কথিত অ্যাম্বুলেন্সটি ফিরে আসতেই ডাক্তার এবং নার্সরা দ্রুত বেরিয়ে আসেন। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্সের দরজা খুলতেই বেরিয়ে আসে একদল শত্রু সৈন্য, হাতে তাদের উদ্যত হাতিয়ার। ক্ষিপ্রতার সাথে তারা হাসপাতাল ভবনের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। সন্ধ্যা নাগাদ আরো একদল শত্রু সৈন্য এসে অবস্থানরত সৈনিকদের সাথে যোগ দেয়। কর্মচঞ্চল হাসপাতাল ভবন এবং পার্শ্ববর্তী আবাসিক এলাকায় নেমে আসে এক বিষণ্ন নীরবতা।

হাসপাতালের কেউ কি আর রাত শেষে আগামি দিনের ভোরের আলো দেখতে পাবে? হালিশহর এবং কোর্ট ভবন, দুটি স্থানে তখনো আমাদের সুদৃঢ় ঘাঁটি ছিলো। তাছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে আমাদের ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দলগুলো তখনো শত্রুসেনাদের মোকাবিলা করছিলো। কিন্তু শেষে কুমিল্লা থেকে নতুন শত্রুদল দেওয়ান হাট ক্রসিংয়ের কাছে পৌঁছে গেলে আগ্রাবাদ এলাকা থেকে আমাদের সৈন্যদের হালিশহর ঘাঁটিতে সরে আসা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

শহরের অর্ধেক জনসংখ্যা ততক্ষণে গ্রামের দিকে চলে গেছে। অনেকে সরাসরি সীমান্তের দিকেও চলে যায়। সকলেই কেমন যেনো হতাশ হয়ে পড়ে।

জনসাধারণ ঠিকই ভেবেছিলো যে, কোনোরূপ সাহায্য ছাড়া যুদ্ধে জয়লাভ আমাদের পক্ষে দেরী হবে। কারণ ইতিমধ্যেই তারা দেখেছে আমাদের সৈন্যরা ভীষণ অসহায় অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করছিলো। আমাদের গোলাবারুদের সরবরাহ ছিলো খুবই কম। একজন সৈনিকের হাতের অস্ত্র অকেজো হয়ে গেলে তাকে নতুন অস্ত্র না দেয়া পর্যন্ত সেই সৈনিকটিই অকেজো হয়ে পড়ে। কেউ আহত হলেও তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা কিংবা তাকে অন্যত্র স্থানান্তরের তেমন কোন ব্যবস্থা আমাদের ছিলো না। এমন কি এক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পানি ও খাদ্য সরবরাহেরও কেউ ছিলো না। আমার ট্যাকটিক্যাল হেড কোয়ার্টারে অয়্যারলেস কিংবা আধুনিক কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না থাকায় বিভিন্ন রণাঙ্গণে যুদ্ধরত সৈনিকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে পারিনি। ফলে সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত হওয়া এবং সে অনুসারে নতুন নির্দেশ দেয়াও সম্ভব হয়নি। এছাড়া যাতায়াতের জন্য যান বাহন সমস্যাও ছিলো প্রকট। আমরা যোগাযোগ এবং পরিবহণের অভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি বেশী। কুমিরায় আমাদের অবস্থান বিপন্ন হওয়ার সংবাদ একজন সংবাদ বাহকের মারফত তিন ঘণ্টা পর পাই। সংবাদ পাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই আমি নতুন কিছু সৈন্য কুমিরার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা কুমিরার দুই মাইল দূরে পৌঁছানোর পূর্বেই কুমিরার পতন ঘটে। আমাদের সৈন্যরা ততক্ষণে হালিশহরের দিকে ফিরে আসতে থাকে।

আরেকটি সংকট ছিলো ট্রেনিং প্রাপ্ত শত্রু সৈন্যদের সাথে যখন অব্যাহতভাবে নতুন নতুন সৈন্য এবং অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ যোগ হচ্ছিলো, আমি তখন অসহায় ভাবে তা দেখছিলাম। একইভাবে দল বেঁধে আমাদের সামরিক লোকজনও শহর ছেড়ে যাচ্ছিলো।

আমি যে কয়জন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিলাম তার সঙ্গে একজনও নতুন সৈনিক কিংবা একটিমাত্র বুলেটও যোগ করতে পারিনি। ক্রমাগত শত্রুসৈন্যের মোকাবেলা করে আমাদের সৈন্যরা ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো। অনেকেই ২৫ তারিখের রাত থেকে এ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ বন্ধ করতে পারেনি। আমার রেলওয়ে হিলের ঘাঁটি, সার্কিট হাউস এলাকা, মেডিকেল কলেজ, ডি সি হিল এবং হালিশহর ও কোর্ট বিল্ডিংয়ের যুদ্ধে আমি নতুন সৈন্য ও অস্ত্র সরবরাহ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় হতাশ হয়েছি বারবার। আর এই প্রত্যাশা যুদ্ধের সেই পর্যায়ে আমার সৈন্যদের অবসাদগ্রস্ত করে তোলে সাময়িকভাবে।

১১

চট্টগ্রাম শহরে চূড়ান্ত লড়াই

৩০শে মার্চ। শহরে তখন কারফিউ চলছে। খুব ভোরে এক ভদ্রলোক চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে অস্থিরভাবে অনবরত টেলিফোন করছিলেন। একটু আগে জানালা দিয়ে তিনি এক নারকীয় দৃশ্য দেখেছেন। একটি গাছের ওপর বাংলাদেশের পতাকা উড়ছিলো। কয়েকজন পাক সেনা কিশোর বয়সের একটি ছেলেকে সেই পতাকাটি নামিয়ে ফেলতে বলে। ছেলেটি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও গাছ বেয়ে উপরে ওঠে এবং পতাকাটি খুলে আস্তে আস্তে ভাঁজ করতে থাকে। ঠিক এই সময়ে নিচ থেকে সৈন্যরা অত্যন্ত সুস্থ মস্তিকে তার দিকে রাইফেল তাক করে গুলী ছোঁড়ে। গুলীবিদ্ধ ছেলেটি বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় নিচে পড়ে যায়। সৈন্যরা হো হো করে হেসে উঠে এবং সে স্থান ত্যাগ করে। ছেলেটির চোখের দৃষ্টির দিক্‌চক্রবালের লাল আভা ক্রমান্বয়ে নীলবর্ণ ধারণ করে; তারপর সেটা ছোট হতে হতে কালো একটি বিন্দুতে পরিণত হয়। এই কালো বিন্দুর মধ্যদিয়ে প্রাণপণে সবুজ আয়তক্ষেত্রের ওপর লাল সূর্যটিকে শেষবারের মতো দেখতে চায়। সে দেখতে চায় তার হাতে ধরা পতাকার লাল সূর্যটিকে।

কোনো অ্যাম্বুলেন্স কিংবা অন্য কেউ কিশোরটির সাহায্যে আসে নি। হাসপাতালের সব ক'টি গাড়িই পাকিস্তানী সৈন্যদের বহন করছিলো। বস্তুত পুরো হাসপাতালটিই মিলিটারী ক্যাম্পে পরিণত হয়েছিলো। বাঙালী ডাক্তার. নার্স এবং অধিকাংশ রোগী ইতিমধ্যেই হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন। আর রক্ত পিপাসু দানবদের হাত থেকে পালাতে যারা একেবারেই অসমর্থ তারা অসহায়ভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন!

প্রতিদিনের ব্যস্ত বিপণীকেন্দ্র নিউমার্কেট এলাকা সেদিন একেবারে চুপচাপ। দুপুরের মধ্যে পাকসেনারা পোর্টের দিক থেকে বরফকল সড়ক হয়ে এখানে পৌঁছে যায় এবং সদর ঘাট, রেলওয়ে স্টেশনে এবং স্টেডিয়ামের দিকে তারা অগ্রসর হতে থাকে। ছোট একটি দল কোর্ট হিলের দিকেও পা বাড়ায়। কিন্তু হিলে অবস্থানরত আমাদের সৈন্যদের বুলেট বৃষ্টিতে পাকিস্তানীদের পিছু হটে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে দেখা যায়।

জনসাধারণ ঠিকই ভেবেছিলো যে, কোনোরূপ সাহায্য ছাড়া যুদ্ধে জয়লাভ আমাদের পক্ষে দেরী হবে। কারণ ইতিমধ্যেই তারা দেখেছে আমাদের সৈন্যরা ভীষণ অসহায় অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করছিলো। আমাদের গোলাবারুদের সরবরাহ ছিলো খুবই কম। একজন সৈনিকের হাতের অস্ত্র অকেজো হয়ে গেলে তাকে নতুন অস্ত্র না দেয়া পর্যন্ত সেই সৈনিকটিই অকেজো হয়ে পড়ে। কেউ আহত হলেও তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা কিংবা তাকে অন্যত্র স্থানান্তরের তেমন কোন ব্যবস্থা আমাদের ছিলো না। এমন কি এক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পানি ও খাদ্য সরবরাহেরও কেউ ছিলো না। আমার ট্যাকটিক্যাল হেড কোয়ার্টারে অয়্যারলেস কিংবা আধুনিক কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না থাকায় বিভিন্ন রণাঙ্গণে যুদ্ধরত সৈনিকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে পারিনি। ফলে সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত হওয়া এবং সে অনুসারে নতুন নির্দেশ দেয়াও সম্ভব হয়নি। এছাড়া যাতায়াতের জন্য যান বাহন সমস্যাও ছিলো প্রকট। আমরা যোগাযোগ এবং পরিবহণের অভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি বেশী। কুমিরায় আমাদের অবস্থান বিপন্ন হওয়ার সংবাদ একজন সংবাদ বাহকের মারফত তিন ঘণ্টা পর পাই। সংবাদ পাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই আমি নতুন কিছু সৈন্য কুমিরার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা কুমিরার দুই মাইল দূরে পৌঁছানোর পূর্বেই কুমিরার পতন ঘটে। আমাদের সৈন্যরা ততক্ষণে হালিশহরের দিকে ফিরে আসতে থাকে।

আরেকটি সংকট ছিলো ট্রেনিং প্রাপ্ত শত্রু সৈন্যদের সাথে যখন অব্যাহতভাবে নতুন নতুন সৈন্য এবং অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ যোগ হচ্ছিলো, আমি তখন অসহায় ভাবে তা দেখছিলাম। একইভাবে দল বেঁধে আমাদের সামরিক লোকজনও শহর ছেড়ে যাচ্ছিলো।

আমি যে কয়জন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিলাম তার সঙ্গে একজনও নতুন সৈনিক কিংবা একটিমাত্র বুলেটও যোগ করতে পারিনি। ক্রমাগত শত্রুসৈন্যের মোকাবেলা করে আমাদের সৈন্যরা ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো। অনেকেই ২৫ তারিখের রাত থেকে এ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ বন্ধ করতে পারেনি। আমার রেলওয়ে হিলের ঘাঁটি, সার্কিট হাউস এলাকা, মেডিকেল কলেজ, ডি সি হিল এবং হালিশহর ও কোর্ট বিল্ডিংয়ের যুদ্ধে আমি নতুন সৈন্য ও অস্ত্র সরবরাহ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় হতাশ হয়েছি বারবার। আর এই প্রত্যাশা যুদ্ধের সেই পর্যায়ে আমার সৈন্যদের অবসাদগ্রস্ত করে তোলে সাময়িকভাবে।

১১

চট্টগ্রাম শহরে চূড়ান্ত লড়াই

৩০শে মার্চ। শহরে তখন কারফিউ চলছে। খুব ভোরে এক ভদ্রলোক চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে অস্থিরভাবে অনবরত টেলিফোন করছিলেন। একটু আগে জানালা দিয়ে তিনি এক নারকীয় দৃশ্য দেখেছেন। একটি গাছের ওপর বাংলাদেশের পতাকা উড়ছিলো। কয়েকজন পাক সেনা কিশোর বয়সের একটি ছেলেকে সেই পতাকাটি নামিয়ে ফেলতে বলে। ছেলেটি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও গাছ বেয়ে উপরে ওঠে এবং পতাকাটি খুলে আস্তে আস্তে ভাঁজ করতে থাকে। ঠিক এই সময়ে নিচ থেকে সৈন্যরা অত্যন্ত সুস্থ মস্তিকে তার দিকে রাইফেল তাক করে গুলী ছোঁড়ে। গুলীবিদ্ধ ছেলেটি বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় নিচে পড়ে যায়। সৈন্যরা হো হো করে হেসে উঠে এবং সে স্থান ত্যাগ করে। ছেলেটির চোখের দৃষ্টির দিক্‌চক্রবালের লাল আভা ক্রমান্বয়ে নীলবর্ণ ধারণ করে; তারপর সেটা ছোট হতে হতে কালো একটি বিন্দুতে পরিণত হয়। এই কালো বিন্দুর মধ্যদিয়ে প্রাণপণে সবুজ আয়তক্ষেত্রের ওপর লাল সূর্যটিকে শেষবারের মতো দেখতে চায়। সে দেখতে চায় তার হাতে ধরা পতাকার লাল সূর্যটিকে।

কোনো অ্যাম্বুলেন্স কিংবা অন্য কেউ কিশোরটির সাহায্যে আসে নি। হাসপাতালের সব ক'টি গাড়িই পাকিস্তানী সৈন্যদের বহন করছিলো। বস্তুত পুরো হাসপাতালটিই মিলিটারী ক্যাম্পে পরিণত হয়েছিলো। বাঙালী ডাক্তার. নার্স এবং অধিকাংশ রোগী ইতিমধ্যেই হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন। আর রক্ত পিপাসু দানবদের হাত থেকে পালাতে যারা একেবারেই অসমর্থ তারা অসহায়ভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন!

প্রতিদিনের ব্যস্ত বিপণীকেন্দ্র নিউমার্কেট এলাকা সেদিন একেবারে চুপচাপ। দুপুরের মধ্যে পাকসেনারা পোর্টের দিক থেকে বরফকল সড়ক হয়ে এখানে পৌঁছে যায় এবং সদর ঘাট, রেলওয়ে স্টেশনে এবং স্টেডিয়ামের দিকে তারা অগ্রসর হতে থাকে। ছোট একটি দল কোর্ট হিলের দিকেও পা বাড়ায়। কিন্তু হিলে অবস্থানরত আমাদের সৈন্যদের বুলেট বৃষ্টিতে পাকিস্তানীদের পিছু হটে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে দেখা যায়।

একই দিনে হালিশহরেও সকাল ৮টা থেকে সংঘর্ষ চলতে থাকে। পাকিস্তানীরা মরিয়া হয়ে কামান দেগে চলছিলো। নৌ-বাহিনীর সবগুলো কামানই তখন সক্রিয় ছিলো। ক্রমাগত দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা যাবত তারা হালিশহরের ওপর গোলাবর্ষণ করে। কামানের ছত্রছায়ায় শত্রুরা হালিশহরের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইপিআর সেনাদের দুঃসাহসী পাল্টা আক্রমণের মুখে তেমন কোনো অগ্রগতি লাভে ব্যর্থ হয়ে শত্রুরা বিমান বাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করে। আধ ঘণ্টার মধ্যে দুটি বিমান চলে আসে এবং বেলা সাড়ে বারোটা থেকে আমাদের অবস্থানের ওপর ক্রমাগত বিমান হামলা চলতে থাকে। আমাদের কোনো বিমান বিধ্বংসী হাতিয়ার ছিলোনা। সেই সময় নিজেদের কোনো বিমান থাকারও কথা নয়। তাই শত্রু বিমানগুলো আকাশে তাদের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে নির্বিঘ্নে আমাদের ওপর বোমাবর্ষণ করতে থাকে। তারা তাদের ইচ্ছামতো রণাঙ্গনের ওপর আঘাত হানতে থাকলো। পরিষ্কার রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে শত্রুর বিমানগুলো একটার পর একটা ট্রেঞ্চ দেখে দেখে স্ট্র্যাপিং করে চলছিলো। আমাদের বীর সেনানীরাও প্রাণপণে ঘাঁটি আকড়ে লড়াই করতে থাকলো। লড়াই করতে করতে অনেকেই ট্রেঞ্চের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করলো। আহতও হলো অনেক। কিন্তু অবিরাম বোমা বর্ষণের ফলে তাদের অপসারণ করাও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যুদ্ধরত বাকি সৈন্যরাও বুঝতে পারলো তাদের আর বেশিক্ষণ হালিশহর রক্ষা সম্ভব হবেনা। গোলাবারুদের মজুতও নিঃশেষ প্রায়। তারা রাইফেলের ওপর বেয়োনেট লাগিয়ে নিচের শত্রুদের সাথে হাতাহাতি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলো।

২৫ এবং ২৬শে মার্চের মধ্যবর্তী রাতে গ্রেফতারকৃত প্রায় পাঁচ শতের মতো শত্রু সৈন্যকে হালিশহরে একটি বিল্ডিংয়ে রেখেছিলাম। ওদের দুর্ভাগ্য, এই বিল্ডিংটিকে শত্রু বিমান এবং গোলন্দাজ বাহিনী আমাদের সদর দফতর মনে করে সরাসরি আঘাত হানতে থাকে। ফলে সমগ্র ভবনটি গুড়িয়ে যেতে বেশি সময় লাগেনি। এভাবে পাকিস্তানী বন্দী সৈনিকরা তাদের নিজেদেরই বিমান ও কামানের গোলার আঘাতে মৃত্যুবরণ করে।

বিকালের মধ্যে শত্রুরা হালিশহর দখল করে নিলো। হাতাহাতি যুদ্ধ চলেছিলো আধঘণ্টার মতো। শত্রুসৈন্য সংখ্যাধিক্যের ফলে চূড়ান্ত ফলাফল কি হবে তা বোঝা গিয়েছিলো। আমাদের সৈন্যরা পেছনে এসে ঢাকা চট্টগ্রাম সড়কের একস্থানে অবস্থান গ্রহণ করলো। সহযোগিদের লাশও ফেলে আসতে হলো। শত্রুদের জন্য আরও ফেলে আসতে হলো বিধ্বস্ত কয়েকটি ভবন, গোলাবারুদের কিছু খালি বাক্স এবং সবুজ ঘাসের ওপর চাপ চাপ রক্তের দাগ।

ইপিআর-এর জনৈক সৈনিক পশ্চাদপসরণের সময় এক ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলো। লক্ষ্য করে দেখলো অর্ধেক ট্রেঞ্চের ভেতর এবং অর্ধেক বাইরে কাত হয়ে পড়ে আছে তারই একজন সহযোগী বন্ধু—যেন অপার শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে অনন্তকালের জন্যে। সে তাকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে ট্রেঞ্চের ভেতরে শুইয়ে দিলো। তারপর মৃত বন্ধুর রাইফেল এবং হেলমেটটি তুলে নিয়ে ঘনায়মান আলো-আঁধারীর মধ্য দিয়ে এক অনিশ্চিত গন্তব্যের পথে এগিয়ে চললো। কয়েক মাইল দূরে কোর্ট বিল্ডিংয়ের অবস্থানে আরো কয়েকজন সহযোদ্ধা তখন অস্ত্রশস্ত্রের নিয়মিত সান্ধ্যকালীন পরীক্ষায় ব্যস্ত অথবা কিছু খাবার কিংবা পানীয়ের সন্ধান করছিলো। দূর আকাশে তখন কত-গুলো শকুন, একবার নিচের দিকে নামছিলো আবার ওপরে উঠছিলো। কোর্ট হিল অবস্থান রক্ষাকারী স্বল্প সংখ্যক ইপিআর সৈনিকদের কাছে তখন আকাশ কাঁপিয়ে বিমান বন্দরে অবতরণকারী শত্রুসৈন্যবাহী বিমান গুলোর বিকট শব্দের চাইতেও এইসব শকুনের আনাগোনা ছিলো আরো ভয়াবহ। প্রকৃতি কিংবা মানুষের রুদ্ররোষ থেকে সর্বদা আত্মরক্ষাকারী অশুভ ইংগিতবাহী এই পাখীগুলোকে এমনি ভাবে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত দ্বীপ-এর উপকূল এলাকায় প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের শিকার লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মৃতদেহে উদর পূর্তি করতে দেখা গিয়েছিলো কয়েকমাস আগে।

হালিশহর পতনের পর শত্রুদের পুরো দৃষ্টি পড়লো কোর্ট হিলের ওপর। এটাই ছিলো শহরে আমাদের সর্বশেষ ঘাঁটি সর্বশেষ আশা। বিভিন্ন দিক থেকে অবস্থানটির ওপর কয়েকবারই হামলা হলো। কিন্তু প্রতিবারই আমাদের সৈন্যরা তা প্রতিহত করে। এরপর এলো ট্যাংক বহর। অগ্রবর্তী ট্যাংকটি পাকা রাস্তা বেয়ে ওপরের দিকে উঠতেই আমাদের সৈন্যদের ট্যাংক বিধ্বংসী শেলের আঘাতে তা অকেজো হয়ে পড়লো। ট্যাংকটি অকেজো হয়ে থেমে পড়লে পেছনে অন্যান্য ট্যাংক এবং পদাতিক সৈন্যরা কিছুটা থমকে দাঁড়ালো। এসময় তারা সম্ভবত আমাদের শক্তির পরিমাপ করছিলো। ইতিমধ্যে অবশ্য শত্রুপক্ষ আমাদের দুর্বলতা বুঝতে পেরেছিলো। আমাদের সৈনিকদের তখন গোলাবারুদ নিঃশেষ প্রায় এবং বাইরের সাথে সকল প্রকার সংযোগও প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলো। অদূর ভবিষ্যতে নতুন করে কোনো সাহায্য লাভের সম্ভাবনাও ছিলো না।

২রা এপ্রিল ভোরে শত্রুরা আবার হামলা শুরু করলো। হামলা ছিলো সুপরিকল্পিত।

মাত্র ৩০ জন সৈনিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো পাকিস্তানীদের পুরো একটি ব্যাটেলিয়ন। দু'টি কোম্পানী মিলে প্রথম আঘাত হানলে তা

সাফল্যের সাথে প্রতিহত করা হয়। এরপর আরো জোরদার হামলা চলতে থাকে। দু'টি সংরক্ষিত কোম্পানী এবার অন্য দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। মারাত্মক গুলী বর্ষণের ছত্রছায়ায় এরা একটু একটু করে পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। এদিকে আমাদের প্রতিরোধকারী সৈন্যদের গোলাবারুদ নিঃশেষ হয়ে যায়। একমাত্র ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্রটিও অকেজো হয়ে পড়ে। পদাতিক বাহিনীর আগে আগে এসময় দু'টি ট্যাংক উপরে উঠে আসে। বলতে গেলে অলৌকিকভাবে সেদিন আমাদের সৈনিকদের প্রায় সবাই সে অবস্থান ত্যাগ করে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলো। এভাবেই কোর্ট হিলের পতন ঘটলো এবং সাথে সাথে অনির্দিষ্টকালের জন্য চট্টগ্রাম নগরীও আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলো। তখন সময় ছিলো বেলা সাড়ে ১২টা। মাত্র ৩০ জন ইপিআর-এর দুর্জয় সৈনিক শত্রুপক্ষের এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য শক্তির অব্যাহত শেলিং এবং উপর্যুপরি আক্রমণের মুখে ৩ দিনেরও বেশি সময় তাদের অবস্থান আগলে রেখেছিলো। কাজেই এই পরাজয় তাদের অদম্য সাহস ও বিক্রমের মহিমাকে ম্লান করে দিতে পারেনি।

শহরের উপকণ্ঠে ভদ্দরহাট থেকে বাংলাদেশ বেতার যে অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করেছিলো, ৩০শে মার্চ বিকালে শত্রুর বিমান আক্রমণের ফলে তাও নিশ্চুপ হয়ে গেলো। হঠাৎ অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়াতে লাখ লাখ শ্রোতা উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে ওঠলো। তাদের এ উৎকণ্ঠা নবজাত একটি শিশুর হঠাৎ হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতই মনে হয়েছিলো।

৩রা এপ্রিল সকাল থেকে চট্টগ্রামে প্রচণ্ড বাতাস বইছিলো। ক্রমে তা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলো। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো, পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলো। বাজার, দোকান পাট সব বন্ধ রইলো। বন্দর নগরীর আটকা পড়া বাসিন্দারা অনাহারের সম্মুখীন হয়ে পড়লো। খাদ্য নেই, পানি নেই, আলো নেই। এমন কি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীও পাওয়া গেলো না। গৃহভৃত্য কিংবা কাউকে কিছু কেনা কাটার জন্য বাইরে পাঠালে তাদের অনেকেই আর ফিরে এলো না। পাক সেনাদের গুলীতে তাদেরকে প্রাণ হারাতে হলো। ঘরে ভীত সন্ত্রস্ত মায়েরা সন্তানদের বুকে চেপে ধরে নিরবে চোখের পানি ফেলতে লাগলো।

বাংলাদেশে যে সীমাহীন রক্তের স্রোত আর অশ্রুর ধারা বয়ে গেছে সে রক্ত আর অশ্রু ধারায় হয়তো এক দিন আরও পূতপবিত্র হয়ে উঠবে বাংলার মাটি।

১২

ভারতের সাথে যোগাযোগ

আঁকাবাঁকা ফেনী নদীর তীরে ছোট মহকুমা শহর রামগড়, সাগর থেকে অনেক উঁচুতে পাহাড়ী এলাকার মধ্যে যেন প্রশান্তির এক প্রতিমূর্তি। নদীর ওপারেই ভারতের ভূভাগ এবং আরেকটি মহকুমা শহর সাবরুম। দুটি মহকুমা ভিন্ন ভিন্ন দু'টি দেশের হলেও নদীর দুই পাড়ের জনগণ বহুকাল আগে থেকেই পরস্পরের সাথে পরিচিত। সভ্যতার অধিকাংশ আবিলতা থেকে মুক্ত দুই অঞ্চলের মানুষ সহজ সরল জীবন যাপন করছিলো। কিন্তু ২৫শে মার্চ যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে সীমান্তের শহর রামগড়ের মত প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এর ধাক্কা লাগে। মার্চের শেষ দিনগুলো ধীরে ধীরে যতই গড়িয়ে যাচ্ছিলো, রামগড়েরও বুঝি সাথে সাথে আসন্ন ধ্বংসের কালোমেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠছিলো।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই আমি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ করার জন্য রামগড় যাই। সেখান থেকে সাবরুম গেলে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বি. এস. এফ.) অফিসাররা আমার সঙ্গে কথা বলেন এবং অবিলম্বে আগরতলার নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। প্রয়োজন বোধে ভারতীয় রাজধানীতে যাওয়ার ব্যবস্থা তাঁরা করে রাখেন।

পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ ঘটনার আকস্মিকতায় ভারত সরকার বিস্ময়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। ভারত মনে করেছিলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী হয়তো বাঙালীদের ওপর ভীষণ অত্যাচার চালাতে পারে এবং নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য কিছু সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানী ভারতে আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে একদিকে ইপিআর, পুলিশ এবং সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালী সদস্যদের অভ্যুত্থান এবং অন্যদিকে পাক সেনাদের গণহত্যার মত ঘটনা তাদের চিন্তারও বাইরে ছিলো।

বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের আলোড়ন ভারতেও পৌঁছে যায়। ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে ধ্বংস এবং গণহত্যার খবর পৌঁছাতেও দেরী হয় না। ভারতীয় জনগণও দ্রুত বুঝতে পারে যে, পূর্ব পাকিস্তানে অচিন্তনীয় এবং

ভয়ংকর কিছু ঘটছে। তাদের সংবাদপত্র এবং বেতারও এই ভয়াবহ এবং বিয়োগান্ত ঘটনার গভীরতা উপলব্ধি করে এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়। এভাবেই ঘটনার ভয়াবহতা অচিরেই ভারতের মাটিতেও ছড়িয়ে পড়ে।

ক্ষণিকের জন্য ভারত সরকার সম্ভবত একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু তারপরেই রাজধানী নয়াদিল্লীতে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলেন, "আমাদের এতো কাছে একটি জাতিকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেয়া যায় না।" ভারতীয় রাজধানী থেকে আরও কয়েকশত মাইল দূরে পাকিস্তানী প্রচার যন্ত্র তখন নির্লজ্জ মিথ্যা বলে চলেছে, "পূর্ব পাকিস্তানে সব কিছু শান্ত"।[৫৫]

বিশ্বের অধিকাংশ সরকার আমাদের দেশের ঘটনাবলীতে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলেও বিশ্ববাসী পাকিস্তানী প্রচারণায় বিশ্বাস করেনি। বাংলার মানুষের করুণ আর্তনাদের কাহিনী ভারতীয় সীমান্ত দিয়ে সারা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বিভিন্ন দেশের সমব্যথী সাংবাদিকবৃন্দ সেই গণহত্যার কাহিনী সারা পৃথিবীর মানুষকে অবহিত করতে লাগলেন দ্রুত গতিতে।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রি আরো ঘোষণা করলেন, "ঘরের পাশের এই মর্মান্তিক ঘটনায় ভারত নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না"।[৫৬] বাঙালীদের অস্তিত্ব রক্ষায় এবং স্বাধীনতার লড়াইয়ে তাঁর সাহায্য করার আগ্রহ আমাদের সংগ্রামের এক নতুন দিক নির্দেশ করলো। তবু প্রশ্ন থেকে গেলো তাঁর সাহায্য কোন্ প্রকারের এবং তা কখন পাওয়া যাবে।

২রা এপ্রিল আমি আগরতলা পৌঁছালে সরাসরি আমাকে বি. এস. এফ-এর সিনিয়র অফিসার মিঃ কালিয়ার অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি তাঁর কাছে আমাদের লড়াইয়ের অবস্থা বর্ণনা করে সামরিক সাহায্যের অনুরোধ জানালাম। মিঃ কালিয়া অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন বিধায় আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন। অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর কোনো গত্যন্তর ছিলো না। আমাকে আগরতলার এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো এবং সেখানেই এক কক্ষে আমি সারাদিন রইলাম। সেখানে সাদা পোশাক পরিহিত কয়েকজন ভারতীয় অফিসার পর্যায়ক্রমে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন; তাঁরা আমার কাছ থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থান, তাদের শক্তি, কোন্ ধরনের অস্ত্র তারা ব্যবহার করছে ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করলেন। তাঁরা আমার অতীত জীবন এবং কি কারণে আমি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলাম সে সব বিষয়েও প্রশ্ন করলেন, ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, পাকবাহিনীর সম্ভাব্য ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং স্বাধীনতা অর্জনে আমরা কি কি উদ্যোগ নিয়েছি তাও জানতে চাইলেন্।

তাঁদের সঙ্গে আমার আলোচনা অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আন্তরিকতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। তাঁরা খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। তবে আলোচনার ধারা থেকে আমি বুঝতে পারি, এরা সকলেই ভারতীয় সামরিক বাহিনী এবং বি. এস. এফ-এর গোয়েন্দা বিভাগের লোক। পরের দিনও নেতৃস্থানীয় ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হলো। বিকালের দিকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রি শ্রী শচীন সিং-এর সঙ্গে আমি বৈঠকে মিলিত হলাম। তাঁর আচরণও ছিলো বন্ধুসুলভ। তাঁর কাছেও আমি অস্ত্রশস্ত্র এবং কিছু জরুরী জিনিসপত্রের জন্য অনুরোধ জানাই।

মুখ্যমন্ত্রি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, দিল্লী থেকে জবাব এলেই তিনি আমার জন্য কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

এ সময়ে আমাকে দরকার হলে দিল্লী যাবার জন্যও প্রস্তুত থাকতে বলা হলো। পরদিন চট্টগ্রাম জেলার কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা আগরতলা পৌঁছলেন। তাঁদের নিয়ে আমি পুনরায় শ্রী শচীন সিং-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে জানালেন যে, ৯২তম বি. এস. এফ ব্যাটেলিয়ন থেকে জরুরী ভিত্তিতে আমি কিছু অস্ত্রশস্ত্র পেতে পারি। আমার অন্যান্য জিনিসপত্রের চাহিদা সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করতে বললেন।

আমি তাঁর কামরার এক কোনায় বসে প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত করে ফেলি। আওয়ামী লীগ নেতাদের হাতে সেটি তুলে দিয়ে আমি তখনই চট্টগ্রামের পথে আগরতলা ত্যাগ করলাম। পথে ৯২তম বি. এস. এফ-এর কমাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তিনি ততক্ষণে আমাকে কয়েকটি লাইট মেশিনগান, রাইফেল, হ্যাণ্ডগ্রেনেড, এবং কিছু গোলাবারুদ সরবরাহ করার জন্য তার ব্যাটেলিয়নকে নির্দেশ দিয়ে ফেলেছেন এবং সেগুলো ইতিমধ্যেই সাবরুম থানায় পৌঁছানো হয়ে গিয়েছিলো।

জিনিসগুলো আমাকে দেয়ার জন্যে ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার থেকে বি. এস. এফ-এর ক্যাপ্টেন মেহেক সিংকে আমার সঙ্গেই পাঠানো হলো।

চট্টগ্রাম শহরের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানীরা গ্রামাঞ্চলের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানীদের একটি কলাম হাটহাজারী, ফটিকছড়ি, নারায়ণহাট এবং হিয়াকু হয়ে রামগড়ের দিকে অগ্রসর হয়। অপর দিকে রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই এবং কক্সবাজারের দিকেও একটি করে কলাম অগ্রসর হতে থাকে। এসময় আমরা গ্রামাঞ্চলের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত নেই ; এ উদ্দেশ্য সাধন কেবল শত্রু সৈন্যদের শহরাঞ্চলে কোনঠাসা করে রাখার মাধ্যমেই সম্ভব ছিলো। এভাবে সুসংগঠিত গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে শত্রুর শক্তিক্ষয় করে

তাদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানাই হবে সঠিক পদক্ষেপ। এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার ছিলো যে, এই সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আমাদেরও হারাতে হবে অসংখ্য অমূল্য জীবন। আমাদের সামনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা ছিলোনা। এ জন্য অবশ্য জনসাধারণকেও সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

রামগড় থেকে দুটি ইপিআর প্লাটুনকে চট্টগ্রাম শহরের প্রায় ছয় মাইল দূরে ভাটিয়ারী এবং ফৌজদারহাটের মধ্যে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়েছিলো। অন্য দুটি ইপিআর প্লাটুনকে ফটিকছড়ি হাটহাজারী হয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে সহযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে পাঠানো হয়। ক্যাপ্টেন হারুন এবং আরো কয়েকজন অফিসার ৬টি কোম্পানী নিয়ে কালুর ঘাট সেতুর নিকটেই প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছিলেন। ঠিক এই পর্যায়ে ৪ঠা এপ্রিল আমরা ভারত থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদের প্রথম সরবরাহ পাই। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এ সময় আমাদের পুরো বাহিনীকে পুণর্বিন্যস্ত করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালী সদস্যদের গুরুত্বহীন স্থান থেকে সরিয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ফ্রন্টগুলোতে পাঠানো হলো। ক্যাপ্টেন মতিন এবং লেফটেন্যান্ট এজাজের নেতৃত্বাধীন এরূপ দুটি কোম্পানী ভারতীয় এলাকা দিয়ে শতাধিক মাইল দূরে চট্টগ্রাম সেক্টরকে শক্তিশালী করার জন্য সেখানে পৌঁছেন। আমাদের দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ এদের একটি কোম্পানী ভাটিয়ারী অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং অন্য একটি কোম্পানীকে নিয়ে আমি হিয়াকু, ফটিকছড়ি হয়ে পুনরায় চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের দিকে অগ্রসর হই।

এটা ছিলো এক কষ্টসাধ্য অভিযাত্রা। রাস্তা ছিলো অত্যন্ত খারাপ। যান্ত্রিক কনভয় বলতে ছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের কয়েকখানি জীপ, আর এই জীপগুলোকে প্রায় অর্ধেক পথই আমাদের ঠেলে নিয়ে যেতে হচ্ছিলো।

আমাদের এই চলাচলের খবর গোপন রাখার উপায় ছিলোনা। কারণ যেমন দিনের বেলায় আমাদের চলতে হচ্ছিলো, তেমনি আবার ভারতের পথে পলায়নপর ভীত সন্ত্রস্ত অসংখ্য জনসাধারণ একই পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলো। যদিও আমরা সবাই বেসামরিক পোশাকে ছিলাম এবং অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলাম, তথাপি শত্রু কবলিত একটি শহরের দিকে কিছু সংখ্যক লোকের সুসংগঠিত হয়ে চলার ভাব দেখে আশঙ্কা ও হতাশায় নিমজ্জিত লোকজনের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়। আত্মসন্তুষ্টি লাভের জন্য তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক সংখ্যার চেয়ে কয়েক গুণ বাড়িয়ে শহরের দিকে তাদের যাত্রার কথা যেভাবে বলাবলি করছিলো, সে খবর দ্রুত শত্রু ঘাঁটিতে পৌঁছে যায়।

ঘর ছাড়া পলায়নপর মানুষের স্রোত যেন আর থামতে চায়না। বিষাদক্লিষ্ট নৈরাশ্যে ভরা ছিলো তাদের দৃষ্টি। অব্যাহত এই জনস্রোতের অশেষ দুর্গতি ছিলো গভীর বেদনাময়। যেখানেই আমরা থেমেছি সেখানেই পলায়নরত মানুষ আমাদের চারপাশে ভীড় করেছে। আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করেছে, আমরা কি শীঘ্রই দেশে ফিরে আসতে পারবো?

"নিশ্চই পারবেন। হয়তো কয়েক সপ্তাহ মাত্র লাগবে।" জবাব শুনে তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠতো, সোজা হয়ে আকাশের দিকে তারা তাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ধরতো। কোনো একজন 'জয় বাংলা' বলে ধ্বনি দিয়ে উঠতেই চারদিক কাঁপিয়ে হাজার হাজার কণ্ঠে তা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতো। তাদের গগণ বিদারী "জয় বাংলা" ধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত হয়ে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়তো। বয়োঃজেষ্ঠ্য নারী পুরুষেরা আমাদের গাড়িগুলো ছুয়ে দেখতেন, আমাদের পোশাকেও হাত দিতেন, আবার আমাদের সঙ্গের অন্যান্য জিনিসপত্রে হাত ছুঁয়ে সেই হাত মুখে বুলোতেন গভীর প্রত্যাশায়।

নারায়ণহাটে পৌঁছে আমরা সন্ধ্যার পরবর্তী যাত্রার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। রাতের সামান্য আহার গ্রহণ করি। নারায়ণহাটি থেকে আমাদের মুক্তি সেনাদের নাজির হাট পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কয়েকটি নৌকার ব্যবস্থা করা হয়। আকাশ ছিলো মেঘাচ্ছন্ন, অন্যদিকে নৌকাগুলোরও কোনো ছই ছিলোনা। ক্লান্তিতে অবসাদে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। কিছুক্ষণ পর মুষল ধারায় বৃষ্টি নেমে আসে। আমরা বৃষ্টিতে ভিজে উন্মুক্ত আকাশের নিচে শীতে কাঁপতে থাকি। নাজিরহাট পৌঁছাতে ভোর হয়ে গেলো। এখানেই খবর পেলাম ক্যান্টনমেন্টের নিকট আমাদের যে সেনাদল ছিলো শত্রুর আক্রমণে তারা পিছু হটে হাটহাজারীর দিকে চলে গেছে। নাজিরহাট পৌঁছেই আমাদের জন্য একটি সম্ভাব্য ঘাঁটি খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে দ্রুত পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করি। খোঁজাখুঁজির পর কয়েক মাইল দূরে উদালিয়া চা বাগানই উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্ধারণ করি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে দিকে রওয়ানা হলাম। বাগানের বাঙালী ম্যানেজার আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের স্বাগত জানালেন। সকল প্রকার সাহায্যের তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন।

সীতাকুণ্ড পাহাড় শ্রেণীর একটা বিচ্ছিন্ন ছোট পাহাড়ের ওপর গড়ে উঠেছে উদালিয়া চা বাগান। সৈন্যদের এখানে ছোট ছোট দলে ভাগ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, খাবারের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাজের ভার দেয়া হলো। অ্যাকশন গ্রুপকেও সদা প্রস্তুত রাখা হলো, যাতে তারা স্বল্পকালীন সময়ে শত্রুর মোকাবিলায় দ্রুত রওয়ানা হতে পারে। প্রয়োজনবোধে বিকল্প ঘাঁটি স্থাপনের স্থানটিও

তাদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানাই হবে সঠিক পদক্ষেপ। এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার ছিলো যে, এই সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আমাদেরও হারাতে হবে অসংখ্য অমূল্য জীবন। আমাদের সামনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা ছিলোনা। এ জন্য অবশ্য জনসাধারণকেও সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

রামগড় থেকে দুটি ইপিআর প্লাটুনকে চট্টগ্রাম শহরের প্রায় ছয় মাইল দূরে ভাটিয়ারী এবং ফৌজদারহাটের মধ্যে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়েছিলো। অন্য দুটি ইপিআর প্লাটুনকে ফটিকছড়ি হাটহাজারী হয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে সহযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে পাঠানো হয়। ক্যাপ্টেন হারুন এবং আরো কয়েকজন অফিসার ৬টি কোম্পানী নিয়ে কালুর ঘাট সেতুর নিকটেই প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছিলেন। ঠিক এই পর্যায়ে ৪ঠা এপ্রিল আমরা ভারত থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদের প্রথম সরবরাহ পাই। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এ সময় আমাদের পুরো বাহিনীকে পুণর্বিন্যস্ত করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালী সদস্যদের গুরুত্বহীন স্থান থেকে সরিয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ফ্রন্টগুলোতে পাঠানো হলো। ক্যাপ্টেন মতিন এবং লেফটেন্যান্ট এজাজের নেতৃত্বাধীন এরূপ দুটি কোম্পানী ভারতীয় এলাকা দিয়ে শতাধিক মাইল দূরে চট্টগ্রাম সেক্টরকে শক্তিশালী করার জন্য সেখানে পৌঁছেন। আমাদের দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ এদের একটি কোম্পানী ভাটিয়ারী অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং অন্য একটি কোম্পানীকে নিয়ে আমি হিয়াকু, ফটিকছড়ি হয়ে পুনরায় চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের দিকে অগ্রসর হই।

এটা ছিলো এক কষ্টসাধ্য অভিযাত্রা। রাস্তা ছিলো অত্যন্ত খারাপ। যান্ত্রিক কনভয় বলতে ছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের কয়েকখানি জীপ, আর এই জীপগুলোকে প্রায় অর্ধেক পথই আমাদের ঠেলে নিয়ে যেতে হচ্ছিলো।

আমাদের এই চলাচলের খবর গোপন রাখার উপায় ছিলোনা। কারণ যেমন দিনের বেলায় আমাদের চলতে হচ্ছিলো, তেমনি আবার ভারতের পথে পলায়নপর ভীত সন্ত্রস্ত অসংখ্য জনসাধারণ একই পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলো। যদিও আমরা সবাই বেসামরিক পোশাকে ছিলাম এবং অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলাম, তথাপি শত্রু কবলিত একটি শহরের দিকে কিছু সংখ্যক লোকের সুসংগঠিত হয়ে চলার ভাব দেখে আশঙ্কা ও হতাশায় নিমজ্জিত লোকজনের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়। আত্মসন্তুষ্টি লাভের জন্য তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক সংখ্যার চেয়ে কয়েক গুণ বাড়িয়ে শহরের দিকে তাদের যাত্রার কথা যেভাবে বলাবলি করছিলো, সে খবর দ্রুত শত্রু ঘাঁটিতে পৌঁছে যায়।

ঘর ছাড়া পলায়নপর মানুষের স্রোত যেন আর থামতে চায়না। বিষাদক্লিষ্ট নৈরাশ্যে ভরা ছিলো তাদের দৃষ্টি। অব্যাহত এই জনস্রোতের অশেষ দুর্গতি ছিলো গভীর বেদনাময়। যেখানেই আমরা থেমেছি সেখানেই পলায়নরত মানুষ আমাদের চারপাশে ভীড় করেছে। আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করেছে, আমরা কি শীঘ্রই দেশে ফিরে আসতে পারবো?

"নিশ্চই পারবেন। হয়তো কয়েক সপ্তাহ মাত্র লাগবে।" জবাব শুনে তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠতো, সোজা হয়ে আকাশের দিকে তারা তাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ধরতো। কোনো একজন 'জয় বাংলা' বলে ধ্বনি দিয়ে উঠতেই চারদিক কাঁপিয়ে হাজার হাজার কণ্ঠে তা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতো। তাদের গগণ বিদারী "জয় বাংলা" ধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত হয়ে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়তো। বয়োঃজেষ্ঠ্য নারী পুরুষেরা আমাদের গাড়িগুলো ছুয়ে দেখতেন, আমাদের পোশাকেও হাত দিতেন, আবার আমাদের সঙ্গের অন্যান্য জিনিসপত্রে হাত ছুঁয়ে সেই হাত মুখে বুলোতেন গভীর প্রত্যাশায়।

নারায়ণহাটে পৌঁছে আমরা সন্ধ্যার পরবর্তী যাত্রার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। রাতের সামান্য আহার গ্রহণ করি। নারায়ণহাটি থেকে আমাদের মুক্তি সেনাদের নাজির হাট পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কয়েকটি নৌকার ব্যবস্থা করা হয়। আকাশ ছিলো মেঘাচ্ছন্ন, অন্যদিকে নৌকাগুলোরও কোনো ছই ছিলোনা। ক্লান্তিতে অবসাদে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। কিছুক্ষণ পর মুষল ধারায় বৃষ্টি নেমে আসে। আমরা বৃষ্টিতে ভিজে উন্মুক্ত আকাশের নিচে শীতে কাঁপতে থাকি। নাজিরহাট পৌঁছাতে ভোর হয়ে গেলো। এখানেই খবর পেলাম ক্যান্টনমেন্টের নিকট আমাদের যে সেনাদল ছিলো শত্রুর আক্রমণে তারা পিছু হটে হাটহাজারীর দিকে চলে গেছে। নাজিরহাট পৌঁছেই আমাদের জন্য একটি সম্ভাব্য ঘাঁটি খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে দ্রুত পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করি। খোঁজাখুঁজির পর কয়েক মাইল দূরে উদালিয়া চা বাগানই উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্ধারণ করি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে দিকে রওয়ানা হলাম। বাগানের বাঙালী ম্যানেজার আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের স্বাগত জানালেন। সকল প্রকার সাহায্যের তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন।

সীতাকুণ্ড পাহাড় শ্রেণীর একটা বিচ্ছিন্ন ছোট পাহাড়ের ওপর গড়ে উঠেছে উদালিয়া চা বাগান। সৈন্যদের এখানে ছোট ছোট দলে ভাগ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, খাবারের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাজের ভার দেয়া হলো। অ্যাকশন গ্রুপকেও সদা প্রস্তুত রাখা হলো, যাতে তারা স্বল্পকালীন সময়ে শত্রুর মোকাবিলায় দ্রুত রওয়ানা হতে পারে। প্রয়োজনবোধে বিকল্প ঘাঁটি স্থাপনের স্থানটিও

দেখে রাখা হলো। রক্ষাব্যূহ নির্মাণের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হলে এই স্থানের দায়িত্ব লেফটেন্যাণ্ট এজাজের ওপর ন্যস্ত করে আমি কালুরঘাটের দিকে অগ্রসর হই।

কালুরঘাটের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে অধিকাংশই ছিলো ইপিআর সৈনিক। প্রাথমিক পর্যায়েই আমি যখন চট্টগ্রাম শহরে পাকসেনাদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম তখনই আমার সংগে যোগ দেয়ার জন্য চট্টগ্রামের সীমান্ত ফাঁড়িগুলো থেকে আগত ইপিআর সৈনিকদের অগ্রযাত্রা মেজর জিয়া থামিয়ে দেন। ইপিআর সৈনিকদের তিনি কালুরঘাটে রেখে দিয়েছিলেন। ৮ বেঙ্গল রেজিমেণ্ট এবং ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের কিছু সৈন্যকেও এখানে রেখে দেয়া হয়। সব মিলিয়ে কালুর ঘাটে তখন ৬টি কোম্পানী ছিলো যার সৈন্য শক্তি ছিলো প্রায় এক হাজার।

মৌলিক রণকৌশল সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে তারাও স্বীকার করবেন যে, কালুরঘাটের মত একটি স্থানে ১০০০ সৈন্য আটকিয়ে না রেখে সে সময় যদি তাদের নিয়ে সরাসরি যুদ্ধে নামতেন তাহলে অনেক ভালো ফল পাওয়া যেতো। সে সময়ে চট্টগ্রাম শহর নিয়ন্ত্রণে রাখার লড়াই ছিলো সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কালুরঘাটের অবস্থান দ্বারা আমাদের সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি। আমি যখন চট্টগ্রাম শহর নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নতুন লোকবল ও অস্ত্রবলের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছিলাম তখন আমারই নির্দেশে আগত ইপিআর সেনাদের কালুরঘাটে আটকে রাখা হয়। আমাদের সৈন্যদের কালুরঘাটে না থামিয়ে আমার সঙ্গে শহরের যুদ্ধে যোগ দিতে দেয়া হলে আমরা সাফল্যের সাথে নৌ-বাহিনীর সদর দফতর, বিমান বন্দর এবং ক্যাণ্টনমেণ্ট দখল করতে পারতাম। এর ফলে পাকিস্তানীরা আর নতুন সৈন্য আনতে পারতো না এবং আমরাও সেখানে তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারতাম। সে ক্ষেত্রে আমাদের যুদ্ধের ইতিহাস হতো সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

পাকিস্তানীরা কখন আক্রমণ করবে এই প্রতীক্ষায় প্রায় ৬ কোম্পানী সৈন্যকে কালুরঘাট অবস্থানে জড়ো করে রাখাতে সামরিক লোকজন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এমনকি সৈন্যরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলো। কালুরঘাটের অবস্থান দ্বারা শুধু একটি কাজই করা সম্ভব ছিলো এবং তাহলো শত্রুরা কখনো কক্সবাজারের পথে অগ্রসর হলে তাদের সে যাত্রাকে কিছু সময়ের জন্য বিলম্বিত করা। কিন্তু পাকিস্তানীরা কক্সবাজারের নির্জন সাগর সৈকত দখল করার জন্য যুদ্ধ শুরু করেনি কিংবা সেখানে গিয়ে অবসর বিনোদনের ইচ্ছাও তখন তাদের ছিলোনা। আমাদের জন্য যেমন, পাকিস্তানীদের জন্যও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ কাজ

ছিলো চট্টগ্রাম শহর, ক্যান্টনমেণ্ট, পোর্ট, নৌ-ঘাঁটি এবং বিমান বন্দর আপন দখলে রাখা, কালুর ঘাটে বসে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব ছিলোনা, সম্ভম হয়নি।

অবশ্য কালুরঘাটে আমাদের সৈন্যরা পরে অনেক হতাহত হয়েও অসম সাহসিকতার সংগে যুদ্ধ করেছিলো। কিন্তু একটি ভ্রান্ত সামরিক অভিযান পরিকল্পনাকে কোন বিশেষ সাহসিকতার দৃষ্টান্ত দ্বারা যেমনি গৌরবান্বিত করা যায় না, তেমনি কোন পক্ষের হতাহতের সংখ্যা দ্বারাও এখানকার প্রতিরক্ষা মূলক অবস্থানের যৌক্তিকতাকেও প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কেবল জনবল এবং অস্ত্রবলের অভাবে চট্টগ্রামের পতন হচ্ছে দেখেও কালুরঘাটে ৬টি কোম্পানীকে কেনো আটকে রাখা হয়েছিলো আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এই বিরাট প্রশ্নটি সব সময়ই থেকে যাবে।

কি কারণে জানিনা, কালুরঘাট যুদ্ধ হয়েছিলো দুই সপ্তাহ পরে এবং এই দুই সপ্তাহ পর্যন্ত আমাদের এখানকার সৈন্যরা প্রায় কোন কাজেই লাগেনি। আমাদের তরুণ অফিসাররা দুর্জয় মনোবল এবং অদম্য সাহসের সংঙ্গে এখানে লড়াই করলেও সৈন্যরা কিন্তু যোগ্য সিনিয়র অফিসারের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করছিলো। অবশ্য আমাদের সিনিয়র অফিসারদের সংখ্যাও তখন খুব বেশি ছিলোনা। এদের মধ্যে আবার মেজর শওকত কক্সবাজার চলে গিয়েছিলেন। ভুল খবরের ভিত্তিতেই এটা হয়েছিলো। তারপর তিনি নিজেই কক্সবাজার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে কালুরঘাটে আমাদের সৈন্যদের সাথে যোগ দেন।

এখানে আমাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ছিলো না। ৩০৩ রাইফেল ছাড়া আর ছিলো কয়েকটি হালকা মেশিন গান এবং দু'টি ৩" মর্টার। ইপিআর মর্টার জেসিও দুটি মর্টার দিয়েই অবিশ্বাস্য কাজ করেছিলেন। মাত্র কয়েক রাউণ্ড মর্টার শেল দিয়েই তিনি শত্রু সৈন্যদের একাধিক জায়গায় ব্যস্ত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি একাই দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে বিভিন্ন জায়গা থেকে মর্টার দাগতে থাকলে আমাদের মর্টারের সংখ্যা ঠিক কত পাকিস্তানীরা তা অনুমান করতে ব্যর্থ হয়। আমাদের প্রতিরোধের দুর্জয়তায় শত্রুরা বার বারই পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং পরিশেষে প্রায় দু'সপ্তাহ পরে ১১ই এপ্রিল কালুরঘাটের যুদ্ধ চূড়ান্ত রূপ নেয়। কালুরঘাট সংঘর্ষে আমরা কেবল সৈনিকই হারাইনি, দুজন অফিসারও সেই সংকটকালে আহত হয়েছিলো। ক্যাপ্টেন হারুন গুরুতর আহত অবস্থায় বার্মায় আশ্রয় নিলেন আর লেফ্‌টেন্যান্ট শমসের মুবিন গুরুতর আহত হয়ে পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী হলেন।

যাহোক, কালুরঘাট অবস্থান পরিদর্শনের পর আমি আবার রামগড় হয়ে ঘুরে কুমিরার দিকে অগ্রসর হই। কুমিরার সৈন্যদের জন্য আরো কিছু অস্ত্রশস্ত্র লাভের উদ্দেশ্যে রামগড়ে আমাকে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়। রামগড়ে মেজর জিয়ার সঙ্গে আমার দেখা হলে তাঁকে আমি কালুরঘাট অবস্থানের অসারতার কথা বলি। তারপর কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে সোজা কুমিরার পথে রওয়ানা হই। কুমিরায় তখনো আমাদের সৈন্যরা শত্রুর সাথে মরণপণ লড়াই করে যাচ্ছিলো।

১৩
কুষ্টিয়ার যুদ্ধ

কুষ্টিয়াতে ২৮শে মার্চ সকালে কারফিউ ওঠাতেই জনসাধারণ পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ৩০শে মার্চ সকালে পুলিশ ও ইপিআর সদস্যরা অসামরিক লোকজনদের সহায়তায় কুষ্টিয়া শহরে অবস্থানরত ২৭ বালুচ রেজিমেণ্টের ওপর আক্রমণ চালিয়ে অবস্থানটি দখল করে নেয়।

চুয়াডাঙ্গাস্থ ৪র্থ ইপিআর উইংয়ের উইং কমাণ্ডার মেজর ওসমান সরকারী কাজে কুষ্টিয়া গিয়ে সার্কিট হাউসে উঠেছিলেন। পাকিস্তানীদের হামলার সময় তিনি কোন প্রকারে কুষ্টিয়া থেকে আত্মরক্ষা করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। ২৬শে মার্চ বেলা ১ টার দিকে তিনি চুয়াডাঙ্গা পৌঁছে ইপিআর সেনাদের সংগঠিত করেন এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সংগে আলোচনায় মিলিত হন। ৪র্থ উইংয়ের সদর দফতর থেকে অয়্যারলেসে ঐ এলাকার সীমান্তবর্তী সকল ফাঁড়ির ইপিআর সদস্যদের জনগণের সহযোগিতায় পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দেয়া হয়। ২৭শে মার্চ সকালে মেজর ওসমান ১ বেঙ্গল রেজিমেণ্টের বাঙ্গালী কমাণ্ডিং অফিসার লেফ-টেন্যাণ্ট কর্ণেল রেজাউল জলিলের সংগে যোগাযোগ করেন। পাকিস্তানীরা কায়দা করে ২৪শে মার্চ এই রেজিমেণ্টকে চৌগাছা পাঠিয়ে দিয়েছিলো। মেজর ওসমান সংক্ষেপে সর্বশেষ পরিস্থিতি বর্ণনা করে ইপিআর সুবেদার মজিদ মোল্লার মারফত লেঃ কর্ণেল জলিলের কাছে একটি চিঠি পাঠান। এই চিঠিতে তিনি লেঃ কর্ণেল জলিলকে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এই অঞ্চলের সার্বিক কমাণ্ড গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু চিঠির কোন জবাব পাওয়া গেলোনা।[৫৭] ২৮শে মার্চ মেজর ওসমান দানেশ নামে জনৈক মুক্তিযোদ্ধার মাধ্যমে তাঁর কাছে পুনরায় বার্তা পাঠান। শোনা যায় মুক্তিযোদ্ধা দানেশ পুনরায় অনুরোধ পত্র নিয়ে লেঃ কর্ণেল জলিলের সামনে উপস্থিত হলে তিনি প্রথমে চিঠিটা পড়েন এবং তাঁর পক্ষে বিদ্রোহে যোগ দেওয়া সম্ভব নয় বলে দানেশকে জানিয়ে দেন। এভাবে তাঁর সাথে দেখা না করার জন্যও তিনি দানেশকে সতর্ক করে দেন। এর পরিণতি

হয়েছিলো করুণ। এই দিন অর্থাৎ ২৮শে মার্চেই লেঃ কর্ণেল জলিলের কাছে ব্যাটেলিয়ন নিয়ে তাকে যশোর ফিরে যাওয়ার এবং অস্ত্রশস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ আসে।

যশোর ক্যান্টনমেন্টে ১ম ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স দলের বাঙালী সৈন্যরা আসন্ন বিপদ অনুভব করতে পেরেছিলো। ২৯শে মার্চ রাতে ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা চৌগাছা থেকে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এলে ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের অস্ত্র জমা না দেয়ার আহ্বান জানায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এর আগেই অস্ত্র জমা দেয়া শেষ করে সৈনিকরা ব্যারাকে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। ২৮শে মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানীরা হঠাৎ ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ঘুমন্ত সৈন্যদের ওপর হামলা করে। বিশ্বাস ঘাতকদের এই আক্রমণে অনেক বাঙালী সেনা প্রাণ হারায়। প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলো এমন কয়েকজন পরে চুয়াডাঙ্গা গিয়ে মেজর ওসমানের সৈন্যদের সাথে যোগ দেয়।[৫৮]

১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর হামলার সময় পাকিস্তানীরা শুধু সৈন্যদেরই হত্যা করেনি, তাদের পরিবার পরিজন নারী শিশুদেরও হত্যা করে। পাকিস্তানীদের হত্যা এবং অত্যাচারের হাত থেকে দুগ্ধপোষ্য নবজাতকেরাও রেহাই পায়নি। ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের বাঙালী কমান্ডিং অফিসার কর্ণেল এস. এ. হাই এবং তাঁর বাঙালী সহকর্মি ক্যাপ্টেন কালামকে ওরা দুঃসহ নির্যাতনের পর হত্যা করে। এই পরিস্থিতিতে চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমান এবং তার সহযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আজম ইপিআর সৈন্যদের নিয়ে কুষ্টিয়া মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। কুষ্টিয়ার ২৭ বালুচ রেজিমেন্টের দুইশত সৈন্য থানা, পুলিশ লাইন এবং জেলা স্কুলে অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। মেজর ওসমান তিনটি ঘাঁটিতেই পর্যায়ক্রমে আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেন। ৩০শে মার্চ ভোর ৪টায় প্রথম আঘাত শুরু হয়। সারাদিন যুদ্ধের পর বিকাল ৫টায় পুলিশ লাইন মুক্ত হয়।

এখানে অনেক পাকিস্তানী নিহত হয়, কয়েকজন আবার পালিয়ে গিয়ে জেলা স্কুলের প্রধান ঘাঁটিতে যোগ দেয়। ৩১শে মার্চ কুষ্টিয়া শহরের পাকিস্তানী অবস্থান গুলোর ওপর আবার নতুন আক্রমণ শুরু হয়। পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার লোক পুলিশ ইপিআর-এর সহায়তায় এগিয়ে আসে। তাদের হাতে ছিলো বাঁশের লাঠি, বন্দুক এবং কয়েকটি ৩০৩ রাইফেল। জনতার ভীড় বেড়ে চলে। দুপুরের মধ্যে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের বিরাট দল পাকিস্তানীদের দ্বিতীয় ঘাঁটি দখল করে নেয়।

শত্রুরা তখন পিছু হটে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে। ২৭ বালুচ রেজিমেন্টের কোম্পানীর

অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। ঘেরাওয়ের মধ্য থেকে কোনভাবে প্রাণে রক্ষা পাওয়া কিছু পাকিস্তানী সেনা দুটি জীপ এবং দুটি ডজ গাড়িতে করে রাতের অন্ধকারে ঝিনাইদহের দিকে পালাতে চেষ্টা করে। খবর পেয়ে জনসাধারণও পথের বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। একদল মুক্তিযোদ্ধা শৈলকূপা সেতুর (যশোর জেলার ঝিনাইদহে) নিকট অবস্থান গ্রহণ করে।

সেতুর নিকট পৌঁছতেই পাকিস্তানীরা মুক্তিযোদ্ধাদের অ্যামবুশে পড়ে যায়। এই অ্যামবুশের ফলে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। কয়েকজন পালাবার চেষ্টা করলে জনসাধারণ তাদের পিছু ধাওয়া করে। পথে তারাও জনতার হাতে প্রাণ হারায়। তবে এই সময়ের মধ্যে ২৭ বালুচ রেজিমেণ্টের ডেল্টা কোম্পানীর হাতে দইশতাধিক বেসামরিক বাঙালী প্রাণ হারিয়েছে, আহত হয়েছে আরো বেশি।

২রা এপ্রিল ভোরের দিকে বালুচ কোম্পানীর অবশিষ্ট সৈন্যরা কুষ্টিয়া থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তার ব্যারিকেডের জন্য যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় তারা গ্রামের পথ ধরে পালাবার চেষ্টা করে। পথে কাউকে দেখতে পেলেই তারা গুলী ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু শীগগিরই তারা হতাশা ও ক্লান্তিতে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গোলাবারুদও ফুরিয়ে যায়। জনসাধারণ সহজেই তাদেরকে বন্দী করে। তারপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তালিকা থেকে ২৭ বালুচ রেজিমেণ্টের ডেল্টা কোম্পানীর নাম চিরতরে মুছে যায়।

পরদিন ৩রা এপ্রিল যশোর থেকে কুষ্টিয়ার পথে আরেকটি পাকিস্তানী কোম্পানী পাঠানো হলে তাদেরকেও একই ভাগ্য বরণ করতে হয়। সৈন্যদের আসার খবর পেয়েই জনগণ বিশয়খালী নামক স্থানে রাস্তায় এক গভীর গর্তের ওপর ডালপালা দিয়ে ঢেকে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। অগ্রবর্তী দুটি জীপ দেখতে না দেখতে গর্তের মধ্যে পড়ে যায় এবং পুরো কনভয় দাঁড়িয়ে পড়ে। কি ঘটছে শত্রুরা তা বুঝবার আগেই চারপাশে লুকিয়ে থাকা জনতা তাদের ঘিরে ফেলে। কোম্পানীর অর্ধেক লোক ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। অন্যরা মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়াতে গিয়ে অনেকে মুখ থুবড়ে পড়ে এবং পশ্চাধাবনকারী জনতার হাতে প্রাণ হারায়। এই ঘটনায় যশোর গ্যারিসন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের হাতে মাত্র দুটি সংঘর্ষে ব্যাটেলিয়নের অর্ধেক শেষ! এ সময় ইপিআর এবং পুলিশ বাহিনীর সাথে জনসাধারণও যোগ দেয় এবং যশোর ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে এগোচ্ছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। এতে যশোর সেনানিবাসে পাকিস্তানীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

৩রা এপ্রিল ঢাকা বিমান বাহিনীর বিমানগুলো চুয়াডাঙ্গার ওপর হামলা চালায়। দুই ঘণ্টারও অধিককাল ধরে তারা নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে। এতে অসংখ্য নিরপরাধ বেসামরিক লোক নিহত ও আহত হয়।[৫৯]

এদিকে ২৬শে মার্চেই দু'জন বাঙালী বেসামরিক অফিসার মেহেরপুরের এসডিও তৌফিক এলাহী চৌধুরী এবং ঝিনাইদহের এসডিপিও মাহবুব উদ্দিন আহম্মদ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেন। পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সাহায্যের অনুরোধ জানিয়ে জনাব তৌফিক এলাহী ২৬শে মার্চ ভারতের নদিয়া জেলার ডি. সি'র নিকট চিঠি লেখেন। চিঠিটির একটি প্রতিলিপি ঐ এলাকার বিএসএফ কমাণ্ডিং অফিসারকেও দেওয়া হয়। ৩০শে মার্চ সকালে জনাব তৌফিক চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমানের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। সেদিনই মেজর ওসমানের পরামর্শে জনাব তৌফিক এবং মাহবুব উদ্দিন প্রয়োজনীয় সাহায্যের বিষয়ে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

এই সময়ে আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব তাজউদ্দিন আহমদ (যুদ্ধকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রি) কয়েকজন দলীয় নেতাসহ ঝিনাইদহে উপস্থিত হন। জনাব তৌফিক এবং জনাব মাহবুবউদ্দিন বিএসএফ অফিসারদের কাছে আওয়ামী লীগ নেতাদের আগমন বার্তা জানিয়ে দেন। তখনই জনাব তাজউদ্দিন এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রথমে কলকাতা এবং সেখান থেকে বিমানযোগে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হয়। জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ৫ই এপ্রিল সীমান্ত ফাঁড়ি জীবননগরে এক বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার জন্যে মেজর ওসমানকে ডেকে পাঠান। বৈঠকে ভারতের কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক এবং বেসামরিক অফিসার উপস্থিত ছিলেন। সভায় যশোর ক্যাণ্টনমেণ্টে আক্রমণ চালানোর জন্য মেজর ওসমানের কি ধরনের সাহায্য প্রয়োজন তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। মেজর ওসমান পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র, বিশেষ করে ভারী অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য জিনিসের জন্য অনুরোধ করেন।[৬০] আলোচনা চলাকালীন সময়েই সংবাদ আসে যে, পাকিস্তানীরা যশোর থেকে ঝিনাইদহের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ঐদিন বিকাল ৫টায় বিশয়খালীর ওপর শত্রুদের দুটি কোম্পানী মরিয়া হয়ে হামলা চালায়। তারা আরও দুবার বিশয়খালীর ওপর হামলা চালায় কিন্তু প্রতিবারই মুক্তি সেনারা তা প্রতিহত করে। এখানকার সংঘর্ষে শত্রুদের হতাহতের সংখ্যা ছিলো ব্যাপক। পরদিন রণাঙ্গণ থেকে হানাদারদের ৭০টি লাশ উদ্ধার করা হয়েছিলো।

৬ই এপ্রিল থেকে পাকিস্তানীরা ঢাকা থেকে বিমানযোগে যশোর ক্যাণ্টনমেণ্টে সৈন্য নিয়ে আসা শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রয়োজনীয় হাতিয়ারের অভাবে পাকিস্তানী সৈন্য চলাচল থামাতে পারেনি। ঐদিন পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত শহর দর্শনা এবং ভারতের সীমান্তবর্তী স্টেশন গেদের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে চুয়াডাঙ্গা (পূর্ব পাকিস্তান) এবং

কলকাতার (ভারত) মধ্যেও টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। চুয়াডাঙ্গার টেলিফোন এক্সচেঞ্জের নামকরণ করা হয়েছিলো "জয় বাংলা" টেলিফোন এক্সচেঞ্জ।

১২ই এপ্রিলের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা যশোর ক্যান্টনমেন্টের ৬ মাইলের মধ্যে পৌঁছে যায়। সময়টি ছিলো খুব সঙ্কটপূর্ণ। মুক্তিযোদ্ধারা অবরুদ্ধ যশোর সেনা-নিবাসের ওপর চরম আঘাত হানার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের জন্য অপেক্ষা করছিলো। এ সময় মেজর ওসমান একটি সংবাদ পান, পদ্মার পূর্ব তীরে শত্রুরা ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করেছে। তারা গোয়ালন্দ কিংবা নগরবাড়ীতে নামার চেষ্টা করছে।[৬১]

১৪
কুমিল্লা পরিকল্পনা

চট্টগ্রাম ক্যাণ্টনমেণ্টে পাকিস্তানীদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক হামলা এবং ১৫০০ বাঙালী সৈন্যকে হত্যার প্রয়াস কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলো না। যশোর ক্যাণ্টনমেণ্টেও পাকবাহিনী অনুরূপ হামলা চালিয়েছিলো। কুমিল্লায় তারা নিয়েছিলো আরো ব্যাপক ও জঘন্য পরিকল্পনা। কিন্তু তাদের সেই জঘন্য পরিকল্পনা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি।

মেজর খালেদ মোশাররফকে ঢাকায় ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর করে পাঠানো হয়েছিলো। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময় থেকে মেজর খালেদ লক্ষ্য করছিলেন যে, রাওয়ালপিণ্ডিস্থ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সিনিয়র অফিসারদের ঢাকা সফরের মাত্রা অহেতুক বেড়ে গেছে। দুটি পশ্চিম পাকিস্তানী ইউনিটকে (১৩ এফ. এফ. এবং ২২ বালুচ রেজিমেণ্ট) ঢাকায় মোতায়েনের জন্য তখন ব্যাপক প্রস্তুতি চলছিলো। সমস্ত ব্যাপারটি ঘটছিলো অতি সংগোপনে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী খালেদ চট্টগ্রাম যান। দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে সেখানকার বাঙালী অফিসারদের প্রতিক্রিয়া জানাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। লেঃ কর্ণেল চৌধুরী, মেজর জিয়া এবং অপর কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর কথা হয়। যুদ্ধের পরে মেজর খালেদ এ প্রসঙ্গে আমাকে জানান, চট্টগ্রামের কয়েকজন বাঙালী অফিসার নাকি তাঁকে বলেছিলেন "এসব রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে রাজনীতিকদেরই মাথা ব্যথা হওয়ার কথা। আমরা সৈনিক, আমাদের কিছু করার নেই। এসব ব্যাপার থেকে দূরে থাকুন।"

মার্চের মাঝামাঝি সময় খালেদ মোশাররফ কুমিল্লাস্থ ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টে যোগদানের নির্দেশনামা পান। ২২শে মার্চ বিকেলে তিনি এই রেজিমেণ্টে যোগদান করেন। ঐ রাতেই ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের তরুণ বাঙালী অফিসাররা তাঁকে দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। ঢাকায় পাকিস্তানীদের সন্দেহজনক আনাগোনা, চলাফেরা এবং কুমিল্লায় অফিসারদের বিবরণে তাঁর মনে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। তরুণ অফিসারগণ আরও

জানালেন, ৫৩ ফিল্ড রেজিমেণ্ট আর্টিলারীর কামানগুলো ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের দিকে মুখ করে বসানো হয়েছে। এই রেজিমেণ্টের চতুর্দিকে ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে। এমন কি ৩ কমাণ্ডো ব্যাটালিয়ন তাদের দূর পাল্লার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলোর নলও ৪ বেঙ্গলের দিকে তাক করে রেখেছে। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কর্তব্যের নামে কুমিল্লা ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে ইতিমধ্যে ৪ বেঙ্গলের দু'টি কোম্পানীকে পশ্চিম পাকিস্তানী মেজর নওয়াজ এবং বাঙালী মেজর সাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

৪ বেঙ্গলের পাকিস্তানী কমাণ্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল খিজির হায়াত ২৪শে মার্চ ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের সন্ধানের নামে মেজর খালেদকে একটি কোম্পানী নিয়ে শমসেরনগর যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পাওয়ার পরই মেজর খালেদ কমাণ্ডিং অফিসারকে ব্যাটালিয়নের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড হিসাবে অপারেশনাল ডিউটিতে তাঁকে অন্ততঃ দুটি কোম্পানী দেয়ার অনুরোধ জানালেন। কমাণ্ডিং অফিসার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "তুমি দু কোম্পানীরও বেশি পেয়ে যাচ্ছো। সিলেট থেকে ৩৩ পাঞ্জাবের একটি কোম্পানী এবং দু'কোম্পানী ইপিআর ইতিমধ্যে শমসেরনগর পাঠানো হয়েছে। তারা সবাই তোমার কমাণ্ডে থাকবে।" খালেদ তবু তাঁর নিজের রেজিমেণ্ট থেকে দুটি কোম্পানী পাঠানোর দাবী জানালে কমাণ্ডিং অফিসার তাঁকে ব্রিগেড কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির কাছে নিয়ে গেলেন। ব্রিগেড কমাণ্ডার তাঁকে নিশ্চয়তা দিলেন যে, শমসেরনগরে তাঁকে আরো সৈন্য দেয়া হবে।[৬২]

শেষ পর্যন্ত মেজর খালেদকে ঐ দিন সন্ধ্যার পর রওয়ানা হতে হয়। ২৫শে মার্চ বেলা ১১টায় তিনি শমসেরনগর পৌঁছেন। কিন্তু সেখানে তিনি ব্রিগেড কমাণ্ডারের ওয়াদা মাফিক ৩৩ পাঞ্জাব অথবা কোনো ইপিআর সৈনিকদের দেখা পেলেন না। ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরও অস্তিত্ব পাওয়া গেলোনা। এই ঘটনায় খালেদ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং পশ্চিম পাকিস্তানী কমাণ্ডিং অফিসারদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও গভীর ভাবে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। সন্দিগ্ধ মনে তিনি অয়্যারলেসে মেজর সাফায়াতের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরদিন সন্ধায় তিনি সাফায়াতের সঙ্গে কথা বলতে পারলেন। অয়্যারলেস সেটের সামনে একজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার থাকার ফলে মেজর সাফায়াত মেজর খালেদকে তেমন কিছু জানাতে পারেননি। কিন্তু ততক্ষণে সাফায়াত ঢাকায় কি ঘটছে তা জেনে গেছেন। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যা ৮টায় একটু সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি খালেদকে অয়্যারলেসে খবর পাঠালেন 'ঢাকায় বেপরোয়া হত্যালীলা চলছে। সর্বত্রই কারফিউ। পাকিস্তানীরা নির্বিচারে গুলীবর্ষণ করে চলেছে।'

এই সাংঘাতিক সংবাদ খালেদকে দারুণভাবে বিচলিত করে তোলে। ক্ষণিকের জন্য যেন তিনি স্থবির হয়ে রইলেন। এতক্ষণে বোঝা গেলো, ঢাকা থেকে কেনো তাঁকে কুমিল্লায় নিয়োগ করা হয়েছে এবং কেনোইবা তাঁকে কুমিল্লা থেকে শমসেরনগর পাঠানো হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটিই একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, তিনি তা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন।

এরপরই খালেদ সাফায়াতের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে তাঁর কোম্পানীকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন। অয়্যারলেসে তিনি সাফায়াতকে প্রস্তুত এবং পাকিস্তানীদের সম্ভাব্য হামলা সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে বললেন। ২৬শে মার্চ রাত সাড়ে ১০টায় খালেদ মোশাররফ তাঁর বাহিনী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পথে পা বাড়ালেন।[৬৩] পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি এ সময় কুমিল্লা থেকে ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেণ্ট এবং মর্টার ব্যাটারী নিয়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করে কুমিরায় ইপিআর বাহিনীর অপ্রত্যাশিত অ্যামবুশের শিকার হয়েছিলেন। এদিকে কর্ণেল খিজির হায়াতও চুপ করে বসে ছিলেন না। বেঙ্গল রেজিমেণ্টের দুটি কোম্পানীকে শমসেরনগর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঠানোর পর ২৫শে মার্চের রাতে তিনি নিজেও ব্রাহ্মণবাড়িয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। এ সময় পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের একটি গ্রুপকেও ব্রাহ্মণবাড়িয়া আনা হচ্ছিলো। খিজির হায়াত ২৭শে মার্চ সকাল ৯টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সকল অফিসারকে এক সম্মেলনে ডাকলেন। এই সম্মেলনেই তিনি বাঙালী অফিসারদের গ্রেফতার এবং পরে অন্যান্য বাঙালী সৈন্যকে নিরস্ত্র করার চক্রান্ত করেছিলেন। যাহোক, গোপনে পাক রেজিমেণ্টের ব্রাহ্মণবাড়িয়া আগমন সংবাদে সাফায়াত পাকিস্তানীদের মতলব বুঝে ফেলেছিলেন। আর তাই কালবিলম্ব না করে ২৭শে মার্চ সকালেই সাফায়াত লেঃ কর্ণেল খিজির হায়াত ও অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে তাদের সকলকে গ্রেফতার করে ফেলেন। এর পর তিনি তার বাহিনী পুনর্গঠনে হাত দেন। বেলা দুটা নাগাদ খালেদ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছে যান এবং উপস্থিত বাঙালী সৈন্য, ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও মুজাহিদসহ উপযুক্ত বেসামরিক লোকদের নিয়ে পরিকল্পিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।[৬৪] বিভিন্ন শ্রেণীর মুক্তিসেনা সমন্বয়ে গঠিত একটি কোম্পানীকে ভৈরবের নিকট অবস্থান গ্রহণ করতে বলা হয়। নরসিংদী, কোম্পানীগঞ্জ এবং সিলেট অভিমুখেও একটি করে কোম্পানী পাঠানো হয়। মেজর সাফায়াত একটি কোম্পানী নিয়ে আখাউড়া, কসবা এবং গঙ্গাসাগর শত্রু মুক্ত করতে অগ্রসর হন। খালেদ প্রথমে মধুপুর ও পরে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে তাঁর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেন। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব তাহেরউদ্দিন

ঠাকুর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাঙালী সেনাদের জন্য সাহায্য সংগ্রহের আশায় এ সময় আগরতলা রওয়ানা হয়ে যান।

১লা এপ্রিল খালেদ মোশাররফ খবর পেলেন যে, জয়দেবপুরে অবস্থানরত দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেণ্টের মেজর সফিউল্লাহ ঢাকার পথে কিশোরগঞ্জ পৌঁচেছেন। খালেদ সঙ্গে সঙ্গেই সফিউল্লাহর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য একজন অফিসারকে কিশোরগঞ্জ পাঠালেন। ঢাকা যাওয়ার আগে তাঁদের করণীয় ও উভয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার বলে তিনি জানালেন। [৬৫] আলোচনার জন্যে ১লা এপ্রিল সফিউল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া যান। মেজর খালেদ তখন সেখানে ছিলেন না। তবে তিনি একটি মেসেজ রেখে গিয়েছিলেন। এর ভিত্তিতে সেই মুহূর্তে সফিউল্লাহ ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করেন। পরবর্তী পর্যায়ে খালেদ এবং সফিউল্লাহ শত্রু হামলা মুক্ত সম্ভাব্য এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৩রা এপ্রিল তাঁরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সরবরাহের অনুরোধ জানান।

কুমিল্লা থেকে কয়েক মাইল দূরে কুমিল্লা-লাকসাম রোডের জাঙ্গালিয়ায় অবস্থিত ওয়াপদা গ্রীড স্টেশনে ২৫শে মার্চের পূর্ব থেকেই এক প্লাটুন বাঙালী সৈন্য মোতায়েন ছিলো। ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত প্লাটুনটি ছিলো বাইরের সকল যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন। ঐদিন অপর একটি প্লাটুন সহ একজন তরুণ অফিসারকে উক্ত এলাকার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। তারা লালমাই হিলে অবস্থান গ্রহণ করে। এসময় শত্রুদের একটি কনভয় লাকসাম যাচ্ছিলো। কিন্তু গন্তব্যস্থলের অদূরে বাঘমারায় বাঙালী প্লাটুন দুটির অ্যামবুশে পড়ে পাকিস্তানীরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অ্যামবুশে পাকিস্তানীদের পঞ্চাশের বেশি নিহত এবং বেশ কিছু সংখ্যক আহত হয়। পাকসেনারা শেষ পর্যন্ত পিছু হটে কুমিল্লা ক্যাণ্টনমেণ্টে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। মুক্তিসেনারা বিপুল সংখ্যক মেশিনগান এবং চীনা অস্ত্রশস্ত্র দখল করে। [৬৬]

এদিকে সাফায়াত তাঁর এলাকার সকল সীমান্ত ফাঁড়ি শত্রুমুক্ত করে ফেলেছেন। ৫ই এপ্রিল পাকসেনাদের দুটি কোম্পানী যানবাহনে কোম্পানীগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে এবং সেখান থেকে তারা পায়ে হেঁটে গ্রামের পথ ধরে। পাকিস্তানীদের কোম্পানী দুটি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কয়েক দফা সংঘর্ষের পর কসবা এবং গঙ্গাসাগর দখল করলেও আখাউড়া দখলে ব্যর্থ হয়। কসবা এবং গঙ্গাসাগরে আমাদের সেনাদের সাহায্যার্থে দুটি কোম্পানী পাঠালে তারা ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে কসবা এবং গঙ্গা সাগর পুনরুদ্ধার করে কিন্তু ভৈরবের কাছে মেঘনার তীরবর্তী অবস্থানের পরিস্থিতি

সঙ্গীন হয়ে ওঠে। মেজর সফিউল্লাহ তাঁর বাহিনী নিয়ে এই অবস্থানের প্রতিরক্ষায় ছিলেন। সফিউল্লাহ এবং খালেদ উভয়েরই ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈন্য সংখ্যা ছিলো সীমিত। তাছাড়া উভয়ের বাহিনীকেই এত বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হচ্ছিলো যে, প্রয়োজনে একে অপরের সাহায্যে আসতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দেয়। এমনকি, পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষায় কেউ নিজের অবস্থান ত্যাগ করলে সেই অবস্থানই বিপন্ন হয়ে পড়বে বলে মনে হয়।

১৫

জয়দেবপুর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ঢাকা থেকে ২৫ মাইল দূরে ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডের জয়দেবপুরে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট অবস্থান করছিলো। তবে মার্চের প্রথম থেকেই ব্যাটালিয়নের সৈন্যদের নানা অজুহাতে বিক্ষিপ্তভাবে ব্যস্ত রাখা হয়। একটি কোম্পানী ছিলো ময়মনসিংহের ইপিআর উইং হেডকোয়ার্টারে; এবং একটি প্লাটুন ছিলো টাঙ্গাইলে, একটি কোম্পানী ছিলো গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে, অবশিষ্ট সৈন্যরা ছিলো জয়দেবপুরে।

১৯শে মার্চ ব্যাটালিয়নের কিছু সৈন্য জয়দেবপুর প্রত্যাবর্তনের পথে ক্রুদ্ধ জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তাদের রাইফেল, স্টেনগান প্রভৃতি ছিনতাই হয়ে যায় এবং জনতার হাতে তারা বন্দী হয়। ঐদিন ৫৭ ব্রিগেডের কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার আরবাব পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের একটি শক্তিশালী দল নিয়ে জয়দেরপুর যাচ্ছিলেন। রাস্তায় জনতা ব্যারিকেড সৃষ্টি করে তা পাহারা দিচ্ছিলো। দলটি সেখানে পৌঁছে জনতার ওপর গুলী চালালে ২জন নিহত এবং ৫০ জন আহত হয়।[৬৭] এরপর রাস্তায় ব্যারিকেড পরিষ্কারে ব্রিগেডিয়ার আরবাবের সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য ২য় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেণ্টকে তলব করা হয়।

২৩শে মার্চ ব্যাটালিয়নের বাঙালী কমাণ্ডিং অফিসারকে ঢাকার ৫৭ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার্সে ডেকে পাঠানো হয় এবং তাঁকে সেখানে আটকে রেখে তাঁর স্থলে ব্যাটালিয়নের একজন নতুন কমাণ্ডিং অফিসার নিয়োগ করা হয়।

১৯শে মার্চের ছোটখাট সংঘর্ষ ছাড়া সেই সময়ে ব্যাটালিয়নটি সতর্ক অবস্থায় থাকার মত তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি। এমন কি ২৫শে মার্চের রাতে ঢাকা-বাসীদের ওপর সশস্ত্র পাকসেনাদের হামলার ঘটনাও তারা জানতে পারেনি। তবে ২৫শে মার্চ রাত থেকে ব্রিগেডের অন্যান্য রেজিমেণ্টের সাথে পূর্বেকার অয়্যারলেস ফ্রিকোয়েন্সীতে যোগাযোগ করা যাচ্ছিলো না, তা ব্যাটালিয়নের অফিসাররা লক্ষ্য করেছিলেন। এতে সৈনিক এবং অফিসারদের মনে কিছুটা সন্দেহও দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু তারা তখনো ঢাকা কিংবা অন্যান্য স্থানে

কি ঘটছে তা বুঝে উঠতে পারেননি। এই কারণে তারা ১লা এপ্রিলে পাক-বাহিনীর সংগে ব্যাটালিয়নের প্রথম সংঘর্ষ না ঘটা পর্যন্ত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। কিন্তু ততোদিনে একদিকে ঢাকার গণহত্যা অভিযান প্রায় সমাপ্ত, অন্যদিকে দেশব্যাপী জনসাধারণ, ইপিআর, পুলিশ, আনসার সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। পাকি-স্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জনগণের পক্ষে যোগ দেয়া ছাড়া তখন আর ব্যাটা-লিয়নের অন্য কোন উপায় ছিলো না।

২৭শে মার্চ বেলা ২টায় ৫৭ ব্রিগেডের কমাণ্ডার ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডিং অফিসারকে অয়্যারলেসে "টংগীতে কিছু লোক মারার জন্য" একটি কোম্পানীকে পাঠাতে বলেন। তদনুযায়ী একটি কোম্পানীকে টঙ্গীতে পাঠানো হয়। এছাড়া ২৫, ২৬ এবং ২৭শে মার্চ এই ব্যাটালিয়নের তেমন কিছু ঘটেনি। ইতিমধ্যে ময়মনসিংহে এক মারাত্মক সংকট ঘনিয়ে ওঠে।

ইপিআর-এর ২ নম্বর উইংয়ের অবাঙালী সহকারী উইং কমাণ্ডার ঢাকা থেকে প্রাপ্ত গোপন নির্দেশ অনুসারে উইংয়ের ই. পি. আর. সদস্যদের বাঙালী অবাঙালী এই দুই দলে ভাগ করে ফেলেন। ২৭শে মার্চ তিনি বাঙালী সেনাদের বিশ্রাম নিতে বলে অবাঙালীদের ডিউটিতে বসান। রাতে হঠাৎ অবাঙালী সৈনিকরা ছাদের ওপর এবং পূর্ব নির্ধারিত কয়েকটি সুবিধাজনক স্থান থেকে বাঙালী ইপিআর সেনাদের ওপর গুলীবর্ষণ শুরু করে। বাঙালী সৈনিকেরা তাড়াতাড়ি অবস্থান গ্রহণ করে পাল্টা গুলীবর্ষণ শুরু করে। ২৮শে মার্চ বেলা ২টা পর্যন্ত গুলী বিনিময়ের পর ময়মনসিংহ সাময়িকভাবে শত্রু মুক্ত হয়। শত্রুপক্ষের অধিকাংশ সৈনিকই প্রাণ হারায়।

২৮শে মার্চ সকালেই ময়মনসিংহের কোম্পানী কমাণ্ডার ব্যাটালিয়ন হেড-কোয়ার্টার্সে ইপিআর-এর অবাঙালী সদস্যদের এই আকস্মিক হামলার কথা জানিয়ে দেন এবং বাঙালী ইপিআর সেনারাও প্রতিশোধ নিচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। ঢাকায় হত্যালীলা, ব্রিগেড সিগন্যাল ব্যবস্থা থেকে রেজিমেণ্টকে বিচ্ছিন্নকরণ এবং সর্বশেষে ময়মনসিংহের কোম্পানীর এই খবরে ব্যাটালিয়নের সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। এর পরেও জয়দেবপুরে থাকাকে তারা বিপজ্জনক বলে মনে করে। সবাই বেরিয়ে পড়ার জন্য, বিশেষতঃ ময়মনসিংহের দিকে যাওয়ার জন্য আগ্রহ দেখালে কমাণ্ডিং অফিসার কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই সময়ে ব্যাটা-লিয়নের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড মেজর সফিউল্লাহ এবং অন্যান্য অফিসার কমাণ্ডিং অফিসারকে বাদ দিয়ে ব্যাটালিয়নসহ জয়দেবপুর ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। ব্যাটালিয়ন পুনর্গঠনের অজুহাতে তারা কেন ১০০ মাইলের অধিক দূরে ময়মনসিংহে

চলে গিয়েছিলেন তা বোধগম্য নয়। একই অজুহাতে চট্টগ্রামের একটি ব্যাটালিয়নও ৩০ মাইল দূরে পটিয়ায় চলে গিয়েছিলো। লক্ষণীয় যে, ব্যাটালিয়ন দু'টি সৈন্য পুনর্গঠনের একই কারণ দেখিয়ে ভিন্ন দূরত্বে এবং রণাঙ্গন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলো।

মেজর সফিউল্লাহ গাজীপুরের সৈন্যদেরকে তাঁর সাথে ময়মনসিংহে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিয়ে ২৮শে মার্চ সকাল ১০টায় তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে জয়দেবপুর ত্যাগ করলেন। পথে তিনি টাঙ্গাইলে থামলেন এবং দেখলেন জনসাধারণ ইতিমধ্যেই পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শহরের চারদিকে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। টাঙ্গাইলের পর মুক্তাগাছাতেও তারা কিছুক্ষণের জন্য থামেন। পরিশেষে তিনি এবং তাঁর সৈন্যদল ২৯শে মার্চ বিকেলে ময়মনসিংহে পৌঁছেন। এই দিন বিকাল ৪টার মধ্যে সমগ্র ব্যাটালিয়নের সৈন্যরা ময়মনসিংহে এসে একত্র হলো। পরদিন অর্থাৎ ৩০শে মার্চ সকালে তিনি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করলেন।[৬৮]

এই বৈঠকের পর সফিউল্লাহ তাঁর অফিসারদের সংগেও আলোচনায় বসলেন। তাঁরা সবাই নিম্নরূপ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন:

ক. দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেণ্টের উপস্থিত সৈন্যরা একটি ইপিআর কোম্পানী সহ পূর্ব দিক দিয়ে ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্টের ওপর আক্রমণ চালাবে।

খ. দুটি ইপিআর কোম্পানী ঢাকার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ মীরপুর, মোহাম্মদপুর এবং বিমান বন্দর এলাকা অভিমুখে অগ্রসর হবে যাতে শত্রুদের ওই দিকে ব্যস্ত রাখা যায়।

গ. এক কোম্পানী ইপিআর সৈন্য গফরগাঁওয়ে মোতায়েন করতে হবে।

ঘ. এক কোম্পানী ইপিআর সৈন্য টাঙ্গাইলে মোতায়েন করতে হবে।

ঙ. এক কোম্পানী ইপিআর সৈন্য থাকবে বাহাদুরাবাদ ঘাটে।

চ. এক কোম্পানী ইপিআর সৈন্যকে সিরাজগঞ্জ ঘাটে রাখা হবে।

এই সব দলের সংগে পর্যাপ্ত সংখ্যক আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সহযোগী বাহিনী হিসাবে রাখা হবে।

৩০শে মার্চ বিকালে সফিউল্লাহ তাঁর সদর দফতর ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জে স্থানান্তর করলেন। ঢাকার পূর্বদিক দিয়ে অগ্রসর হতে হলে সৈন্যদের ট্রেন যোগে নরসিংদী যাওয়া দরকার ছিলো। সেখান থেকে সৈন্যদেরকে শীতলক্ষ্যা নদী পর্যন্ত গিয়ে নৌকায় নদী পার হয়ে পায়ে হেঁটে আরো এগিয়ে গিয়ে

পাক সৈন্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার জন্য সুবিধাজনক এক জায়গায় অবস্থান নিতে হবে। কিশোরগঞ্জে বসেই সফিউল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে খালেদ মোশাররফের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য তাঁর একটি টেলিফোন বার্তা পান। এই বার্তা পেয়ে সফিউল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া রওনা হবার সিদ্ধান্ত নেন। ৩১শে মার্চ রাত ১টায় সফিউল্লাহ অবসর প্রাপ্ত মেজর নুরুজ্জামান সহ ট্রেনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পথে রওনা হন। ১লা এপ্রিল তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেন। এ সময় খালেদ তাঁর সদর দফতরে ছিলেন না। খালেদের সহকারী মেজর সাফায়াত জামিল সফিউল্লাহকে খালেদের একটি বর্তা দেন। উক্ত বার্তায় খালেদ মোশাররফ সফিউল্লাহকে তাঁর ঢাকা অভিযানের পরিকল্পনা বাতিল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই বার্তার উপর ভিত্তি করেই সফিউল্লাহ তাঁর পরিকল্পনা বাতিল করেন। কিন্তু যে সকল ইপিআর কোম্পানীকে আগেই ঢাকার পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে অভিযান চালাবার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো তারা ইতিমধ্যেই রণাঙ্গন এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিলো। অন্য কোন নির্দেশ না পেয়ে তারা নিজ থেকেই পাকিস্তানীদের ওপর আক্রমণ শুরু করে দেয়। তারপর সফিউল্লাহর সাথে তাদের দীর্ঘদিন কোন যোগাযোগ ছিলোনা।

মূল পরিকল্পনা অনুসারে ক্যাপ্টেন নাসিমের অধীনে বেঙ্গল রেজিমেণ্টের এক কোম্পানী সৈন্য এবং সুবেদার শরিফের অধীনে ইপিআর-এর একটি কোম্পানী ৩০শে মার্চ সাড়ে ১২টায় নরসিংদীর পথে ময়মনসিংহ ত্যাগ করে। রাত ১১টার দিকে নাসিম ঢাকা না গিয়ে ভৈরবে ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। এতেই ইপিআর কোম্পানীর সৈনিকদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। অবশ্য ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান ইপিআর কোম্পানীর সাথে যেতে মনস্থ করেন। মতিউর ছুটিতে ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় ময়মনসিংহে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেন। ৩১শে মার্চ ভোরে এই দল নরসিংদী এসে পৌঁছে। তারা ট্রেন থেকে নেমে পায়ে হেঁটেই ঢাকার পথে যাত্রা শুরু করে। ডেমরা ঘাট দিয়ে তাদের ঢাকা পৌঁছার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানীরা আগেই ডেমরায় অবস্থান গ্রহণ করায় এ পথ তাদের ত্যাগ করতে হয়।

১লা এপ্রিল রাতে ক্যাপ্টেন মতিউর এবং সুবেদার ফরিদ ৬০ জন ইপিআর সৈন্য নিয়ে রামপুরায় পাকিস্তানীদের ওপর প্রথম আঘাত হানেন। এই আক্রমণ পরিচালনার জন্য ডাংগায় তাঁরা একটি গোপন ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। অপর-দিকে ইপিআর সেনাদের আরেকটি দল ঢাকা নগরীরমধ্যে দুঃসাহসী অভিযান চালায়। ২রা এপ্রিল এরা ঢাকায় ১জন পাকিস্তানী অফিসার এবং ৫জন সৈন্যকে হত্যা করে। পাকিস্তানীদের একটি গাড়ীও ধ্বংস হয়ে যায়। এ সময় ঢাকা

থেকে একটি পাকিস্তানী ব্যাটালিয়ন ময়মনসিংহের দিকে যাচ্ছিলো। ১লা এপ্রিল টাংগাইলের কাছে এই ব্যাটালিয়ন একটি ইপিআর কোম্পানীর অ্যামবুশে পড়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নতুন আনা সৈন্যরা এমনটি আশা করতে পারেনি। তারা হতবাক হয়ে যায় এবং বিস্ময়ের ঘোর না কাটতেই দেখে যে অন্ততঃ দুটি প্লাটুন শেষ, বাকিরা তখন পিছনে হটতে বাধ্য হয়।[৬৯]

ঢাকা শহরের মধ্যেও তখন ইপিআর দলের অভিযান চলছিলো। রাজার বাগ পুলিশ হাসপাতাল, ডেমরা, যাত্রাবাড়ী প্রভৃতি এলাকায় তারা আক্রমণ চালায়। ৬ই এপ্রিল ইপিআর সৈন্যরা (সিপাই নান্নু, সিপাই আফতাব, সিপাই জাহাঙ্গীর, সিপাই সাইদুর রহমান) যাত্রাবাড়ী রোডে একটি পাকিস্তানী দলের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালালে শত্রুপক্ষের বেশ কয়েকজন নিহত এবং আহত হয়। ৬ই এপ্রিল ভারতের আকাশবাণীর খবরে বলা হয়, মুক্তিবাহিনী নরসিংদী থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আসলে যা ঘটেছিলো তা হচ্ছে ইপিআর নায়েব সুবেদার সুলতান এবং সুবেদার গণি যৌথভাবে পঁচিশের রাতে আক্রান্ত, পলায়নপর বিশৃংখল ইপি-আর সদস্যদের সংগঠিত করছিলেন। তাঁরা প্রথমে নরসিংদী এবং সেখান থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন। ৬ই এপ্রিল ইপিআর বাহিনীর এই গ্রুপটির ওপর পাকিস্তানী বিমানগুলো আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে একে অপরের সংগে সংযোগ হারিয়ে ফেলে।

এই সময়ে শত্রুপক্ষের ২ পদাতিক ব্যাটালিয়নের একটি কলাম ভৈরবের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। ২ বেঙ্গল রেজিমেণ্টের একটি কোম্পানী নরসিংদীর কাছে অগ্রসরমান পাকিস্তানীদের জন্যে ওৎপেতে থাকে। ২রা এপ্রিল শত্রু সেনাদের একটি পুরা ব্যাটালিয়ন মুক্তিসেনাদের অ্যামবুশে পড়ে যায়। এই অ্যামবুশে পাকিস্তানীরা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। হতাহতের সংখ্যা প্রায় একশত। মাত্র একটি কোম্পানী দিয়ে শত্রুসেনাদের একটি পুরা ব্যাটালিয়নকে ঘায়েল করা দুঃসাধ্য ছিল বৈকি। হতচকিত শত্রুসেনারা প্রথমে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটে। কিন্তু একটু পরেই তাদের কামানগুলো আমাদের যোদ্ধাদের অবস্থান লক্ষ্য করে গোলা-বর্ষণ শুরু করে। পাল্টা আঘাতে আমাদের সৈন্যরা পিছু হটে ভৈরবের নিকট রামপুরে অবস্থান গ্রহণ করে। ঠিক এই পর্যায়ে সফিউল্লাহর সঙ্গে খালেদ মোশাররফের যোগাযোগ হয়। সফিউল্লাহ তখন তাঁর সৈন্যদের পুনর্গঠন কর-ছিলেন। দুটি নিয়মিত পদাতিক কোম্পানীকে তখন নরসিংদীর মুখোমুখি ভৈরবে মোতায়েন করা হয়। একটি কোম্পানীকে সিলেটে পাঠানো হয়। চতুর্থ কোম্পানীটিকে সরাইলে সংরক্ষিত রাখা হয়। এই সব নিয়মিত কোম্পানীর শক্তিবৃদ্ধির জন্য অনিয়মিত আনসার ও মুজাহিদদেরও সংযুক্ত করা হয়।

৭ই এপ্রিল পাকিস্তানীরা সিলেট থেকে পিছু হটে সালুটিকর বিমান ঘাঁটিতে জড়ো হয়। কিন্তু ভৈরব সেতুর নিকটে তখন একটি প্রধান যুদ্ধের আয়োজন চলছিলো। এখানে শত্রুরা পুরো একটি পদাতিক ব্রিগেড মোতায়েন করে। মেথিবান্দায় পাকিস্তানীরা তাদের আর্টিলারী স্থাপন করেছিলো। আমাদের অবস্থানের উপর দিয়ে প্রতিদিনই ওদের পর্যবেক্ষণ বিমানগুলো উড়ছিলো। শেষ পর্যন্ত ১৫ই এপ্রিল পাকিস্তানীদের সংগে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ৬টি এফ—৮৬, স্যাবর জেট—২ ইস্ট বেঙ্গলের অবস্থানের উপর ক্রমাগত বোমা বর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে কামান থেকেও গোলা বর্ষণ শুরু হয়। প্রচণ্ড হামলার মুখে আমাদের সৈন্যরা ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে বিকল্প কোন অবস্থানেও যেতে পারছিলোনা। তাছাড়া শত্রুর কামান কিংবা বিমান আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যেও তাদের তেমন কোন হাতিয়ার ছিলো না। এদিকে গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলার ছত্রছায়ায় পাকিস্তানী বিমান বহর দুটি কমাণ্ডো কোম্পানীকে আমাদের অবস্থানের পিছনে তাল শহরে নামিয়ে দেয়। ফলে আমাদের পিছনের এলাকাটিও বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সরাইলে অবস্থানরত সংরক্ষিত কোম্পানীটিকে অগ্রসর হতে বলা হয়। কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে। শত্রুপক্ষের শক্তির তুলনায় একটি কোম্পানীর বাড়তি সাহায্য ছিল অকিঞ্চিৎকর। যুদ্ধ তখন প্রায় সমাপ্তির দিকে এবং ফলাফলও পাকিস্তানীদের অনুকূলে। অব্যাহত গোলাবর্ষণ এবং বিমান আক্রমণের দরুণ আমাদের হতাহতের সংখ্যা বাড়ছিলো। অপরদিকে পাকিস্তানী কমাণ্ডোরা পিছন দিক থেকে এগিয়ে এলে সৈন্যরা কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না। কেউ কেউ ট্রেঞ্চ ত্যাগ করে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে অবস্থান ত্যাগ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অবশিষ্টরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

শত্রুরা ভৈরব থেকে রেল লাইনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং আখাউড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এপ্রিলের শেষ নাগাদ তেমন কোন প্রতিরোধ ছাড়াই ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং আখাউড়ার পতন ঘটে।

ওদিকে সালুটিকর বিমান ঘাঁটিতে ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য আটকা পড়ে গিয়েছিলো। কোন পথেই তাদের বেরোবার উপায় ছিলো না। আমাদের দুর্ভাগ্য অবরুদ্ধ এই বিমান ঘাঁটির ওপর আঘাত হানার জন্য সালুটিকরের আশেপাশে আমাদের তেমন কোন ট্রেনিং প্রাপ্ত সৈন্য ছিলো না। ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে বিমানযোগে ৩১৩ ব্রিগেডের সৈন্য আসার ফলে সালুটিকরে অবস্থানরত পাকিস্তানীদের শক্তি প্রায় দুই ব্যাটালিয়নে উন্নীত হয়। ১৯শে এপ্রিল সালুটিকরের আশে পাশে আমাদের অবস্থানের ওপর পাকিস্তানী বিমান থেকে বেলা

সাড়ে ১২টা পর্যন্ত অনবরত গোলা বর্ষণ চলে। বিকালের দিকে শত্রুরা বিমান বন্দর থেকে বেরোবার চেষ্টা করে কিন্তু আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা পূর্বেই সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিলো বলে পাকিস্তানীদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এদিনকার সংঘর্ষে শত্রুপক্ষের বিপুল সংখ্যক হতাহত হয়। হানাদারদের কয়েকদফা চেষ্টা শুধু নিজ দলের হতাহতের সংখ্যাই বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু এ অবস্থা ছিলো সাময়িক, পাকিস্তানীরা চাচ্ছিলো সময়, তাদের অব্যাহত বিমান হামলা, বোম্বিং এবং নতুন নতুন সৈন্যের আগমনে সালুটিকর থেকে তাদের মুক্তির পথ প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

১৬
প্রথম বাংলাদেশ সরকার

৪ঠা এপ্রিল চট্টগ্রাম শহরের পতন ঘটলে পাকিস্তানীরা ক্রমান্বয়ে কালুরঘাট সেতুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১০ই এপ্রিলের মধ্যে সেতুর নিকট তারা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে তোলে। এই সময় শত্রুরা ছিলো আক্রমণমুখী এবং আমাদের ভূমিকা ছিলো আত্মরক্ষামূলক। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে থাকতে থাকতে আমাদের সৈন্যরা উদ্যম হারিয়ে ফেলছিলো।

১১ই এপ্রিল সকাল ৮টায় শত্রু পক্ষের গোলন্দাজ বাহিনী কালুরঘাট অবস্থানের ওপর আক্রমণ শুরু করে। নৌ-বাহিনীর কামানগুলো থেকেও গোলা বর্ষণ শুরু হয়। ক্যাপ্টেন হারুন এবং লেফটেন্যান্ট শমসের সেতুর পশ্চিম পার্শ্বে (শহরের দিকে) অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্বে ছিলেন। আমাদের প্রধান অবস্থান ছিলো সেতুর পূর্ব পার্শ্বে।

কিছুক্ষণের মধ্যে শত্রুদের গোলা বর্ষণ তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই গোলা বর্ষণের ছত্রছায়ায় পাকিস্তানীরা সম্মুখ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সেতুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ট্রেঞ্চ থেকে হারুন শত্রুপক্ষের অস্বাভাবিক তৎপরতা লক্ষ্য করে শমসেরকে বললো "তোমার বাইনোকুলারটা দাওতো, ওদের অবস্থানটা দেখি"। কথা শেষ না হতেই হারুন তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলো। তীব্র যন্ত্রণায় হারুন কুকড়ে যাচ্ছিলো। লাইট মেশিন গানের এক ঝাঁক গুলী তাকে বিদ্ধ করেছে। দুজন ছাত্র তাড়াতাড়ি হারুনকে ধরে সেতুর গোড়ায় নিয়ে এলে, সে নিজেই প্রায় দৌড়ে সেতু পার হয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে যায়। তাঁকে একটি মাইক্রোবাসে পটিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এর অল্পক্ষণ পরেই শমসেরের হাটুতে গুলী লাগলে সেও অচল হয়ে পড়ে। তখন তাঁর প্রায় চারপাশেই লড়াই চলছিলো। শমসের শত্রুদের হাতে বন্দী হয়। দুজন অফিসারকে হারিয়ে আমাদের সৈন্যদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। তারা ঘাঁটি ত্যাগ করে পেছনে হটতে শুরু করে। সেদিন বিকাল নাগাদ কালুরঘাটে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং আমাদের সৈন্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামের পথ ধরে রামগড়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

পথে মহালছড়িতে হঠাৎ পাকিস্তান বাহিনীর একটি কমাণ্ডো কোম্পানীর সাথে তাদের সংঘর্ষ বেধে যায়। পাক বাহিনীর সাথে বিচ্ছিন্নতাবাদী মিজোরাও ছিলো। পাকিস্তান সরকার এই সব মিজোদের আশ্রয় এবং ট্রেনিং দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক তৎপরতায় সহায়তা করতো।

উদালিয়া চা বাগানে আমাদের যে কোম্পানী ঘাঁটি স্থাপন করেছিলো পাকিস্তানীদের তীব্র আক্রমণে তাদের সে এলাকা পরিত্যাগ করতে হয়। ওদিকে চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়কের কুমিরায় তখন প্রচণ্ড লড়াই চলছিলো। চট্টগ্রামের দিকে শত্রুর অগ্রাভিযান প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের যে সৈন্যরা সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেছিলো, শত্রু বাহিনী পর্যবেক্ষক বিমানের সহযোগিতায় তাদের ওপর প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ শুরু করে। গোলা বর্ষণে আমাদের পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আরো রক্তক্ষয় এড়ানোর জন্য আমাদের সৈন্যরা সীতাকুণ্ড সরে আসে। শত্রু সৈন্যের আগমন বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যেই সেখানে আমাদের অল্প কয়েকজন সৈন্য থেকে যায় এবং এই অবসরে বাঙালী সৈন্যরা তাদের সীতাকুণ্ড ঘাঁটি সুদৃঢ় করে গড়ে তোলে। কিন্তু ১৬ই এপ্রিলের মধ্যে শত্রুরা আমাদের সীতাকুণ্ড অবস্থানের ওপর আঘাত হানে। তারা গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় কয়েক দফা হামলা চালায়। নৌবাহিনীর কামানগুলো তখন ব্যাপকভাবে গোলা বর্ষণ করছিলো। তবুও আমাদের সেনারা পাল্টা আঘাত হেনে শত্রুপক্ষের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি করে। জানা যায়, চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং যশোরের সামরিক বেসামরিক হাসপাতালগুলোয় শত্রুপক্ষের হতাহতদের স্থান সংকুলান হচ্ছিলোনা। প্রথম প্রথম তারা কিছু অফিসার এবং জেসিও'র লাশ দাফনের উদ্দেশ্যে বিমানযোগে পশ্চিম পাকিস্তান পাঠিয়েছিলো। কিন্তু নিহতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পরে আর লাশ পাঠানো সম্ভব হয়নি। তাছাড়া প্রথম দিকে এই সব লাশ দেখে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য সৈন্য এবং সেখানকার বেসামরিক জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হয়ে উঠছিলো। তাই পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশে কি ঘটছে তা গোপন রাখতে চাচ্ছিলেন।

বাংলাদেশে প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে তখন লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে। এই সময়ে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় আমবাগানে বাঙালীর জীবনে এক অনন্য সাধারণ ঘটনা ঘটে যায়। দিনটি ছিলো এপ্রিলের ১৭ তারিখ। ঐদিন সকাল আনুমানিক ৮টায় জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কর্ণেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা বৈদ্যনাথতলা এসে পৌঁছলেন। নেতৃবৃন্দের বসার জন্য পাশের গ্রাম গুলো থেকে কিছু সংখ্যক চেয়ার জোগাড় করা হলো। সেসব চেয়ারের অধিকাংশের হাতল

ছিলোনা। বেলা ১১টার মধ্যে অন্যান্য নেতারা পৌঁছে গেলেন। পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন এবং জনা পঞ্চাশেক বিদেশী সাংবাদিকও সবুজ শ্যামলিমায় ঘেরা আম্রকাননে উপস্থিত হলেন। এদের সামনেই সেদিন গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।[৭০] শেখ মুজিবের নামানুসারে এ জায়গাটির নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ঘোষণা করা হয় রাষ্ট্রপতি হিসাবে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম হন উপরাষ্ট্রপতি এবং ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি। কারণ রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান তখন পাক সামরিক জান্তার কারাগারে বন্দী। ইপিআর এর একটি প্লাটুন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিসভায় ছিলেন :

১. প্রধানমন্ত্রি : তাজউদ্দিন আহমদ
২. আইন, সংসদীয় বিষয় ও পররাষ্ট্রমন্ত্রি : খোন্দকার মোশতাক আহমদ
৩. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রি : এইচ. এম. কামরুজ্জামান
৪. অর্থমন্ত্রি : এম. মনসুর আলী

আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্য কর্ণেল (অব) এম. এ. জি. ওসমানী বাংলাদেশ বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ নিযুক্ত হন। উপরোক্ত ঐতিহাসিক সমাবেশে নতুনরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম এবং এর সরকার গঠনের কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হয়। মূল স্বাধীনতা ঘোষণা আদেশটি ইতিপূর্বে অর্থাৎ ১৯৭১ এর ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর থেকে প্রচার করা হয়েছিলো এবং এটি কার্যকর করা হয় পূর্ববর্তী ২৬শে মার্চ থেকে।

স্বাধীনতা ঘোষণা আদেশে বলা হয় :

একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচনের জন্য যেহেতু ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে আওয়ামী লীগ থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে, এবং যেহেতু একটি শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন, এবং যেহেতু আহূত পরিষদের অধিবেশন হঠকারী এবং অবৈধভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী রাখা হয়েছে, এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের ওয়াদা পূরণের পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদের আলোচনা চলাকালে এক অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ যুদ্ধ শুরু করেছে এবং যেহেতু এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণের ঘটনায়

ও পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোকের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের ন্যায়সঙ্গত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার যথাযথভাবে পূরণ করতে গিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সংহতি যথারীতি ঘোষণা করেছেন এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ নিষ্ঠুর ও বর্বর যুদ্ধ আরম্ভ করেছে এবং এখনো অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের ওপর গণহত্যা ও অচিন্তনীয় নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে এবং যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা এবং অন্যান্য নির্যাতনমূলক কার্যের দ্বারা বাংলাদেশের লোকদের নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের পক্ষে অধিবেশন এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং জনগণের জন্য একটি সরকার গঠনের কাজ অসম্ভব করে তুলেছেন, এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা এবং বৈপ্লবিক চেতনা দ্বারা বাংলাদেশের ভূখণ্ডের ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে ;

যেহেতু সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী দেশের জনগণ আমাদের যে ম্যাণ্ডেট দিয়েছে তা সমুন্নত রাখতে বাধ্য, বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা যথাযথভাবে আমাদের নিয়ে একটি গণপরিষদ গঠন করেছি, এবং পারস্পরিক আলাপ আলোচনার পর, বাংলাদেশের জনগণের সমান অধিকার, মানবিক অধিকার, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা-কল্পে বাংলাদেশকে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা এবং গঠন করছি, এবং তদদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইতিপূর্বেই যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন তা বহাল করছি এবং এতদ্বারা নিশ্চয়তা প্রদান করছি এবং প্রস্তাব গ্রহণ করছি যে, একটি শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকবেন এবং প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি হবেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন এবং তিনি ক্ষমা প্রদর্শনসহ সকল প্রশাসনিক এবং আইন প্রণয়নকারী ক্ষমতার অধিকারী হবেন, এবং প্রধানমন্ত্রি এবং তাঁর (রাষ্ট্রপতির) বিবেচনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রি নিয়োগের ক্ষমতাও তাঁর থাকবে, এবং তিনি কর আদায় এবং অর্থ ব্যয়ের অধিকারী থাকবেন, গণ-পরিষদ আহ্বান এবং মূলতবী করার ক্ষমতা তাঁর থাকবে এবং বাংলাদেশের জনগণকে একটি সুশৃঙ্খল এবং ন্যায়বিচার ভিত্তিক সরকার প্রদানের জন্য দরকার হতে পারে এমন সকল কাজই তিনি করবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিরা আরো প্রস্তাব নিতেছি যে, রাষ্ট্রপতি না থাকলে কিংবা তিনি তাঁর দফতরে হাজির হতে না পারলে অথবা কোন

কারণে তিনি তাঁর অধিকার প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হলে, উপ-রাষ্ট্রপতি, এই ঘোষণায় রাষ্ট্রপতিকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতার অধিকারী হবেন এবং রাষ্ট্রপতির ওপর অর্পিত সকল কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করবেন।

আমরা আরো প্রস্তাব গ্রহণ করছি, জাতিসমূহের সদস্য হিসাবে এবং জাতি সংঘ সনদ দ্বারা যে কর্তব্য এবং দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তাবে সেসব আমরা পালন ও কার্যকর করবো।

আমরা আরো সিদ্ধান্ত নিতেছি যে, এই স্বাধীনতা ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

আমাদের আরো প্রস্তাব, এই প্রস্তাবাবলী কার্যকর করার উদ্দেশ্যে, রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতিকে শপথ গ্রহণ করানোর জন্য আমাদের দ্বারা যথারীতি অধিকার প্রাপ্ত, অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলীকে এতদ্বারা ক্ষমতা দিচ্ছি ও নিয়োগ করছি।

ওদিকে ১৮ই এপ্রিল শত্রু বাহিনী আমাদের সীতাকুণ্ড অবস্থান ছত্রভঙ্গ করে দিলে এখান থেকে আমাদের সৈন্যদেরকে মিরেশ্বরাই-এ পশ্চাদপসরণ করতে হলো। আমরা জানতাম মিরেশ্বরাইতেও আমরা অল্প কিছু দিনের জন্য থাকতে পারবো, তারপর আবার সরে যেতে হবে। আবার যুদ্ধ করবো, আবার হটতে হবে। এই দুঃখজনক অবস্থা কতদিন চলবে তা কারো জানা ছিলোনা। সৈন্যরাও ক্রমে আস্থা হারিয়ে ফেলছিলো। কোন অবস্থান প্রতিরক্ষায় নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে নিজেরাই সন্দিহান হয়ে উঠেছিলো। লোকবল এবং বিপুল অস্ত্রবলের সাহায্যে শত্রুপক্ষ প্রতিটি যুদ্ধেই ইচ্ছামতো ফলাফল নির্ধারণ করে চলছিলো। এই সংকট-ময় দিনগুলোতে আমাদের সব চাইতে বেশি দরকার ছিলো কিছু ভালো অস্ত্রের। চিরাচরিত পন্থায় যুদ্ধ হচ্ছিলো। অস্ত্রবল বৃদ্ধি করতে না পারলে আমাদের জয়ের কোনো আশাই ছিলোনা। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বাংলাদেশ বাহিনীর কলকাতাস্থ সদর দফতরটি ছিলো রণাঙ্গন থেকে বহুদূরে। সম্ভবতঃ এই দূরত্বের কারণেই যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের চাহিদা সম্পর্কে সদর দফতর কিছুটা উদাসীন ছিলো। একদিকে আমাদের সামরিক সদর দফতর থেকে বলা হতো 'যেভাবেই হোক ঘাঁটি দখলে রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা কর।' আবার উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র চাইলে জবাব পেতাম, 'এটাতো গেরিলা যুদ্ধ, ভারী অস্ত্রের তেমন প্রয়োজন নেই।' ওই জবাব গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কিত বই পড়া জবাব, না ভারতের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহে সরকারের অক্ষমতা—তা আমরা জানতাম না। গেরিলা যুদ্ধে উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন নেই, এই উক্তিটি যে কত অসার, সে সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য যে সব দেশে গেরিলা যুদ্ধ চলছিলো,

সে সব যুদ্ধ পর্যালোচনা করলেই বুঝা যাবে। তাছাড়া আমরা শুধু গেরিলা যুদ্ধই করছিলাম না, সাথে সাথে প্রচলিত ধারার লড়াইও আমাদের করতে হচ্ছিলো। দেশের বেশ কয়েকটি স্থানে আমাদের সৈন্যরা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে শত্রুপক্ষের অগ্রাভিযান প্রতিরোধেরও চেষ্টা করছিলো। প্রচলিত প্রথার এই যুদ্ধের পাশাপাশি ট্রেনিং প্রাপ্ত ছোট ছোট গেরিলা দলকেও বাংলাদেশের ভেতরে পাঠানো হচ্ছিলো।

একাত্তরের যুদ্ধের এই বৈশিষ্ট্য অনেকেই পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারেননি। তাই আমাদের সরকার এবং সামরিক হেড কোয়ার্টারের কাছে আমাদের সুবিধা-অসুবিধাও বোধগম্য হয়নি। সবচাইতে নাজুক অবস্থা ছিলো আমাদের। অর্থাৎ সমর ক্ষেত্রের কমাণ্ডারদের, যাঁদেরকে সৈন্য ও অফিসারদের কাছে যুদ্ধের ব্যাপারটা বুঝাতে হতো। সে সময়ের একটি ঘটনার কথা বলছি—তখন আমি সৈন্য নিয়ে মিরেশ্বরাই এলাকায় শত্রুর সাথে যুদ্ধ করছিলাম। ৩ ইঞ্চি মর্টার গোলার ঘাটতি ছিলো আমাদের, এবং শত্রুরা তখন আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের ওপর কামান দেগে চলছিলো। শত্রুর গোলায় আহত একজন সৈনিক আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি আমাদেরকে কামানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের কামান ব্যবহার করছেন না কেন?' এ প্রশ্নের আমি কোন জবাব দিতে পারিনি। তবু আমার আশা ছিলো, শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য আমি পাবোই। এটা আমার দুরাশা ছিলো কি না বলতে পারিনা। পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার ইঙ্গিতের উপর ভিত্তি করেই আমি যোদ্ধাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

শেষ পর্যন্ত যখন অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছিলো না এবং যোদ্ধাদের পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র দেয়া যাচ্ছিলো না সে অবস্থায় সৈন্যদের ঘাঁটি আগলে থাকার নির্দেশ দেয়া আমাদের জন্য খুবই অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। ভারত সরকার, আমাদের সরকার এবং সামরিক হেডকোয়ার্টার যদি সময় মতো প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে অসমর্থই হবেন তাহলে সে কথাটা সোজা বলে দিলে আমাদের উচ্চাশা এবং ভুল বুঝাবুঝির অবসান হতে পারতো। দুঃখ এই যে যুদ্ধের ৯ মাসে এই সমস্যাটি বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদেরকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছিলো। ক্রমানুয়ে দেখা যেতে লাগলো প্রায় সকল নিশ্চয়তাই শূন্যগর্ভ। এতদসত্ত্বেও আমি আমার বাহিনীকে দৃঢ় মনোবল নিয়ে তাদের অবস্থান রক্ষা করতে বাধ্য করছিলাম। এছাড়া আর কোন বিকল্প পথ ছিলোনা। কোন কোন সময় মনে হয়েছে সৈন্যদের আমরা গিনিপিগের মতো ব্যবহার করছি। ট্রেঞ্চে বসে থেকে কেউই প্রাণ হারাতে চায় না। তারা যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধই করতে চেয়েছিলো, কিন্তু প্রচলিত যুদ্ধের সুযোগ ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছিলো।

২০শে এপ্রিল পাক-সেনাদের দুটি ব্যাটালিয়ন সর্বশক্তি দিয়ে মিরেশ্বরাইয়ের ওপর প্রচণ্ড হামলা চালায়। চূড়ান্ত আঘাত হানার পূর্বে প্রায় ২৪ ঘণ্টাই পাক কামানগুলো আমাদের অবস্থানের উপর আঘাত হেনে চলছিলো। মাটি খোঁড়ার সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক জিনিসপত্র না থাকায় তেমন শক্তিশালী বাংকারও আমরা তৈরী করতে পারিনি। অনেক সময়ই সৈন্যদের বেয়োনেট দিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখেছি। উপরের আচ্ছাদন তৈরীর জিনিসপত্রও ছিলো না। তাই আমাদের বাংকার এবং ট্রেঞ্চগুলো কামানের গোলায় ভেঙ্গে পড়ছিলো, খোলা জায়গায় আমাদের সৈন্যরা শত্রুর সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছিলো। যা আশংকা করেছিলাম, শত্রুরা এই সময় এয়ার বার্স্ট শেল নিক্ষেপ করতে শুরু করে। আমাদের সৈন্যরা এই ধরনের হামলার সাথে পরিচিত ছিলো না। হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় অবস্থান থেকে তারা পেছনে হটতে শুরু করে। শত্রু পক্ষেও হতাহত কম হচ্ছিলো না। পরপর তিন দফা আক্রমণে ওদেরকে শতাধিক সৈন্য হারাতে হয়।

আমাদের ট্যাংক বিধ্বংসী গোলায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আটটি যান প্রায় তিন ঘণ্টা যাবত জ্বলতে থাকে। মটরযানে অবস্থানরত বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্যও জ্বলন্ত দগ্ধ হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমাদের সৈন্যরা পরবর্তী অবস্থান মস্তাননগরে প্রতিরক্ষাব্যুহ গড়ে তোলে। এই সময়ে শত্রু পক্ষের আক্রমণকারী সৈন্যদের সাথে কয়েকটি ট্যাংক এসে যোগ দিলে সংঘর্ষ তীব্রতর হয়ে ওঠে।

আমাদের সৈন্যরা মস্তাননগরে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার পূর্বেই সেখানে শত্রুর কামানের গোলা এসে পড়তে থাকে। বাঙালী সেনাদের তখন খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা যাচ্ছিলো না। এমনকি গোলাবারুদের যোগান দেয়া কঠিন হয়ে উঠেছিলো। তবু তারা শেষ গুলীটি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘাঁটি আগলে থাকে। শত্রুরা তখন ট্যাংক সামনে নিয়ে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। মস্তাননগরের অবস্থান টিকিয়ে রাখা দুষ্কর হয়ে উঠলে আমি করেরহাটের কয়েক মাইল দক্ষিণে হিংগুলী এলাকায় সৈন্যদের নিয়ে যেতে মনস্থ করি। এখানে পূর্ব পশ্চিম বরাবর একটি খাল থাকায় শত্রুদের দ্রুত অগ্রগমন সম্ভব ছিলোনা। অগ্রসরমান শত্রুর ট্যাংকের অগ্রযাত্রা থামাতে হলে খালের উপর প্রধান সেতুটি ধ্বংস করা দরকার।

তখন প্রায় মধ্য রাত। আমাদের সৈন্যরা সবাই ক্লান্ত অবসন্ন। তবু তারা দ্রুত হিংগুলীতে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গড়ে তোলে এবং পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। রাতে কারো চোখে ঘুম ছিলোনা। পাকিস্তানীরা সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিলো। হিংগুলীর অদূরেই আমরা তাদের যানবাহন

এবং ট্যাংকের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আমি সেতুটি ধ্বংসের কাজে হাত দিলাম। আমাকে সহায়তা করছিলো বিএসএফ-এর মেজর প্রধান।

রাত ২টা নাগাদ সেতুটি ধ্বংস করার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হলো এবং মেজর প্রধান সেই রাতেই সাবরুমের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি তিরিশ সেকেণ্ডের একটি ফিউজে আগুন ধরিয়ে দ্রুত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিই। এক এক করে সেকেণ্ড অতিবাহিত হয়, তারপর মিনিট। কিন্তু বিস্ফোরণ আর ঘটলো না। আসলে ফিউজটি খারাপ ছিলো। আমার সঙ্গে অতিরিক্ত যে একটি ফিউজ ছিলো তাও দেখা যায় অকেজো। ভোর হতে আর মাত্র দু'ঘণ্টা বাকি। এরই মধ্যে সেতু আমাদের ধ্বংস করতেই হবে। তখন আমার সামনে হিংগুলীর ২৫ মাইল দূরের রামগড় থেকে ফিউজ নিয়ে আসা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিলো না। ট্যাংক এবং অন্যান্য গাড়ী ক্রমশঃ নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছিলো। রাত তখন ৩টা। আমি তখন মরিয়া হয়ে ফিউজের জন্য খবর পাঠালাম। আমাদের নিজস্ব কোন বিস্ফোরকের মজুত ছিলো না। ফলে সম্পূর্ণভাবে বিএসএফ-এর ওপর নির্ভর করতে হতো।

রাতে আমরা দ্রুত হিংগুলী ঘাঁটিতে অবস্থান নিয়েছিলাম, ভোরে আবার তার কিছুটা পুনর্বিন্যাস করার দরকার হবে। ভয় ছিলো এই পুনর্বিন্যাসের আগেই শত্রুরা এসে না পড়ে। সেতু ধ্বংস করা যায়নি, ট্যাংক এসে পড়লে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করবে। ইতিমধ্যে রামগড় ফেরার পথে মেজর প্রধান খবর পান যে, সেতুটি ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। এই সংবাদে তিনি দ্রুত কয়েকটি ফিউজ নিয়ে পুনরায় আমাদের হিংগুলী অবস্থানে আসেন। রাত তখন পৌনে ৪টা। এসময় রামগড়ের দিক থেকে অগ্রসরমান একটি জীপের আলো আমার নজরে পড়ে। মেজর প্রধান জীপ থেকে দৌড়ে এসে আমাকে একটি ফিউজ দিয়ে বলেন এটা আশা করি কাজ করবে। না, সেটাতেও কোন কাজ হলো না। শেষ পর্যন্ত চতুর্থ ফিউজে কাজ হলো।

কর্ণবিদারী বিস্ফোরণের আওয়াজ কয়েক মাইল দূর থেকেও শোনা গেলো। সেতুটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়াতে আমাদের দুশ্চিন্তার অবসান হলো। আমরা দু'জনে আনন্দে বলে উঠলাম, 'চমৎকার'।

শত্রু সৈন্যদের মূল দল তখন মাত্র মাইল খানেক দূরে। এদের পেছনেই ছিলো আর্টিলারী। দিনের প্রথম আলোয় আমরা তাড়াতাড়ি ঘাঁটি পুনর্বিন্যাসের কাজে হাত দেই।

এই সংকটময় মুহূর্তে কুমিল্লা সেক্টর থেকে পাওয়া আমাদের একটি নিয়মিত কোম্পানীকে অন্য এক যুদ্ধ ফ্রণ্টে চলে যেতে হয়। আমার কাছে হিংগুলীতে

২০শে এপ্রিল পাক-সেনাদের দুটি ব্যাটালিয়ন সর্বশক্তি দিয়ে মিরেশ্বরাইয়ের ওপর প্রচণ্ড হামলা চালায়। চূড়ান্ত আঘাত হানার পূর্বে প্রায় ২৪ ঘণ্টাই পাক কামানগুলো আমাদের অবস্থানের উপর আঘাত হেনে চলছিলো। মাটি খোঁড়ার সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক জিনিসপত্র না থাকায় তেমন শক্তিশালী বাংকারও আমরা তৈরী করতে পারিনি। অনেক সময়ই সৈন্যদের বেয়োনেট দিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখেছি। উপরের আচ্ছাদন তৈরীর জিনিসপত্রও ছিলো না। তাই আমাদের বাংকার এবং ট্রেঞ্চগুলো কামানের গোলায় ভেঙ্গে পড়ছিলো, খোলা জায়গায় আমাদের সৈন্যরা শত্রুর সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছিলো। যা আশংকা করেছিলাম, শত্রুরা এই সময় এয়ার বার্স্ট শেল নিক্ষেপ করতে শুরু করে। আমাদের সৈন্যরা এই ধরনের হামলার সাথে পরিচিত ছিলো না। হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় অবস্থান থেকে তারা পেছনে হটতে শুরু করে। শত্রু পক্ষেও হতাহত কম হচ্ছিলো না। পরপর তিন দফা আক্রমণে ওদেরকে শতাধিক সৈন্য হারাতে হয়।

আমাদের ট্যাংক বিধ্বংসী গোলায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আটটি যান প্রায় তিন ঘণ্টা যাবত জ্বলতে থাকে। মটরযানে অবস্থানরত বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্যও জ্বলন্ত দগ্ধ হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমাদের সৈন্যরা পরবর্তী অবস্থান মস্তাননগরে প্রতিরক্ষাব্যুহ গড়ে তোলে। এই সময়ে শত্রু পক্ষের আক্রমণকারী সৈন্যদের সাথে কয়েকটি ট্যাংক এসে যোগ দিলে সংঘর্ষ তীব্রতর হয়ে ওঠে।

আমাদের সৈন্যরা মস্তাননগরে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার পূর্বেই সেখানে শত্রুর কামানের গোলা এসে পড়তে থাকে। বাঙালী সেনাদের তখন খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা যাচ্ছিলো না। এমনকি গোলাবারুদের যোগান দেয়া কঠিন হয়ে উঠেছিলো। তবু তারা শেষ গুলীটি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘাঁটি আগলে থাকে। শত্রুরা তখন ট্যাংক সামনে নিয়ে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। মস্তাননগরের অবস্থান টিকিয়ে রাখা দুষ্কর হয়ে উঠলে আমি করেরহাটের কয়েক মাইল দক্ষিণে হিংগুলী এলাকায় সৈন্যদের নিয়ে যেতে মনস্থ করি। এখানে পূর্ব পশ্চিম বরাবর একটি খাল থাকায় শত্রুদের দ্রুত অগ্রগমন সম্ভব ছিলোনা। অগ্রসরমান শত্রুর ট্যাংকের অগ্রযাত্রা থামাতে হলে খালের উপর প্রধান সেতুটি ধ্বংস করা দরকার।

তখন প্রায় মধ্য রাত। আমাদের সৈন্যরা সবাই ক্লান্ত অবসন্ন। তবু তারা দ্রুত হিংগুলীতে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গড়ে তোলে এবং পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। রাতে কারো চোখে ঘুম ছিলোনা। পাকিস্তানীরা সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিলো। হিংগুলীর অদূরেই আমরা তাদের যানবাহন

এবং ট্যাংকের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আমি সেতুটি ধ্বংসের কাজে হাত দিলাম। আমাকে সহায়তা করছিলো বিএসএফ-এর মেজর প্রধান।

রাত ২টা নাগাদ সেতুটি ধ্বংস করার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হলো এবং মেজর প্রধান সেই রাতেই সাবরুমের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি তিরিশ সেকেণ্ডের একটি ফিউজে আগুন ধরিয়ে দ্রুত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিই। এক এক করে সেকেণ্ড অতিবাহিত হয়, তারপর মিনিট। কিন্তু বিস্ফোরণ আর ঘটলো না। আসলে ফিউজটি খারাপ ছিলো। আমার সঙ্গে অতিরিক্ত যে একটি ফিউজ ছিলো তাও দেখা যায় অকেজো। ভোর হতে আর মাত্র দু'ঘণ্টা বাকি। এরই মধ্যে সেতু আমাদের ধ্বংস করতেই হবে। তখন আমার সামনে হিংগুলীর ২৫ মাইল দূরের রামগড় থেকে ফিউজ নিয়ে আসা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিলো না। ট্যাংক এবং অন্যান্য গাড়ী ক্রমশঃ নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছিলো। রাত তখন ৩টা। আমি তখন মরিয়া হয়ে ফিউজের জন্য খবর পাঠালাম। আমাদের নিজস্ব কোন বিস্ফোরকের মজুত ছিলো না। ফলে সম্পূর্ণভাবে বিএসএফ-এর ওপর নির্ভর করতে হতো।

রাতে আমরা দ্রুত হিংগুলী ঘাঁটিতে অবস্থান নিয়েছিলাম, ভোরে আবার তার কিছুটা পুনর্বিন্যাস করার দরকার হবে। ভয় ছিলো এই পুনর্বিন্যাসের আগেই শত্রুরা এসে না পড়ে। সেতু ধ্বংস করা যায়নি, ট্যাংক এসে পড়লে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করবে। ইতিমধ্যে রামগড় ফেরার পথে মেজর প্রধান খবর পান যে, সেতুটি ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। এই সংবাদে তিনি দ্রুত কয়েকটি ফিউজ নিয়ে পুনরায় আমাদের হিংগুলী অবস্থানে আসেন। রাত তখন পৌনে ৪টা। এসময় রামগড়ের দিক থেকে অগ্রসরমান একটি জীপের আলো আমার নজরে পড়ে। মেজর প্রধান জীপ থেকে দৌড়ে এসে আমাকে একটি ফিউজ দিয়ে বলেন এটা আশা করি কাজ করবে। না, সেটাতেও কোন কাজ হলো না। শেষ পর্যন্ত চতুর্থ ফিউজে কাজ হলো।

কর্ণবিদারী বিস্ফোরণের আওয়াজ কয়েক মাইল দূর থেকেও শোনা গেলো। সেতুটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়াতে আমাদের দুশ্চিন্তার অবসান হলো। আমরা দু'জনে আনন্দে বলে উঠলাম, 'চমৎকার'।

শত্রু সৈন্যদের মূল দল তখন মাত্র মাইল খানেক দূরে। এদের পেছনেই ছিলো আর্টিলারী। দিনের প্রথম আলোয় আমরা তাড়াতাড়ি ঘাঁটি পুনর্বিন্যাসের কাজে হাত দেই।

এই সংকটময় মুহূর্তে কুমিল্লা সেক্টর থেকে পাওয়া আমাদের একটি নিয়মিত কোম্পানীকে অন্য এক যুদ্ধ ফ্রণ্টে চলে যেতে হয়। আমার কাছে হিংগুলীতে

তখন এক শ'র বেশি লোক ছিলো না, যাদের অধিকাংশই ইপিআর, পুলিশ ও মুজাহিদ। আমাদের সৈন্যদের বেশির ভাগই মহালছড়ি এবং নারায়ণহাট এলাকার সংঘর্ষে ব্যাপৃত ছিলো। আমাদের হিংগুলীর অগ্রবর্তী অঞ্চল ছিলো প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল রক্ষা করা অপরিহার্য। কুমিল্লা সেক্টরের কোম্পানীর কাছে কিছু ভালো অস্ত্র ছিলো তা তারা নিয়ে গেছে। আমাদের ছিলো মাত্র দুটি লাইট মেশিন গান। বাকি গুলো ছিলো সবই সেকেলে ৩০৩ রাইফেল। একটি তিন ইঞ্চি মর্টার পাওয়া গেলেও সেটিও আপন খেয়ালে চলতো। আমি বুঝতে পারছিলাম মাত্র একশ সৈন্য নিয়ে দুই ব্যাটালিয়ন শত্রু সৈন্যকে নিশ্চয়ই বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবেনা। নারায়নহাটে সৈন্য চেয়ে আমি যে খবর পাঠিয়ে ছিলাম তাদের আসতে অন্তত দুদিন লাগবে। এখানে আমাকে এই দুদিন শত্রুদের ঠেকাতে হবে। শত্রুরা আমার আসল শক্তি সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও আভাস পেলে তৎক্ষণাৎই আক্রমণ করে বসতো। সেতুর পূর্বদিকে পাহাড়ী এলাকা পর্যন্ত প্রায় সমতল। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট টিবি, টিলা। সৈন্য চলাচলে এগুলো আড়াল হিসাবে কাজে লাগছিলো। এই সমতল এলাকাটির দৈর্ঘ্য ছিলো প্রায় দুই মাইল। সেতুর পশ্চিম দিকের এলাকা একেবারে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত আমাদের অরক্ষিত রাখতে হচ্ছিল। সৈন্য সংখ্যা বেশি না থাকায় আমি জনা তিরিশের মতো লোক নিয়ে তাদের দু'ভাগে ভাগ করি। এরপর দু'দলকে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে পাঠাই। উদ্দেশ্য ছিলো, তারা এমনভাবে চলাচল করবে যাতে দূর থেকে শত্রুরা বুঝতে পারে দুটি অঞ্চল জুড়েই আমরা প্রতিরক্ষা-মূলক অবস্থান গ্রহণ করেছি। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা সামনে এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় শুয়ে পড়ে এবং এমনভাবে হামাগুড়ি দিয়ে কোন মাঠ কিংবা ঝোপের পিছনে চলে আসতো যাতে শত্রুরা তাদের পিছনে হটে যাওয়া দেখতে না পায়। এখান থেকে উঠে আবার তারা বেশ একটু প্রকাশ্য ভাবেই আরেক জায়গায় যেতে থাকে। গোপনে পিছন দিকে এবং প্রকাশ্যে সামনের দিকে যাওয়ার এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েক বার করে চলে। এতে শত্রুদের ধারণা জন্মায় যে এক একটি স্থানেই পঞ্চাশ ষাট জন করে বাঙালী সেনা রয়েছে অথচ আমাদের ছিলো মাত্র পনেরজনের মতো। বিকাল পর্যন্ত আমরা কাজটি চালিয়ে যেতে থাকি। দূর থেকে কেউ এ দৃশ্য দেখলে নির্ঘাত মনে করবে সেতুর উভয় পার্শ্বে আমাদের পনের শত থেকে দুই হাজার সৈন্য প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছে।

এই অবস্থায় আমাদের বাদবাকি সৈন্যরা সেতুর নিকট রাস্তা কভার করে সুবিধাজনক স্থান গুলোতে প্রতিরক্ষাব্যুহ গড়ে তুলতে থাকে। সন্ধ্যা নাগাদ

আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। পদ্ধতিটি কিছু সময়ের জন্যে অবশ্যই কাজে লেগেছিলো। রাতে আমাদের সারা সম্মুখভাগ জুড়ে শত্রুর কামানের গোলা বর্ষণ শুরু হয়। দুই দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে, তবু তারা এগিয়ে এসে আক্রমণ করলো না। এদিকে আমার দলেও নতুন সৈন্য এসে পৌঁছায়নি। এ সময় এক নতুন বিপদ দেখা দিলো। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিপুল সংখ্যক সৈন্য এসে পড়ায় শত্রুরা প্রতিটি রণাঙ্গনে আরো বেশি করে সৈন্য পাঠাতে লাগলো। ১২০ এম. এম. মর্টার সহ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি পুরো ব্যাটালিয়ন ফটিকছড়ি নারায়ণহাট দিয়ে হিয়াকুর দিকে এগোয়। এদের অগ্রাভিযানের ফলে হিয়াকু এবং করেরহাট হিংগুলী এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে আমাদের সকল সৈন্য আটকা পড়ার আশংকা দেখা দেয়। এই অবস্থায় আমি নারায়ণহাট থেকে সৈন্য পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করি।

১৭
যুদ্ধের বিস্তৃতি

দিনাজপুর

ইপিআর-এর দিনাজপুর সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সও ছিলো দিনাজপুরে। এর অধীনে ৮ নম্বর উইং ছিলো দিনাজপুরে, ৯ নম্বর উইং ঠাকুরগাঁয়ে এবং ১০ নম্বর উইং ছিলো রংপুরে। সেক্টরের অধিকাংশ অফিসারই ছিলো অবাঙালী।

১৯৭০-এর নির্বাচনের সময় থেকেই ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেণ্টের (এফ এফ) একটি কোম্পানী দিনাজপুর সার্কিট হাউসে অবস্থান করছিলো। শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের পর দিনাজপুরে পাকিস্তানী এফ এফ কোম্পানীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। আরও লক্ষ্য করা যায়, তারা তাদের অস্ত্রের মুখ ইপিআর হেডকোয়ার্টারের দিকে ঘুরিয়ে বসিয়েছে।

১৯৭১ এর ২৮শে মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানীরা দিনাজপুর আক্রমণ করেনি। ২৮শে মার্চ বেলা ৩টার দিকে ২৬ এফ এফ রেজিমেণ্টের সৈন্যরা হঠাৎ ইপিআর হেডকোয়ার্টারের ওপর মর্টারের আক্রমণ শুরু করে। বাঙালী সৈন্যরা কিন্তু এতে মোটেও বিস্মিত হয়নি। কারণ তারা আগেই ওদের পক্ষ থেকে হামলার আশংকা করছিলো। ইপিআর-এর বাঙালী সৈনিকেরা সাথে সাথে আক্রমণের জবাব দেয়। বাঙালী সৈন্যরা মর্টার প্লাটুন নিয়ে নদীর তীরে প্রতিরক্ষাব্যূহ স্থাপন করে। ইপিআর হাবিলদার মুসলিম দ্রুত শহরে গিয়ে বেসামরিক লোকদের সাহায্য কামনা করেন। বাঙালী ইপিআর'দের যারা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ডিউটিতে শহরে ছিলো তারাও পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য হেডকোয়ার্টারে চলে আসে। হাজার হাজার লোকও ইপিআর হেডকোয়ার্টারের দিকে ছুটে আসে। ইপিআর হাবিলদার আবু সাঈদ অস্ত্রশালার দরজা ভেঙ্গে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ইপিআর সৈনিকদের হাতে তুলে দেয়। হাবিলদার নাজিম, সিপাই আনোয়ার, মোহাম্মদ কায়কাউস এবং অন্যরা ট্যাংক বিধ্বংসী কামান নিয়ে সার্কিট হাউসের পাকিস্তানীদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। তিন দিন অবিরাম যুদ্ধ চলে। যুদ্ধ শুরুর সময় বাঙালী সৈন্যদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য

দিনাজপুরে কোন বাঙালী অফিসার অথবা সিনিয়র জেসিও ছিলেন না। ইপিআর সেনারা নিজ থেকেই অস্ত্র নেয় এবং তারাই জনসাধারণকেও সংগঠিত করে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। বাঙালী সেনাদের যুদ্ধের প্রথম দিকে নেতৃত্বে ছিলেন হাবিলদার ভুলুমিয়া, হাবিলদার কামাল, হাবিলদার বদিউর রহমান, নায়েক আবদুল হাকিম প্রমুখ। এঁরা বলিষ্ঠ উদ্যোগ না নিলে দিনজাপুরে বহু সংখ্যক ইপিআর এবং বেসামরিক লোককে প্রাণ হারাতে হতো।

পরদিন সকালে অয়্যারলেস হেডকোয়ার্টার থেকে দিনাজপুর সেক্টরের সকল ফাঁড়িতে পাকিস্তানীদের হামলা এবং বাঙালীদের প্রতিশোধ গ্রহণের সংবাদ জানিয়ে দেয়া হয়। তিন দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ইপিআর এবং জনসাধারণ দিনাজপুর শহর মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

এ সময় সৈয়দপুরে ৩ বেঙ্গল রেজিমেণ্টও পাকিস্তানীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। আমাদের কিছু সংখ্যক সৈন্য এবং দু'জন অফিসার সেখান থেকে আত্মরক্ষা করে এসে দিনাজপুরের ইপিআর সদস্যদের সঙ্গে যোগ দেন। ৩০শে মার্চ ইপিআর এর ৯ উইংয়ের সৈন্যরাও রংপুর থেকে এসে দিনাজপুরের সেনাদের সাথে মিলিত হয়।

৪ঠা এপ্রিল এই এলাকার বাঙালী অফিসার এবং জেসিওরা ভাতগাঁও সেতুর কাছে এ বৈঠকে মিলিত হয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। বৈঠকে তারা বাঙালী সৈন্যদের প্লাটুন এবং কোম্পানী শক্তিতে বিভক্ত করে সকল ফ্রণ্টে শত্রুর অভিযানকে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেন। ৫ই এপ্রিল থেকে বাঙালী সেনাদের এই সব অবস্থানের ওপর পাকিস্তানী অগ্রবর্তী দলগুলোর হামলা শুরু হয়। আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলোর ওপর শত্রুর কামান এবং ট্যাংকের গোলা এসে পড়তে থাকে।

৬ই এবং ৭ই এপ্রিল আমাদের নিলফামারী অবস্থান আক্রান্ত হয়। এখানে ৮ জন পাকিস্তানী মারা গেলেও আমাদের সৈন্যদের বারংবার হামলার মুখে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হতে হয়।

৭ই এপ্রিল মেজর নিজামের নেতৃত্বে বাঙালী সৈন্যরা পার্বতীপুরের পাকিস্তানী অবস্থানের ওপর আত্মঘাতী আক্রমণ চালায়। আগে থেকে কামান বা মর্টারের গোলা দ্বারা শত্রুব্যূহ কিছুটা দুর্বল না করেই তারা সরাসরি আক্রমণ করে বসে। ফলে অনেক মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারান এবং পার্বতীপুর শত্রুদের দখলে থেকে যায়। এখানকার অবশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধারা সরে এসে হাবড়ায় অবস্থান গ্রহণ করে। পাকিস্তানীরা ১২ই এপ্রিল হাবড়ার ওপর আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানী ট্যাংকের আক্রমণে হাবড়ার পতন ঘটে।

৭ই এবং ৮ই এপ্রিল পাকিস্তানীরা আমাদের ভূষিরবন্দর অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়, এখানেও পাকিস্তানীরা ট্যাংক ব্যবহার করে। মুক্তিযোদ্ধারা স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং দিনাজপুর শহরের দশ মাইল দূরে তেরাস্তার মাথায় নতুন অবস্থান গড়ে তোলে। ট্যাংক এবং গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানী সৈন্যরা একে একে আমাদের নিলফামারী বন্দর, ভূষিরবন্দর এবং অন্যান্য এলাকায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিচ্ছিলো। ১০ই এপ্রিল আমাদের তেমাথা সড়কের অবস্থানের ওপর ওরা আঘাত হানে। এখানে ওদের সঙ্গে ট্যাংক এবং কামান ছিলো। এই মোড়টি ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সৈয়দপুর এবং রংপুর থেকে এখান দিয়েই দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় যাওয়ার পথ। কার্যত উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের সংযোগ কেন্দ্র ছিলো এটি।

তেমাথা সড়কের প্রচণ্ড লড়াইয়ে উভয় পক্ষেই বিপুল সংখ্যক হতাহত হয়। ট্যাংক বিধ্বংসী কামানের ল্যান্স নায়েক মুস্তাফিজুর রহমান এবং ড্রাইভার সাত্তার শত্রুপক্ষের ট্যাংক এবং কামানের প্রচণ্ড খোলাবৃষ্টির মধ্যে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে চলছিলো। শত্রুর গোলায় আহত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত তারা দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য লড়াই করতে থাকে। শত্রুর হাতে তেমাথা সড়কের পতনের পর উত্তরাঞ্চলে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যত ভেঙ্গে পড়ে। আরো কয়েকটি ছোট খাট যুদ্ধের পর ১৬ই এপ্রিল নাগাদ পাকিস্তানীরা দিনাজপুরে তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে।

ঠাকুরগাঁ

আরো উত্তরে ঠাকুরগাঁয়ে ২৮শে মার্চ রাত ১০টা থেকে বাঙালী ইপিআর সেনারা পাকসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। ৩০শে মার্চ বিকাল ৩টা নাগাদ ৯ ইপিআর উইংয়ের সেনারা ঠাকুরগাঁয়ের পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাভূত করে। ৯ উইংয়ের কমাণ্ডার মেজর মোহাম্মদ হোসেন এবং তার আরও কয়েকজন সহ-যোদ্ধা লড়াইয়ে প্রাণ হারান। এরপর ঠাকুরগাঁ এলাকায় পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠন এবং যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন, সুবেদার আতাউল হক, সুবেদার হাফিজ, নায়েক সুবেদার মতিউর রহমান প্রমুখ।

৩১শে মার্চ ৯ উইংয়ের কয়েকটি কোম্পানী বীরগঞ্জ, শালবাগান এবং ভাত-গাঁও অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। ওই তারিখ থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত ৯ উইংয়ের সেনারা দিনাজপুরের সেনাদের সাথে বিভিন্ন এলাকায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে। পাকিস্তানীদের ট্যাংক ও কামানের প্রচণ্ড গোলার আঘাতে এই অঞ্চলে আমাদের অবস্থান ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলে এই সব সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

১৬ই এপ্রিল নাগাদ পঞ্চগড়ের শেষ অবস্থানও শত্রুর দখলে চলে যায়। ইত্যবসরে জয়গঞ্জ, ঝাড়বাড়ী, দেবীগঞ্জ, ভাতুগাঁও, খানসামা, ভূষিরবন্দর প্রভৃতি স্থানেরও একে একে পতন ঘটে। এই এলাকার যুদ্ধে ইপিআর বাহিনীর সঙ্গে বাঙালী অফিসারদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন নজরুল, ক্যাপ্টেন আশরাফ, ক্যাপ্টেন আনোয়ার, লেফটেন্যাণ্ট মোখলেস, লেফটেন্যাণ্ট রফিক প্রমুখ। পলাশ বাড়ীর যুদ্ধে লেঃ রফিক পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী হন এবং নির্মম নির্যাতনের পর তাঁকে হত্যা করা হয়।

বরিশাল

দক্ষিণে বরিশালে তখন সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি চলছিলো। সাঁজোয়া বাহিনীর অফিসার মেজর জলিল ছিলেন তখন ছুটিতে। জনসাধারণ তাঁকে বরিশাল নিয়ে এসে এই অঞ্চলের সামরিক কমাণ্ড গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে। দেরি না করে তিনি উপস্থিত আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ, ছাত্র ও জনসাধারণের ভেতর থেকে লোক নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তোলেন এবং তাদেরকে যুদ্ধের কিছু ট্রেনিং দেন। জলিল এখানে লেঃ হুদা, লেঃ মেহেদী এবং লেঃ নাসের প্রমুখ কয়েকজন অফিসারকেও পেয়ে যান। এদিকে লেঃ জিয়া, পিরোজপুরের ছাত্র, পুলিশ, আনসার এবং ইপিআর সদস্যদের নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আরেকটি দল গড়ে তুলছিলেন। পরে এই দল মেজর জলিলের দলের সংগে মিলিত হয়।

খুলনা বেতার কেন্দ্র মুক্ত করার জন্য মেজর জলিল ৪ঠা এপ্রিল পিরোজপুর হয়ে বাগেরহাটের পথে রওনা হন। ৭ই এপ্রিল রাতে নায়েব সুবেদার সিদ্দিকের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা নদী পার হয়ে খুলনা বেতার কেন্দ্রের ওপর আক্রমণ চালায়। সংঘর্ষে ২০ জন পাকসেনা নিহত হলেও মুক্তিযোদ্ধাদের এ আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে যায়। এখানে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

১৭ই এপ্রিল পাকিস্তান বিমান বাহিনী বরিশাল শহরের ওপর হামলা করে। এই সময় মেজর জলিল অস্ত্রশস্ত্রের তীব্র অভাব অনুভব করায় অস্ত্রসংগ্রহে লেঃ হুদাকে সংগে নিয়ে ভারতে চলে যান। তিনি লেঃ জিয়া, লেঃ নাসের এবং লেঃ মেহেদীকে বরিশাল, পটুয়াখালী এবং খুলনা এলাকা প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে যান। কিন্তু প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর পাকিস্তানীরা ২৫শে এপ্রিল বরিশাল দখল করে নেয়। মেজর জলিল এই সময়ের মধ্যে ভারত থেকে ফিরতে পারেননি।

মে মাসের ৫ তারিখে তিনি দুটি লঞ্চে ৪০ জন যোদ্ধা এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারত থেকে বরিশাল মুক্ত করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। গাবরার নিকট কপোতাক্ষ নদীতে পাকিস্তানী নৌবাহিনীর গানবোট হঠাৎ লঞ্চ দুটির ওপর আক্রমণ করে বসে।

আক্রমণে দুটি লঞ্চই ডুবে যায়। পাকিস্তানীরা ২৬ জন বাঙালী সৈনিককে বন্দী করে। জলিল বরিশাল ফিরতে না পারায় শহরটি মুক্ত করার পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

এ সময়ে দেশের সকল অঞ্চলেই ইপিআর, পুলিশ, আনসার, ছাত্র এবং জনসাধারণ পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলছিলো। প্রায় সর্বত্রই ছিলো একই দৃশ্য। কেবল চট্টগ্রামেই ছিলো ব্যতিক্রমধর্মী। চট্টগ্রামেই শুধু আমরা ইপিআর, পুলিশ, ছাত্র ও জনসাধারণকে নিয়ে পাকিস্তানীদের ওপর প্রথম আক্রমণ চালিয়েছিলাম। দেশের অন্যান্য স্থানে কিন্তু পাক সেনারাই জনসাধারণের ওপর প্রথম বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ হামলা শুরু করে। ফলে সারা দেশে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ আন্দোলনও গড়ে ওঠে। কিন্তু জনগণের এই প্রতিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। এর পেছনে অনেক গুলো কারণ ছিলো। যেমন পাকিস্তানীদের উন্নত অস্ত্র সম্ভার, দ্রুত খবর আদান প্রদানের সুবিধা এবং পরিকল্পিত পরিবহণ ব্যবস্থা ছিলো। পক্ষান্তরে আমাদের হাতে ছিলো সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র। দ্রুত খবর আদান প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিলো না। সংগ্রামের সমন্বিত পরিকল্পনাও ছিলো অনুপস্থিত। ফলে যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় আমরা দু'এক জায়গায় সুবিধা করতে পারলেও ক্রমান্বয়ে আমাদেরকে পেছনে হটতে হয়। আমরা তখন গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধের দিকে ঝুঁকে পড়ি। বর্বর শত্রুকে ঘায়েল করতে জনসাধারণের সহযোগিতায় আমাদের গেরিলা তৎপরতাকে জোরদার করে তুলতে হয়।

১৮
পশ্চিম ফ্রন্টে বিপর্যয়

পশ্চিম ফ্রন্টের যুদ্ধের গতিধারায় তখন দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিলো। কিছু সময়ের জন্য যশোর ক্যান্টনমেন্ট আমাদের সৈন্যদের হাতে কার্যতঃ অবরুদ্ধ ছিলো। কিন্তু শত্রুর ওপর আঘাত হানার জন্য মেজর ওসমান প্রয়োজনীয় অস্ত্র পাচ্ছিলেন না।

অন্যদিকে অবরুদ্ধ থাকলেও যশোর ক্যান্টনমেন্টে নতুন নতুন সৈন্য যোগ হচ্ছিলো। বেড়ে চলছিলো তাদের অস্ত্রশস্ত্রের মজুত। সি-১৩০ পরিবহণ বিমানেই সৈন্য এবং অস্ত্র আনা হচ্ছিলো। চালনা পোর্ট হয়ে ঢাকার সঙ্গে সংযোগ বহনকারী সড়ক পথেও অস্ত্র এবং সৈন্য পাঠাবার চেষ্টা চলছিলো।

পাক সেনাদের অবতরণ ঠেকানোর জন্য গোয়ালন্দে আমাদের কিছু সৈন্য পাঠানো হয়। কিন্তু নগরবাড়ীতে কাউকে পাঠানো সম্ভব হয়নি। যানবাহনের সংকটই ছিলো এর মুখ্য কারণ। ১১ই এপ্রিল ওসমানের চুয়াডাঙ্গা হেড কোয়ার্টারে পাকিস্তানীরা স্ট্র্যাফিং ও বোমা বর্ষণ করে। ১২ই এপ্রিল পাকিস্তানীরা গোয়ালন্দে নামার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এই রাতেই শত্রুরা প্রায় বিনা বাধায় নগরবাড়ীতে নেমে পড়ে।[১১] এবং সঙ্গে সঙ্গে পাবনার দিকে অগ্রসর হয়। ১৩ই এপ্রিল নাগাদ শত্রুরা পাবনা অতিক্রম করে। তারা পাকশী সেতু হয়ে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। ফলে এই সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের পেছনের অংশের বিপদ দেখা দেয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা যাতে পাকশী সেতু ব্যবহার করতে না পারে সে জন্য ওসমান তাড়াতাড়ি কিছু সৈন্য পাঠান। ১৩ই এপ্রিল দিবাগত রাতে পাকশী সেতুর কাছে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়। ওসমানের সেনারা বীর বিক্রমে লড়াই করলেও তারা অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন। এবং নতুন কোন সৈন্য পাচ্ছিলো না। নিঃশেষিত গোলাবারুদের অভাবও পূরণ হচ্ছিলো না। পরদিন সকাল হতে না হতেই মুক্তিযোদ্ধাদের স্থানটি পরিত্যাগ করতে হয়। তবে যাবার আগে তারা সেতুর আংশিক ক্ষতি করে যায়। ফলে সেতুটি ট্রেন চলাচলের অনপযুক্ত হয়ে পড়ে।

১৪ই এপ্রিল শত্রুরা ভেড়ামারায় পৌঁছে যায়। শত্রুদের অগ্রযাত্রার লক্ষ্য ছিল কুষ্টিয়া ও যশোর। এই দলের সাফল্যে অবরুদ্ধ যশোর ক্যান্টনমেন্টের সৈন্যরা পুনর্জীবন লাভ করে। তারা ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে অপর দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সচেষ্ট হয়। কামান এবং বিমানের গোলাগুলীর ছত্রছায়ায় পাকিস্তানীরা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। তখন পর্যন্ত ওসমান মাত্র নতুন কয়েকটি ৩০৩ রাইফেল, দুটি এল এম জি এবং দুটি মর্টার লাভ করেছিলো। মাত্র একটি কোম্পানীর অস্ত্রের প্রয়োজন মেটাবার জন্যও এগুলো যথেষ্ট ছিলোনা।

পক্ষান্তরে শত্রুরা প্রায় দুই ব্রিগেড শক্তি নিয়ে লড়াই করছিলো। সামনে পেছনে দুদিক থেকেই শত্রুর সুপরিকল্পিত চাপের মুখে ওসমান পরবর্তী বিকল্প অবস্থানে সরে যেতে বাধ্য হন। চারদিক থেকে হামলা শুরু হলে ওসমান ১৫ই এপ্রিল তার হেড কোয়ার্টার চুয়াডাঙ্গা থেকে মেহেরপুর স্থানান্তর করে মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বিন্যস্ত করেন। কিন্তু তিনি ১৯শে এপ্রিল এই হেড কোয়ার্টার পুনরায় সীমান্ত ফাঁড়ি ইছাখালীতে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হন।[১২]

শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমাদের বীর সেনাবাহিনীরা এই ভাবে শত্রুর ওপর সমানে আঘাত হেনে চলছিলো। ফলে শত্রুকেও জানমালের ব্যাপক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। কিন্তু লোকজন এবং অস্ত্রবলে অনেক বেশি শক্তিশালী শত্রু পক্ষ ক্ষতি সত্যেও ক্রমেই সাফল্যের সঙ্গে সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ২৩শে এপ্রিল নাগাদ যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনা পাকিস্তানীদের করতলগত হয়। আমাদের শেষ অবস্থান ছিলো বেনাপোলের ছয় মাইল পূর্বে কাগজপুকুরে। এখানে ওসমান সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

২৪শে এপ্রিল সকালে এই অবস্থানের ওপরও শত্রুরা কামানের গোলাবর্ষণ শুরু করে। আমাদের একটি ইপিআর কোম্পানী পাকিস্তানীদের এই হামলা প্রতিরোধ করে চলছিলো।[১৩] সকাল ১১টায় দুই ব্যাটালিয়ন শত্রু সৈন্য বাঙালী-দের ওপর প্রচণ্ড হামলা চালায়। প্রথমটি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করা হয়। শত্রুর পক্ষে ক্ষতির পরিমাণ ছিলো ব্যাপক। কিন্তু তারপরই তারা আরো দুই দফা হামলা চালায়। পাকিস্তানীদের এ হামলাও প্রতিহত করা হয়। আমাদের মাত্র একটি মেশিনগানই অসংখ্য শত্রুসেনার প্রাণ সংহার করে। কিন্তু হঠাৎ করে একটি গুলীর আঘাতে মেশিনগানার আহত হন। ইপিআর হাবিলদার মুজিব তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড গুলী বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে গিয়ে সেই পরিত্যক্ত মেশিনগানটি তুলে নিয়েই গুলী চালাতে শুরু করেন। অমিত বিক্রমে তিনি একাই পুরো একটি শত্রু প্লাটুন নির্মূল করে দেন। এসময় তিনি দেখেন সামনের মাঠ অতিক্রম করে ইপিআর এর পোশাকে কিছু লোক এগিয়ে আসছে। আসলে এরা ছিলো

ছদ্মবেশী পাকিস্তানী। মুজিব যখন একথা বুঝতে পারলো তখন আর সময় ছিলো না। দুই প্লাটুন পাকিস্তানী সেনা হাবিলদার মুজিবকে ঘিরে ফেলে। দেশ মাতৃকার জন্য আরেকজন বাঙালী সৈনিক শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে করতে শত্রুর বেয়োনেটের আঘাতে সেদিন জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মেশিনগানটি হাতছাড়া হওয়ার পর আমাদের কাগজপুকুরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। বিকেল নাগাদ সব শেষ হয়ে যায়। ওসমানের সৈন্যরা ভারতীয় সীমান্তের দিকে সরে যায়। আর সে সাথেই পশ্চিম ফ্রন্টের যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

১৯
প্রার্থনা

কেরেরহাট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ওপর একটি ছোট ব্যবসায়কেন্দ্র। কিন্তু ২৪শে এপ্রিল এখানে মরুভূমির মতো নির্জনতা বিরাজ করছিলো। হিংগুলী সেতু এলাকা থেকে আমাদের মুক্তিবাহিনী এখানে সরে এসে নতুন প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তোলার পর তারা ছাড়া এখানে আর একটি প্রাণীও ছিলো না। কেরেরহাটের টেলিফোন পরিচালনাকারী একমাত্র বেসামরিক ব্যক্তি টেলিফোন অপারেটর আগের রাতে কাছেই কোন এক জায়গায় আর্টিলারীর গোলা বিস্ফোরিত হলে পালিয়ে যায়। কেরেরহাট থেকে একটি রাস্তা পাহাড়ের ভেতর দিয়ে রামগড় চলে গেছে। সবাই বুঝতে পেরেছিলো, কেরেরহাটের পতন ঘটলে রামগড় এবং এমনকি ফেনী নদীর শুভপুর সেতু এলাকা বিপদের সম্মুখীন হবে। এই পতনের ফলে রসদ সরবরাহ এবং রণকৌশলগত দিক থেকে শত্রুর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ওপর থেকেও আমাদের নিয়ন্ত্রণ হারাতে হবে। কিন্তু আমার সৈন্য সংখ্যা এতই অপর্যাপ্ত ছিলো যে, তা দিয়ে কেরেরহাট দখলে রাখাতো দূরের কথা, শত্রুদের অগ্রযাত্রা কিছু সময়ের জন্য ঠেকিয়ে রাখাও দুঃসাধ্য!

আমার সৈন্যরা ২৫শে মার্চ থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলো। এসব লড়াইয়ের বেশির ভাগই ছিলো প্রথমে শত্রুকে কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রেখে তারপরেই পশ্চাদপসরণ করা। এতে করে সব সময়ই এক জায়গায় কিছুক্ষণ থাকার পর কোন্ সময় পেছনে সরতে হবে, এই চিন্তা তাদেরকে পেয়ে বসে। যত নিশ্চয়তা আর উৎসাহই দেয়া হোক না কেন তাদের রণকৌশলের কোন পরিবর্তন হচ্ছিলো না। সৈন্যদের মধ্যে আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সে সময়ে প্রয়োজন ছিলো উন্নত ও কার্যকর অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দেয়া এবং অব্যাহত সহযোগিতা ও সৈন্য শক্তি বৃদ্ধি করা। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, এসব আশা করা তখন আমাদের কাছে বিলাসের নামান্তর হয়ে উঠেছিলো।

সেদিনই আমি সংবাদ পেলাম যে, মহালছড়িতে আমাদের সৈন্যরা শত্রুদের সাথে তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে এবং পাকিস্তানীদের পক্ষে দুই ব্রিগেড

মিজোও আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। আমাদের সৈন্যরা প্রায় চারদিক দিয়েই ঘেরাও হয়ে পড়েছে। সেখানে অতিরিক্ত সৈন্য শক্তি বৃদ্ধি না ঘটলে সেখান থেকে কোন নিরাপদ স্থানে সরে আসাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নারায়ণহাট এলাকা থেকেও একই ধরনের সংবাদ পেলাম। সেখানে শত্রুরা ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংযোগ স্থলগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলো। তিরিশজন সৈন্যকে পৃথক করে মহালছড়িতে পাঠানো হলো। এর ফলে করেরহাটের অবস্থান আরো দুর্বল এবং বিপজ্জনক হয়ে পড়লো। অবশিষ্ট ৭০ জনকে নিয়ে আমি প্রধান সড়ক জুড়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুললাম। পাহাড়ের দিকটা অরক্ষিতই রয়ে গেলো। আমি হিংগুলীতে যেরূপ কৌশল অবলম্বন করেছিলাম এখানেও ঠিক অনুরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করলাম। বেলা ৩টা পর্যন্ত সে প্রক্রিয়া অব্যাহত রইলো। তারপর খা খা রৌদ্দুরের মধ্যে চিড়া, গুড় এবং খালের ঘোলা পানি দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের পাট চুকিয়ে ফেললাম। অবশ্য এই খাবারটা আগের রাতের অনুরূপ খাবারের চেয়ে খেতে বেশি ভালো লেগেছিলো।

করেরহাটের অগ্রবর্তী এলাকা থেকে আমি আধ মাইল পেছনে স্কুল এলাকার দিকে ফিরছিলাম। আশে পাশে থেমে থেমে তখন কামানের গোলা পড়ছিলো। দুটি মেয়ে লোক দেখি ছুটাছুটি করছে। তিনটি কুঁড়েঘর মাটিতে মিশে গেছে। সেগুলো থেকে তখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছিলো। চারদিকে বারুদের গন্ধ। একটি বালককে দেখি রক্তের মধ্যে পড়ে আছে। শেলের টুকরা অংশ পেটের মধ্য দিয়ে ছেলেটিকে একেবারে দু'ভাগ করে ফেলেছে। তার বিস্ফোরিত চোখ দু'টিতে তখনো আতংকের চিহ্ন লেগেছিলো। 'দৌড়াদৌড়ি করোনা, শেলিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক জায়গায় শুয়ে থাকো', আমি তাদেরকে চিৎকার করে বললাম। তারা বিভ্রান্তের মতো আমার দিকে চেয়ে রইলো। ওদের আর আমার মাঝখানে শুকনো একটি নালা। ওদের মধ্যে একজন আমাকে বললো, "তুমি কে?" "আমরা তোমাদের সন্তান", জবাব দিয়ে আমি আবার স্কুলের দিকে পা বাড়ালাম। যেতে যেতে পেছন ফিরে দেখলাম, ওদের একজন লাশটির পাশে হাটু গেড়ে বসে পড়লো। তারপর কাঁপা কাঁপা দুটি হাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তুলে ধরে সর্বশক্তিমানের কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে। ট্যাংকের আওয়াজ ক্রমেই কাছে ঘনিয়ে আসছিলো। কামান, মর্টার, মেশিনগান এবং রাইফেলের গুলীর প্রচণ্ড শব্দে তখন চারিদিকে এক ভয়াল পরিবেশ বিরাজ করছিলো।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। কেউ একটি গাড়ীতে কিছু খাবার নিয়ে এলো। কোনো শরণার্থী দল হয়তো তাদের নিজেদের খাবার থেকে আমাদের জন্য কিছু পাঠিয়ে থাকবে।

গোলাগুলীর শব্দ কিছুক্ষণের জন্য থেমে আসে। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে আমি একটি খোলা জায়গায় গা এলিয়ে দিলাম। নরম ঘাস এবং ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে আমার মধ্যে কেমন যেন একটা ভাবান্তর দেখা দিলো। আমার মানসপটে ভেসে উঠলো যুদ্ধের চিত্র, স্বাধীনতার স্বপ্ন। মনে হলো সবকিছু যেন অনেক দূরে। সেই বৃদ্ধার প্রার্থনা কানে বাজতে থাকে, "আল্লাহ্, আমার ছেলেকে তুমি নিয়ে গেছো। সেই ছেলের জন্য কোনো নালিশ নেই। কিন্তু দেশের জন্য আমার যেসব ছেলে যুদ্ধ করছে তুমি তাঁদেরকে সাহায্য করো।" আবেগে আমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে "...এ জাতি কত বড়। এদের জন্য যুদ্ধ করে আমি আজ গর্বিত ও সম্মানিত। এই বৃদ্ধা নিজের ছেলের জন্য না করে অন্যের জন্য প্রার্থনা করছিলেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই এই মায়ের কথা শুনবেন।" আল্লাহকে অবশ্যই শুনতে হবে। আপন মনে আমি আওড়ালাম কথাগুলো। এক সময় নিজের অজান্তেই দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

২০

প্রান্তসীমায়

এপ্রিলের শেষ দিনগুলোর কথা এখন স্মরণ করাও কষ্টকর। যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা মানুষের চোখ যেন অন্ধ করে দিয়েছিলো। প্রতিদিন পাহাড়ের পেছনে পূর্বাকাশে সূর্য উঠতো। আবার সে তার নিয়মিত যাত্রাপথ অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরের দূর দিকচক্রবালে অস্ত যেতো; পেছনে রেখে যেতো হাজার হাজার মৃত-মানবদেহ—যারা সবাই ছিলো বিদ্বেষের হলাহলে পূর্ণ যুদ্ধের শিকার। যতদূর দু' চোখ যায় শুধু লাশ আর লাশ। এমনকি শয়নে স্বপনেও কেবল লাশের ছবি।

প্রায় সময়ই বাতাসে ভেসে আসতো বারুদ আর গলিত মৃতদেহের গন্ধ। রাইফেল, মেশিনগান এবং ভারী অস্ত্রের আওয়াজের যেন বিরাম নেই, ক্রমেই তা গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ছিলো। রাতে দূর থেকে দেখা যেতো আগুনের লেলিহান শিখা, তার ওপর কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠছে। সারা তল্লাট ছেয়ে যেতো আগুনে আগুনে। উর্ধ্বে উত্থিত ধোয়ার কুণ্ডলীর নিচেই শোনা যেতো হত্যা, ধর্ষণ ও ধ্বংসে উন্মত্ত যুদ্ধরত পাকিস্তানী সৈন্যদের পৈশাচিক উল্লাসের তাণ্ডব চিৎকার। দূর থেকে তখন ট্রেঞ্চের ভেতরে কোন মুক্তিযোদ্ধা কিংবা পলায়নপর কোন পল্লীবালা শেষ সম্বল-টুকু বুকে আঁকড়ে ধরে ঐ অগ্নিশিখার দিকে চাইতে গিয়ে আরো বেশি করে নিমজ্জিত হতো হতাশার অন্ধকারে। সে কি পৈশাচিক বর্বরতা! পাকিস্তানীদের সে বর্বরতার পরিমাপ করা মানুষের সাধ্যেরও অতীত। যতোই দিন যাচ্ছিলো পাকিস্তানীদের বর্বরতা ততোই বাড়ছিলো। দখলকৃত এলাকায় তারা মানব ইতিহাসের পৈশাচিক এবং অশ্রুতপূর্ব সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলো। তাদের তৎপরতায় বোঝা যায় তিনটি পৃথক দলে ভাগ হয়ে তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছিলো।

প্রথম ছিলো হামলাকারী দল। কোন লক্ষ্যস্থল দখল করাই ছিলো এদের প্রধান কাজ। তবে সময় ও সুযোগ মত দ্বিতীয় দলের কাজও এরা করতো। হামলাকরীদের পরেই থাকতো সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় দল—যাদের কাজ ছিলো

গোলাগুলীর শব্দ কিছুক্ষণের জন্য থেমে আসে। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে আমি একটি খোলা জায়গায় গা এলিয়ে দিলাম। নরম ঘাস এবং ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে আমার মধ্যে কেমন যেন একটা ভাবান্তর দেখা দিলো। আমার মানসপটে ভেসে উঠলো যুদ্ধের চিত্র, স্বাধীনতার স্বপ্ন। মনে হলো সবকিছু যেন অনেক দূরে। সেই বৃদ্ধার প্রার্থনা কানে বাজতে থাকে, "আল্লাহ্, আমার ছেলেকে তুমি নিয়ে গেছো। সেই ছেলের জন্য কোনো নালিশ নেই। কিন্তু দেশের জন্য আমার যেসব ছেলে যুদ্ধ করছে তুমি তাঁদেরকে সাহায্য করো।" আবেগে আমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে "...এ জাতি কত বড়। এদের জন্য যুদ্ধ করে আমি আজ গর্বিত ও সম্মানিত। এই বৃদ্ধা নিজের ছেলের জন্য না করে অন্যের জন্য প্রার্থনা করছিলেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই এই মায়ের কথা শুনবেন।" আল্লাহকে অবশ্যই শুনতে হবে। আপন মনে আমি আওড়ালাম কথাগুলো। এক সময় নিজের অজান্তেই দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

২০

প্রান্তসীমায়

এপ্রিলের শেষ দিনগুলোর কথা এখন স্মরণ করাও কষ্টকর। যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা মানুষের চোখ যেন অন্ধ করে দিয়েছিলো। প্রতিদিন পাহাড়ের পেছনে পূর্বাকাশে সূর্য উঠতো। আবার সে তার নিয়মিত যাত্রাপথ অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরের দূর দিকচক্রবালে অস্ত যেতো, পেছনে রেখে যেতো হাজার হাজার মৃত-মানবদেহ—যারা সবাই ছিলো বিদ্বেষের হলাহলে পূর্ণ যুদ্ধের শিকার। যতদূর দু' চোখ যায় শুধু লাশ আর লাশ। এমনকি শয়নে স্বপনেও কেবল লাশের ছবি।

প্রায় সময়ই বাতাসে ভেসে আসতো বারুদ আর গলিত মৃতদেহের গন্ধ। রাইফেল, মেশিনগান এবং ভারী অস্ত্রের আওয়াজের যেন বিরাম নেই, ক্রমেই তা গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ছিলো। রাতে দূর থেকে দেখা যেতো আগুনের লেলিহান শিখা, তার ওপর কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠছে। সারা তল্লাট ছেয়ে যেতো আগুনে আগুনে। উর্ধ্বে উত্থিত ধোয়ার কুণ্ডলীর নিচেই শোনা যেতো হত্যা, ধর্ষণ ও ধ্বংসে উন্মত্ত যুদ্ধরত পাকিস্তানী সৈন্যদের পৈশাচিক উল্লাসের তাণ্ডব চিৎকার। দূর থেকে তখন ট্রেঞ্চের ভেতরে কোন মুক্তিযোদ্ধা কিংবা পলায়নপর কোন পল্লীবালা শেষ সম্বল-টুকু বুকে আঁকড়ে ধরে ঐ অগ্নিশিখার দিকে চাইতে গিয়ে আরো বেশি করে নিমজ্জিত হতো হতাশার অন্ধকারে। সে কি পৈশাচিক বর্বরতা! পাকিস্তানীদের সে বর্বরতার পরিমাপ করা মানুষের সাধ্যেরও অতীত। যতোই দিন যাচ্ছিলো পাকিস্তানীদের বর্বরতা ততোই বাড়ছিলো। দখলকৃত এলাকায় তারা মানব ইতিহাসের পৈশাচিক এবং অশ্রুতপূর্ব সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলো। তাদের তৎপরতায় বোঝা যায় তিনটি পৃথক দলে ভাগ হয়ে তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছিলো।

প্রথম ছিলো হামলাকারী দল। কোন লক্ষ্যস্থল দখল করাই ছিলো এদের প্রধান কাজ। তবে সময় ও সুযোগ মত দ্বিতীয় দলের কাজও এরা করতো। হামলাকরীদের পরেই থাকতো সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় দল—যাদের কাজ ছিলো

অবাধে হত্যা ও ধর্ষণ চালিয়ে যাওয়া। তাদের এসব কাজের জন্য তাদেরকে কারো কাছেই জবাবদিহি করতে হতো না। সম্ভবত পাকিস্তান সরকারের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিলো জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে বশে আনা এবং বাঙালী জাতির বংশধারাকে পরিবর্তিত করা। এই দ্বিতীয় গ্রুপের পেছনে থাকতো জঘন্য অপরাধীদের একটি চক্র। তারা প্রতিটি ঘরবাড়ি লুণ্ঠন করতো। তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দিতো। সরকার থেকে এদেরকে পেট্রোল, কেরোসিন এবং অন্যান্য দাহ্য পদার্থ সরবরাহ করা হতো। অসহায় নিরপরাধ বাঙালীদের ওপর এই বর্বর নিষ্ঠুরতা এক নারকীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছিলো। জানা যায় পশ্চিম পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যক কুখ্যাত কয়েদীকে জেল থেকে ছাড়িয়ে এনে বাংলাদেশের জনগণের ওপর লেলিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

এতসব নিষ্ঠুর অত্যাচার বাঙালীদের দমন করে রাখতে পারেনি। ক্রমানুয়ে প্রতিরোধ হয়ে ওঠে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর। শত্রুকে মারার জন্যে একটি গুলীও অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত নিজ অবস্থানে অপেক্ষায় থাকছিলো আমাদের যোদ্ধারা। অনেক সময় কোন দুঃসাহসী যোদ্ধা ঘাঁটি ছেড়ে অগোচরে ঢুকে পড়তো শত্রুর এলাকায় এবং সুযোগমতো শত্রু হত্যা করে ফিরে আসতো নিজের ঘাঁটিতে। অনেকে ফিরতে পারতো না। শত্রু নিধনের এই দুঃসাহসী অভিযান চলছিলো অব্যাহত গতিতে।

সাময়িক কোন জয় চূড়ান্ত বিজয় হতে পারেনা। ইতিহাসের এই শিক্ষা ইয়াহিয়া খানের ছিলোনা। তা না হলে তিনি এমন ধ্বংস যজ্ঞের আয়োজন করতেন না; রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে চাইতেন না সামরিক ব্যবস্থার মাধ্যমে। তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন চূড়ান্ত ভুলের প্রান্তসীমায়।

প্রথম দিকে সাময়িকভাবে পাকিস্তানীরা জয়ী হয়। গ্রামে-গঞ্জে নগরে-বন্দরে বিস্তৃত হয় তাদের আধিপত্য। কিন্তু সেই সাথে তারা হারিয়ে ফেলছিল জনগণের ওপর তাদের প্রভাব। পাকিস্তানীদের নৃশংস অত্যাচারে প্রতিটি বাঙালী তাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে। পাকিস্তানের ওপর বিন্দুমাত্র আর আস্থা রইলো না এদেশের মানুষের। একটা জাতির সুতীব্র ঘৃণা আর প্রত্যাখ্যানের মুখে কোন সামরিক বাহিনী বিজয়ী হয়েছে চূড়ান্তভাবে তেমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। পাকিস্তানীদেরও তাই ছিলো বিধিলিপি। আর তাই স্বাধীনতার জন্যে জনগণের অতুগ্র বাসনার কাছে পাকিস্তানীদের সেই সাময়িক জয় সময়ের ব্যবধানে চরম পরাজয়েই রূপান্তরিত হয়েছিলো।

২১
রামগড় ভস্মীভূত

২৫শে এপ্রিল পাকিস্তানীদের হাতে করেরহাটের পতন ঘটে। তারপর তারা তিন দিক থেকে রামগড় অভিমুখে অগ্রসর হয়। করেরহাট-রামগড় সড়কে একদল, নারায়ণহাট-হিয়াকু-রামগড় পথে দ্বিতীয় দল এবং মহালছড়ি-রামগড় সড়ক ধরে তৃতীয় দল অগ্রসর হতে থাকে। করেরহাট থেকে রামগড় যাওয়ার পথে পাহাড়গুলো দখল করার জন্য পাকিস্তানীরা পূর্বদিকে এগোচ্ছিলো। ফেণী নদীর শুভপুর সেতুর দিকেও কিছু সংখ্যক শত্রু-সৈন্য অগ্রসর হচ্ছিলো। পক্ষ কাল পরে এই সেতুর কাছেই এক রক্তক্ষয়ী লড়াই সংগঠিত হয়।

করেরহাট এবং রামগড়ের মাঝামাঝি স্থানে ছোট্ট বাজার হিয়াকু। শত্রুরা কিভাবে যেন জেনেছিলো আমরা রামগড়েই চট্টগ্রাম সেক্টরের সদর দফতর স্থাপন করেছি। কথাটি আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ নয়। এখানে আমাদের কিছু জ্বালানী এবং খাদ্য মজুত ছিলো, আর ছিলো আমাদের আহতদের চিকিৎসার জন্য অস্থায়ী একটি হাসপাতাল। এছাড়া ছিলো ছোট্ট একটি ট্রেনিং ক্যাম্প। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের এখানে আমরা অস্ত্র ও বিস্ফোরক ব্যবহারের ট্রেনিং দিচ্ছিলাম। তবে প্রয়োজনে এখান থেকেও সবকিছু সরানোর প্রস্তুতি আমাদের ছিলো। রামগড় অবশ্য আমাদের মান-সম্মানেরও প্রতীক হয়ে উঠেছিলো। কারণ, এটাই ছিলো আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বশেষ মহকুমা সদর দফতর। তাই আমরা স্থানটি প্রতিরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সবরকম প্রস্তুতি গ্রহণ করি। এজন্য আমরা কয়েকটি সেতু ধ্বংস করে ফেলি। সীমিত সম্পদ ও শক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে যতদূর সম্ভব ব্যাপক এলাকা জুড়ে সম্ভাব্য শত্রু হামলার স্থানগুলোতে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা গড়ে তুলি।

রণকৌশলগত দিক থেকে তখন হিয়াকু এবং করেরহাটের মধ্যে আমাদের কোন সৈন্য রাখার উপযোগিতা ছিলো না। সৈন্যদের এখানে শত্রু বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে যাওয়ার ভয় ছিলো। তাই সকল দিকের সব সৈন্য প্রত্যাহার করে হিয়াকু এলাকায় সমাবেশ করেছিলাম।

অন্য পথে আরো পূর্বে মহালছড়িতে আমাদের সৈন্যদের ওপর ইতিমধ্যে শত্রুরা হামলা চালিয়েছিলো। আমাদের বাহিনী তখন আরো সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র চেয়ে বার বার খবর পাঠাচ্ছিলো। কিন্তু আমরা তাদের কিছুই পাঠাতে পারিনি।

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ সামরিক কমাণ্ডের মতো কিছু একটা গঠন করেন। রণাঙ্গনের কমাণ্ডাররা কিন্তু সর্বোচ্চ সামরিক কমাণ্ড থেকে কোন আদেশ পাননি। বস্তুতঃ অভিযান সংক্রান্ত কোন আদেশই তাদের ছিলো না। যে কোন মূল্যে শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে, আমাদের প্রতি এটাই ছিলো সেই বিমূর্ত হাইকমাণ্ডের একমাত্র নির্দেশ। যুদ্ধ ক্ষেত্রের বাস্তব চিত্রের সাথে এই আদেশের কোন সম্পর্ক ছিলো না। শত্রুর অগ্রাভিযান কিছু সময়ের জন্য হয়তো বিলম্বিত করা যায়, কিন্তু প্রাণঘাতী লড়াইয়ের ময়দানে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ ছাড়া শত্রুকে দমন করার চিন্তা আকাশ কুসুম স্বপ্ন মাত্র। কেউ কেউ এ যুক্তি অনুধাবন না করেই খামখেয়ালী এবং অসঙ্গত আদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অচিরেই আমাদের সৈন্যরা এই অদৃশ্য কমাণ্ডের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং এর আসল অস্তিত্ব সম্পর্কেই সকলের মধ্যে সন্দেহ দেখা দেয়।

পাকিস্তানীরা মহালছড়ি আক্রমণ করেছিলো ২৭শে এপ্রিল। এখানে ছিলো প্রায় তিন হাজার সৈন্যের দুটি মিজো ব্রিগেড এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি নিয়মিত কমাণ্ডো কোম্পানী। আমাদের সৈন্যদের পাহাড়ী এলাকায় যুদ্ধের ট্রেনিং ছিলো না। অস্ত্র ও রসদপত্রেরও অভাবছিল। তাই মহালছড়িতেও আমাদের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। পাকিস্তানীরা মিজোদের সামনের সারিতে পাঠিয়ে দিয়ে একটির পর একটি হামলা চালাতে থাকে। প্রথমে প্রতিবারই তাদের সে হামলা ব্যর্থ হয়ে যায়। হামলায় মিজোরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেছন থেকে পাকিস্তানী কমাণ্ডোদের চাপের ফলে মিজোরা পেছনেও সরতে পারছিলোনা। এমন কি কমাণ্ডোরা অস্ত্র দিয়ে এমন ভাব দেখাচ্ছিলো যে, কোন মিজো পালাতে চেষ্টা করলেই তাকে গুলী করা হবে। যুদ্ধ গড়িয়ে চলে। মিজোদের কয়েকটি ছোট ছোট দল কোন ক্রমে কয়েকটি টিলা পেরিয়ে পাহাড়ের ওপর সুবিধাজনক স্থান দখল করে নেয়। এদের এই জায়গা থেকে আমাদের অবস্থান এবং রামগড় অভিমুখী সড়ক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো।

যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে ওঠে। আমাদের সৈন্য-সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি শত্রুসৈন্যরা বাঙ্গালী সৈন্যদের প্রায় ঘিরে ফেলে। তরুন অফিসার ক্যাপ্টেন কাদেরকে আমরা এখানে হারাই। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে একটা সুবিধাজনক স্থান দখল করার জন্য সে এগিয়ে গিয়েছিলো যাতে বাঙ্গালী

সৈন্যদের নিরাপদ পশ্চাদপসরণে সে সাহায্য করতে পারে। কাদের সফল হয়েছিলো, কিন্তু তারপরেই লাইট মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলীতে তার দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বীরের মত মৃত্যু বরণ করেছিলো ক্যাপ্টেন কাদের। কিন্তু এই যুদ্ধে প্রথম একজন অফিসার হারিয়ে আমাদের সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিলো। দুজন ছাত্র শওকত ও ফারুক (পরে দুজনই সেনাবাহিনীতে কমিশন প্রাপ্ত অফিসার হয়েছিলেন) এবং সিপাই ড্রাইভার আব্বাস শত্রুদের গুলী-বৃষ্টির মধ্য দিয়েই ক্যাপ্টেন কাদেরের দেহ উদ্ধার করে আনে। রামগড়ে আমরা যথাযোগ্য ধর্মীয় ও সামরিক মর্যাদায় কাদেরের মৃতদেহ দাফন করি।

এপ্রিলের ২৯ তারিখে হিয়াকুর কাছে যুদ্ধ শুরু হয়। আমাদের অবস্থান স্থলের সামনের জায়গাটি ছিলো খোলা, কিন্তু দুপাশে ছোট ছোট টিলার ওপর ঘন জঙ্গল। এই জঙ্গলের আড়াল দিয়ে শত্রুরা আমাদের পেছনে চলে আসতে পারতো। সে পরিস্থিতিতে সরবরাহ ঘাঁটি রামগড় থেকে আমাদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হতো। আমাদের কাছে তখন রান্না করার মতো কিছুই ছিলো না, অধিকাংশ খাবারই আসতো রামগড় থেকে। দিনটি ছিলো পরিষ্কার। ভোর থেকেই আমাদের অবস্থানের ওপর মর্টার শেলিংয়ের মাধ্যমে কয়েক দফা হামলা হয়। বোমা বর্ষণের ছত্রছায়ায় আমাদের দিকে অগ্রসরমান শত্রুর অগ্রভাগে ছিলো প্রায় দুইশত স্থানীয় দালাল। খোলা মাঠ দিয়ে দুই কোম্পানী পাকসেনা এগিয়ে আসছিলো। ওরা এক শত গজের মধ্যে আসতেই আমাদের অস্ত্রগুলো গর্জে উঠলো। এই আকস্মিক হামলায় মুহূর্তের মধ্যে ওরা ভয় ও আতঙ্কে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়লো। মাত্র কয়েক জন কোন রকমে পালাতে পারলেও অবশিষ্ট সবাই নিহত অথবা আহত হয়ে পড়ে রইলো। কিছুক্ষণ পর শত্রুদের একটি ব্যাটালিয়ন দুই ভাগে ভাগ হয়ে আমাদের অবস্থানের ডান ও বাম দিকে আক্রমণ চালালো। দীর্ঘ দুই ঘণ্টা অবিরাম লড়াইয়ে আমাদের কয়েকজন হতাহত হবার পর অবশেষে আমাদের সৈন্যদেরকে চিকনছড়ার দিকে পশ্চাদপসরণ করার নির্দেশ দেয়া হলো।

হিয়াকুর পতনের পর রামগড়ের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। সব চাইতে বিপজ্জনক ব্যাপার ছিলো শত্রুরা আমাদের বেসামরিক ব্যক্তিদের বিশেষ করে বড় বড় শরণার্থী দলের ভারত গমনের পথ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলো। সে সময়ে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক ধূলিময় রাস্তা ধরে নারায়ণহাট থেকে হিয়াকু এবং তারপর রামগড় হয়ে ফেনী নদী পেরিয়ে সাবরুমে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিলো। কিন্তু হিয়াকুর পতনের পর সে পথ বন্ধ হয়ে গেল।

সাবরুমের লোক সংখ্যা ছিলো খুবই কম। কিন্তু এপ্রিলের শুরু থেকেই হানাদার পাক-বাহিনীর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

অন্য পথে আরো পূর্বে মহালছড়িতে আমাদের সৈন্যদের ওপর ইতিমধ্যে শত্রুরা হামলা চালিয়েছিলো। আমাদের বাহিনী তখন আরো সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র চেয়ে বার বার খবর পাঠাচ্ছিলো। কিন্তু আমরা তাদের কিছুই পাঠাতে পারিনি।

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ সামরিক কমাণ্ডের মতো কিছু একটা গঠন করেন। রণাঙ্গনের কমাণ্ডাররা কিন্তু সর্বোচ্চ সামরিক কমাণ্ড থেকে কোন আদেশ পাননি। বস্তুতঃ অভিযান সংক্রান্ত কোন আদেশই তাদের ছিলো না। যে কোন মূল্যে শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে, আমাদের প্রতি এটাই ছিলো সেই বিমূর্ত হাইকমাণ্ডের একমাত্র নির্দেশ। যুদ্ধ ক্ষেত্রের বাস্তব চিত্রের সাথে এই আদেশের কোন সম্পর্ক ছিলো না। শত্রুর অগ্রাভিযান কিছু সময়ের জন্য হয়তো বিলম্বিত করা যায়, কিন্তু প্রাণঘাতী লড়াইয়ের ময়দানে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ ছাড়া শত্রুকে দমন করার চিন্তা আকাশ কুসুম স্বপ্ন মাত্র। কেউ কেউ এ যুক্তি অনুধাবন না করেই খামখেয়ালী এবং অসঙ্গত আদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অচিরেই আমাদের সৈন্যরা এই অদৃশ্য কমাণ্ডের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং এর আসল অস্তিত্ব সম্পর্কেই সকলের মধ্যে সন্দেহ দেখা দেয়।

পাকিস্তানীরা মহালছড়ি আক্রমণ করেছিলো ২৭শে এপ্রিল। এখানে ছিলো প্রায় তিন হাজার সৈন্যের দুটি মিজো ব্রিগেড এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি নিয়মিত কমাণ্ডো কোম্পানী। আমাদের সৈন্যদের পাহাড়ী এলাকায় যুদ্ধের ট্রেনিং ছিলো না। অস্ত্র ও রসদপত্রেরও অভাবছিল। তাই মহালছড়িতেও আমাদের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। পাকিস্তানীরা মিজোদের সামনের সারিতে পাঠিয়ে দিয়ে একটির পর একটি হামলা চালাতে থাকে। প্রথমে প্রতিবারই তাদের সে হামলা ব্যর্থ হয়ে যায়। হামলায় মিজোরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেছন থেকে পাকিস্তানী কমাণ্ডোদের চাপের ফলে মিজোরা পেছনেও সরতে পারছিলোনা। এমন কি কমাণ্ডোরা অস্ত্র দিয়ে এমন ভাব দেখাচ্ছিলো যে, কোন মিজো পালাতে চেষ্টা করলেই তাকে গুলী করা হবে। যুদ্ধ গড়িয়ে চলে। মিজোদের কয়েকটি ছোট ছোট দল কোন ক্রমে কয়েকটি টিলা পেরিয়ে পাহাড়ের ওপর সুবিধাজনক স্থান দখল করে নেয়। এদের এই জায়গা থেকে আমাদের অবস্থান এবং রামগড় অভিমুখী সড়ক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো।

যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে ওঠে। আমাদের সৈন্য-সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি শত্রুসৈন্যরা বাঙ্গালী সৈন্যদের প্রায় ঘিরে ফেলে। তরুন অফিসার ক্যাপ্টেন কাদেরকে আমরা এখানে হারাই। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে একটা সুবিধাজনক স্থান দখল করার জন্য সে এগিয়ে গিয়েছিলো যাতে বাঙ্গালী

সৈন্যদের নিরাপদ পশ্চাদপসরণে সে সাহায্য করতে পারে। কাদের সফল হয়েছিলো, কিন্তু তারপরেই লাইট মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলীতে তার দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বীরের মত মৃত্যু বরণ করেছিলো ক্যাপ্টেন কাদের। কিন্তু এই যুদ্ধে প্রথম একজন অফিসার হারিয়ে আমাদের সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিলো। দুজন ছাত্র শওকত ও ফারুক (পরে দুজনই সেনাবাহিনীতে কমিশন প্রাপ্ত অফিসার হয়েছিলেন) এবং সিপাই ড্রাইভার আব্বাস শত্রুদের গুলী-বৃষ্টির মধ্য দিয়েই ক্যাপ্টেন কাদেরের দেহ উদ্ধার করে আনে। রামগড়ে আমরা যথাযোগ্য ধর্মীয় ও সামরিক মর্যাদায় কাদেরের মৃতদেহ দাফন করি।

এপ্রিলের ২৯ তারিখে হিয়াকুর কাছে যুদ্ধ শুরু হয়। আমাদের অবস্থান স্থলের সামনের জায়গাটি ছিলো খোলা, কিন্তু দুপাশে ছোট ছোট টিলার ওপর ঘন জঙ্গল। এই জঙ্গলের আড়াল দিয়ে শত্রুরা আমাদের পেছনে চলে আসতে পারতো। সে পরিস্থিতিতে সরবরাহ ঘাঁটি রামগড় থেকে আমাদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হতো। আমাদের কাছে তখন রান্না করার মতো কিছুই ছিলো না, অধিকাংশ খাবারই আসতো রামগড় থেকে। দিনটি ছিলো পরিষ্কার। ভোর থেকেই আমাদের অবস্থানের ওপর মর্টার শেলিংয়ের মাধ্যমে কয়েক দফা হামলা হয়। বোমা বর্ষণের ছত্রছায়ায় আমাদের দিকে অগ্রসরমান শত্রুর অগ্রভাগে ছিলো প্রায় দুইশত স্থানীয় দালাল। খোলা মাঠ দিয়ে দুই কোম্পানী পাকসেনা এগিয়ে আসছিলো। ওরা এক শত গজের মধ্যে আসতেই আমাদের অস্ত্রগুলো গর্জে উঠলো। এই আকস্মিক হামলায় মুহূর্তের মধ্যে ওরা ভয় ও আতঙ্কে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়লো। মাত্র কয়েক জন কোন রকমে পালাতে পারলেও অবশিষ্ট সবাই নিহত অথবা আহত হয়ে পড়ে রইলো। কিছুক্ষণ পর শত্রুদের একটি ব্যাটালিয়ন দুই ভাগে ভাগ হয়ে আমাদের অবস্থানের ডান ও বাম দিকে আক্রমণ চালালো। দীর্ঘ দুই ঘণ্টা অবিরাম লড়াইয়ে আমাদের কয়েকজন হতাহত হবার পর অবশেষে আমাদের সৈন্যদেরকে চিকনছড়ার দিকে পশ্চাদপসরণ করার নির্দেশ দেয়া হলো।

হিয়াকুর পতনের পর রামগড়ের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। সব চাইতে বিপজ্জনক ব্যাপার ছিলো শত্রুরা আমাদের বেসামরিক ব্যক্তিদের বিশেষ করে বড় বড় শরণার্থী দলের ভারত গমনের পথ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলো। সে সময়ে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক ধূলিময় রাস্তা ধরে নারায়ণহাট থেকে হিয়াকু এবং তারপর রামগড় হয়ে ফেনী নদী পেরিয়ে সাবরুমে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিলো। কিন্তু হিয়াকুর পতনের পর সে পথ বন্ধ হয়ে গেল।

সাবরুমের লোক সংখ্যা ছিলো খুবই কম। কিন্তু এপ্রিলের শুরু থেকেই হানাদার পাক-বাহিনীর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

থেকে আগত সমাজের সকল স্তরের শরণার্থীর ভীড়ে সে শহরের লোক সংখ্যা বাড়তে থাকে। দলে দলে সাবরুমে আগত শরণার্থীদের মধ্যে শুধু গোটা পরিবারের সদস্যাই থাকতো না, কখনো বা গোটা একটি গ্রামের সবাইকে একশ মাইলেরও অধিক পথ অতিক্রম করে সেখানকার আশ্রয়ে আসতে দেখা গেছে। ধনী গরীব নির্বিশেষে সবাইকেই এই সুদীর্ঘ পথ পায়ে হেটে অতিক্রম করতে হতো। যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। একটা গরুর গাড়ীও ছিলো সে সময়ে বিলাসের নামান্তর। ঐ অঞ্চলে গরুর গাড়ী যে কয়টি ছিলো তাও আমাদের রণাঙ্গন থেকে হতাহতদের অপসারণের কাজে ব্যবহৃত হতো। বাড়ী ঘর থেকে আশ্রয়চ্যুত সেইসব নর-নারীর এইসব দুঃসহ ক্লেশ এবং দুর্বিসহ যাত্রা যে কত বেদনাদায়ক ছিলো তা বর্ননা করা সহজ সাধ্য নয়। সেদিন সে দুর্বিসহ যাত্রায় যাঁরা যাত্রী হয়েছিলেন, তারা এখন চিন্তাও করতে পারবেন না যে, এমনটি সত্যিই ঘটেছিলো। মনে হবে একটি দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন বুঝি।

পাকিস্তানীদের বর্বরতার শিকার অসহায় জনসাধারণ প্রথম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতো রামগড় গিয়ে। দেখা গেছে, অধিকাংশ লোকই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। ভবিষ্যতে কি আছে কেউ ভাবতে পারতো না। এর ওপরে আরো ছিলো ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশের দলিল পত্র ঠিকঠাক করার দীর্ঘসূত্রী প্রক্রিয়া। এখানেই শেষ নয়। ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশের পর ত্রাণ-সামগ্রী পাওয়ার জন্য আরেক দফা কাগজপত্র ঠিকঠাক করতে হতো। এসব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর তারা কিছু ত্রাণ সামগ্রী হাতে পেতো। অসহায় শরণার্থীরা নীরবে এইসব কষ্টকর আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত করতো। ক্রমান্বয়ে শরণার্থীদের সংখ্যা এত বিপুল হয়ে ওঠে যে, এদের জন্য আশ্রয়-শিবির স্থাপন এবং জীবন ধারণের সামান্য কিছু ব্যবস্থা করতে ভারত সরকারের সমগ্র প্রশাসন যন্ত্র কিছুদিনের জন্য হিমসিম খেয়ে যায়। পাকিস্তানী সৈন্যদের হামলায় প্রধান প্রধান সবগুলো রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলেও ভীত সন্ত্রস্ত অসহায় লোকদের ভারত গমন অব্যাহত গতিতেই চলতে থাকে। তাদের সকলের মনেই ছিলো একটি আশা, একদিন তারা আবার তাদের বাড়ী ঘরে ফিরতে পারবে। কিন্তু সেদিন কবে আসবে কেউ জানতো না।

করেরহাটের পতনের পর বুঝতে পারি বর্তমান ধারায় যুদ্ধ করে আমরা কিছুই করতে পারবো না। আমরা আমাদের বাহিনীকে সুসংগঠিত করে তুলতে পারছিলাম না। এই বাহিনীতে ছিলো বিভিন্ন ধরনের লোক—ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ, সামরিক বাহিনীর লোক এবং মাত্র সপ্তাহ খানেকের ট্রেনিংয়ের পর রণাঙ্গনে নামিয়ে দেয়া নতুন মুক্তিযোদ্ধা। এইসব দলের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ

শৃঙ্খলার অভাব ছিলো আমাদের বিপর্যয়ের একটি কারণ। আমাদের সকল সৈন্যকে একটা নিরাপদ শিবিরে নিয়ে তাদের জন্য বিশ্রাম ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। তাহলে তাদেরকে নিয়েই আবার একটা সংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত বাহিনী গড়ে তোলা যেতো। আমাদের অধিকাংশ সৈন্যকেই ইতিমধ্যে অপুষ্টিরও শিকার হয়ে পড়তে হয়েছিলো।

সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সীমানার ছয় মাইল ভেতরে হরিণায় একটা গোপন শিবির স্থাপন করা হয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমরা কয়েকটি তাবু পেয়েছিলাম। রামগড় থেকে কিছু কিছু জিনিস এখানে নিয়ে আসা হলো। শিবিরের জন্য যে হাসপাতালের ব্যবস্থা করেছিলাম যুদ্ধে আহতদের সেখানে আনা হয়। এরপর যুদ্ধ থেকে একটু অবকাশ পেলেই নতুন ভাবে আমাদের বাহিনী সংগঠনের কাজ পুর্ণোদ্যমে শুরু হয়।

মুজিব নগরে গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার তখন অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করছিলেন। কাজটি ছিলো খুবই দুঃসাধ্য। বাংলাদেশ বাহিনী একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ এলাকায় তাদের দখল প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে কেউ আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি দেবে না। যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় বাংলাদেশের যে কোন একটি অঞ্চলে যতদূর সম্ভব সৈন্যদের জড়ো করে সেই এলাকা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা যেতো। সময় নষ্ট না করে সেই সময়ই এই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু দেখা গেছে, কর্তৃপক্ষ সকল ফ্রন্টেই যুদ্ধ করতে আগ্রহী এবং যুদ্ধ করে জয়ী হতেও চাইছিলেন। আমাদের সৈন্য সংখ্যা এবং তাদের পরিমাণের প্রেক্ষিতে রণকৌশলগত দিক থেকে এ ব্যবস্থা ছিলো অবাস্তব। সব জায়গায় যুদ্ধ করার দরুন সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে আমাদের সেনাদের বিচ্ছিন্ন এবং স্থানীয়ভাবে লড়ে যেতে হয় এবং এই লড়ে যাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলো লক্ষ্যহীন। তাই একটির পর একটি এলাকা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে থাকে।

৩০শে এপ্রিল মহালছড়ির সৈন্যরা রামগড় এসে পৌঁছে। এখান থেকে সকলে ছোট ছোট দলে হরিণা শিবিরের দিকে অগ্রসর হয়। ওদের আসার আগে কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে রামগড় ছেড়ে যেতে প্রস্তুত থাকার আদেশ দিয়েছিলেন। এই আদেশে বোঝা গিয়েছিলো, হাইকম্যাণ্ড আমাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে অসমর্থ। তখন সাহায্য ব্যতিরেকে মাত্র তিন দিনের বেশি যুদ্ধ করার সামর্থ্য আমাদের ছিলো না। কিন্তু অবাক কাণ্ড ৩০শে এপ্রিল রাতেই আরেকটি নতুন আদেশ পেলাম, "বাংলাদেশ সরকারের জন্য রামগড় রক্ষা করো।" ইতিমধ্যে চিকনছড়া থেকে আমরা সৈন্য সরিয়ে এনেছি। হরিণায় আমাদের

নিরাপদ পশ্চাপসরণের জন্য রামগড়ের বাইরে কিছু সৈন্য রেখেছি, যাতে শত্রুর অগ্রাভিযান কিছু সময়ের জন্য তারা বিলম্বিত করতে পারে। শত্রু বাহিনী রামগড়ের মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। আমাদের সৈন্যদের অর্ধেক তখন হরিণার রাস্তায়।

অবশ্য সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার পর রামগড় প্রতিরক্ষার জন্য উপস্থিত যাদেরকে পেলাম সবাইকে জড়ো করা হলো। পাকিস্তানী সৈন্য যাতে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে না পড়ে তা প্রতিহত করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দলও সাবরুমে চলে এলো। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই পদক্ষেপে কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিলো। গুজব রটেছিলো যে, রামগড় প্রতিরক্ষায় ভারতীয় সৈন্যরাও অংশ নিতে পারে। কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটেনি।

১লা মে থেকে শত্রুরা রামগড়ের আশেপাশের এলাকার ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। একটি দল মূল সড়ক ধরে অগ্রসর হচ্ছিলো। অন্য একটি দল রামগড়ের পূর্ব-দক্ষিণে পাহাড়ের দিকে এগোতে থাকে। এই পাহাড় এবং রামগড়ের মধ্যে কিছুটা জায়গা একেবারে খোলা এবং সমতল। ১লা মে দিবাগত রাতে এই পাহাড়ে গোপনে শত্রু সমাবেশ ঘটেছিলো।

২রা মে সকালে পাকিস্তানীরা মরিয়া হয়ে রামগড়ের ওপর আক্রমণ শুরু করে। কামানের প্রচণ্ড গোলার ছত্রছায়ায় তারা সড়ক পথে আমাদের প্রথম প্রতিরক্ষাব্যুহ ভেঙ্গে দেয়। শেলের আঘাতে আমাদের বাংকারগুলো ভেঙ্গে পড়তে থাকে। এদিকে সেই পাহাড় এবং রামগড়ের মধ্যবর্তী স্থানটিতে ধোঁয়ার জাল সৃষ্টি করা হয় এবং ধোঁয়ার আড়ালে শত্রুদের দ্বিতীয় দলটি রামগড়ের মধ্য ভাগের দিকে অগ্রসর হয়। সন্ধ্যার ঘণ্টা খানেক আগে শত্রুরা শহরটির মধ্যাঞ্চলের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ চালায়। এতে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এরপর এক ঘণ্টারও বেশি সময় আমাদের সৈন্যরা শত্রুর ওপর গুলীবর্ষণ অব্যাহত রাখে এবং পরিশেষে গুলী ফুরিয়ে গেলে তারা অন্ধকারের আড়ালে পশ্চাদপসরণ করে।

ওদিকে সাবরুমের সকল বেসামরিক ব্যক্তিদের ইতিপূর্বেই আরো অভ্যন্তরে নিরাপদ স্থানে অপসারণ করা হয়েছিলো। সারা তল্লাট জুড়ে বুলেট ছুটছিলো, ভারতীয় এলাকায় বাড়ীঘর এবং গাছপালায় গিয়ে গুলী লাগছিলো, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষীবাহিনীও (বি. এস. এফ.) ইতিমধ্যে যার যার ট্রেঞ্চের ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। তবে তারা সবকিছু অবলোকন করেছিলো মাত্র।

এ সময় শত্রুর একটি অয়্যারলেস বার্তা আমরা শুনতে পাই। ওতে বলছিলো "রামগড়ের বিদ্রোহী হেড কোয়ার্টার দখল করেছি।"

২রা মে'র এই রাতে শত্রুরা রামগড়ের ঘর বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সমগ্র বাজার এলাকা জ্বলে ওঠে। উর্ধমুখী ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর অগ্নি বলয়ের ভেতর দিয়ে দূরে তখন পাহাড় শ্রেণীর অস্পষ্ট রেখা চোখে পড়ছিলো ; সেখানেই আমাদের স্বপ্নের সেই দেশ যার জন্য আমরা যুদ্ধ করে চলেছি, অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। কিন্তু কত দিন এ যুদ্ধ চলবে তা আমরা কেউ জানতাম না।

২২
শুভপুর সেতুর যুদ্ধ

রামগড় হারানোর বিপর্যয়ে আমাদের তখন মনমরা অবস্থা। হরিণায় বিকল্প সদর দফতর স্থাপন করতে পারলেও ভারতের আশ্রয় থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে একথা যেনো কোনমতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। রামগড়ে আমাদের একটা সান্ত্বনা ছিলো যে সেটা আমাদের নিজেদের দেশ। সেখানকার সব কিছুই আমাদের। কিন্তু হরিণা ভারতীয় এলাকা। দু'টির মধ্যে বিরাট পার্থক্য। রামগড়ের পতনের পর মনে হয়েছিলো আমরা বুঝি সব কিছুই হারালাম। আমাদের সব স্বপ্ন বুঝি ভেঙ্গে গেলো। আমাদের কেউ কেউ শিশুর মত কেঁদে-ছিলো। মানসিক আঘাতে পাথর হয়ে যাওয়া অনেককে দেখেছিলাম যেন একটা ঘোরের মধ্যে পা-দু'টি টেনে নিয়ে হরিণার দিকে চলছে। কাঁধে ঝুলছে পুরনো দিনের হাতিয়ার এবং গুলীশূন্য থলে।

এদিকে প্রধান সড়কে শুভপুর সেতুর কাছে মারাত্মক লড়াই আসন্ন হয়ে ওঠে। ভারতীয় বিএসএফ বাহিনীর সহযোগিতায় সেতুর একটি অংশ আমরা এর আগে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। এখানে আমাদের দলে লোক সংখ্যা ছিল মাত্র একশ -এর মতো। এদের অধিকাংশই ছিলো আবার সাত দিনের ট্রেনিং প্রাপ্ত বেসা-মরিক, মুক্তিযোদ্ধা। সেতু প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পড়েছিলো ইপিআর সুবেদার ফখরুদ্দিনের ওপর। আমাদের লক্ষ্য ছিলো শত্রুরা যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ সেতু ব্যবহারের সুযোগ না পায় এবং ঢাকা ও কুমিল্লার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে না পারে।

করেরহাটের পতনের পর সেতুর উত্তর দিক থেকে আমরা সৈন্য প্রত্যাহার করে সেতুর দক্ষিণ দিকে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করি। আমরা জানতাম, সেতুটি দখল করার জন্য শত্রুরা মরিয়া হয়ে উঠবে। করেরহাটে তারা কামান মোতায়েন করেছিলো, কয়েকটি ট্যাংকও নদীর পাড় পর্যন্ত চলে এসেছিলো। দূর থেকে শত্রু পক্ষের কামানের গোলা এসে আমাদের ওপর পড়ছিলো। ট্যাংক-গুলো অগ্রসর হয়ে আমাদের একটির পর একটি বাংকার ধ্বংস করে চলছিলো।

আমাদের ট্যাংক বিধ্বংসী কয়েকটি ছোট হাতিয়ার থাকলেও তখন তার কোন শেল আমাদের কাছে ছিলো না।

ট্যাংক ও কামানের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ছত্রছায়ায় পাকিস্তানীরা কয়েকবারই নদী পার হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। দু'বার তাদের সৈন্যরা নদীপথে মাঝামাঝি পর্যন্ত এসে দু'দিকের গুলীর মধ্যে পড়ে যায়। পরিষ্কার দিনের আলোয় তাদেরকে দেখে দেখে আমরা গুলীবিদ্ধ করতে থাকি। অনেকটা যেন বেশ আরামের সাথে টার্গেট প্রাক্‌টিস করার মতো। এভাবে দু'কোম্পানীরও বেশি সৈন্য আমরা নির্মূল করি। তাদের লাশগুলো নদী দিয়ে ভাসতে ভাসতে সাগরের দিকে চলে যায়। এইভাবে লোক ক্ষয়ের পর শত্রুরা নদী পার হয়ে সেতু দখলের চেষ্টা ত্যাগ করে।

ওদিকে কুমিল্লা ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে আগত পাক সেনাদের নিকট ফেনী শহরের পতন ঘটে। ১১ই মে'র মধ্যে তারা শুভপুর সেতুর কাছে এসে পড়ে।

পাকিস্তানীদের এই কলামে শত্রুদের আনুমানিক দুটি ব্যাটালিয়ন ছিলো। পক্ষান্তরে সেতুর কাছে একশ-এরও কম সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা তখন চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। পরের দিন শুরু হয় যুদ্ধ।

১২ই মে সকাল থেকে করেরহাটের কামানগুলো আমাদের ওপর গোলা বর্ষণ শুরু করে। অপরদিকে নদীর পাড়ে শত্রু ট্যাংকগুলোকেও দেখা যায়। পাকিস্তানীরা আমাদের অবস্থানের উত্তর এবং পশ্চিম দিকে ধূম্রজালের সৃষ্টি করে। সকাল ১১টায় পশ্চিম দিকের সেই ধোঁয়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে দুটি কোম্পানী প্রথম হামলা শুরু করে। কিন্তু বেশ কিছু পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করে তাদেরকে পিছু হটতে হয়। তারপর কিছু সময় সব চুপচাপ। বেলা ৩টার দিকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার হামলা শুরু করে। দুটি শত্রু ব্যাটালিয়নকেই হামলায় অংশ নিতে দেখা যায়। দিনের বাকি সময়টুকু আমাদের সেনাদেরকে প্রচণ্ডতম গোলা বর্ষণের মোকাবিলা করতে হয়। প্রায় অর্ধেক মুক্তিযোদ্ধাই তখন শেলের আঘাতে আহত। সরাসরি আঘাতে বাংকারগুলো ধ্বসে পড়লে অনেকেরই জীবন্ত সমাধি ঘটে। আমরা হতাহতদের সরাতে পর্যন্ত পারছিলাম না। নতুন সৈন্যও যোগ হচ্ছিলো না। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা খাদ্য কিংবা পানির মুখ দেখেনি। বেলা ৫ টার দিকে কামানের গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়। শত্রুরা তখন আমাদের অবস্থান থেকে আনুমানিক ৩০০ গজ দূরে। শুধু একটি মেশিনগান এবং দুটি লাইট মেশিনগান দিয়ে আমরা এদের মোকাবিলা করছিলাম। ট্যাংকের আঘাতে অস্ত্রগুলো ধ্বংস হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো সমানে শত্রু নিধন করে চলে। এরপর আমাদের সৈন্যরা শুধু ৩০৩ রাইফেল দিয়ে গুলী

চালাতে থাকে। অচিরেই হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানীদের তুলনায় সংখ্যায় আমরা ছিলাম খুবই কম। আমাদের যে সব সেনা ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থানে ছিলো তারা শেষ পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করতে পেরেছিলো। এদের অধিকাংশই ছিলো গুরুতর আহত, কিন্তু তবু তাদের মনোবল ভেঙে পড়েনি।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। শুভপুর সেতুর অদূরে ভারতের শ্রীনগর সীমান্ত ফাঁড়ি। এখান থেকে একটি কাঁচা রাস্তা পাহাড়ের ভেতর দিয়ে আগরতলা অভিমুখী প্রধান সড়কে গিয়ে মিশেছে। এই সন্ধ্যায় রাস্তাটিতে অন্য কোন লোক ছিলো না—শুধু রণাঙ্গন ফেরত কিছু লোক নিঃশব্দে হেঁটে চলছিলো। এদের মধ্যে কেউ হাটছিলো লাঠিতে ভর দিয়ে, কয়েকজনকে আবার সহ-যোদ্ধারা ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো। পথে আমাদের একজন অফিসারের সাথে তাদের দেখা হলে জনৈক মুক্তিযোদ্ধা তার বা হাত তুলে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানায়। তার ঝুলন্ত ডান হাত থেকে রক্ত ঝড়ছিলো। শেলের বিচ্ছুরিত টুকরোয় এটি প্রায় দুভাগ হয়ে গিয়েছিলো। শুধু এক ফালি চামড়ার সাহায্যে কাঁধের নিচে হাতখানি ঝুলছিলো। সে দৃশ্য দেখা যায় না। দুঃসহ যন্ত্রণায় তার মুখ কুঁকড়ে যাচ্ছিলো। তবু সে মুখে একটু হাসির ভাব ফুটিয়ে অফিসারকে "জয় বাংলা" বলে শুভেচ্ছা জানায়। তারপর সে অন্যদের সাথে সামনে অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে যায়।

২৩

বেলুনিয়া থেকে পশ্চাদপসরণ

মে মাসের মাঝামাঝি। সবার মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে নতুন একটা চিন্তা শুরু হয়। যুদ্ধের ব্যাপারে একটা নতুন পর্যায়ের পুনর্গঠন পরিকল্পনাও হাতে নেয়া হয়। এ যাবত আমাদের যুদ্ধে ভবিষ্যৎ কৌশলগত পরিকল্পনা ছিলোনা। ভারতীয় সীমান্তরক্ষীবাহিনী (বি. এস. এফ) শুধু কিছু কিছু সহযোগিতা করে চলছিলো। সামর্থ্য অনুযায়ী তারা আন্তরিকভাবেই সব কিছু করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধ্যের সীমানা অতিক্রম করতেও তারা কসুর করেনি। তবে এরূপ একটি যুদ্ধে নিয়মিত সামরিক বাহিনী যতখানি করতে পারে সেই তুলনায় বিএসএফ-এর সামর্থ্য ছিলো সীমিত।

১৫ই মে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড যুদ্ধে সকল প্রকার রসদ সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অভিযান সংক্রান্ত সামগ্রিক সমন্বয় সাধনের ভারও তারা হাতে নেয়। এই পরিবর্তনের অর্থ এই নয় যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের মুক্তি সংগ্রামে তখনই সরাসরি অংশ গ্রহণ করেছিলো। তবুও ভারত সরকারের এই পদক্ষেপটি ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভবতঃ চলতি ঘটনা-প্রবাহের সাথে ভারতীয় সমর শক্তির পরোক্ষ হস্তক্ষেপও বটে যা ক্রমান্বয়ে আরো গভীরতর হতে থাকে।

শুভপুরের পতনের পর আমাদের সর্বশেষ অবস্থান বেলুনিয়াই ছিলো তীব্রতম সংঘর্ষস্থল। ১৫০ জন বাঙালী সেনা স্থানটি রক্ষা করছিলো। মুহুরী নদী দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত অঞ্চলটির পশ্চিম অংশ রক্ষায় ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ ও তাঁর বাহিনী। বেলুনিয়ায় আরো সৈন্যের দরকার ছিলো। কিন্তু সে সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কয়েকটি শক্তিশালী ইউনিট গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমাদের বেশকিছু সংখ্যক ট্রেনিং প্রাপ্ত লোককে আরো উচ্চতর ট্রেনিংয়ের জন্য তুরা'তে পাঠানো হয়েছিলো। যারা ছিলো তাদেরকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে আমরাই মূল ঘাঁটিতে তাদের ট্রেনিং দিচ্ছিলাম। সর্বশেষ এলাকা বেলুনিয়া রক্ষার চেষ্টা অবশ্যই আমরা করবো, তবে তার জন্য

সর্বশক্তি নিয়োগ করার পরিকল্পনা আমরা বাতিল করে দেই। সে সময় যথা সম্ভব বেশি সংখ্যায় শত্রু সৈন্য নিধন করাই ছিলো আমাদের প্রধান লক্ষ্য—তা যেখানেই হোক কিংবা যে অবস্থায়ই হোক। কোন এলাকা দখল করা এবং তা নিয়ন্ত্রণে রাখার পরিকল্পনা আমাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখতে হয়। পুরোপুরি সজ্জিত এবং ট্রেনিং প্রাপ্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যখন আমাদের বাহিনী গঠন করতে পারবো তখন অন্য চিন্তা করা যাবে।

বেলুনিয়া প্রতিরক্ষার অংশ হিসাবে ২৬শে মে আমাদের সৈন্যরা চাঁদগাজীর গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি উড়িয়ে দেয়।

২৭শে মে'র কথা। দু'জন ইপিআর সিপাই সীমান্ত পার হয়ে আমার কাছে হাজির হয়। আমার এই সিপাই দু'জন চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে পাহারায় ছিলো এবং ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানীরা তাদের বন্দী করে। তাদের কাছে ছিলো দু'টি করে হাত বোমা। সেগুলো আমার পায়ের কাছে রেখে তারা কেঁদে ওঠে—"এগুলো তোমাদের কাছে কেন?" আমি একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি, "আপনাকে মারার জন্য একজন পাকিস্তানী মেজর এগুলো আমাদের দিয়েছে।"

সারাটা যুদ্ধকালেই পাকিস্তানীরা এই ধরনের লোক পাঠাচ্ছিলো। এদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলো তাদের যুদ্ধবন্দী। আকর্ষণীয় পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে এদের পাঠানো হতো, আবার অনেক সময় এদের পরিবার পরিজনকে পাকিস্তানীরা জিম্মি হিসাবেও আটক রাখতো। কিন্তু শত্রুরা কোন সময়েই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত স্বল্প সংখ্যক বাঙালী অফিসারের কাউকেই এভাবে হত্যা করতে পারেনি।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য আমি কোন খবর আছে কিনা জানতে চাইলাম। 'হ্যাঁ স্যার, তিনটি ট্যাংক শুভপুর পার হয়ে ছাগলনাইয়ার দিকে আসছে', তারা জানালো।

নিশ্চয়ই এসব ট্যাংকের লক্ষ্যস্থল ছিলো বেলুনিয়া। তবে বেলুনিয়ার জন্য সৈন্য, ট্যাংক বা কামান বহর সমাবেশ ছিলো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

৬ই জুন পাকিস্তানীদের দুটি কোম্পানী চাঁদগাজীতে হামলা চালায়। শক্তি পরীক্ষার এই হামলা দু'ঘন্টা অব্যাহত থাকে। আমাদের সেনারা মর্টার ও মেশিনগান দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করে। শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে দেশপ্রেমিক নাগরিকদের সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের মর্টারগুলো নির্ভুলভাবে শত্রু সেনাদের আঘাত হেনে চলছিলো। আমাদের আকস্মিক নির্ভুল মর্টার হামলায় পাকিস্তানীরা হতচকিত হয়ে পড়ে। বেলুনিয়ার প্রথম শক্তি পরীক্ষায় পাকিস্তানীরা

ব্যাপক হতাহত হয়। মর্টারের গোলা নিঃশেষিত হওয়ায় বেশ কিছু দিন আমরা মর্টারগুলো ব্যবহার করতে পারিনি। এবার বেলুনিয়ার জন্য কিছু গোলাবারুদ পাওয়ায় সেগুলো ফলপ্রসূভাবেই কাজে লাগাচ্ছিলাম। আতংকগ্রস্ত শত্রুসৈন্যরা তখন ছাগলনাইয়ার দিকে পালাতে শুরু করে। আমাদের কয়েকজন সৈন্যকে ট্রেঞ্চ থেকে মাঠের মধ্যে বেরিয়ে ওদের তাড়া করে ছুটতে দেখা যায়। এরপর দিন দশেক সব চুপচাপ।

বাংলাদেশের বেলুনিয়া অঞ্চলটি খুবই সংকীর্ণ বলে পাকিস্তানীরা তাদের বিমান বহর ওখানে পাঠাতে পারছিলো না। ওদের ভয় ছিলো, বিমান ঘোরাতে গিয়ে কোনক্রমে যদি ভারতীয় এলাকায় ঢুকে পড়ে তাহলে ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রতিশোধ নেবার জন্য এগিয়ে আসবে। আমাদের মনে হচ্ছিলো, শত্রুরা ঐ পর্যায়ে সেই ঝুঁকি নেবে না।

১৬ই জুন ভোরে পাকসেনারা আবার চাঁদগাজীতে হামলা চালালে তা প্রতিহত করা হয়। ১৭ই এবং ১৮ই জুন শত্রুরা আরো কয়েক দফা হামলা করে। কিন্তু প্রতিবারই তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এরপর ১৯শে জুন পাকবাহিনী স্থল ও আকাশ পথে যৌথ আক্রমণ চালায়। পাঁচটি হেলিকপ্টারে তারা আমাদের অবস্থানের পেছনে সৈন্য নামিয়ে দেয়। সামনে দিয়ে কামানের গোলার ছত্রছায়ায় দুটো পদাতিক ব্যাটালিয়ন সর্বশক্তি নিয়োগ করে অগ্রসর হতে থাকে। এরা কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারেনি এবং আগের দলগুলোর মতোই এদেরকেও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। কিন্তু বিপদ দেখা দেয় পিছন দিকে। হেলিকপ্টারযোগে নামানো বিপুল সংখ্যক শত্রুসৈন্য আমাদের ওদিকটা ঘিরে ফেলেছিলো। তখন দুদিক থেকে আটকা পড়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা দেখা দেয়। তাই সে রাতেই আমরা চাঁদগাজী ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেই।

এরপর বাংলাদেশের কোন অঞ্চল আর আমাদের হতে রইলো না। বলা চলে সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় তখন শুরুর মুখে।

১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধকে মোটামুটি কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি:

প্রথম পর্যায়: ২৪শে মার্চ থেকে জুনের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কে পরিকল্পিত এবং অপরিকল্পিত উপায়ে যুদ্ধ চালনা এবং একই সঙ্গে সারা দেশে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত, তবে সমন্বয় বিহীন প্রতিরোধ আন্দোলনের কাল বলা চলে।

দ্বিতীয় পর্যায়: জুনের শেষ সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পর্যায়ে পুনর্গঠন, সমন্বয় সাধন এবং যুদ্ধের প্রকৃতি গেরিলা ধারায় রূপান্তরিত করার কাজ চলে। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন সামরিক ইউনিটকে (নিয়মিত সৈন্য) শত্রুর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রচলিত পন্থায় যুদ্ধের জন্য গড়ে তোলা হয়।

তৃতীয় পর্যায়ঃ অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত। এ সময়ে গেরিলা তৎপরতা তীব্রতর করা হয় এবং কয়েকটি সীমিত নিয়মিত সামরিক কার্যক্রম গৃহীত হয়। এই পর্যায়ে কয়েকটি নিয়মিত ব্যাটালিয়ন এবং বিভিন্ন সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর বিরুদ্ধে কয়েকটি ছোটখাট সংঘর্ষে সীমিত বিজয় লাভেও সমর্থ হয়।

চতুর্থ পর্যায়ঃ ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। এটা ছিলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ বাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর যৌথ অভিযানের কাল—যার ফলশ্রুতি ছিলো ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের চূড়ান্ত বিজয় লাভ।

২৪
তিক্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব

১৯শে জুন দিবাগত রাতে বেলুনিয়া পতনের পর বাংলাদেশে আমাদের সর্বশেষ স্থানটুকুও হাতছাড়া হয়ে গেলো। নিঃশব্দে আমাদেরকে এই পরিণতি মেনে নিতে হয়েছিলো। কুমিল্লা এবং সিলেট সেক্টরে ভারতীয় সীমানা বরাবর মাত্র কয়েক বর্গমাইল জায়গা ছাড়া আমাদের আর কোনো স্থান এরপর দখলে ছিলো না। এই সময়ে এক দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। আমার ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা মনে পড়ছিলো। তাদের গৌরবজনক আত্মত্যাগ এবং তৎপরবর্তী বিজয় লাভের কথা স্মরণ করে আমরা আত্মশক্তি ফিরে পাচ্ছিলাম। এই জাতীয় দুর্বিপাক শুধু আমাদের একার ওপরেই নেমে আসেনি। স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্বমানবতার অত্যুগ্র আকাঙ্খা এবং দুঃসহ কষ্ট স্বীকারের সনাতন চিত্র আমাদের মানসপটেও তখন ভাসমান।

কিন্তু আমাদের এই স্বপ্ন কতদিনে সত্য হয়ে উঠবে প্রত্যেকেই আমরা নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে তার হিসাব করছিলাম। কেউ কেউ আশু ভারতীয় হস্তক্ষেপ কামনা করছিলো। আবার কেউ আপন শক্তির ওপর নির্ভর করে স্বাধীনতার জন্য সুদীর্ঘ বিশ বছর কিংবা আরও বেশি সময় ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করছিলো।

তখন পর্যন্ত ভারতের সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার আগ্রহ তেমন দেখা যায়নি। অবশ্য এজন্যে ভারতের অনুকূলে (প্রথমতঃ) বিশ্বজনমত প্রয়োজন ছিলো। নিপীড়িত বাঙালীর পক্ষে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের প্রশ্নে না হলেও অন্ততঃ পাকবাহিনীর নৃশংসতার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপনের জন্যেও বিশ্বজনমত গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিলো। (দ্বিতীয়তঃ) অনেক আগে থেকেই পাকিস্তানীরা ভারতকে এই উপমহাদেশে মুসলমানদের শত্রু বলে চিহ্নিত করে আসছিলো। তাই এ ব্যাপারে একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে জনগণের সমর্থন পাওয়ার আশা কম ছিলো। ভারতীয়দের তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপে বাংলাদেশে পর্যন্ত ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারতো।

তৃতীয় পর্যায়ঃ অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত। এ সময়ে গেরিলা তৎপরতা তীব্রতর করা হয় এবং কয়েকটি সীমিত নিয়মিত সামরিক কার্যক্রম গৃহীত হয়। এই পর্যায়ে কয়েকটি নিয়মিত ব্যাটালিয়ন এবং বিভিন্ন সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর বিরুদ্ধে কয়েকটি ছোটখাট সংঘর্ষে সীমিত বিজয় লাভেও সমর্থ হয়।

চতুর্থ পর্যায়ঃ ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। এটা ছিলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ বাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর যৌথ অভিযানের কাল—যার ফলশ্রুতি ছিলো ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের চূড়ান্ত বিজয় লাভ।

২৪

তিক্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব

১৯শে জুন দিবাগত রাতে বেলুনিয়া পতনের পর বাংলাদেশে আমাদের সর্বশেষ স্থানটুকুও হাতছাড়া হয়ে গেলো। নিঃশব্দে আমাদেরকে এই পরিণতি মেনে নিতে হয়েছিলো। কুমিল্লা এবং সিলেট সেক্টরে ভারতীয় সীমানা বরাবর মাত্র কয়েক বর্গমাইল জায়গা ছাড়া আমাদের আর কোনো স্থান এরপর দখলে ছিলো না। এই সময়ে এক দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। আমার ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা মনে পড়ছিলো। তাদের গৌরবজনক আত্মত্যাগ এবং তৎপরবর্তী বিজয় লাভের কথা স্মরণ করে আমরা আত্মশক্তি ফিরে পাচ্ছিলাম। এই জাতীয় দুর্বিপাক শুধু আমাদের একার ওপরেই নেমে আসেনি। স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্বমানবতার অত্যুগ্র আকাঙ্খা এবং দুঃসহ কষ্ট স্বীকারের সনাতন চিত্র আমাদের মানসপটেও তখন ভাসমান।

কিন্তু আমাদের এই স্বপ্ন কতদিনে সত্য হয়ে উঠবে প্রত্যেকেই আমরা নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে তার হিসাব করছিলাম। কেউ কেউ আশু ভারতীয় হস্তক্ষেপ কামনা করছিলো। আবার কেউ আপন শক্তির ওপর নির্ভর করে স্বাধীনতার জন্য সুদীর্ঘ বিশ বছর কিংবা আরও বেশি সময় ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করছিলো।

তখন পর্যন্ত ভারতের সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার আগ্রহ তেমন দেখা যায়নি। অবশ্য এজন্যে ভারতের অনুকূলে (প্রথমতঃ) বিশ্বজনমত প্রয়োজন ছিলো। নিপীড়িত বাঙালীর পক্ষে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের প্রশ্নে না হলেও অন্ততঃ পাকবাহিনীর নৃশংসতার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপনের জন্যেও বিশ্বজনমত গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিলো।

(দ্বিতীয়তঃ) অনেক আগে থেকেই পাকিস্তানীরা ভারতকে এই উপমহাদেশে মুসলমানদের শত্রু বলে চিহ্নিত করে আসছিলো। তাই এ ব্যাপারে একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে জনগণের সমর্থন পাওয়ার আশা কম ছিলো। ভারতীয়দের তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপে বাংলাদেশে পর্যন্ত ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারতো।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের যুদ্ধ পরিচালনার মতো পুরো প্রস্তুতি ভারতীয় সেনা-বাহিনীর তখন ছিলো না। পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের অধিকাংশ সৈন্যই নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের দমনের কাজে ব্যস্ত ছিলো। এমন কি পশ্চিম বঙ্গের নকশালীদের বিরুদ্ধেও তাদের ব্যস্ত থাকতে হতো। তাই তখন ভারতের সামরিক মানচিত্রে পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্ব ছিলো কম।

এছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর শক্তিশালী অংশটি তখন ছিলো চীন এবং পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে মোতায়েন। তাই বাংলাদেশে কোন সক্রিয় অভিযানের পূর্বে ভারতীয় বাহিনীর সার্বিক পুনর্গঠন অত্যাবশ্যক ছিলো। পশ্চিম পাকিস্তান কিংবা চীনের দিক থেকেও হামলা আসার সম্ভাবনা থাকায় একই সঙ্গে দু'টি সীমান্তে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা বলবৎ রাখার প্রয়োজন ছিলো। চীন সে সময় বাংলাদেশে সৃষ্ট ঘটনাবলীর জন্য প্রকাশ্যেই পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন এবং ভারতের সমালোচনা করছিলো। তবে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ কিংবা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে চীন ছিলো নীরব। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, স্বাধীনতা অর্জনে বাঙালীরা বদ্ধপরিকর কিনা এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছতে তারা ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত কিনা, সে বিষয়ে ভারত এবং তার বিশ্বস্ত মিত্র রাশিয়া নিঃসন্দেহ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করছিলো। অক্টোবর পর্যন্ত ভারত হয়তো দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো। এরপরে তাদের সিদ্ধান্ত নেবার সময় আসে। ভারতে এক কোটি শরণার্থীর আহার-বাসস্থানের খরচ বছরে ৫২৫ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। বিদেশী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিলো মাত্র ১১২ কোটি ৫০ লাখ টাকা। অবশিষ্ট ৪১২ কোটি ৫০ লাখ টাকা ভারতের ঘাড়েই চেপে যায়। ভারতের পক্ষে এ ভার বহন সাধ্যের অতীত হয়ে ওঠে। অপরদিকে ক্ষণস্থায়ী একটা চূড়ান্ত হামলার খরচ এর চাইতে অনেক কম। সবচাইতে বড় কথা, ভারতের মাটিতে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর জন্য ভারতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এমন কি মারাত্মক রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টির সম্ভাবনাও ছিলো। তাই স্বেচ্ছায় তাদের ঘরে ফেরার পরিবেশ যতো তাড়াতাড়ি সৃষ্টি করা যায়, ভারতের পক্ষে ততই ছিলো মঙ্গল। ইয়াহিয়া খান অবশ্য তখনও ধ্বংসের চিন্তায় মগ্ন!

পাকিস্তানী প্রচার যন্ত্র প্রথম থেকেই বিশ্ববাসীকে মিথ্যা স্তোকবাক্য শোনাচ্ছিলো। প্রচারের মাধ্যমগুলো বলছিলো, বাংলাদেশে সবকিছুই স্বাভাবিক ভাবে চলছে এবং শরণার্থীরাও দেশে ফিরে আসছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র ছিলো তার বিপরীত। তখনো প্রতিদিন হাজার হাজার শরণার্থী ভারতের পথে পাড়ি জমাচ্ছিলো।

এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর দেশ ত্যাগের ঘটনা ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। তাদের অধিকাংশই ছিলো পায়দলের যাত্রী। কেউ বা নৌকায়

করে, ভেলায় চড়ে, পারলে গরুর গাড়ি জোগাড় করে দলে দলে সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছিলো। চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধ এবং রোগীদের নেয়া হতো ঘাড়ে করে কিংবা বাঁশের মাচানে বেঁধে। এদের সবাই যেন এক একটি বিষাদের প্রতিমূর্তি। পথ চলতে চলতে অনেকেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে এবং এদেরকে ফেলে যাওয়া ছাড়া সঙ্গীদের কোন গত্যন্তর ছিলোনা। খোলা আকাশের নীচে এইসব লাশ দিনের পর দিন পঁচতে থাকতো কিংবা শকুন ও শিয়াল উদর পূর্তি করতো। কেউ কেউ আবার ধরাও পড়তো। পাকবাহিনী এদেরকে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে নৃশংস ভাবে হত্যা করতো।

একবার একদল শরনার্থী পাকিস্তানী টহলদারদের দেখতে পেয়ে পাটখেতের মধ্যে আত্মগোপন করে, এদের সাথে ছিলো একমাসের শিশু সন্তান সহ এক মহিলা। পাটখেতে লুকানো শিশুটি হঠাৎ কেঁদে উঠে। হানাদাররা শুনতে পাবে এই ভয়ে মা সন্তানের মুখ চেপে ধরে। আতংক আর ত্রাসে কতক্ষণ সে শিশুর মুখ এইভাবে চেপে ধরে রেখেছিলো তা আর মনে ছিলো না। পাকিস্তানীরা চলে যাবার পর দেখা যায় শিশুটি চিরতরে নিস্পন্দ হয়ে গেছে। পরবর্তীতে শরণার্থী শিবিরে এ ঘটনার কথা আমি শুনেছিলাম।

সীমান্ত পথের যাত্রী আরেকটি পরিবারকে পাকিস্তানীরা ধরে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে মা বাবার সামনেই সৈন্যরা তাদের এক কিশোরী কন্যাকে অত্যাচার করতে থাকে। দুঃসহ যন্ত্রণায় মেয়েটি কিছু ক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এরপরই সৈন্যরা শরণার্থীদের "সীমান্ত পার করে দেবো" বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। পরের রাতে ওদেরকে সীমান্তের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে নরপশুরা হাসতে হাসতে মা-বাবাকে গুলী করে হত্যা করে এবং মেয়েটিকে আবার ক্যাম্পে নিয়ে আসে। মাসখানেক পর একটা ঝোঁপের পাশে শিয়ালে খাওয়া মেয়েটির লাশের অর্ধেক পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের দীর্ঘ সীমান্ত রেখা বরাবর এ ধরণের বেদনাময় ঘটনা আরো কত যে ঘটেছে তার খবর আজ আর দেয়া সভব নয়। এতদসত্বেও এক কোটি লোক এই সীমান্ত পার হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে শিবির গড়ে তোলা হয়েছিলো। কিন্তু সমস্যাটি এত বিরাট ও ভয়াবহ ছিলো যে অনেক সময় এর কোন সমাধানকে অসম্ভব বলে মনে হতো। প্রথম দিকে শরণার্থীদের অধিকাংশকেই থাকতে হতো রাস্তার পাশে কিংবা রেল ষ্টেশন, বিমান ঘাঁটি অথবা স্কুল কলেজের শূন্য ঘরে। আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ সর্বত্রই একই দৃশ্য। তারা হানাদার বাহিনীর রোষানলের কবল থেকে মুক্তি পেলেও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই

পাচ্ছিলো না। বিভিন্ন শিবিরে মহামারী দেখা দেয়। স্বদেশের মাটি থেকে অনেক দূরে অসহায় শরণার্থীরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে থাকে। শিশু ও বৃদ্ধরাই মহামারীর সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছিলো। ওষুধের অভাব, ডাক্তারের সংখ্যাও ছিলো নগণ্য। সে অবস্থা ছিলো অবর্ণনীয়।

যুদ্ধ শিবিরগুলোর অবস্থাও তেমন কিছু ভালো ছিলোনা। পাকিস্তানীদের সঙ্গে লড়াই করার উদ্দেশ্যে ভারতে গমনকারী বাঙালী তরুণ ও যুবকদের জন্য এই সব শিবির স্থাপন করা হয়েছিলো। প্রথম অবস্থায় গড়ে প্রতিদিন পাঁচশত থেকে এক হাজার তরুণ এই সব শিবিরে উপস্থিত হতো। এদের এই সংখ্যা অনুপাতেই প্রতিটি শিবিরের জন্য রসদপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অনেক শিবিরেই বাড়তি এক হাজার লোকের খাবার ব্যবস্থা করতে হতো। জুলাই থেকে শরণার্থী তরুণদের সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে যাওয়াতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানীরাও বুঝতে পারে যে গেরিলা যুদ্ধের জোর প্রস্তুতি চলছে। এবং এ যুদ্ধের প্রধান শক্তি হবে বাঙালী তরুণরা। তাই তারা সকল এলাকার বাড়ি বাড়ি তল্লাশী চালিয়ে তরুণ বয়সী সবাইকে আটক করতে শুরু করে। এদের কেউ আর দখলদারদের হাত থেকে ছাড়া পায়নি। যাদেরকেই ধরতে পেরেছে তাদেরকেই পাকিস্তানীরা হত্যা করেছে। প্রায়ই চোখে পড়তো এক সাথে দড়ি দিয়ে বাধা ৫/৬টি ছেলের লাশ রাস্তার পাশেই পড়ে আছে কিংবা নদী দিয়ে ভাসছে। হানাদার সৈন্যরা যেখানে ক্যাম্প করেছিলো তার আশে পাশেই এ দৃশ্য বেশি চোখে পড়তো। পাকিস্তানীরা ধরেই নিয়েছিলো এটাই হচ্ছে বাঙালীদের উপযুক্ত প্রাপ্য। এর ফলে গ্রাম বাংলার সর্বত্র আতংক ছড়িয়ে পড়ে। কেউ আর উঠতি বয়সের ছেলেদের ঘরে রাখতে সাহস পাচ্ছিলো না। পনের থেকে পঁচিশ বছরের প্রায় সবাই তাই বাড়ীঘর ছেড়ে আত্মগোপন করে চলতে থাকে। তাদের অধিকাংশই সীমান্ত পার হয়ে ভারতে উপস্থিত হয়। বাঙালীরাও বুঝতে পেরেছিলো যে মুক্তিবাহিনীতে বাঙালীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য পাকিস্তানীরা এদেশের তরুণ সমাজকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসেই সম্ভবতঃ সবচাইতে বেশি সংখ্যক তরুণ ভারতীয় শিবিরগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এই মাসগুলোতে এ দেশের মানুষ পাকিস্তানীদের হাত থেকে আপন পুত্র সন্তানকে যে কোথায় লুকিয়ে রাখবে সেই চিন্তাতেই ছিলো অধীর। বস্তুতঃ পাকিস্তানের হাত থেকে রক্ষার জন্য বাবা মা এবং বোনেরা যুবকদের বাড়ি ছেড়ে ভারতে চলে যেতে বলতো। তাদের ভয় ছিলো দেশে থাকলে পাকিস্তানীরা যে কোন সময় তাদের ধরে নিয়েই মেরে ফেলবে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই মায়েরা ছেলেদের বাড়ি থেকে চলে

যেতে বলেছে। বোনেরা চোখের পানিতেই ভাইদের বিদায় জানিয়েছে। তারা প্রার্থনা জানিয়ে বলেছে নিশ্চয়ই এরা এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারবে। আবার এরা ফিরে আসবে। আবার তাদের ঘর ভরে উঠবে আনন্দ হাসিতে। অনেক তরুণ সত্যসত্যই এক দিন ফিরে এসেছিলো ; আবার অনেকে ফিরে আসেনি আর কোনদিন। শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। দেশের জন্য যুদ্ধ করে কত তরুণ যে চিরদিনের তরে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে তার হিসাব নেই। বাংলার মানুষ এই সব সন্তানদের ভুলে গেছে সময়ের বিবর্তনে।

কিন্তু তাদের পিতামাতার কাছে, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে, বোনদের কাছে এখনো তাদের স্মৃতি বারে বারে ফিরে আসে—নির্জন রাতের অন্ধকারে, নিঃসঙ্গে। আজও কত মায়েরা বোনেরা, চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া তাদের আপনজনদের জন্য নিঃশব্দে ফেলে চোখের জল। কোন লেখকই কোনদিন তাঁর লেখনীতে স্বামীহারা, সন্তানহারার যন্ত্রনাকাতর সেইসব বেদনার্ত হৃদয়কে মূর্ত করে তুলতে পারবেন না, কোন শিল্পীর পক্ষেও রক্তাক্ত সেই বেদনার ছবি আঁকা কখনো সম্ভব হবে না। আর আজ আমরা ক'জনই বা সেই স্বামীহারা সন্তানহারা যন্ত্রণাকাতর সেই মানুষগুলোর কথা ভাবি?

তরুণদের অপ্রত্যাশিত ভীড় শিবিরগুলোর ব্যাবস্থাপনা আমাদের জন্য বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছিলো। প্রতিদিন গড়ে প্রায় সহস্রাধিক অতিরিক্ত লোকের জন্য আহারের ব্যবস্থা করতে হতো। এ জন্য অন্যদের নির্ধারিত আহার্য কমিয়ে দিতে হয়। প্রায়ই আমাদেরকে সামরিক শিবিরের রেশন দিয়ে শিবিরের প্রয়োজন মেটাতে হতো। সামরিক শিবিরের নিকটবর্তী যুব শিবিরগুলোর জন্য এ ব্যবস্থা সম্ভব হলেও দূরের যুব শিবিরগুলোর জন্য তা সম্ভব হয়নি।

আরো অনেকগুলো সমস্যাই সমান প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিলো। অধিকাংশ লোকই বাড়ি ঘর সহায় সম্বল ত্যাগ করে এক কাপড়ে চলে এসেছিলো। অতিরিক্ত ভীড়ের কারণে শিবিরগুলোর আবহাওয়াও দূষিত হয়ে উঠেছিলো। ফলে মহামারী আকারে রক্ত আমাশয় দেখা দেয়। ঔষধের অভাবে অনেকেরই প্রাণ হারাতে হয়। ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা ও পেটের পীড়া ছিলো প্রতিটি শিবিরের সাধারণ রোগ।

শিবিরের বাসিন্দাদের মধ্যেও অনেকগুলো সংকটের জন্ম নেয়। রাজনৈতিক বিরোধিতা, হিংসা, আত্মদম্ভ এবং নিয়ম-শৃংখলার অভাব—সবকিছু মিলিয়ে এক একা সময় শিবিরের স্বাভাবিক কাজ পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে উঠতো। সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেও অনেক সময় এদের মধ্যে তুমুল লড়াই বেধে যেতো।

এমনকি কে কোন্ ব্যারাকে শোবে তা নিয়েও মারামারি বেধে যেতো। বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর অত্যাচার আর নির্যাতনের হাত থেকে একবার বাঁচতে পেরে অনেক তরুণই এই বিদেশ বিভূঁইয়ে কেন এসেছে সেকথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলো। দোষ যে কারো ছিলো না তা নয়। শিবিরের কমাণ্ডার এবং কিছু রাজনৈতিক নেতা এ দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। তরুণদের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য আমরা তেমন চেষ্টা করিনি। এটা খুবই দুঃখ-জনক।

খুব কম সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা এসেছিলো শিল্প শ্রমিকদের ভেতর থেকে। চট্টগ্রাম এলাকার প্রায় একলাখ শিল্প শ্রমিকের মধ্যে বড়জোর একশত লোক আমার সেক্টরে যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলো।

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি সংখ্যায় ছিলো ছাত্র। একথা এক বাক্যে বলা যায় যে, দেশের স্বাধীনতার জন্য ছাত্র সমাজের অবদান ছিল সর্বাধিক। জাতি চিরদিন দেশমাতৃকার সেবায় আত্ম নিবেদিত এই সব তরুণকে স্মরণ করবে, যারা বিদেশী শাসন, শোষণ আর অত্যাচারের হাত থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য অকুতভয়ে যুদ্ধ করেছিলো। ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয়ে তারা ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন করেছিলো সত্য, কিন্তু ন্যায় বিচার ভিত্তিক শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাদের এখনো স্বপ্নই রয়ে গেছে। দেশের জন্য বিরল আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেও তাদের মধ্যে দু'একজন আবার সমস্যারও সৃষ্টি করেছিলো। সম্ভবতঃ এই ধরনের যুদ্ধে এটাই স্বাভাবিক। তবে নিশ্চয়ই এ কথা আশা করা ভুল হবে না যে, শেষ পর্যন্ত একদিন তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং জীবনের বাস্তবতার সঙ্গেও নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হবে।

'৭১-এর ছাত্রসমাজ ছিলো সম্ভবতঃ সবচাইতে অধিক রাজনৈতিক সচেতন, মাতৃভূমির স্বাধীনতায় গভীরভাবে আত্মনিবেদিত। কিন্তু অন্যদিকে তারা দলীয় রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়েছিলো। তাদের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নানা সমস্যারও সৃষ্টি করছিলো। এদের মধ্যে প্রায় সময়ই ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকতো। তবে এই সব বিরোধের সমাধানও অসাধ্য কিছু ছিলোনা, বিভিন্ন সময়ে আমরা অনায়াসেই তাদের অনেক বাহ্যিক দ্বন্দ্বের ফয়সালা করতে পেরেছি। এদের মধ্যে অবশ্য স্বল্পসংখ্যক ছাত্রকে কিছুতেই পথে আনা যায়নি। এরা ছিলো প্রধানতঃ ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান। এজন্যই হয়তো এমনটি হয়েছিলো। একজন গেরিলার কঠোর জীবনের সাথে তারা কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছিলো না। আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল এসব পরিবারের সদস্যদের যা হয়ে থাকে। আয়েশী জীবন যাপনে অভ্যস্ত এই সব তরুণ সাধারণতঃ আদেশ পালনে অনিচ্ছুক

ছিলো। যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের চাইতে অভিজ্ঞ কেউ যদি কি ভাবে কোথায় যুদ্ধ করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে যেতেন তাহলে তাদের কেউ কেউ এটাকে উপর থেকে চাপানো নির্দেশ বলে মনে করতো। এই সব ছেলেকে অল্প সময় কিছুতেই কথা বোঝানো যেতো না। সপ্তাহ দুয়েকের ট্রেনিংয়ের পরে মনে করতো তারা এক একজন চে গুয়েভারা, মাওসেতুং কিংবা রোমেল বনে গেছে। বাঙালী সেনাবাহিনীর সদস্যরা যে তাদেরই ভাই, একই লক্ষ্য সামনে রেখে যে তারা সকলে যুদ্ধ করছে তারা সামরিক প্রশ্নে তাদের চাইতে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নির্দেশ মানা প্রয়োজন এ কথা কিছুতেই তাদের বুঝানো যেতোনা। সবাই চাইতো সে-ই গ্রুপ লিডার, থানা লিডার, কিংবা জেলা লিডার হবে। কারো আদেশ মেনে কাজ করতে তারা ছিলো নারাজ।

যুদ্ধে সবচাইতে বেশি সহযোগিতা করেছে আমাদের কৃষক সমাজ। তাদের মধ্যে আত্মম্ভরিতা কিংবা মিথ্যা গর্বের বালাই ছিলো না। স্বাধীনতার জন্য তারা ছিলো আন্তরিক এবং নিবেদিত। লাভক্ষতির হিসাব তারা জানতো না। একজোড়া বুট, একটি লুঙ্গী, কিংবা কম্বল অথবা খুব ভালো খাবারের প্রতিও তাদের কখনো লোভ করতে দেখিনি। উচ্চাভিলাষহীন এই সব সরল লোককে যেখানেই যে কাজ দেয়া হয়েছে তা তারা হাসিমুখে পালন করেছে।

নীচের পর্যায়ের কিছু রাজনৈতিক নেতার দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ সে সময় লক্ষ্য করা গেছে। স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব বাজী রেখে দেশের আপামর জনসাধারণ যখন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত, তখন তারা স্বাধীনতা অর্জনের পর কে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদটি দখল করবে তাই নিয়ে ছিলো ব্যস্ত। তারা রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েমের তিক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। অচিরেই তাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির উদ্ভব ঘটে, যা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলটিকে প্রায় বিভক্ত করে ফেলে। এর সাথে আবার যুক্ত হয়েছিলো কিছু লোকের অশালীন জীবন ধারা। বলতে দ্বিধা নেই, একটি জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসকে তারা করেছিলো কালিমালিপ্ত। বিলাসবহুল আবাস, সুন্দর দামী পোশাক, উত্তম খাদ্য এবং পানীয়, দামী সিগারেট এ সবই ছিলো তাদের বুর্জোয়া সুলভ জীবনের সহচর, অভুক্ত বাঙালীরা যখন ছেঁড়া কাপড়ে চরম প্রতিকূল এক মানবেতর পরিবেশে লড়াই করে যাচ্ছিলো, দেশের কোটি কোটি মানুষের মাথার উপর যখন প্রতিনিয়ত মৃত্যুর খড়্গ ঝুলছিলো তখন এরা দুঃখী দেশবাসীর প্রতি শ্রদ্ধার নির্দশন স্বরূপ সামান্যতম সহমর্মিতা কিংবা আত্মসংযমের পরিচয় দিতে পারেননি। এই অশালীন জীবন যাপনের জন্য একদিন যে বিপক্ষের

প্রতারণার শিকার হতে পারেন একথাও তারা বেমালুম ভুলে বসেছিলেন। অবশ্য নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকদের জীবন ধারা ছিলো ভিন্নতর। তাঁরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের এবং বিশ্বের কাছে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রি জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এবং কর্ণেল ওসমানীর নাম বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। সংগ্রামী জীবনের কঠোরতম কৃচ্ছতার জন্য তাঁরা সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছিলেন।

কিছু সংখ্যক নেতার রাজনৈতিক তৎপরতার কারণে আরেকটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিলো। যুব শিবিরে আগত প্রত্যেক তরুণ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি অনুগত কিনা তা যাচাই-এর ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পদক্ষেপ নিতেন এবং বাছাই ও মনোনয়ন পর্ব শেষ হলে তাদেরকে ট্রেনিং গ্রহণের সুযোগ দেয়া হতো। তারপর তাদেরকে বাংলাদেশের ভেতরে গেরিলা যুদ্ধের জন্য পাঠানো হতো। সে সময় এ ব্যাপারে বেশ কিছু অভিযোগ পাওয়া যায় যে, অতি উৎসাহী কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের কোনো ছাত্র কিংবা তরুণকে ট্রেনিং গ্রহণের জন্য বাছাই করছিলেন না। এতে করে ট্রেনিং থেকে বাদ পড়া তরুণদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এবং সামরিক কমাণ্ডাররাও এতে অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। আমরা সবাই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিলাম। কথাটি আমাদের কিছু সংখ্যক লোক ভুলে যেতেন। অন্য রাজনৈতিক দলের লোকেরাও ছিলো খাঁটি দেশপ্রেমিক। অথচ কিছু সংখ্যক সংকীর্ণ দৃষ্টির অতি উৎসাহী এবং বিবেকবর্জিত নেতৃবৃন্দের এহেন কার্যকলাপের দরুণ তাদেরকে নিদারুণ সংকটের মধ্যে পড়তে হয়। অবশ্য সুস্থ চিন্তাধারার সিনিয়র আওয়ামী লীগ নেতাদের হস্তক্ষেপে পরের দিকে এ অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং সমগ্র বিষয়টিকে ক্রমান্বয়ে সঠিক পথে পরিচালনার চেষ্টা করা হয়।

একটি ঘটনার কথা এখানে না বলে পারছিনা, কারণ স্বাধীনতার পর বিষয়টি আমাদের (সামরিক কমাণ্ডারদের) অনেকের মধ্যে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো। ভারতীয় এলাকায় শ্রীনগর ফাঁড়ির কাছে (ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শুভপুর সেতুর অদূরে) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) ব্যারিষ্টার আফসার স্থানীয় বি. এস. এফ. কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ছোট একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খুলেছিলেন। তাঁর কাজে আমরা আপত্তির কোন কারণ খুঁজে পাইনি। কেননা, ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক ট্রেনিং এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি সবকিছুই আমাদের অফিসারদের কঠোর তত্ত্বাবধানে হচ্ছিলো। ডানপন্থী-বামপন্থী নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাচ্ছিলো এবং আমরাও চাচ্ছিলাম তাদের সকলকে সঙ্গে নিতে। এ জন্য ন্যাপ বামপন্থী

না ডানপন্থী, সে প্রশ্ন আমাদের কাছে ছিলো অবান্তর। কিন্তু কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা এই অকপট উদ্যোগের বিকৃত অর্থ করায় এবং ভুল তথ্য পরিবেশন করায় আমাদেরকে বামপন্থী বলে চিহ্নিত করা হয়। তারা রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাদের সার্বিক নিরপেক্ষতাকে কলঙ্কিত করে তোলে। শ্রীনগরের ক্যাম্প নিয়ে একটা রাজনৈতিক গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতারা ক্যাম্পটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানান। বি. এস. এফ কর্তৃপক্ষ এই ক্যাম্পের উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পারলেও রাজনৈতিক চাপে তারা এটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের অনুসারী নয় এমন বহু মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলো। প্রতিটি সেক্টরেই তারা যুদ্ধ করেছে। সেক্টর কমাণ্ডাররাও চাইতেন, রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে দেশপ্রেমিক উপযুক্ত সকল নাগরিকই যেন দেশের জন্য যুদ্ধ করার সুযোগ পায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই আন্তরিক প্রচেষ্টার ভুল অর্থ করা হতো, এবং ফলে সৃষ্টি হতো ভুল বোঝাবুঝির। আমাদের অনেককেই নকশালী, বামপন্থী, ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা হতো। স্বাধীনতার পর অনেকের কাছে আমরা দীর্ঘদিন সন্দেহের পাত্র হয়েছিলাম।

এতসব সমস্যা, সংকট সত্ত্বেও আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের লক্ষ্য ছিলো সুস্পষ্ট। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই স্বাধীনতা অর্জনের পরে কোনো কিছু প্রাপ্তির আশা পোষণ করতেন। আমাদের প্রচুর সমস্যাও ছিলো। শত্রুর ওপর বড় রকমের আক্রমণ পরিচালনার পূর্বেই সেইসব সমস্যার সমাধান করে আমাদের যুদ্ধ পরিচালনার পথকে সহজ করে নেয়া প্রয়োজন ছিলো।

উল্লেখিত সমস্যাবলীর সমাধানের উদ্দেশ্যে সেক্টর কমাণ্ডারদের নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেই প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। ৯ই জুলাই উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য অবিলম্বে কলকাতা যাওয়ার একটি জরুরী বার্তা পেলাম ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাধ্যমে।

প্রতারণার শিকার হতে পারেন একথাও তারা বেমালুম ভুলে বসেছিলেন। অবশ্য নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকদের জীবন ধারা ছিলো ভিন্নতর। তাঁরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের এবং বিশ্বের কাছে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রি জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এবং কর্ণেল ওসমানীর নাম বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। সংগ্রামী জীবনের কঠোরতম কৃচ্ছতার জন্য তাঁরা সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছিলেন।

কিছু সংখ্যক নেতার রাজনৈতিক তৎপরতার কারণে আরেকটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিলো। যুব শিবিরে আগত প্রত্যেক তরুণ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি অনুগত কিনা তা যাচাই-এর ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পদক্ষেপ নিতেন এবং বাছাই ও মনোনয়ন পর্ব শেষ হলে তাদেরকে ট্রেনিং গ্রহণের সুযোগ দেয়া হতো। তারপর তাদেরকে বাংলাদেশের ভেতরে গেরিলা যুদ্ধের জন্য পাঠানো হতো। সে সময় এ ব্যাপারে বেশ কিছু অভিযোগ পাওয়া যায় যে, অতি উৎসাহী কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের কোনো ছাত্র কিংবা তরুণকে ট্রেনিং গ্রহণের জন্য বাছাই করছিলেন না। এতে করে ট্রেনিং থেকে বাদ পড়া তরুণদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এবং সামরিক কমাণ্ডাররাও এতে অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। আমরা সবাই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিলাম। কথাটি আমাদের কিছু সংখ্যক লোক ভুলে যেতেন। অন্য রাজনৈতিক দলের লোকেরাও ছিলো খাঁটি দেশপ্রেমিক। অথচ কিছু সংখ্যক সংকীর্ণ দৃষ্টির অতি উৎসাহী এবং বিবেকবর্জিত নেতৃবৃন্দের এহেন কার্যকলাপের দরুণ তাদেরকে নিদারুণ সংকটের মধ্যে পড়তে হয়। অবশ্য সুস্থ চিন্তাধারার সিনিয়র আওয়ামী লীগ নেতাদের হস্তক্ষেপে পরের দিকে এ অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং সমগ্র বিষয়টিকে ক্রমান্বয়ে সঠিক পথে পরিচালনার চেষ্টা করা হয়।

একটি ঘটনার কথা এখানে না বলে পারছিনা, কারণ স্বাধীনতার পর বিষয়টি আমাদের (সামরিক কমাণ্ডারদের) অনেকের মধ্যে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো। ভারতীয় এলাকায় শ্রীনগর ফাঁড়ির কাছে (ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শুভপুর সেতুর অদূরে) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) ব্যারিষ্টার আফসার স্থানীয় বি. এস. এফ. কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ছোট একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খুলেছিলেন। তাঁর কাজে আমরা আপত্তির কোন কারণ খুঁজে পাইনি। কেননা, ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক ট্রেনিং এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি সবকিছুই আমাদের অফিসারদের কঠোর তত্ত্বাবধানে হচ্ছিলো। ডানপন্থী-বামপন্থী নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাচ্ছিলো এবং আমরাও চাচ্ছিলাম তাদের সকলকে সঙ্গে নিতে। এ জন্য ন্যাপ বামপন্থী

না ডানপন্থী, সে প্রশ্ন আমাদের কাছে ছিলো অবান্তর। কিন্তু কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা এই অকপট উদ্যোগের বিকৃত অর্থ করায় এবং ভুল তথ্য পরিবেশন করায় আমাদেরকে বামপন্থী বলে চিহ্নিত করা হয়। তারা রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাদের সার্বিক নিরপেক্ষতাকে কলঙ্কিত করে তোলে। শ্রীনগরের ক্যাম্প নিয়ে একটা রাজনৈতিক গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতারা ক্যাম্পটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানান। বি. এস. এফ কর্তৃপক্ষ এই ক্যাম্পের উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পারলেও রাজনৈতিক চাপে তারা এটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের অনুসারী নয় এমন বহু মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলো। প্রতিটি সেক্টরেই তারা যুদ্ধ করেছে। সেক্টর কমাণ্ডাররাও চাইতেন, রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে দেশপ্রেমিক উপযুক্ত সকল নাগরিকই যেন দেশের জন্য যুদ্ধ করার সুযোগ পায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই আন্তরিক প্রচেষ্টার ভুল অর্থ করা হতো, এবং ফলে সৃষ্টি হতো ভুল বোঝাবুঝির। আমাদের অনেককেই নকশালী, বামপন্থী, ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা হতো। স্বাধীনতার পর অনেকের কাছে আমরা দীর্ঘদিন সন্দেহের পাত্র হয়েছিলাম।

এতসব সমস্যা, সংকট সত্ত্বেও আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের লক্ষ্য ছিলো সুস্পষ্ট। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই স্বাধীনতা অর্জনের পরে কোনো কিছু প্রাপ্তির আশা পোষণ করতেন। আমাদের প্রচুর সমস্যাও ছিলো। শত্রুর ওপর বড় রকমের আক্রমণ পরিচালনার পূর্বেই সেইসব সমস্যার সমাধান করে আমাদের যুদ্ধ পরিচালনার পথকে সহজ করে নেয়া প্রয়োজন ছিলো।

উল্লেখিত সমস্যাবলীর সমাধানের উদ্দেশ্যে সেক্টর কমাণ্ডারদের নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেই প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। ৯ই জুলাই উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য অবিলম্বে কলকাতা যাওয়ার একটি জরুরী বার্তা পেলাম ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাধ্যমে।

২৫
বিলম্বিত কনফারেন্স

১০ই জুলাই আমি আগরতলা থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের একখানি বিমানে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে গৌহাটিতে আধ ঘণ্টার জন্য থেমে রাত সাড়ে আটটার দিকে কলকাতার আকাশে পৌঁছে গেলাম। নিচে তখন মুষলধারায় বৃষ্টির সাথে বেগে বাতাস বইছিলো। এহেন দুর্যোগে কয়েকবার চেষ্টা করার পর আমাদের বিমান রানওয়ে স্পর্শ করলো। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে আমার চার ঘণ্টার কষ্টকর যাত্রা শেষ হলো। রাত তখন ৯টা।

অচেনা কলকাতায় আমি সম্পূর্ণ এক অপরিচিত আগন্তুক। বিমান বন্দরের ভবনে কিছুক্ষণ পায়চারী করার পর একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। শিখ ড্রাইভারকে বললাম বাংলাদেশ আমি হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যেতে। কিন্তু রাতে আমি হেড কোয়ার্টার খুঁজে পেলাম না। তখন ড্রাইভারকে মাঝারী ধরনের একটি হোটেলে নিয়ে যেতে বললাম।

বহুদিন পরিচর্যার অভাবে আমার চুল, দাড়ি সমানে বেড়ে উঠেছিলো। পায়ে ক্যাম্বিশের জুতা জোড়া ছেঁড়া ও ময়লা, গায়ে বেঢপ মাপের জামাটিও আকারে বেশ বড়, পরণে ট্রাউজার এবং হাতে কিছু সরকারী কাগজপত্র ভর্তি একটি কাপড়ের থলে, এই ছিলো আমার সেদিনকার সর্বাঙ্গীন চেহারা। শিখ ড্রাইভার নিশ্চয়ই আমার সাথে রসিকতা করে থাকবে। সে আমাকে একটি ব্যয় বহুল হোটেলে পৌঁছে দিলো। হোটেলে ঢুকতেই অনুভব করলাম রিসেপশন রুমটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। আমি যেন হঠাৎ করে দারুণ একটা আঘাত পেলাম। মনের অজান্তেই হাত বাড়িয়ে আমার থলেটি স্পর্শ করলাম। সেখানে উপস্থিত সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত পুরুষ ও মহিলাদের বিস্মিত দৃষ্টির মুখে আমি বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। মুহূর্তে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞেস করলাম, "একটা রুম পাওয়া যাবে কি?" ভদ্রলোক আড়চোখে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটু জরীপ করে নিলেন। আমার জুতো, ট্রাউজার, সার্ট, থলে, দাড়ি কোন কিছুই তার দৃষ্টি এড়ালো না। তারপর কিছুটা কৌতুহলের হাসি

ফুটিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি...?" "হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি", সাথে সাথে জবাব দিলাম।

পরদিন সকালে হোটেল ত্যাগ করলাম। কিন্তু এক রাতের ভাড়া হিসাবে পকেটে যা ছিল তার অর্ধেকটা বেরিয়ে গেছে। বাংলাদেশ বাহিনীর হেড-কোয়ার্টারে যাওয়ার সারাটা পথে আমি শুধু সেই শিখ ড্রাইভারকে অভিসম্পাত করছিলাম।

১১ই থেকে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলনের আলোচনা সকালে শুরু হয়ে শেষ হতো রাতে। সেখানে সকল সেক্টর কমাণ্ডারই উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে আমরা নানা ধরণের সমস্যা এবং সমন্বিত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করি। উল্লেখ্য যে, তখন পর্যন্ত আমাদের চিন্তার কিংবা কাজের কোন সমন্বয় ছিলো না।

কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের ভবনটিতে আমরা মিলিত হয়েছিলাম। এটা ছিলো বিএসএফ-এর অফিস। যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকারকে এটি ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছিলো।

আমাদের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন জনাব তাজউদ্দীন আহমদ। বাংলাদেশ বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ কর্ণেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানী প্রথম দিনের অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নি।

১২ই জুলাই দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ছিলেন:

১. প্রধানমন্ত্রি তাজউদ্দীন আহমদ
২. কর্ণেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানী
৩. লেঃ কর্ণেল এম. এ. রব
৪. গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার
৫. মেজর (অবঃ) নুরুজ্জামান
৬. মেজর সি. আর. দত্ত
৭. মেজর জিয়াউর রহমান
৮. মেজর কে. এম. সফিউল্লাহ
৯. মেজর খালেদ মোশাররফ
১০. মেজর মীর শওকত আলী
১১. উইং কমাণ্ডার এম. কে. বাশার
১২. মেজর ওসমান চৌধুরী
১৩. মেজর রফিকুল ইসলাম
১৪. মেজর নাজমুল হক

২৫
বিলম্বিত কনফারেন্স

১০ই জুলাই আমি আগরতলা থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের একখানি বিমানে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে গৌহাটিতে আধ ঘণ্টার জন্য থেমে রাত সাড়ে আটটার দিকে কলকাতার আকাশে পৌঁছে গেলাম। নিচে তখন মুষলধারায় বৃষ্টির সাথে বেগে বাতাস বইছিলো। এহেন দুর্যোগে কয়েকবার চেষ্টা করার পর আমাদের বিমান রানওয়ে স্পর্শ করলো। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে আমার চার ঘণ্টার কষ্টকর যাত্রা শেষ হলো। রাত তখন ৯টা।

অচেনা কলকাতায় আমি সম্পূর্ণ এক অপরিচিত আগন্তুক। বিমান বন্দরের ভবনে কিছুক্ষণ পায়চারী করার পর একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। শিখ ড্রাইভারকে বললাম বাংলাদেশ আমি হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যেতে। কিন্তু রাতে আমি হেড কোয়ার্টার খুঁজে পেলাম না। তখন ড্রাইভারকে মাঝারী ধরনের একটি হোটেলে নিয়ে যেতে বললাম।

বহুদিন পরিচর্যার অভাবে আমার চুল, দাড়ি সমানে বেড়ে উঠেছিলো। পায়ে ক্যাম্বিশের জুতা জোড়া ছেঁড়া ও ময়লা, গায়ে বেঢপ মাপের জামাটিও আকারে বেশ বড়, পরণে ট্রাউজার এবং হাতে কিছু সরকারী কাগজপত্র ভর্তি একটি কাপড়ের থলে, এই ছিলো আমার সেদিনকার সর্বাঙ্গীন চেহারা। শিখ ড্রাইভার নিশ্চয়ই আমার সাথে রসিকতা করে থাকবে। সে আমাকে একটি ব্যয় বহুল হোটেলে পৌঁছে দিলো। হোটেলে ঢুকতেই অনুভব করলাম রিসেপশন রুমটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। আমি যেন হঠাৎ করে দারুণ একটা আঘাত পেলাম। মনের অজান্তেই হাত বাড়িয়ে আমার থলেটি স্পর্শ করলাম। সেখানে উপস্থিত সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত পুরুষ ও মহিলাদের বিস্মিত দৃষ্টির মুখে আমি বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। মুহূর্তে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞেস করলাম, "একটা রুম পাওয়া যাবে কি?" ভদ্রলোক আড়চোখে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটু জরীপ করে নিলেন। আমার জুতো, ট্রাউজার, সার্ট, থলে, দাড়ি কোন কিছুই তার দৃষ্টি এড়ালো না। তারপর কিছুটা কৌতুহলের হাসি

ফুটিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি...?" "হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি", সাথে সাথে জবাব দিলাম।

পরদিন সকালে হোটেল ত্যাগ করলাম। কিন্তু এক রাতের ভাড়া হিসাবে পকেটে যা ছিল তার অর্ধেকটা বেরিয়ে গেছে। বাংলাদেশ বাহিনীর হেড-কোয়ার্টারে যাওয়ার সারাটা পথে আমি শুধু সেই শিখ ড্রাইভারকে অভিসম্পাত করছিলাম।

১১ই থেকে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলনের আলোচনা সকালে শুরু হয়ে শেষ হতো রাতে। সেখানে সকল সেক্টর কমাণ্ডারই উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে আমরা নানা ধরণের সমস্যা এবং সমন্বিত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করি। উল্লেখ্য যে, তখন পর্যন্ত আমাদের চিন্তার কিংবা কাজের কোন সমন্বয় ছিলো না।

কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের ভবনটিতে আমরা মিলিত হয়েছিলাম। এটা ছিলো বিএসএফ-এর অফিস। যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকারকে এটি ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছিলো।

আমাদের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন জনাব তাজউদ্দীন আহমদ। বাংলাদেশ বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ কর্ণেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানী প্রথম দিনের অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নি।

১২ই জুলাই দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ছিলেন:

১. প্রধানমন্ত্রি তাজউদ্দীন আহমদ
২. কর্ণেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানী
৩. লেঃ কর্ণেল এম. এ. রব
৪. গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার
৫. মেজর (অবঃ) নুরুজ্জামান
৬. মেজর সি. আর. দত্ত
৭. মেজর জিয়াউর রহমান
৮. মেজর কে. এম. সফিউল্লাহ
৯. মেজর খালেদ মোশাররফ
১০. মেজর মীর শওকত আলী
১১. উইং কমাণ্ডার এম. কে. বাশার
১২. মেজর ওসমান চৌধুরী
১৩. মেজর রফিকুল ইসলাম
১৪. মেজর নাজমুল হক

১৫. মেজর এম. এ. জলিল

১৬. মেজর এ. আর. চৌধুরী

দশদিন ব্যাপী সম্মেলনে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি। এই বৈঠকে লেঃ কর্ণেল এম. এ. রব বাংলাদেশ বাহিনীর চীফ-অব-স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার ডেপুটি চীফ-অব-স্টাফ নিযুক্ত হন।

সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ যে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো তা হচ্ছে:

১. বিভিন্ন সেক্টরের সীমানা নির্ধারণ।

২. নিম্নলিখিত ভাবে গেরিলা যুদ্ধের আয়োজন:

ক. নির্ধারিত এলাকায় নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে পাঁচ অথবা দশ জনকে নিয়ে গঠিত ট্রেনিং প্রাপ্ত গেরিলা দলকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হবে।

খ. গেরিলাদের শ্রেণী বিভক্তি

অ্যাকশন গ্রুপ: এই গ্রুপের সদস্যরা শত্রুর বিরুদ্ধে সরাসরি গেরিলা হামলা পরিচালনা করবে। তারা শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ হাতিয়ার বহন করবে।

গোয়েন্দা সেনা: এই গ্রুপের গেরিলারা সাধারণতঃ সংঘর্ষে জড়িত হবে না। এরা শত্রু পক্ষের খবরাখবর সংগ্রহ করবে। এদের সাধারণতঃ শতকরা ৩০ ভাগের বেশি অস্ত্র থাকবে না।

গেরিলা ঘাঁটি: প্রতিটি ঘাঁটিতে গেরিলাদের থাকা খাওয়ার জন্য কয়েকটি নিরাপদ গৃহের ব্যবস্থা থাকবে যেখান থেকে যথাযথ খবর প্রাপ্তির পরই পরবর্তী লক্ষ্যস্থলে তারা পৌঁছতে পারবে। প্রত্যেক ঘাঁটিতে একটি করে মেডিক্যাল গ্রুপ থাকবে যারা প্রয়োজনে গেরিলাদের চিকিৎসা করবে। প্রত্যেক ঘাঁটিতে একজন রাজনৈতিক নেতার কিছু দায়িত্ব থাকবে। এদের দায়িত্ব হবে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে পাকিস্তানীদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়া এবং একই সংগে বাঙালীরা যেন মানসিক সাহস ও শক্তি হারিয়ে না ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। শত্রুর বিরুদ্ধে বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে আরো বেশি সংখ্যক গেরিলা কিংবা নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকদের স্থান সংকুলানের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিকে তৈরী রাখাও এদের দায়িত্ব ছিলো।

৩. নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের অবিলম্বে ব্যাটালিয়ন, ফোর্স এবং সেক্টর ট্রুপস-এর ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে।

৪. শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

ক. প্রতিটি সুবিধাজনক স্থানে শত্রুর বিরুদ্ধে রেইড এবং অ্যামবুশের মাধ্যমে আঘাত হানার জন্য বিপুল সংখ্যক গেরিলাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে দেয়া হবে না। বিদ্যুতের খুঁটি, সাবস্টেশন প্রভৃতি উড়িয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ অচল করার মাধ্যমে এ কাজ করতে হবে।

গ. পাকিস্তানীদেরকে কোন কাঁচামাল কিংবা উৎপাদিত পণ্য রফতানী করতে দেয়া হবে না। এসব জিনিস যে সব গুদামে থাকবে সেগুলো ধ্বংস করে দিতে হবে

ঘ. শত্রু পক্ষের সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম আনা নেয়ার জন্য ব্যবহারযোগ্য বাহন রেলপথ, নৌ-যান পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করতে হবে।

ঙ. রণকৌশলগত পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

চ. শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করার পরে তাদের বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলোর ওপর গেরিলারা মরণপণ আঘাত হানবে।

বিভিন্ন সেক্টর এবং ফোর্স পুনর্গঠনের কাজে ইপিআর-এর ভূমিকা ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ইপিআর বাহিনীর কাছ থেকেই বাংলাদেশ সরকার প্রায় সমুদয় অস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যবস্থা করেছিলো। শুধু তাই নয় প্রথম থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে তারাই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো। ইপিআর-এর অয়্যারলেস সেট এবং যান বাহন ব্যাপকভাবে কাজে লেগেছিলো। মুক্তিযুদ্ধে ইপিআর-এর সিগন্যালম্যানরা এবং ড্রাইভাররা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সেই দুর্দিনে স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত প্রাণ ড্রাইভাররা শত্রু পক্ষের তুমুল গোলাবৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমাদের সৈন্য ও রসদ বহণ করে দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আমাদের এই সম্মেলনে বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়:

এক নম্বর সেক্টর

ক. এলাকা: চট্টগ্রাম জেলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার অংশ বিশেষ (মুহুরী নদীর পূর্ব পাড় পর্যন্ত) নিয়ে এই সেক্টরটি গঠিত।

খ. সাব সেক্টরের সংখ্যা পাঁচ

গ. সেক্টর ট্রুপস্ : সেক্টর ট্রুপস এর মোট সংখ্যা ছিল ২১০০। এর মধ্যে ১৫০০ ছিল ই. পি. আর. বাহিনীর সদস্য। বাকি ২০০ পুলিশ, ৩০০ সেনা বাহিনীর সদস্য এবং ১০০ ছিল নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্য।

ঘ. গেরিলা : এই সেক্টরের ২০ হাজার গেরিলার মধ্যে বিভিন্ন দলে সুসংগঠিত ছিল ৮ হাজার গেরিলা। গেরিলাদের ৩৫ ভাগকে এবং সেক্টর ট্রুপস-এর সকল সদস্যকে অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-বারুদ সরবরাহ করা হয়।

ঙ. সেক্টর কমাণ্ডার : মেজর রফিকুল ইসলাম

দুই নম্বর সেক্টর

ক. এলাকা : ফরিদপুর জেলার পূর্বাংশ, ঢাকা শহর সহ ঢাকা জেলার দক্ষিনাংশ, কুমিল্লা জেলা (আখাউড়া-আশুগঞ্জ রেল পথের উত্তরাংশ বাদে) এবং সমগ্র নোয়াখালী জেলা (মুহুরী নদীর পূর্বাংশ বাদে)।

খ. সাব সেক্টরের সংখ্যা ছয়

গ. সেক্টর ট্রুপস এবং 'কে ফোর্স' এর সংখ্যা ৪ হাজার

ঘ. গেরিলা : ৩০ হাজার

ঙ. সেক্টর কমাণ্ডার : ১৯৭১ সনের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মেজর খালেদ মোশাররফ। (খালেদ মোশাররফ আহত হলে সেক্টরের দায়িত্ব নেন ক্যাপ্টেন হায়দার)

তিন নম্বর সেক্টর

ক. এলাকা : কুমিল্লা জেলার অংশ বিশেষ (আখাউড়া-আশুগঞ্জ রেলসড়কের উত্তরাংশ) সিলেট জেলার অংশ বিশেষ (লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ লাইনের দক্ষিণাংশ), ঢাকা জেলার উত্তরাংশ এবং ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা নিয়ে এই সেক্টর গঠিত।

খ. সাব সেক্টরের সংখ্যা : দশ

গ. সেক্টর ট্রুপস এবং 'এস্ ফোর্স'' প্রায় ২৫ হাজার

ঘ. গেরিলা : ১০ হাজার

ঙ. সেক্টর কমাণ্ডার : ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মেজর সফিউল্লাহ। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মেজর নুরুজ্জামান। সেক্টরের দায়িত্ব হস্তান্তর করার পর মেজর সফিউল্লাহ 'এস ফোর্সের' কমাণ্ডার হিসাবে এই বাহিনীর সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেন।

চার নম্বর সেক্টর

ক. এলাকা : সিলেট জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত এই সেক্টরটি ছিল নিম্নরূপ :

১. পশ্চিম সীমান্ত : তামাবিল - আজমীরগঞ্জ - লাখাই লাইন

২. দক্ষিণ সীমান্ত : লাখাই—শায়েস্তাগঞ্জ লাইন

খ. সাব সেক্টরের সংখ্যা : ছয়

গ. সেক্টর ট্রুপস : ২ হাজার

ঘ. গেরিলা : ৮ হাজার

ঙ. সেক্টর কমাণ্ডার : মেজর সি. আর. দত্ত

পাঁচ নম্বর সেক্টর

ক. এলাকা : সিলেট জেলার অবশিষ্টাংশ তামাবিল - আজমীরগঞ্জ লাইনের পশ্চিম এলাকা

খ. সাব সেক্টরের সংখ্যা : ছয়

গ. সেক্টর ট্রুপস : ৮ শত

ঘ. সেক্টর কমাণ্ডার : মেজর মীর শওকত আলী

ছয় নম্বর সেক্টর

ক. এলাকা : যমুনার পশ্চিমে দিনাজপুরের রানীশংকল - পীরগঞ্জ - বীরগঞ্জ লাইনের উত্তরাংশ ও রংপুর জেলার পীরগঞ্জ - পলাশবাড়ী লাইনের উত্তর এবং পূর্ব অংশ নিয়ে এই সেক্টর গঠন করা হয়েছিল। দিনাজপুরের রানীশংকল, পীরগঞ্জ, বীরগঞ্জ এবং রংপুরের পলাশবাড়ী ৬ নং সেক্টর থেকে বাদ দিয়ে ৭ নং সেক্টরভুক্ত করা হয়েছিল।

খ. সাব সেক্টরের সংখ্যা : পাঁচ

গ. সেক্টর ট্রুপস : ১ হাজার ২ শত

ঘ. গেরিলা : ৬ হাজার

ঙ. সেক্টর কমাণ্ডার : উইং কমাণ্ডার এম. কে. বাশার

সাত নম্বর সেক্টর

ক. এলাকা : সমগ্র রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা এবং দিনাজপুর ও রংপুরের অংশ বিশেষ (দিনাজপুরের রানীশংকল-পীরগঞ্জ - বীরগঞ্জ লাইনের দক্ষিণাংশ এবং রংপুরের পলাশবাড়ী - পীরগঞ্জ লাইনের দক্ষিণাংশ) নিয়ে এই সেক্টর গঠিত।

খ. সাব সেক্টরের সংখ্যা : আট
গ. সেক্টর ট্রুপস : ২ হাজার
ঘ. গেরিলা : ১০ হাজার
ঙ. সেক্টর কমাণ্ডার : মেজর নাজমুল হক। ১৯৭১ সনের আগষ্ট মাসে দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারান। আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত : মেজর কিউ. এন. জামান এই সেক্টরের কমাণ্ডার ছিলেন।

আট নম্বর সেক্টর

ক. এলাকা : সম্পূর্ণ কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুর জেলার অংশ এবং খুলনা জেলার সাতক্ষীরা। সীমানা : উত্তরে পদ্মা নদী। পদ্মা -যমুনা মিলনস্থান থেকে ফরিদপুরের মাদারীপুর বরাবর কাল্পনিক লাইন পূর্ব সীমান্ত এবং মাদারীপুর - সাতক্ষীরা কাল্পনিক লাইন দক্ষিণ সীমান্ত। মাদারীপুর এই সেক্টরের আওতা বহির্ভূত।
খ. সাব সেক্টরের সংখ্যা : পাঁচ
গ. সেক্টর ট্রুপস : ২ হাজার
ঘ. গেরিলা : ৭ হাজার
ঙ. সেক্টর কমাণ্ডার : আগষ্ট পর্যন্ত মেজর আবু ওসমান চৌধুরী। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মেজর এম. এ. মঞ্জুর।

নয় নম্বর সেক্টর

ক. এলাকা : সমগ্র বরিশাল জেলা, পটুয়াখালী জেলা, খুলনা জেলা (সাতক্ষীরা বাদে) এবং ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের অংশ বিশেষ
খ. সাব সেক্টরের সংখ্যা : আট
গ. সেক্টর ট্রুপস : ৭ শত
ঘ. গেরিলা : ১০ হাজার
ঙ. সেক্টর কমাণ্ডার মেজর এম. এ. জলিল

দশ নম্বর সেক্টর

এই সেক্টরের কোনো আঞ্চলিক সীমানা ছিলো না। শুধু নৌ-বাহিনীর কমাণ্ডোদের নিয়ে গঠিত এই সেক্টরের সদস্যদের শত্রু পক্ষের নৌ-যান ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হতো। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সংখ্যক কমাণ্ডো নিয়ে এক একটি গ্রুপ গঠিত হতো। যে সেক্টরের

এলাকায় কমাণ্ডো-অভিযান পরিচালিত হতো সেই এলাকার সেক্টর কমাণ্ডারের অধীনে থেকে কমাণ্ডোরা কাজ করতো। নৌ-অভিযান শেষ হওয়ার পর কমাণ্ডোরা আবার তাদের মূল সেক্টর অর্থাৎ ১০ নম্বর সেক্টরে ফিরে আসতো।

এগার নম্বর সেক্টর

ক. এলাকা : কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে এই সেক্টর গঠিত। যমুনা নদীতে উত্তরে ফুলছড়ি ঘাট ও বাহাদুরাবাদ ঘাটকে এই সেক্টরভুক্ত করা হয়েছিল।

খ. সাব সেক্টরের সংখ্যা : আট

গ. সেক্টর ট্রুপস : এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য

ঘ. গেরিলা : গেরিলার সংখ্যা মোট ২০ হাজার

ঙ. সেক্টর কমাণ্ডার : মেজর এম. এ. তাহের। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে তিনি যুদ্ধে আহত হন। পরবর্তীতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট হামিদুল্লাহ্ উপরোক্ত দায়িত্ব পালন করেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অত্র এলাকায় বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে স্বতন্ত্রভাবে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীনে 'জেড্ ফোর্স' এই এলাকায় যুদ্ধ করেছে। সিলেট জেলার যুদ্ধেও এই বাহিনী অংশ গ্রহণ করেছে।

সেক্টর গুলোর সীমানা নির্ধারণ ও কমাণ্ডার নিয়োগের পর শুরু হয় সুদীর্ঘ আলোচনা, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনী, ই. পি. আর. ও পুলিশের বিদ্যমান সদস্যদের পুনর্গঠিত করণ ও সেই সাথে একটি অনিয়মিত নতুন যোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলা। বিপুল সংখ্যক গেরিলা বা অনিয়মিত বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বল্পতম সময়ে 'হীট এণ্ড রান' বা 'হামলা কর সরে যাও' পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শত্রু সেনার শক্তি ও মানসিক বলকে নাজুক করে দেয়াই ছিল এই বাহিনী সৃষ্টির মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের নিম্নলিখিতভাবে পুনর্গঠিত করা হয়।

নিয়মিত আর্মী ব্যাটালিয়ন

তখনকার স্বল্প সংখ্যক ব্যাটালিয়ন গুলো নিয়ে প্রথম বাংলাদেশ বাহিনী গঠিত হয়। এইসব ব্যাটালিয়নের জনশক্তি ছিলো খুবই কম। প্রত্যেক সেক্টর

থেকে লোক সংগ্রহ করে এই শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা চলে। তারপর এগুলোকে ব্রিগেড ব্যাটালিয়ন-এর ভাগ করা হয়। "কে-ফোর্স", "এস-ফোর্স" এবং "জেড-ফোর্স" নামে এগুলো পরিচিত হয়।[১৪] এসব বাহিনীর অধিকাংশ লোকই ছিলো ইপিআর-এর।

সেক্টর ট্রুপস

উপরোক্ত ব্যাটালিয়নগুলোতে যেসব ইপিআর, পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর লোককে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি তাদেরকে যার যার সেক্টরে যুদ্ধ করার জন্য ইউনিট ও সাব-ইউনিটে ভাগ করা হয়। নিয়মিত ব্যাটালিয়ন গুলোর চাইতে সেক্টর ট্রুপস্-এর অস্ত্রবল ছিলো কিছুটা কম। ওপরের প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপ মুক্তিফৌজ, এম এফ, মুক্তিবাহিনী অথবা নিয়মিত সৈন্য হিসাবে পরিচিত। এদেরকে সেনাবাহিনীর বিধি-বিধান ও নিয়মকানুন মেনে চলতে হতো। এদেরকে জীবন ধারণের ভাতা হিসাবে একটা যুক্তি-সংগত অংকের অর্থ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু তারা কোনো বেতন গ্রহণ করেনি। সরকারী ভাবে তাদের নাম রাখা হয় "নিয়মিত বাহিনী।"[১৫]

অনিয়মিত বাহিনী বা ফ্রিডম ফাইটার্স

গেরিলা পদ্ধতিতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যেসব লোককে ট্রেনিং দেয়া হতো তারা ছিলো ফ্রিডম ফাইটারস্। এর সরকারী নাম ছিলো অনিয়মিত বাহিনী অথবা গণ-বাহিনী। এরা সেনাবাহিনীর নিয়ম-কানুন অনুসারে চলতে বাধ্য ছিলো না। অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব ছিলো। তবে আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, সুদীর্ঘ এবং কঠোর সংগ্রামী জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে তারা আপনা থেকেই সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবে। সাধারণতঃ এদেরই বলা হতো 'গেরিলা'। মুক্তিফৌজ এবং ফ্রিডম ফাইটারদেরও সাধারণভাবে এফ এফ ফ্রিডম ফাইটার্স বলা হতো।[১৬] এবং এই নামে সকল যোদ্ধাই সুপরিচিত ছিলো।

অনিয়মিত বাহিনীর লোকেরা কোনো বেতন কিংবা জীবন ধারন ভাতা পেতো না। ট্রেনিংয়ের পর বাংলাদেশের ভেতরে পাঠানোর সময় তাদেরকে রাহা খরচ হিসাবে কিছু অর্থ দেয়া হতো। একে বলা হতো 'ইনডাকশন মানি' বা নিযুক্তি-ভাতা।

আমাদের নিয়মিত (এম. এফ) এবং অনিয়মিত (এফ. এফ) বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো এবং সদস্য সংখ্যা হিসাব করে তাদের জন্য কাপড়-চোপড়, রেশন, অস্ত্র, গোলাবারুদ, অয়্যারলেস সেট এবং টেলিফোন সেট, কম্পাস, বাইনো-

কুলার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা তৈরী করে পুরো সেক্টরের অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের সাকুল্য তালিকা সরকারের কাছে পেশ করতে হতো। আমাদের সরকার আবার ভারত সরকারের কাছ থেকে জিনিসগুলো সংগ্রহ করতেন। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা আগেই বলেছি। নিঃসন্দেহে এই সমস্যার জন্য প্রথম দিকে আমরা মার খেয়েছিলাম। সেক্টরগুলোতে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তেমন কোনো সামঞ্জস্য ছিলো না। কিছু এলো চীনের তৈরী, কিছু বৃটিশ, আবার কিছু আমেরিকান। এগুলোর গোলাবারুদ নিয়ে আমাদের নিদারুণ সংকটে পড়তে হতো। শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে শুধু এক ধরনের (সম্ভবত ভারতীয় অস্ত্র) দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

যানবাহনের সমস্যার তো কোনো অন্তই ছিলো না। খুচরা যন্ত্রপাতির অভাবে প্রায়ই গাড়িগুলি অচল থাকতো। এরপর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যেভাবে হোক যতদূর সম্ভব বেশি গাড়ি চালু রাখতে হবে। ভারত সরকারের সাথে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ই-এম-ই (ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল এ্যাণ্ড ইকুইপমেণ্ট) বিভাগকে এই কাজের ভার দেয়া হয়।

চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার অভাব ছিলো প্রকট। ভারতের হাসপাতালগুলো আহত শরণার্থীতে ভরে গিয়েছিলো। এদের বেশির ভাগই ছিলো বুলেট কিংবা বেয়োনেটের আঘাতে আহত। আমরা বাঙালী সৈনিকদের জন্য কয়েকটি অস্থায়ী ফিল্ড হাসপাতাল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেই। পরে সব চাইতে বড় হাসপাতালটি স্থাপিত হয়েছিলো ২ নম্বর সেক্টরে। যুদ্ধের সময় খুব কম সংখ্যক চিকিৎসকই ভারতে গিয়েছিলেন। এই ঘাটতি পূরণের জন্য ৪র্থ বর্ষের মেডিকেল ছাত্রদের পর্যন্ত কাজে নিয়োগ করা হয়। তারা চিকিৎসা, ক্যাম্প এবং সাব-সেক্টরের দায়িত্বও গ্রহণ করে। ভারতের সামরিক হাসপাতাল গুলোতে আমাদের আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করানোর জন্যও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংগে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

এ রকম আরো অনেক সমস্যার কথা এবং সেগুলোর সমাধানের উপায় নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়। সেক্টরগুলোতে কতগুলো অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি একেবারেই ছিলো না। এ ব্যাপারে আমাদের চাহিদা ঠিক সময়ে পূরণ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতিও পেয়েছিলাম। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা কখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে কিছুই পাইনি কিংবা ঠিক সময়েও পাইনি। হয়তো এর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও থাকতে পারে। বর্ষার সময়ে আমাদের অধিকাংশ সৈনিকের জন্য জরুরী ভিত্তিতে আচ্ছাদন নির্মাণের কথা ছিলো, কিন্তু কোন সময়েই এ আচ্ছাদনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি। তাবুর সাজসরঞ্জামও চাহিদা অনুযায়ী

কখনো পাইনি। শীতে কম্বলের সংখ্যা ছিলো অল্প, গরম কাপড়ও ছিল কম। আমাদের সৈন্যরা অধিকাংশ যুদ্ধই করেছে খালি পায়ে। জঙ্গলে চলাচলের বুট ছিলো মাত্র কয়েক জোড়া। আমরা বিপুল সংখ্যক প্লাষ্টিকের স্যাণ্ডেল পেয়েছিলাম। ওগুলো ছিলো বাথরুমের জন্য উপযুক্ত, যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য নয়।

প্রতিটি সেক্টরের সামরিক অভিযানের ক্ষমতা এবং কি পরিমাণ সৈন্য আমাদের আছে সে সব নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। কমাণ্ডো ধরনের হামলার জন্য তখনো আমরা নিয়মিত সৈন্যদের পুরা পুনর্গঠন করতে কিংবা ট্রেনিং দিতে পারিনি। তাই বাংলাদেশের খুব ভেতরে প্রবেশ করার পরিকল্পনা আমরা কিছু-দিনের জন্য বাদ দিয়ে তখনকার মতো সমগ্র সীমান্ত এলাকা বরাবর শত্রুর ওপর আঘাত হানার প্রস্তুতি নেই। গেরিলা তৎপরতার ওপরেই সব চাইতে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যক লোককে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দেয়া হয়। স্থানীয়ভাবে আমরা স্বল্প সংখ্যক ফ্রিডম ফাইটারকে প্রধানতঃ বি. এস. এফ-এর সহযোগিতায় ট্রেনিং দেই। যুদ্ধে আমাদের লোক বলের চাহিদা পূরণের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রতিমাসে কয়েক হাজার ফ্রিডম ফাইটারকে ট্রেনিং দেয়ার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেয়। আমরা আশা করে-ছিলাম এর দ্বারা কয়েক মাসের মধ্যে আমরা পর্যাপ্ত সংখ্যক গেরিলাকে গড়ে তুলতে পারবো এবং এদেরকে দিয়ে পাকবাহিনীকে সব সময় ব্যতিব্যস্ত রাখা যাবে। ইত্যবসরে সরাসরি অভিযান পরিচালনার জন্য নিয়মিত সৈন্যদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্গঠনের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলবে। ফ্রিডম ফাইটারদের ওপর যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতি ধ্বংসের দায়িত্ব থাকবে। প্রয়োজনে তারা শত্রু দলকে অ্যামবুশ করবে এবং সশস্ত্র ঘাঁটি, জ্বালানি ও অস্ত্রপাতি মজুতের স্থান কিংবা অন্যান্য সরবরাহ কেন্দ্রের ওপর হামলা চালাবে। এরপর নিয়মিত বাহিনীর সর্বাত্মক অভিযান চালিয়ে শত্রু পক্ষকে সহজেই কাবু করা যাবে।

এইভাবে আমরা চূড়ান্ত রণকৌশল নির্ধারণ করি। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায়, কে কখন সেই সর্বাত্মক অভিযান চালাবে।

তখনকার মতো যুদ্ধের জন্য সর্বাধিক সংখ্যক লোককে ট্রেনিং দেয়ার ব্যাপারেই আমরা বেশি আগ্রহী ছিলাম। ট্রেনিং কর্মসূচীর মেয়াদ ছিলো দুই থেকে তিন সপ্তাহের। এই সময়ের মধ্যে তারা রাইফেল, লাইট মেশিন গান, হ্যাণ্ড গ্রেনেড, বিস্ফোরক প্রভৃতি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখতো। এছাড়া অ্যামবুশের কায়দা-কানুন এবং রণাঙ্গনের বিভিন্ন কৌশল কিছু শেখানো হতো।

আমাদের সব প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিলো গুণগত নয়, পরিমানগত দিক দিয়ে কি করে আরো বেশি লোক গড়ে তোলা যায়। প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্য সরবরাহ এবং ট্রেনিংয়ের জন্য আমাদেরকে পুরাপুরি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হতো। এ ব্যাপারে আমাদের সংগে সব সময় যোগাযোগ রাখার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার তাদের কয়েকজন সিনিয়র সামরিক অফিসারকে নিয়োগ করেন। ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংকের এইসব অফিসার ভারতীয় বাহিনীর ইস্টার্ণ কমাণ্ডের সরাসরি সামরিক এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনে থেকে কাজ করতেন। তাদের নিযুক্তি ছিলো ভারতীয় সেক্টর কমাণ্ডার হিসাবে। ভারতের একজন সেক্টর কমাণ্ডার বাংলাদেশের দুই অথবা তিনটি সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন। প্রধানতঃ ভারতীয় সেক্টর কমাণ্ডারদের মাধ্যমেই বাংলাদেশ বাহিনীর হেডকোয়ার্টার এবং ইস্টার্ণ কমাণ্ডের সাথে আমাদের যোগাযোগ রাখতে হতো। যুদ্ধের গাবতীয় নীতিমালা আমাদের হেডকোয়ার্টার এবং ভারতীয় ইস্টার্ণ কমাণ্ড যৌথভাবে প্রণয়ন করতেন। এই সকল নীতি কার্যকর করার দায়িত্ব দেয়া হতো ভারতীয় এবং বাংলাদেশ সেক্টর কমাণ্ডারদের হাতে। অনেক সময় পরস্পর বিরোধী একাধিক নির্দেশও আসতো। তখন আমরা পড়তাম বিপাকে, কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতো।

১৫ই জুলাই আমরা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধান-মন্ত্রি জনাব তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হই। এ অনুষ্ঠানে অবশ্য কোন মত বিনিময় কিংবা বিভিন্ন সেক্টরের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি। সে রাতে সেটি ছিলো শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান। আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে শপথ গ্রহণ করি।

কলকাতা ত্যাগের পূর্বেই জানতে পারলাম, পাকিস্তান থেকে কয়েকজন বাঙালী সামরিক অফিসার পালিয়ে আসতে পেরেছেন। এইসব অফিসারের কাছেই জানা গেলো যে, অন্যান্য বাঙালী অফিসারও আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে পলায়নের চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই পালানোর চেষ্টা, অর্থাৎ পাকিস্তানের সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আসা এবং তারপর যুদ্ধে যোগ দেয়া খুবই বিপজ্জনক ছিলো; বিশেষ করে পাকিস্তানে যারা পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করছিলেন তাদের জন্যে তো বটেই। পাকিস্তান থেকে আমাদের অফিসাররা চলে আসছেন এ খবরে আমরা খুবই খুশি হয়েছিলাম। আবার অন্য কিছু ঘটনা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিলো। আমাদের যুব শিবির থেকেও এ সময়ে কিছু লোক পালিয়ে যায়। হয়তো যুব শিবিরের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কিংবা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে তারা এ কাজ

করেছিলো। তবে এদের সংখ্যা ছিলো নগণ্য। এ ঘটনা তেমন কোন উল্লেখ-যোগ্য সমস্যারও সৃষ্টি করেনি।

যুব শিবিরে কিছু লোকের মধ্যে হতাশা ছিলো, এ কথা সত্য। জুলাইয়ের শেষ দিকে মেজর খালেদ মোশাররফ এবং আমি আগরতলার কাছে এই ধরনের একটি শিবির দেখতে যাই। সেখানে তিন হাজার যুবক দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে ট্রেনিংয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলো। স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা ছিলো খুবই দুঃখজনক। খাদ্য ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। অন্যান্য যুব শিবিরেরও একই হাল। লক্ষ্যহীন সুদীর্ঘ অপেক্ষার পর একটি লোকের পক্ষে হতাশ হয়ে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক। যুব শিবিরের সংখ্যা পরের দিকে প্রায় দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও এতো বিপুল সংখ্যক যুবকের জন্য সকল ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা দুরূহ হয়ে পড়েছিলো।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করে পারছিনা---শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ-কারী খুব কম লোকের মধ্যেই ট্রেনিং গ্রহণের কিংবা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার আগ্রহ দেখা যেতো। যুদ্ধকালে এক লাখেরও বেশি মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নেয়। কিন্তু এর মধ্যে শতকরা এক ভাগও শরণার্থী শিবিরের লোক ছিলো না। এর কারণ সম্ভবতঃ যুবশিবির গুলোতে যারা এসেছিলো তারা তাদের পরিবার পরিজন বাংলাদেশে ফেলে এসেছিলো তাই ট্রেনিংয়ের পরই তারা বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ছিলো উদগ্রীব। তাদের স্বদেশ ত্যাগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো সামরিক ট্রেনিং গ্রহণ করা। অন্যদিকে বাড়িঘর থেকে পালিয়ে শরণার্থী শিবিরে যারা আশ্রয় নিয়েছিলো তারা পরিবার-পরিজন সহই সেখানে থাকতো। জীবন বাঁচানোর জন্য অন্ততঃ দু'বেলা দু'মুঠো আহার জুটবে এই নিশ্চয়তা শিবিরে তাদের ছিলো। বাংলাদেশে তাদের জন্য দুশ্চিন্তা করার মতো খুব বেশি কেউ ছিলো না। শিবিরে তাদের জীবনের ভয়ও কম ছিলো। এসব কারণেই অন্ততঃ সেই মুহূর্তে দেশে ফেরার তেমন আগ্রহ তাদের ছিলো না। তাদের নিরাপদ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা কারা করছে, কিভাবে করছে, এ নিয়ে তাদের তেমন মাথা ব্যথা ছিলো না। মনে মনে তারা চাইতো কষ্টের কাজটুকু অন্যে করুক, তারা একদিন ধীরে সুস্থে ফিরতে পারলেই হলো। শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দাদের মধ্যে এবং নিছক ভয়ে যারা দেশ ত্যাগ করেছিলো তাদের মধ্যে এই মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা গেছে। যুদ্ধে তাদের বিশেষ কোন অবদান ছিলো না, কিছু থাকলে তা ছিলো পরিস্থিতি সাপেক্ষ; স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়। এদিকে শত ভয়-ভীতি এবং দারুণ বিপদের মধ্যেও যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী দেশেই থেকে গিয়েছিলো, স্বাধীনতার জন্য তাদেরকেই দিতে হয়েছে সব চাইতে বেশি মূল্য।

২৬
যুদ্ধের পরিবর্তিত গতি

জুন মাসের শেষ দিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এই সময়ে প্রচলিত যুদ্ধ পদ্ধতি এবং গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশ বাহিনীকে পুনর্গঠিত করা হয়। বস্তুতঃ জুনের চতুর্থ সপ্তাহ থেকে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু হলেও বিভিন্ন সেক্টরের তৎপরতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে জুলাই মাসে আমরা এক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলাম। এই সম্মেলনের কথা আগেই বলেছি। ১৫ই মে পর্যন্ত আমরা যা কিছু সাহায্য পেয়েছিলাম তার ব্যবস্থা করেছিলো ভারতীয় বিএসএফ। যাহোক, সময়ের বিবর্তনে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের দু'টি নতুন ডিভিশনকে বাংলাদেশে এনে মোতায়েন করার পর পুরো যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই কারণে সব কিছুতে ভিন্নতর সমন্বয় সাধন, প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি এবং ব্যাপক সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু এই প্রয়োজন মেটানোর সামর্থ্য বিএসএফ-এর ছিলোনা। তাই ১৯৭১-এর ১৬ই মে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিএসএফ-এর কাছ থেকে বাংলাদেশের অস্বাভাবিক ঘটনাবলী মোকাবিলার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিভিন্ন পাকিস্তানী ডিভিশনের আক্রমণকারী দল-গুলো ২৫শে মার্চ রাতে আকস্মিক সশস্ত্র আক্রমণের ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে অবস্থান গ্রহণের কাজ সম্পন্ন করে। চলাচলের কাজ বিমানযোগে সম্পন্ন করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার দূরত্ব বিবেচনা করে (১২০০ মাইল ভারতীয় এলাকা) এবং ভারতের ওপর দিয়ে সকল প্রকার পাকিস্তানী বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় পাকিস্তানের পুরো দুটি আর্মী ডিভিশনকে পূর্বাঞ্চলে স্থানান্তর করতে অন্ততঃ এক মাসের কম সময় লাগার কথা নয়। এই হিসাবে দেখা যায় যে, এক মাস আগে অর্থাৎ ৭১-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু না করলে দুই ডিভিশন পাকসেনা ২৮শে মার্চের মধ্যে বাংলাদেশে আসতে পারতো না। বাংলাদেশে গণহত্যার উদ্দেশ্য নিয়েই এইসব আর্মি ডিভিশন পশ্চিম পাকে মোতায়েন করার ষড়যন্ত্র হয়েছিলো। সব কিছুর তোড়জোড়

শুরু হয়েছিলো ২৮ ফেব্রুয়ারীর আগেই। তাহলে দেখা যায়, ভুট্টো ১৬ই ফেব্রুয়ারী যে হুমকি দিয়েছিলেন তার সাথে এই ষড়যন্ত্রের নিশ্চয়ই একটা যোগ-সাজশ ছিলো। ভুট্টো বলেছিলেন "কেউ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকা যেতে চাইলে তাকে নিজ দায়িত্বেই যেতে হবে, তা তিনি খাকী পোশাকে অথবা সাদা-কালো যে পোশাকেই যান না কেন।" রাওয়ালপিণ্ডির আর্মী হেডকোয়ার্টারে ২২শে ফেব্রুয়ারী যে উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন হয়, সম্ভবতঃ সেখানেই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে। ইয়াহিয়া খান এবং তার সিনিয়র আর্মী জেনারেলরা এই সম্মেলনে একত্র হয়েছিলেন। এখানে তারা সংগোপনে চক্রান্তের নীল নকশা তৈরী করেন এবং গণহত্যা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। এই উদ্দেশ্যে তারা দুটি আর্মী ডিভিশন পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানোরও সিদ্ধান্ত নেন। নির্ধারিত ডিভিশন দু'টির প্রথম ব্যাচের সৈন্যরা ছদ্মবেশে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা এসে অবতরণ করে এবং তার পরের দিন অর্থাৎ ১লা মার্চ ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতুবী ঘোষণা করেন। এ-সময় থেকেই ইয়াহিয়া খান তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে চলছিলেন এবং সব কিছুই করা হচ্ছিলো ২২শে ফেব্রুয়ারী জেনারেলদের নিয়ে তিনি যে চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন তারই ভিত্তিতে। সৈন্য স্থানান্তরের ব্যাপারে বাংলাদেশের জনগণ কিংবা বিশ্ববাসীর মনে যাতে কোন সন্দেহ দেখা না দেয় সেজন্য ইয়াহিয়া শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। আসলে এই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিলো শুধু সময় ক্ষেপন করা। পূর্বোক্ত দু'টি ডিভিশনের সৈন্যদের বিনা বাধায় পূর্বাঞ্চলে এসে যথাস্থানে অবস্থান গ্রহণের জন্যই সময়ের দরকার ছিলো।

৯ম ডিভিশনের ৩১৩ ব্রিগেডকে বিমানযোগে সিলেট পাঠানো হয়। ১১৭ ব্রিগেড যায় কুমিল্লায়। ১৪ ডিভিশনের অধীনে কুমিল্লায় যে ৫৩ ব্রিগেড অবস্থান করছিলো ইতিমধ্যেই তাকে চট্টগ্রামে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ৯ম ডিভিশনের বাংলাদেশে আসার পরই মেঘনার পূর্বদিকের সমগ্র এলাকা অর্থাৎ সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ৫৩ ব্রিগেড চট্টগ্রামে, ১১৭ ব্রিগেড কুমিল্লায় এবং ৩১৩ ব্রিগেড সিলেটে অবস্থান গ্রহণ করে। আগে থেকেই পূর্বাঞ্চলে মোতায়েন ১৪ ডিভিশনের ওপর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা প্রভৃতি জেলার দায়িত্ব ছিলো। এর ৫৩ ব্রিগেডকে ৯ম ডিভিশনের অধীনে এবং ৯ম ডিভিশনের ২৭ ব্রিগেডকে ১৪ ডিভিশনের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৪ ডিভিশনের ৫৭ ব্রিগেড ঢাকায় অবস্থান করছিলো। এই ডিভিশনের অপর ব্রিগেডটি ছিলো উত্তরবঙ্গে।

পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে ১৬শ ডিভিশন চলে আসার পর উত্তর রণাঙ্গনের দায়িত্ব এই ডিভিশন গ্রহণ করে। জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হওয়া ছাড়াও এই সকল বাহিনীর সার্বিক কমাণ্ডের দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। ১১ই এপ্রিল লেঃ জেনারেল এ. কে. নিয়াজী ইস্টার্ণ কমাণ্ডের কমাণ্ডার নিযুক্ত হওয়ার পর জেনারেল টিক্কা খান তাঁর এই বাড়তি দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এরপর তিনি শুধু গভর্ণর এবং সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে কাজ করেন। পাকিস্তানীদের উল্লিখিত সেনাবাহিনী ছাড়াও পরে আরো দুটি ডিভিশন গড়ে তোলা হয়। এই দুটি পাক ডিভিশনের জন্য বাংলাদেশ বাহিনী এবং এমনকি ভারতীয় বাহিনীতেও পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলাদেশ বাহিনীর পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সকল সেক্টরে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানও অব্যাহত থাকে। আমাদের আক্রমণাত্মক তৎপরতা অক্ষুণ্ন রাখা এবং লড়াইয়ের উদ্যমকে সমুন্নত রাখাই ছিলো এর উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন সেক্টরে শত্রুর বিরুদ্ধে যে সব আক্রমণ, অ্যামবুশ ও হামলা চালানো হয়েছে তার মাত্র কয়েকটির কথা এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। এর দ্বারা কিছুটা অনুমান করা যাবে যুদ্ধের গতি কেমন ছিলো এবং অনভিজ্ঞ 'ফ্রিডম ফাইটার'রা কিভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে অব্যাহত আক্রমণ চালিয়ে একটা কার্যকর ও সংহত যোদ্ধা বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিলো।

আমার ১ নম্বর সেক্টরের সেনানীরা ১০ই জুন রামগড় করেরহাট সড়কের হিয়াকুতে একটি পাক টহলদার দলকে অ্যামবুশ করে। সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষে ৪ জন শত্রুসেনা নিহত হয়।

দুই সপ্তাহের ভেতর ২৩শে জুন তারিখে একই এলাকার আরেকটি অ্যামবুশের আয়োজন করা হয়। এবার মারা যায় ১ জন পাকিস্তানী অফিসার ও ৩ জন সৈন্য। আহত হয় ২ জন। আমাদের মুক্তি যোদ্ধারা সকলে নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসে।

১লা জুলাই আমি ক্যাপ্টেন শামসুল হুদার সঙ্গে এক প্লাটুন সৈন্য দেবীপুর ঘাঁটি আক্রমণের জন্য পাঠাই। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এক বাংকার থেকে অন্য বাংকারে লাফিয়ে লাফিয়ে হ্যাণ্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে এবং সাব-মেশিনগান দিয়ে বাংকারের ভেতরে অবস্থানকারী শত্রুর উপর গুলীবর্ষণ করতে থাকে। অভিযান শেষ হওয়ার পর মুক্তি যোদ্ধারা ঘাঁটিতে ফিরে আসে। সেদিন আমাদের পক্ষে অসীম সাহসে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিলেন সিপাই ফজলুর রহমান, হাবিলদার আবুল হোসেন এবং সিপাই তোহা মিয়া। ৬ জন শত্রুসৈন্য নিহত এবং ১২ জন আহত হয়েছিলো। এটা ছিলো শত্রুর বিরুদ্ধে আরেকটি সফল হামলা।

শুরু হয়েছিলো ২৮ ফেব্রুয়ারীর আগেই। তাহলে দেখা যায়, ভুট্টো ১৬ই ফেব্রুয়ারী যে হুমকি দিয়েছিলেন তার সাথে এই ষড়যন্ত্রের নিশ্চয়ই একটা যোগ-সাজশ ছিলো। ভুট্টো বলেছিলেন "কেউ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকা যেতে চাইলে তাকে নিজ দায়িত্বেই যেতে হবে, তা তিনি খাকী পোশাকে অথবা সাদা-কালো যে পোশাকেই যান না কেন।" রাওয়ালপিণ্ডির আর্মী হেডকোয়ার্টারে ২২শে ফেব্রুয়ারী যে উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন হয়, সম্ভবতঃ সেখানেই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে। ইয়াহিয়া খান এবং তার সিনিয়র আর্মী জেনারেলরা এই সম্মেলনে একত্র হয়েছিলেন। এখানে তারা সংগোপনে চক্রান্তের নীল নকশা তৈরী করেন এবং গণহত্যা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। এই উদ্দেশ্যে তারা দুটি আর্মী ডিভিশন পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানোরও সিদ্ধান্ত নেন। নির্ধারিত ডিভিশন দু'টির প্রথম ব্যাচের সৈন্যরা ছদ্মবেশে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা এসে অবতরণ করে এবং তার পরের দিন অর্থাৎ ১লা মার্চ ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতুবী ঘোষণা করেন। এ-সময় থেকেই ইয়াহিয়া খান তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে চলছিলেন এবং সব কিছুই করা হচ্ছিলো ২২শে ফেব্রুয়ারী জেনারেলদের নিয়ে তিনি যে চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন তারই ভিত্তিতে। সৈন্য স্থানান্তরের ব্যাপারে বাংলাদেশের জনগণ কিংবা বিশ্ববাসীর মনে যাতে কোন সন্দেহ দেখা না দেয় সেজন্য ইয়াহিয়া শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। আসলে এই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিলো শুধু সময় ক্ষেপন করা। পূর্বোক্ত দু'টি ডিভিশনের সৈন্যদের বিনা বাধায় পূর্বাঞ্চলে এসে যথাস্থানে অবস্থান গ্রহণের জন্যই সময়ের দরকার ছিলো।

৯ম ডিভিশনের ৩১৩ ব্রিগেডকে বিমানযোগে সিলেট পাঠানো হয়। ১১৭ ব্রিগেড যায় কুমিল্লায়। ১৪ ডিভিশনের অধীনে কুমিল্লায় যে ৫৩ ব্রিগেড অবস্থান করছিলো ইতিমধ্যেই তাকে চট্টগ্রামে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ৯ম ডিভিশনের বাংলাদেশে আসার পরই মেঘনার পূর্বদিকের সমগ্র এলাকা অর্থাৎ সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ৫৩ ব্রিগেড চট্টগ্রামে, ১১৭ ব্রিগেড কুমিল্লায় এবং ৩১৩ ব্রিগেড সিলেটে অবস্থান গ্রহণ করে। আগে থেকেই পূর্বাঞ্চলে মোতায়েন ১৪ ডিভিশনের ওপর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা প্রভৃতি জেলার দায়িত্ব ছিলো। এর ৫৩ ব্রিগেডকে ৯ম ডিভিশনের অধীনে এবং ৯ম ডিভিশনের ২৭ ব্রিগেডকে ১৪ ডিভিশনের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৪ ডিভিশনের ৫৭ ব্রিগেড ঢাকায় অবস্থান করছিলো। এই ডিভিশনের অপর ব্রিগেডটি ছিলো উত্তরবঙ্গে।

পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে ১৬শ ডিভিশন চলে আসার পর উত্তর রণাঙ্গনের দায়িত্ব এই ডিভিশন গ্রহণ করে। জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হওয়া ছাড়াও এই সকল বাহিনীর সার্বিক কমাণ্ডের দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। ১১ই এপ্রিল লেঃ জেনারেল এ. কে. নিয়াজী ইস্টার্ণ কমাণ্ডের কমাণ্ডার নিযুক্ত হওয়ার পর জেনারেল টিক্কা খান তাঁর এই বাড়তি দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এরপর তিনি শুধু গভর্ণর এবং সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে কাজ করেন। পাকিস্তানীদের উল্লিখিত সেনাবাহিনী ছাড়াও পরে আরো দুটি ডিভিশন গড়ে তোলা হয়। এই দুটি পাক ডিভিশনের জন্য বাংলাদেশ বাহিনী এবং এমনকি ভারতীয় বাহিনীতেও পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলাদেশ বাহিনীর পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সকল সেক্টরে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানও অব্যাহত থাকে। আমাদের আক্রমণাত্মক তৎপরতা অক্ষুণ্ন রাখা এবং লড়াইয়ের উদ্যমকে সমুন্নত রাখাই ছিলো এর উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন সেক্টরে শত্রুর বিরুদ্ধে যে সব আক্রমণ, অ্যামবুশ ও হামলা চালানো হয়েছে তার মাত্র কয়েকটির কথা এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। এর দ্বারা কিছুটা অনুমান করা যাবে যুদ্ধের গতি কেমন ছিলো এবং অনভিজ্ঞ 'ফ্রিডম ফাইটার'রা কিভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে অব্যাহত আক্রমণ চালিয়ে একটা কার্যকর ও সংহত যোদ্ধা বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিলো।

আমার ১ নম্বর সেক্টরের সেনানীরা ১০ই জুন রামগড় করেরহাট সড়কের হিয়াকুতে একটি পাক টহলদার দলকে অ্যামবুশ করে। সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষে ৪ জন শত্রুসেনা নিহত হয়।

দুই সপ্তাহের ভেতর ২৩শে জুন তারিখে একই এলাকার আরেকটি অ্যামবুশের আয়োজন করা হয়। এবার মারা যায় ১ জন পাকিস্তানী অফিসার ও ৩ জন সৈন্য। আহত হয় ২ জন। আমাদের মুক্তি যোদ্ধারা সকলে নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসে।

১লা জুলাই আমি ক্যাপ্টেন শামসুল হুদার সঙ্গে এক প্লাটুন সৈন্য দেবীপুর ঘাঁটি আক্রমণের জন্য পাঠাই। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এক বাংকার থেকে অন্য বাংকারে লাফিয়ে লাফিয়ে হ্যাণ্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে এবং সাব-মেশিনগান দিয়ে বাংকারের ভেতরে অবস্থানকারী শত্রুর উপর গুলীবর্ষণ করতে থাকে। অভিযান শেষ হওয়ার পর মুক্তি যোদ্ধারা ঘাঁটিতে ফিরে আসে। সেদিন আমাদের পক্ষে অসীম সাহসে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিলেন সিপাই ফজলুর রহমান, হাবিলদার আবুল হোসেন এবং সিপাই তোহা মিয়া। ৬ জন শত্রুসৈন্য নিহত এবং ১২ জন আহত হয়েছিলো। এটা ছিলো শত্রুর বিরুদ্ধে আরেকটি সফল হামলা।

৩রা জুলাই দুপুরে রামগড়-করেরহাট রোডের চিকনছড়ায় আমাদের সৈন্যরা একজন পাকিস্তানী ক্যাপ্টেনসহ বেশ কয়েকজন শত্রুসৈন্য বহনকারী একটা মাইক্রোবাস অ্যামবুশ করে। ক্যাপ্টেনসহ ৫ জন পাকিস্তানী নিহত হয়। করেরহাট থেকে হিয়াকু হয়ে রামগড় পর্যন্ত এই রাস্তাটি পাহাড়ী এলাকার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। রাস্তার দু'পাশে ছিলো ঘনবন। এই কারণে আক্রমণ ও অ্যাম-বুশের জন্য আমাদের সৈন্য চলাচলে বেশ সুবিধে হচ্ছিলো। আমরা এই সড়ক এলাকায় বহু সংখ্যক আক্রমণ পরিচালনা করি এবং এতে বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য মারাও যায়। ভয়ে পাকিস্তানীরা এই রাস্তা দিয়ে শুধু দিনের বেলায় চলাচল করতো, রাতে পারতপক্ষে রাস্তায় বের হতো না।

১৯শে জুলাই আমরা করিয়াবাজারে পাকিস্তানী অবস্থানের ওপর হামলা চালাই। এর আগে খবর পেয়েছিলাম যে প্রায় ২০০ বাঙালী আত্মরক্ষার জন্য ভারতে পালিয়ে যাচ্ছিলো। একজন পাকিস্তানী মেজরের নেতৃত্বে পাঞ্জাব রেজি-মেণ্টের সৈন্যরা পথে তাদের বন্দী করে এখানে এনে রেখেছে। আরো জেনে-ছিলাম, পাকিস্তানীরা বাঙালী বন্দীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে এবং বন্দীদের ভেতর অনেক নারীও রয়েছে। এসব বন্দীকে মুক্ত করার জন্য আমরা আক্রমণের প্রস্তুতি নেই। বাজারের হাই স্কুলটিতে উক্ত মেজর তার সৈন্যসামন্ত সহ অবস্থান করছিলেন। ১৯শে জুলাই রাত প্রায় দেড়টার দিকে ২ ইঞ্চি মর্টার, রকেট লাঞ্চার, এলএমজি এবং রাইফেল সজ্জিত আমাদের ৪৫ জন সৈনিক এখানে আক্রমণ শুরু করে। বন্দীদের রাখা হয়েছিলো পাশের কয়েকটি দোকান ও অন্যান্য ঘরে। আমাদের লোকেরা স্কুল ভবনটির ওপর এমনভাবে এল এম জি চালাতে থাকে যেন শত্রুরা কোন ক্রমে বাইরে না আসতে পারে। এদিকে মুক্তিযোদ্ধারা চিৎকার করে বন্দীদের রাতের অন্ধকারে পালাতে নির্দেশ দেয়। ১৫০ জন বন্দী তখন পালাতে সক্ষম হয়। এরপর প্রায় ৩০ মিনিট প্রচণ্ড মর্টার ও রকেট বর্ষণ অব্যাহত থাকে। ২৮ জন শত্রু সৈন্য প্রাণ হারায়। আমাদের পক্ষে কেউ হতাহত হয়নি।

হিয়াকুর কাছে পাকিস্তানী অবস্থানের ওপর আরেকটি আক্রমণ চালিয়ে-ছিলাম, সামরিক যানবহান পার্কিংয়ের জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত একটি স্থানে। ২৭শে জুলাই বিকাল ৪টার দিকে মর্টার ও রকেট লাঞ্চার দিয়ে আমরা এখানে আক্রমণ চালাই। দিনের বেলা এই আক্রমণে শত্রুরা হতচকিত হয়ে পড়ে। ১৫ মিনিটের আক্রমণে পার্কিংয়ের জায়গাটি পুরাপুরি ধ্বংস করে দেয়া হয়। ৪ জন শত্রু সৈন্য ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং অজ্ঞাত সংখ্যক আহত হয়। বেশ কিছু গাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলে অনেক রাত পর্যন্ত সেগুলো জ্বলতে থাকে।

নম্বর এবং ৩ নম্বর সেক্টরেও পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য অ্যামবুশ ও আক্রমণ চালানো হয়।

১৪ই মে লেঃ মোরশেদ ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিলেট ডাইভারসন রোডে এক অ্যামবুশের ব্যবস্থা করেন। আগেই খবর পাওয়া গিয়েছিলো শত্রুর একটি কনভয় এই সড়ক দিয়ে আসছে। আমাদের লোকেরা রাস্তায় মাইন পেতে শত্রুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তখন প্রায় মধ্যরাত। কনভয়টি এসেই একেবারে অ্যামবুশের মধ্যে পড়ে যায়। শত্রুর প্রথম দুটি যান মাইন বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়। শুরু হয় গোলাগুলী। বেশ কয়েকজন শত্রু সৈন্য নিহত ও আহত হয়। আমাদের যোদ্ধারা সফল হামলার শেষে ঘাঁটিতে ফিরে আসে। আমাদের পক্ষে কেউ হতাহত হয়নি। আরেকটি অনুরূপ সফল অ্যামবুশ করা হয় সিলেটের নলুয়া চা বাগানের একটি রাস্তায়। ক্যাপ্টেন মতিউরের নেতৃত্বে চালিত এই অ্যামবুশে ১৫ জন পাকসেনা নিহত হয়।

১৬ই মে তেলিয়াপাড়া চা-বাগানের কাছে এক অ্যামবুশে ৪০ জন শত্রু সৈন্য হত্যা করা হয়। তেলিয়াপাড়া অ্যামবুশে পাকিস্তানীদের অনেক লোক ক্ষয় হওয়ায় তাদের সাহায্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আরো সৈন্য পাঠান হয়। মুক্তিযোদ্ধারা নতুন সৈন্যদের আগমন বার্তা পেয়ে তেলিয়াপাড়া চা-বাগানের নিকট সড়কের ওপর আবার অ্যামবুশের ব্যবস্থা করে। তারা সড়কে ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন পেতে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। ১৯শে মে তারিখের এই অ্যামবুশে লেঃ মোরশেদের অধীনে ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেছিলো। পাকিস্তানীরা সম্ভবতঃ প্রধান সড়কের ওপর এ ধরণের অতিকিত আক্রমণ আশা করতে পারেনি। শত্রুদের প্রথম যানটি পার হতে পারলেও দ্বিতীয় গাড়িটি বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তৃতীয়টিও চোখের পলকে ধ্বংস হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের হালকা মেশিনগান গর্জে ওঠে। এখানে শত্রুদের ৭টি যান ধ্বংস এবং বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। অ্যামবুশের সময় একজন ফ্রিডম ফাইটারকে শত্রুরা ধরে ফেলেছিল। কিন্তু অ্যামবুশ পার্টি অসীম সাহসে আক্রমণ চালিয়ে তাকে মুক্ত করে আনে। ফেরার পথে দেখা যায় যে, আমাদের সকলেই অক্ষত রয়েছে। পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে পাকিস্তানীরা একটি ট্রান্সপোর্ট দল পাঠিয়ে হতাহতদের তুলে নিয়ে যায়।

শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিটি সংঘর্ষেই যে আমরা জয়ী হয়েছি তা নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে পরাজয়ও হয়েছে। পাকিস্তানীরা লঞ্চে করে রায়পুরার নিকট বেলাবো বাজার দখল করতে যাচ্ছিলো। ১৪ই জুলাই সুবেদার বাশার বেলাবোর নিকট অ্যামবুশের ব্যবস্থা করে। পাকিস্তানীরা কি ভাবে যেন এটা টের পেয়ে যায়।

তারা তখন লঞ্চ বাদ দিয়ে কয়েকটি নৌকায় চড়ে এগোতে থাকে যাতে আমাদের যোদ্ধারা টের না পায়। নৌকাগুলো এসে আমাদের অ্যামবুশ পার্টিকে ঘিরে ফেলে হঠাৎ গুলী ছুঁড়তে শুরু করে। দুই ঘণ্টারও অধিক সময় প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত সুবেদার বাশার এবং ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারান। বাকি মুক্তিযোদ্ধারা কোনমতে ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

৩১ বালুচ রেজিমেণ্টের একটি কোম্পানী সালদা নদী দিয়ে কুমিল্লার মন্দভাগের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। খবর পেয়ে ১৯শে জুলাই সুবেদার ওয়াহাবের নেতৃত্বে আমাদের একটি কোম্পানী মন্দভাগের কাছে অ্যামবুশ পাতে। শত্রুরা এসে পড়তেই নদীর দু'ধার থেকে ওদের ওপর গুলী বর্ষণ শুরু হয়। কোম্পানীর একজন সিনিয়র অফিসারসহ অনেক সৈন্য দিশেহারা অবস্থায় নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা গুলীতে অথবা ডুবে মারা যায়। সেই সিনিয়র বালুচ অফিসারসহ শত্রুপক্ষে হতাহতের সংখ্যা ছিলো ৬০ জন।

আগেই বলেছি, সিলেট জেলার দক্ষিণে হবিগঞ্জ এবং উত্তরে সিলেটের একটি থানা পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত ৪ নম্বর সেক্টরের আয়তন ছিলো কয়েকশত বর্গমাইল। এই অঞ্চলে ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের সংগে মুক্তিযোদ্ধাদের বেশ কয়েক দফা প্রচণ্ড লড়াই হয়। ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের একটি কোম্পানী কুশিয়ারা নদীর শেওলা ঘাটের কাছে অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। এই ফেরীঘাট দিয়েই কানাইয়ের ঘাট এবং সিলেটের মধ্যে বাতায়াতের পথ। এদিকে ক্যাপ্টেন রব তাঁর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কুশিয়ারার পূর্বতীরে সুতারকান্দিতে অবস্থান নিয়ে বসেছিলেন। ওখান থেকে তিনি মাঝে মাঝেই শত্রুর বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনার জন্য ছোট ছোট দল পাঠাতেন। ২৪শে মে ভোরে পাকিস্তানীরা আমাদের সুতারকান্দি ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়। প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। এরপর সকাল সাড়ে সাতটার দিকে প্রচণ্ড কামানের গোলার সাহায্যে শত্রুরা দ্বিতীয় দফা আক্রমণ চালালে তাও প্রতিহত করা হয়। বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাবারুদের মজুত ছিলো সীমিত। নতুন কিছু পাওয়ারও সম্ভাবনা ছিলো না। বিভিন্ন দিক থেকে কামানের গোলা বর্ষণসহ পুনঃ পুনঃ আক্রমণে আমাদের যোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। পশ্চাদপসরণের আগে তাদের পাল্টা আঘাতে শত্রু পক্ষের ৩৯ জন প্রাণ হারায়। দুজন শত্রু সৈন্য বন্দী হয়। আমাদের ২ জন মুক্তিযোদ্ধাকে শত্রুরা ধরে নিয়ে যায়। অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে তাদের হত্যা করা হয় বলে পরে জানা যায়। এখানে পাকিস্তানীদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য বিরাটকায় হেলিকপ্টার যোগে সৈন্য ও রসদপত্র পাঠাতে হয়েছিলো।

১৯শে জুন ক্যাপ্টেন রবকে সিলেট জেলার লাঠিটিলা শত্রু ঘাঁটি দখল করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এখানে মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ শুরুর আগে প্রায় ৩০ মিনিট কামান থেকে শেলিং করা হয়। কামানের ছত্রছায়া দিয়েছিলো ভারতীয় সেনাবাহিনী। গোলাবর্ষণ ক্ষান্ত হতেই মুক্তিযোদ্ধারা ঝড়ের গতিতে আক্রমণ চালিয়ে সমগ্র লাঠিটিলা শত্রুমুক্ত করে। প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান থেকে পালাতে গিয়ে অনেক শত্রু সৈন্য বাঙালী যোদ্ধাদের হাতে প্রাণ হারায়। আমাদের পক্ষে ৪ জন যোদ্ধা আহত হয়েছিলো।

এ দু'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াও শত্রুর বিরুদ্ধে আরো অনেক ছোটখাট আক্রমণ এই সেক্টরে চালানো হয়েছিলো। ক্যাপ্টেন শরিফুল হক (ডালিম) কুবিতাল সাব-সেক্টরে আক্রমণ ও অ্যামবুশ চালিয়ে পাকিস্তানীদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলো। দিলখুশ এবং জুরী এলাকায় তাঁর আক্রমণে অনেক পাকসেনা হতাহত হয়। ক্যাপ্টেন শরিফুল দিলখুশে এক লড়াইয়ে গুরুতর রূপে আহত হওয়ায় বেশ কিছু দিন তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হয়।

সিলেটের উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে ৫ নম্বর সেক্টর গঠিত। এই সেক্টরে পাকিস্তানীদের তেমন তৎপরতা ছিলো না। মেজর শওকত, ক্যাপ্টেন মুসলিম, লেফ্‌টেন্যান্ট তাহেরুদ্দিন, লেফ্‌টেন্যান্ট এস. এম. খালেক এবং লেফ্‌টেন্যান্ট ফজলুর রহমান এখানে শত্রুর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সফল আক্রমন পরিচালনা করেন।

উইং কমাণ্ডার বাশার কার্যকরভাবে তাঁর ৬নং সেক্টর (রংপুর, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর) সংগঠিত করেছিলেন। তাঁর অধীনে স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দিন, ক্যাপ্টেন নজরুল, ক্যাপ্টেন নোয়াজিশ, ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার, ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান, ক্যাপ্টেন দিলওয়ার, লেফটেন্যান্ট সামাদ, সুবেদার মাহমুদ, সুবেদার হাফিজ, নায়েব সুবেদার খালেক, নায়েব সুবেদার গোফরান, নায়েব সুবেদার বদি এবং আরো অনেকে শত্রুর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সফল 'রেইড' এবং 'অ্যামবুশ' করেছিলেন। অন্যান্য সেক্টরের মতোই এই সেক্টরেও ইপিআর সেনারাই ছিলো আমাদের প্রধান শক্তি।

৭ নম্বর সেক্টরে মেজর নাজমুল কয়েকটি দুঃসাহসিক আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। ১৮ই জুন তিনি এক কোম্পানী ইপিআর এবং কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে দিনাজপুরের ঠনঠনিয়া পাড়ায় পাক-সেনাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। ৩০ মিনিট প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধারা স্থানটি দখল করে নেয়। এই সংঘর্ষে ১৫ জন পাকিস্তানী সেনা নিহত এবং ১৪ জন আহত

হয়। আমাদের পক্ষে ১জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ এবং ২জন আহত হন। এই আক্রমণে মেজর নাজমুল নিজে উপস্থিত থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। ৪ঠা জুলাই রাতে তিনি কাঞ্চনে আরেকটি দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছিলেন। অবশ্য এ আক্রমণ সফল না হলেও আমাদের পক্ষে কেউ হতাহত হয়নি।

১১ই আগস্ট সুবেদার মেজর এম. এ. মজিদ চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমার শিবগঞ্জ থানার কলাবাড়ীতে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে এক দুঃসাহসিক এবং সফল আক্রমণ চালিয়েছিলেন। ভোর সাড়ে চারটায় তিনি ৬৪ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে পাকিস্তানী অবস্থানের ওপর হামলা শুরু করেন। দুই ঘন্টা তীব্র সংঘর্ষের পর আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা কলাবাড়ী দখল করতে সক্ষম হন। শত্রুরা এখান থেকে পিছু হটে কানসার্টে তাদের মূল অবস্থানে প্রতিরক্ষাব্যুহ জোরদার করে।

১৪ই আগস্ট থেকে মুক্তিযোদ্ধারা কানসার্টের ওপর অব্যাহত মর্টার শেলিং আরম্ভ করে। ২৩শে আগস্ট ক্যাপ্টেন ইদ্রিস এবং সুবেদার মেজর মজিদ যৌথভাবে কানসার্টের ওপর হামলা চালায়। প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর মুক্তিযোদ্ধারা কানসার্ট দখল করেন। কিন্তু মাত্র চার ঘন্টার মধ্যেই চাপাই-নবাবগঞ্জ থেকে বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য কানসার্ট পাঠানো হয়। পাক-সেনাদের তীব্র চাপের মুখে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে কানসার্ট ছেড়ে আসতে হয়। এই তীব্র সংঘর্ষে একজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। শত্রুপক্ষে কতজন হতাহত হয়েছিলো তা অবশ্য জানা যায়নি।

এই সেক্টরে হাবিলদার শফিক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিযান চালিয়েছিলেন। ৩রা আগস্ট তিনি রাজশাহীর পুটিয়া থানার অন্তর্গত ঝলমলিয়া সেতুর নিকট শত্রু সৈন্যদের ওপর হামলা চালান। এই অভিযানে দুটি এল-এমজি অবস্থান পুরো ধ্বংস করে দেয়া হয়। সংঘর্ষে ৪জন পাকসেনা নিহত হয়।

৪ঠা আগস্ট তিনি তাহেরপুরে নদীতে টহলরত একদল শত্রু সৈন্যকে অ্যামবুশ করেন। রাত ১০টায় শত্রুদের নৌকাগুলোর ওপর হাবিলদার শফিক এবং তার দলের অন্যান্যরা প্রথমে হ্যাণ্ডগ্রেনেড ছোঁড়া শুরু করে এবং তার পরপরই এলএমজি এবং রাইফেল থেকে গুলী বর্ষণ করে। এই অ্যামবুশে ১৮জন পাকসেনা নিহত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে নৌকায় তিন জন বাঙালী মাঝি গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। অবশ্য কোন মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হয়নি।

এই সেক্টরে ১৭ই আগস্ট মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অভিযান দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলো। ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী সারদা পুলিশ একাডেমীতে থাকতো। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিবলী ছয়জনের একটি দল নিয়ে এক কোম্পানী শত্রুর ওপর দুঃসাহসী হামলা চালায়। মুক্তিযোদ্ধারা ক্রলিং

করে শত্রু অবস্থানের একেবারে কাছে চলে যায় এবং বাংকারের ভেতর হ্যাণ্ডগ্রেনেড ছুঁড়তে থাকে। হাত বোমা ছুড়তে ছুড়তে বাংকারের পর বাংকার পার হয়ে তারা একাডেমীর একটি বাংলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে। এখানেই শত্রু সেনাদের মূল অংশ অবস্থান করছিলো। মরণজয়ী মুক্তিযোদ্ধারা পরাভূত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে ১০ জন শত্রু সেনাকে হত্যা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের একজন মাত্র পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলো। বাকি চারজনকে পাকিস্তানীরা সেই জায়গাতেই হত্যা করে। শিবলী গ্রেফতার হয়। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের ঠিকানা সংগ্রহের জন্য পাকিস্তানীরা তাঁর ওপর নির্যাতন শুরু করে। কিন্তু সেই নির্ভীক যোদ্ধার মুখ থেকে তারা একটি তথ্যও বের করতে পারেনি। পাকিস্তানীরা তার চোখ দুটি উপড়ে ফেলে। তার পর একটি একটি করে দাঁত তুলতে থাকে। আংগুল গুলো কেটে দেয়। চরম দানবীয় নির্যাতনেও শিবলী দেশমাতৃকার সেবায় অটল থাকে। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর কোন হদিস সে শত্রুকে দেয়নি। আরো অনেক তরুণের মতো বাংলার বীর সন্তান শিবলীও আমাদের জাতীয় গর্ব। মাতৃভূমির জন্য নিবেদিত প্রাণ শিবলীর অপূর্ব বীরত্ব এবং দুর্জয় সাহসিকতা আমাদের তরুণদের যুগে যুগে প্রেরণা যোগাবে।

২৭শে মে আমাদের ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা অবস্থানের ওপর পাকিস্তানী একটি ব্যাটালিয়ন আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন এক কোম্পানী ইপিআর সৈন্য নিয়ে পাকিস্তানীদের বার বার আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের পাল্টা আঘাতে পাক ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার আহত এবং একজন ক্যাপ্টেন সহ শতাধিক শত্রু সৈন্য নিহত হয়। আমাদের পক্ষে নিহত হয় ২জন, আহত হন ৮জন। নায়েব সুবেদার জববার, হাবিলদার বেলায়েত হোসেন এবং হাবিলদার তরিকুল্লাহর দুর্জয় মনোবল এবং অদম্য সাহসিকতার জন্যই শত্রু সেনারা সেদিন পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু শত্রুরা প্রতিবারই নতুন সৈন্য দ্বারা বলিয়ান হয়ে বার বার আক্রমণ চালাতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ১৪ ঘন্টারও বেশি সময় লড়াই করার পর আমাদের যোদ্ধারা বয়রা অবস্থান ত্যাগ করে।

১৫ই মে ক্যাপ্টেন হুদার নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল কাশিপুর সীমান্ত ফাঁড়ির নিকট শত্রু অবস্থানের ওপর হামলা চালায়। ছয়জন পাকিস্তানীকে নিহত এবং একটি এলএমজি, আটটি রাইফেল ও কিছু গোলাবারুদ হস্তগত করতে সক্ষম হয় আমাদের যোদ্ধারা।

এ সময় ক্যাপ্টেন হুদা খবর পেলেন যে পাকিস্তানী সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী সুতীপুর গ্রামে ঢুকে একের পর এক সবকিছু ধ্বংস করছে। নির্বিচারে তারা নারী,

পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করছে। নিরপরাধ অসহায় গ্রামবাসীরা পালাতে গিয়ে তাদের গুলীর শিকার হচ্ছে। দুটি ইপিআর প্লাটুন নিয়ে ক্যাপ্টেন হুদা দ্রুত অকুস্থলে পৌঁছে গ্রামটি ঘিরে ফেলেন এবং পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেন। শত্রুরা এতে দ্বিধা প্রকাশ করলে ক্যাপ্টেন হুদা চারদিক থেকে তাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করেন। দু'ঘন্টা লড়াইয়ের পর ১১ জন পাক সেনা নিহত হয় এবং ৪ জনকে আটক করা হয়। অবশিষ্টরা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

২৭শে মে তারিখেও ক্যাপ্টেন হুদার নেতৃত্বাধীন প্লাটুনের সঙ্গে কাশিপুর সীমান্ত ফাঁড়ির কাছে ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের দু'টি কোম্পানীর সংঘর্ষ হয়। লড়াই শুরু হলে ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন তৌফিক এলাহীকে সীমান্ত ফাঁড়ির ডান দিক থেকে শত্রুর ওপর আঘাত হানার আহব্বান জানান। বাঙালী সৈন্য-দের যৌথ আক্রমণে শত্রুদের অনেকেই মৃত্যু বরণ করে। জীবিতরা দিশেহারা হয়ে কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পালায়। কিন্তু এর মধ্যে ৬০ জন শত্রুকে প্রাণ দিতে হয়েছে। পরে রণাঙ্গন থেকে তাদের লাশ উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া তিন জন পাকিস্তানী বন্দী এবং চারটি সামরিক যান পুরাপুরি ধ্বংস করে দেয়া হয়। প্রায় হাতাহাতি যুদ্ধের সময় মাত্র ১০ ফুট দূরের রাইফেলের গুলীতে বাঙালী সুবেদার মনিরুজ্জামান প্রাণ হারান। হাবিলদার আরব আলী এক অল্পবয়সী পাকিস্তানী লেফটেন্যান্টের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধে একাই তাঁকে হত্যা করেন। আরব আলী অবশ্য সামান্য আহত হয়েছিলেন।

এই সেক্টরে আরো অনেকগুলো অ্যামবুশ এবং সম্মুখ সংঘর্ষে ক্যাপ্টেন এ. আর. আজম চৌধরী, ক্যাপ্টেন তৌফিক এলাহী (মেহেরপুরের সাবেক এসডিও), ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজুর রহমান, লেফ্‌টেন্যান্ট জাহাংগীর, নায়েব সুবেদার এ. মতিন পাটোয়ারী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

৯নম্বর সেক্টর কমাণ্ডার মেজর জলিল প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে পুনরায় তাঁর সৈনিকদের পুনর্গঠিত করেন। স্মর্তব্য যে দু'টি লঞ্চ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারত থেকে ফেরার পথে পাকিস্তানীরা গানবোট দ্বারা তাঁর সবকিছু নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছিলো। তিনি তাঁর সেক্টরকে সুবিধা অনুযায়ী কয়েকটি সাব-সেক্টরে ভাগ করেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে অ্যামবুশ এবং সরাসরি আক্রমণ চালাতে থাকেন। এই সেক্টরে তার সহযোদ্ধাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন হুদা, লেফ্‌টেন্যান্ট জিয়া, লেফ্‌টেন্যান্ট মুখার্জী, লেফ্‌টেন্যান্ট মেহেদী, লেফ্‌টেন্যান্ট বেগ, লেফ্‌টেন্যান্ট শাহজাহান, সুবেদার ইলিয়াস, সুবেদার লস্কর, নায়েব সুবেদার গফ্‌ফার, হাবিলদার

সোবহান, হাবিলদার আবদুল হক এবং আরো অনেকে শত্রুর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সাফল্যজনক আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন।

ইপিআর-এর পাঁচটি মোটর লঞ্চের উপর মেশিনগান বসিয়ে সেগুলো গানবোট হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এই সেক্টরে ইপিআর মোটর লঞ্চগুলো যুদ্ধে দারুণ কাজে লেগেছিলো। শংকর, শ্রীপুর, দেবহাটা, খানজি, বসন্তপুর, উকশা এবং লইখালীতে পাকিস্তনীরা শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করে। ১২ই জুন দিবাগত মধ্যরাতে ক্যাপ্টেন নুরুল হুদার নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা বসন্তপুরের পাকিস্তানী ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়। সেই রাতে প্রায় একই সময় লেঃ মুখার্জী, হাবিলদার সোবহান এবং জনাব শাহজাহানের (শিক্ষক) নেতৃত্বে আরেক দল মুক্তিযোদ্ধা শ্রীপুরের শত্রু ঘাঁটির ওপর আঘাত হানে। এতে দু'টি স্থানের পাক সেনারাই হতচকিত হয়ে পড়ে। বসন্তপুরে ২০ জন শত্রুসেনা প্রাণ হারায় ও ৬০টি রাইফেল, দু'টি এলএমজি এবং প্রচুর গোলাবারুদ আমাদের হস্তগত হয়। শ্রীপুরের সংঘর্ষে পাকিস্তানীদের হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি, তবে মুক্তিযোদ্ধারা এখানে ৩৫টি রাইফেল, কিছু গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক দখল করে। দু'টি স্থানেই আমাদের কেউ হতাহত হয়নি।

জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে ক্যাপ্টেন হুদা খানজীর শত্রু ঘাঁটির ওপর হামলা চালান। রাত ১০টার দিকে আক্রমণের আগে কিছুক্ষণ ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা বর্ষণ করা হয়। মর্টারের গোলাবর্ষণের পরেই আক্রমণ শুরু হয় তিন দিক থেকে। এই আক্রমণ প্রতিহত করা পাক সেনাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারা পালিয়ে সাতক্ষীরা এবং দেবহাটার মাঝামাঝি পারুলিয়ার নতুন ঘাঁটিতে আশ্রয় নেয়। চারজন আহত পাকিস্তানীকে বন্দী করা হয়, তাদের সাথে আরো পাওয়া যায় কয়েকটি দু'ইঞ্চি মর্টার, এলএমজি, চাইনিজ রাইফেল, কিছু গোলাবারুদ ও অন্যান্য রসদ। এই আক্রমণের সাফল্যে মুক্তিযোদ্ধা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মনোবল বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

শ্যামনগর ওয়াপদা কলোনীর পাকিস্তানী অবস্থানের ওপর মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালায় ২০শে আগস্ট। প্রায় দেড়শ মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন হুদা, লেঃ বেগ এবং ইপিআর-এর সুবেদার আবদুল হকের নেতৃত্বে শত্রু প্লাটুনের ওপর আঘাত হানে। রাত দু'টায় দু'ইঞ্চি মর্টার সহযোগে আক্রমণ শুরু হয়। সুবেদার ইলিয়াস এবং অপর কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ক্রলিং করে ওয়াপদা কলোনীতে শত্রুর ব্যুহের একেবারে কাছে চলে যায়। বাকি মুক্তিযোদ্ধারাও তাদের অনুসরণ করে এক-যোগে আক্রমণ চালায়। সংঘর্ষে সুবেদার ইলিয়াস এবং ৭জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়। ৬জন মুক্তিযোদ্ধাকে শত্রুরা বন্দী করে নিয়ে যায়। শত্রুপক্ষে নিহত হয়

৪জন। অপর চারজন আহত পাকিস্তানী সৈন্য মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। শত্রুপক্ষের বাকি সৈন্যরা আহত সঙ্গীদের নিয়ে পলায়ন করে। মুক্ত শ্যামনগর থানায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

বিভিন্ন সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাদের অব্যাহত অ্যামবুশ এবং অতর্কিত আক্রমণ চালানোর সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচলিত পদ্ধতির কয়েকটি অভিযানেরও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেগুলো কার্যকর করা হয়। নবগঠিত "জেড-ফোর্স" এ ধরনের কয়েকটি অভিযানে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। যুদ্ধের প্রচণ্ডতার দিক দিয়ে এইসব অভিযানের মধ্যে কামালপুর এবং বাহাদুরাবাদের সংঘর্ষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩০শে জুলাই রাতে ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের দু'টি কোম্পানী কামালপুর সীমান্ত ফাঁড়ির ওপর আক্রমণ শুরু করে। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে ডেল্টা কোম্পানী এবং তাদের সঙ্গেই ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে "ব্রাভো" কোম্পানী অভিযানে অংশ নেয়। এ সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী দুর্জয় শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিলো। কিন্তু অভিযান আমাদের ব্যর্থ হয় এবং পরদিন সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে আমাদের যোদ্ধারা পেছনে সরে আসে। সংঘর্ষে আমরা ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন এবং অপর ৩০ জনকে হারাই। আমাদের পক্ষে আহতের সংখ্যা ছিলো দু'জন অফিসারসহ ৬৮ জন। শত্রু পক্ষেও হতাহতের সংখ্যা কম ছিল না। তাদের পক্ষে বেশি ক্ষতি হয়েছিলো আক্রমণ শুরুর পূর্বেকার কামানের গোলাবর্ষণে।

এরপর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংঘর্ষ ঘটে ৩১শে জুলাই। অভিযান পরিচালনায় ছিলেন মেজর শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে ৩ বেঙ্গল রেজিমেন্ট। বাহাদুরাবাদ-ঘাটে পাকিস্তানীদের শক্তিশালী ঘাঁটির ওপর আমাদের দু'টি কোম্পানী এই আক্রমণ চালায়। এতে শত্রুরা হতভম্ব হয়ে পড়ে।

বাহাদুরাবাদ ঘাটের ফেরী পারাপারের মাধ্যমে উত্তর বঙ্গের রেল যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। এই যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করার এবং যতো দিন পারা যায় স্থানটি মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই মুক্তিবাহিনী এখানে আক্রমণ চালায়। আক্রমণকারী দল কয়েকটি নৌকায় ১৫ মাইল নদী পথ অতিক্রম করে প্রায় মাঝ রাতে লক্ষ্যস্থলের কাছে গিয়ে পৌঁছে। কাজটি ছিল খুবই বিপজ্জনক। আমাদের একটি নৌকার উপর পাকিস্তানী গানবোটগুলোর বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখা দিলে সমস্ত অভিযানই অংকুরে বিনষ্ট হতো। সবগুলো নৌকাই তারা অতি সহজে ধ্বংস করতে পারতো, সাথে সাথে অসহায়ভাবে মরতে হতো আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের।

যাহোক, মুক্তিবাহিনী লক্ষ্যস্থলের কাছে পৌঁছেই তিন ইঞ্চি মর্টার শেল দিয়ে প্রথম হামলা চালায়। সাথে সাথে তারা বিভিন্ন প্লাটুনে ভাগ হয়ে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানার জন্য দ্রুত অগ্রসর হয়। নায়েব সুবেদার বুলু মিয়া অগ্রবর্তী প্লাটুনটি নিয়ে এগিয়ে যান প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলোর দিকে। অত্যন্ত নিকট থেকে হ্যাণ্ড গ্রনেড ছুঁড়ে ছুঁড়ে তারা শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় প্রচণ্ড হাতাহাতি যুদ্ধ। শত্রুপক্ষের ভারী ও হালকা মেশিনগান যে সব জায়গায় স্থাপন করা হয়েছিলো হাতবোমার বিস্ফোরণে তার অধিকাংশই ধ্বংস হয়। ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিপুল সংখ্যক রেলওয়ে ওয়াগন, স্টীমার প্রভৃতি। এগুলোতে করে শত্রু সৈন্য বহন করা হচ্ছিলো। পাকিস্তানীরা আক্রমণের তীব্রতা সামাল দিতে না পেরে পালাতে শুরু করে। তাদের অনেকে হতাহত হয়। শত্রুপক্ষে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষতি ছিলো অপূরণীয়। লড়াই তখন প্রায় শেষ। এমন সময় একটা গুলী এসে অগ্রবর্তী প্লাটুন কমাণ্ডার সুবেদার বুলু মিয়ার দেহে বিদ্ধ হয়। আমাদের পক্ষে এটাই ছিলো একমাত্র ক্ষতি। এই অভিযানে মেজর সাফায়াত, ক্যাপ্টেন আনোয়ার, লেঃ নূরুন্নবী, সুবেদার আলী আকবর, সুবেদার করম আলী এবং সুবেদার বুলু মিয়ার নেতৃত্বে সকল সদস্য সুপরিকল্পিতভাবে অসম সাহস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বলেই তারা জয়ের মালাও ছিনিয়ে আনতে পেরেছিলেন। একইসঙ্গে দেওয়ানগঞ্জেও আমাদের যোদ্ধারা আরেকটি অভিযান চালায়। এখানেও আমাদের সফল আক্রমণের বিরুদ্ধে টিকতে না পেরে পাকিস্তানী সৈন্যরা পালিয়ে যায়। অবশ্য দিন তিনেকের ভেতরেই শত্রুরা আবার পুরো শক্তি নিয়ে এসব ঘাঁটিতে ফিরে আসে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারাও আপন আপন দায়িত্ব সম্পন্ন করে নিজেদের জায়গায় প্রত্যাবর্তন করে।

কে-ফোর্স এবং এস-ফোর্সও যুদ্ধের বিভিন্ন সময়ে অনুরূপ অভিযান পরিচালনা করে। প্রয়োজন অনুযায়ী কখনো কোম্পানী, আবার কখনো ব্যাটালিয়ন শক্তিতে এসব অভিযান পরিচালিত হয়।

চারদিকে তখন যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি তীব্রতর হয়ে ওঠে। দিনে দিনে শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যাও দ্রুত বাড়তে থাকে। হতাহত হতে থাকে মুক্তিযোদ্ধারাও। কখনো কখনো আমাদের পরাজয়ও স্বীকার করতে হয়। তবে অধিকাংশ অভিযানেই আমরা জয়ী হতে পেরেছি। এই লাভ ক্ষতির মধ্য দিয়েই বিভিন্ন শ্রেণীর লোক নিয়ে গঠিত আমাদের বাহিনী পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে একযোগে রুখে দাঁড়ানোর জন্য একটি একীভূত ও সমন্বিত শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পেরে-

ছিলো। আমাদের ইপিআর, পুলিশ, ছাত্র, বেসামরিক ও অন্যান্য শ্রেণীর নাগরিক, সামরিক বাহিনীর লোক সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি থেকে এসেছিলো, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা কারো ছিলো, আবার কারো ছিলো না। মানসিকতাও ছিলো সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। অথচ তারা নিজেদের সকল অমিল বিসর্জন দিয়ে ভাবের সুসমন্বিত আদান প্রদানের মাধ্যমে এতো অল্প সময়ের মধ্যে যেভাবে শত্রুকে পরাভূত করতে পেরেছিলো, ইতিহাসে তার নজির খুব বেশি নেই। যুদ্ধকালের জয় পরাজয় দুটোই আমাদের কাজে লেগেছিলো। প্রতিটি বিজয় আমাদের মনোবলকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এবং প্রতিটি পরাজয় থেকে শিখতে পেরেছি কোথায় আমাদের ভুল। এতে করে ভবিষ্যতে আরো নির্ভুলভাবে আক্রমণ পরিচালনা করার প্রস্তুতি নিতে পেরেছি। প্রাথমিক অবস্থার প্রতিরোধ এবং স্বতঃস্ফূর্ত অথচ শতধা বিচ্ছিন্ন আক্রমণ চালাবার পর আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের বাহিনীর যথাযথ সমন্বয় সাধন এবং পরিকল্পিত পুনর্গঠন ছাড়া আমরা শুধু শত্রুকে ছোট খাট আঘাতই হানতে পারবো, কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। আর তাই বাংলাদেশে যোদ্ধা শক্তিগুলোকে সমন্বিত বাহিনীতে রূপান্তর করার লক্ষ্যেই আমরা জুলাই মাসে কলকাতায় সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলাম।

২৭
শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিলো। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, গায়ক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী এবং কলা-কুশলীবৃন্দ যে বিরাট অবদান রেখেছেন তার উল্লেখ না করলে আমাদের মুক্তি-যুদ্ধের ইতিহাস অসমাপ্ত থেকে যাবে।

৩০শে মার্চ চট্টগ্রামে আমাদের বেতার কেন্দ্রটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ছোট্ট একটি ট্রান্সমিটার অনেক চেষ্টায় অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতের আগরতলার নিকট কর্ণেল চৌমোহনীতে ছোট্ট ট্রান্সমিটারটি দিয়ে আমরা একটা নতুন বেতার কেন্দ্র পুনরায় চালু করেছিলাম। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এক কিলোওয়াট শক্তির এই ট্রান্সমিটারটি অনুষ্ঠান প্রচার করে। কিন্তু এর শক্তি ছিলো খুবই কম। কেবল মাত্র কুমিল্লার সীমান্ত এলাকার নোয়াখালী ও সিলেটের অংশ বিশেষ ছাড়া আর কোথাও অনুষ্ঠান শোনা যেতো না। এদিকে আমাদের সরকার একটা শক্তিশালী ট্রান্সমিটারের জন্য ভারতের সংগে আলোচনা করছিলেন। আলোচনার ফলশ্রুতিতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ৫০ কিলোওয়াটের একটি ট্রান্সমিটারের ব্যবস্থা করেন এবং এটি ২৩শে মে তারিখের মধ্যে মুজিব-নগরে স্থাপন করা হয়। কিন্তু শুধু ট্রান্সমিটার পেলেই তো চলবে না, প্রচারের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত অনুষ্ঠানমালা, তাছাড়া এর জন্য অন্যান্য অনেক আয়োজনও দরকার ছিলো। আমাদের কোন রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি ছিল না। টেপ কিংবা ট্রান্সমিশনের অন্যান্য সাজসরঞ্জামও ছিলো না। প্রধানমন্ত্রি তাজউদ্দিন আহমদ যে কক্ষটিতে বাস করতেন তার পাশেই ছোট্ট একটি কুঠরিকে স্টুডিওতে রূপান্তরিত করা হয়। রেকর্ডিংয়ের জন্য দরকারী জিনিস পত্রের একটি তালিকা তৈরী করে পরিষদ সদস্য জনাব মান্নানের হাতে দেয়া হয়। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। বস্তুতঃ একেবারে শূন্য থেকেই সবকিছু শুরু করা হয়েছিলো।

২৪শে মে বেতারে অনুষ্ঠান প্রচারের প্রস্তুতি শুরু হয়। শুরু হয়েছিল শুধু একটি রেকর্ডিং মেশিন এবং একটি মাইক্রোফোন দিয়ে। সে দিন রাত চারটা পর্যন্ত খেটে তিনটি অধিবেশনের জন্য অনুষ্ঠান সূচী তৈরী করা হয়। তারপর ২৫শে মে মুজিবনগর থেকে বাঙালীদের এবং বিশ্ববাসীর জন্য 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের' অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়। অনুষ্ঠানের প্রথমে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের প্রতি অভিবাদন জানানো হয়, অভিবাদন জানানো হয় বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি—যাঁরা বাঙালীদের সংগ্রামে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ২৫শে মে এই অনুষ্ঠান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীদের নিজস্ব বেতার কেন্দ্র লাভের দীর্ঘ-দিনের কাঙ্খিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। মুজিবনগর বেতার কেন্দ্র থেকে সার্থক অনুষ্ঠান প্রচার করার জন্য যে সব বাঙালী দিনের পর দিন কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের তৎকালীন প্রেস সেক্রেটারী আমিনুল হক বাদশা, টি. এইচ. সিকদার, আশফাকুর রহমান, শহীদুল ইসলাম, তাহের সুলতান, সামসুল হুদা, মাহবুব উদ্দিন, নজরুল, সুকুমার বিশ্বাস প্রমুখের নাম করতে হয়। এদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন মুস্তাফা আনোয়ার, আবদুল্লাহ আল ফারুক, আবুল কাসেম সন্দীপ, আবদুস শুকুর এবং বেতার প্রকৌশলী সৈয়দ আবদুস শাকের, রাশেদুল হোসেন, আমিনুর রহমান, এ. এম. শফিকুজ্জামান, রেজাউল করিম, কাজী হাবিবুল্লাহ প্রমুখ। এই শেষের দলের ব্যক্তিরাই কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনায় সরাসরি জড়িত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, কালুরঘাট কেন্দ্র থেকে ২৬শে মার্চ আমাদের প্রথম অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। মুজিব-নগর বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল :

১. অগ্নিশিখা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

২. রক্তস্বাক্ষর : একটি জাতীয়তাবাদী সাহিত্য আসর

৩. বজ্রকণ্ঠ শেখ মুজিবুর রহমানের টেপকরা বক্তৃতা, বিশেষ করে ৭ই মার্চের বক্তৃতাটি বিরাট অনুপ্রেরণার উৎস ছিল

৪. দর্পন একটি বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠান

৫. জাগরণী জাতীয়তাবাদী এবং বিপ্লবী সংগীতানুষ্ঠান

৬. ঐকতান সংগীতানুষ্ঠান

৭. চরম পত্র : একটি ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক অনুষ্ঠান। পাকসেনাদের মনোবল ভাঙার জন্য তাদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরা হতো এই অনুষ্ঠানে।

৮. বহির্বিশ্ব এবং বিদেশী নাগরিকদের জন্য বিশেষ ইংরেজী অনুষ্ঠান।

৯. ইংরেজী খবর

১০. বাংলা খবর

১১. বিশ্ব জনমত : আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন বিদেশী পত্র পত্রিকা এবং প্রখ্যাত বিশ্ব নেতৃবর্গের মতামত।

পবিত্র কোরান তেলওয়াতের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন সকালের অনুষ্ঠান শুরু হতো। হিন্দুদের জন্য গীতা এবং বৌদ্ধদের জন্য ত্রিপিটক পাঠের ব্যবস্থা হয়েছিলো সপ্তাহে দুবার।

বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের জনগণের কাছে এই সব অনুষ্ঠানগুলি ছিলো অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই বিরাট সাফল্যের পেছনে রয়েছে বাঙালী বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, লেখক, কবি, গায়ক, সংগীত শিল্পী, চিত্র শিল্পী এবং বেতার কেন্দ্রের কলাকুশলী ও কর্মচারীদের কঠোর পরিশ্রম, নিরলস প্রচেষ্টা এবং অকৃত্রিম দেশ-প্রেম। সৈয়দ আলী আহসান, শওকত ওসমান, রণেশ দাশ গুপ্ত, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মযহারুল ইসলাম, ডঃ এ. আর. মল্লিক, ডঃ সারোয়ার মোর্শেদ, সন্‌জিদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক, ডঃ অজয় রায়, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, ফয়েজ আহমদ, গাজী-উল-হক, জহির রায়হান, সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আবদুল তোয়াব খান, মহাদেব সাহা, ডঃ মাহমুদ-উল-ইসলাম, মাহবুব তালুকদার, উম্মে কুলসুম, নাসিমা চৌধুরী, নওয়াজেস হোসেন, আসাদ চৌধুরী, সুকুমার বিশ্বাস নির্মলেন্দু গুণ, বদরুল হাসান এবং আরো অনেকের অবদান সবাই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তাঁরা নিবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা ও গান রচনা করে—গান গেয়ে জনগণকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছেন—অনুপ্রাণিত করেছেন শত্রুকে পর্যুদস্ত করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে।

এমনকি চিত্র শিল্পীরাও বসে ছিলেন না। তাঁদের অনুপ্রেরণা মূলক চিত্রকর্ম-মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম প্রেরণা জুগিয়েছিলো। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রামের ছবি এঁকেছেন—একেছেন গেরিলা পরিবেষ্টিত হয়ে আর পালাবার পথ না পাওয়া পাক সেনাদের দুর্দশার চিত্র। চিত্রশিল্পীদের মধ্যে কামরুল হাসান, দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুণ্ড, নাজির আহমেদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে কামরুল হাসানের 'নরপশু ইয়াহিয়ার' সেই অসাধারণ চিত্রটির কথা কখনো ভোলা যাবেনা।

সংগীতে সেদিন যারা কণ্ঠ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন আবদুল জব্বার, সমর দাস, আপেল মাহমুদ, অজিত রায়, রথীন রায়, কাদেরী কিবরিয়া, রফিকুল আলম, এম. এ. মান্নান, মান্না হক, স্বপ্না রায়, কল্যাণী ঘোষ, আলোকময় নাহা, প্রবাল চৌধুরী, অরুপ রতন চৌধুরী, সুকুমার বিশ্বাস, উমা চৌধুরী প্রমুখ। দেশের প্রতি ও জাতির

সংগ্রামের প্রতি প্রাণের দরদ দিয়ে গাওয়া দেশাত্মবোধক গানগুলো সেদিন এ-দেশের মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করেছিলো। এই গানগুলো যখনই মানুষ স্মরণ করবে তখনই তাদের মনে পড়বে এসব গানের নেপথ্য শিল্পীদের কথা।

হাসান ইমাম, সুভাষ দত্ত, সুমিতা দেবী, রাজু আহমদ, নারায়ণ ঘোষ, মাধুরী চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ বোস, আজমল হুদা মিঠু প্রমুখ ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত নাট্য শিল্পী। কল্যাণমিত্রের 'জল্লাদের দরবার' নামক ধারা-বাহিক নাট্যানুষ্ঠানটিও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিলো।

বেতারের অনুষ্ঠানমালা সাফল্যের সাথে প্রযোজনা করেছেন আলী যাকের, আলমগীর কবির, মুস্তফা মনোয়ার, তাহের সুলতান, এম. আর. আখতার (মুকুল), কামাল লোহানী প্রমুখ। ইংরেজী সংবাদ পাঠে প্রশংসা লাভ করেছেন—মিসেস পারভীন হোসেন এবং নাসরিন আহমদ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে কুড়িটিরও বেশি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিলো। এইসব পত্রিকার কতগুলো প্রেসে ছেপে, কতগুলো সাইক্লোষ্টাইল কপি করে, আবার কতগুলো শুধু হাতে লিখে বিতরণ করা হতো। প্রকাশের ভঙ্গি যা-ই হোক, সবগুলোরই আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিলো অভিন্ন—শত্রুর বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা।

খবরের কাগজগুলোর প্রচার সংখ্যা বেশি ছিলো না বলে বাংলাদেশের জনগণের চাহিদা মিটানো যেতো না। অনেককে দেখা যেতো, দূর দূরান্তে গিয়ে স্বাধীন বাংলার একটি পত্রিকা সংগ্রহ করছে-কিংবা শুধু এক নজর চোখ বুলিয়ে আসছে। সে সময় মুক্তিযুদ্ধের খবরের কাগজ ঘরে রাখা কিংবা সাথে নিয়ে চলা ছিলো ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, যেসব অল্প বয়সের ছেলে এগুলো বিলি করতো, কাগজ সহ ধরা পড়লে পাকিস্তানীরা সেই স্থানেই তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনাও ছিলো সমান ভাবে বিপদজনক। ধরা পড়লে একমাত্র চরমতম দণ্ড মৃত্যুই ছিলো তাৎক্ষণিক শাস্তির বিধান। তবু লোকজন উন্মুখ হয়ে এই অনুষ্ঠান শুনতো লুকিয়ে লুকিয়ে, সংগোপনে। কখনো একা, কখনো বা পরিবারের সকলে মিলে। এ ব্যাপারে অনেক স্থানেই বেশ একটা অভিন্ন প্রস্তুতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রথমে ঘরের সকল আলো নিভিয়ে বাইরে একজনকে পাহারায় রাখা হতো যাতে সন্দেহভাজন কেউ এলেই অন্যদের সাবধান করে দেয়া যায়। তারপর রেডিও চালু করে সবাই গোল হয়ে বসতো এবং আওয়াজ খুব কমিয়ে রেখে রেডিও শুনতো। একজনের মাথা আরেকজনের সাথে ঠেকিয়ে কি আগ্রহে যে তারা দূর থেকে ভেসে আসা সেই মৃদু শব্দগুলো

যতো—সে এক অপূর্ব দৃশ্য। কেউ আবার এতেও নিরাপদ বোধ না করে রেডিও নিয়ে যেতো একেবারে কাঁথা কিংবা লেপের নীচে। মুক্তিযোদ্ধাদের কোন খবর শুনলে তৎক্ষণাৎ সে মাথা বের করে ঘরের সকলকে চাঞ্চল্যকর খবরটা দিয়েই আবার কাঁথার মধ্যে ঢুকে পড়তো পরবর্তী খবর শোনার জন্য।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনা থেকে কেউ যাতে বাদ না পরে সেজন্য পরিবারের প্রত্যেকেই এভাবে পর্যায়ক্রমে রেডিও শোনার ব্যবস্থা করা হতো।

"চরমপত্র" ছিলো সবচাইতে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে দক্ষ ব্যবস্থাপনায় ছিলেন এম. আর. আখতার (মুকুল)। একদিকে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ এবং অন্যদিকে গাম্ভীর্যের অপূর্ব সংমিশ্রণে এটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছিলো। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার প্রেরণা যোগাতে ছেলেবুড়ো সবার কাছে এই অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিলো অসামান্য।

বাংলার মানুষের মনে সবচাইতে বেশি দাগ কেটেছিলো গানের অনুষ্ঠানটি। গানের ভাষা ছিলো অর্থময়—সুর ছিলো আকর্ষণীয়।

সেদিন সে গানগুলো এদেশের মানুষের মনকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতো। পথে প্রান্তরে যে গানের ভাষা আর সুর সংগ্রামী মানুষের কণ্ঠে জীবন ঐশ্বর্যে মহিয়ান হয়ে উঠেছিলো। ইতিহাস থেকে তা কোনদিনই মুছে যাবার নয়। সেদিন যে গানগুলো সবচাইতে বেশি জনপ্রিয় ছিলো সেগুলো হলো :

১. জয় বাংলা, বাংলার জয়
হবে হবে হবে
হবে নিশ্চয়- .....
(কণ্ঠ দিয়েছেন আব্দুল জব্বার ও সহ শিল্পীবৃন্দ)

২. মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি.
(গীতিকার : গোবিন্দ হালদার
কণ্ঠ : আপেল মাহমুদ)

৩. সোনা সোনা সোনা, লোকে বলে সোনা,
সোনা নয় ততো খাঁটি,
লোকে যত বলে তারো চেয়ে খাঁটি
আমার বাংলা দেশের মাটি .....
(গীতিকার : আব্দুল লতিফ)

৪. জনতার সংগ্রাম চলবে- .....-চলবেই
(রচনা : সিকান্দার আবু জাফর)

৫. এক সাগর রক্তের বিনিময়ে,
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলবনা।
(গীতিকার: গোবিন্দ হালদার
কণ্ঠ: স্বপ্না রায় ও সহশিল্পীবৃন্দ)

৬. তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর
পাড়ি দেবরে
(কণ্ঠ: আপেল মাহমুদ ও রথীন্দ্রনাথ রায়)

৭. শোন একটি মজিবরের থেকে
লক্ষ মজিবরের কণ্ঠধ্বনি,
প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে
ওঠে রনি.....
(রচনা: গৌরী প্রসন্ন মজুমদার,
কণ্ঠ: ভারতীয় শিল্পী অংশুমান রায় ও সহ-শিল্পীবৃন্দ)

৮. আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে
কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হলে জননী.....
(রবীন্দ্র সঙ্গীত
কণ্ঠ: অজিত রায়)

৯. নোংগর তোল তোল
সময় যে হ'ল হ'ল.....
(কণ্ঠ: রথীন্দ্রনাথ রায় ও সহ শিল্পীবৃন্দ)

১০. পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
রক্ত লাল, রক্ত লাল
(সমবেত সংগীত, সুরকার সমর দাস)

সময়ের পরিক্রমায় আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই। অতি আপনজনের চেহারাও মনে আসেনা—ভুলে যাই তাদের কণ্ঠস্বর। কিন্তু আমরা যারা এই যুদ্ধের পর বেঁচে আছি "জয় বাংলা বাংলার জয়" গানটি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারবোনা। এত অগুণিত মানুষের মনে এত দীর্ঘ সময় প্রিয় গান হিসাবে আর কোন গানই স্থান করে নিতে পেরেছে কিনা জানিনা। এ গানের

স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রতিকী ধ্বনি (সিগনেচার টিউন) হিসাবে ব্যবহৃত ।। ভাবাবেগ পূর্ণ এবং অর্থবহ এই গান আনন্দানুভূতির সীমানার বাইরে দের চেতনার জগতে অনাগতকাল অনুপ্রেরণার এক মহান উৎস হিসাবে হয়ে থাকবে।

"মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি" গানটি ছিলো অত্যন্ত ভাবা- পূর্ণ। নারী আর সেদিনের শিশুদের কাছে গানটি ছিলো গভীর আবেগময়, নিজেদেরকে ফুলের মতই অসহায় ভেবে তারা প্রার্থনা করতো প্রিয়জনরা যেন নিষ্ঠুর পাকিস্তানীদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করে। এইসব হায় মানুষদের বাঁচাবার জন্যইতো সেদিনের মুক্তি সংগ্রাম।

সেই মুক্তি সংগ্রামে আমাদের সবাইকে দিতে হয়েছে চরমমূল্য। প্রতিটি ধীন মানুষ রেখে গেছে মুক্তির সংগ্রামে তার নিজস্ব অবদান। কোনোদিন সবাই ভুলে যেতে পারে এইসব মানুষের কথা—বিস্মৃত হতে পারে সেই ক্তির সংগ্রামে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্যদের অবদানের কথা। ইতিহাস কি পারবে তাদের ভুলে যেতে?

২৮

সীমাহীন দুঃখের দেশ

"প্রতিদিন বাংলাদেশের জনগণের ওপর পাকিস্তানী সেনাদের নতুন নতুন নির্যাতনের খবর পাচ্ছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা গ্রামগুলো ঘেরাও করে প্রথমে হত্যাকাণ্ড এবং তারপরেই চালায় লুণ্ঠন। লুণ্ঠনের পর দানবীয় তাণ্ডবে তারা গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেয়, তরুণ যুবকদের ধরে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। এদের কেউই আর কোন দিন স্বদেশের মুখ দেখতে পায়নি।" (আমার রণাঙ্গণের ডায়েরীর একটি পৃষ্ঠা থেকে)

এই করুণ কাহিনী বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ বংশ পরম্পরায় বয়ে নিয়ে চলবে, বলাবলি করবে। দু'শো বছরের বিদেশী শাসন আর শোষণের পর আমাদের জীবনে এসেছিলো স্বাধীনতার পরিহাস। বংশ পরম্পরায় সব কিছুর শেষে আমাদের যে টুকু লাভ হয়েছে তাকে সংক্ষেপে বলা যায় উপহাস, বঞ্চনা আর দুর্ভোগ। যুগে যুগে অন্ধ প্রকৃতিও আমাদের দুঃখ দিয়েছে। কালান্তর মহামারী, সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ, অথৈ বন্যা এবং ভয়াবহ ঝড় সকলেই পর্যায়ক্রমে এদেশের মানুষের কাছ থেকে আপন আপন পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়েছে চির দুখী মাতৃভূমি। তোমার সন্তানদের দুর্দশার পরিমাণ করার সাধ্য বোধ হয় কারো নেই।

যুদ্ধ কালেও সেই অমানিশা পোহাবার কোন লক্ষ্য চোখে পড়ছিলো না। স্বাধীনতার সংগ্রাম যতো তীব্রতর হয়ে উঠেছে, আকাশে শকুনীর সংখ্যাও ততো বাড়ছে। সকলেই বুঝতে পারি, যুগ যুগ ধরে আমরা যে কষ্ট সয়েছি সামনের দিনগুলোতে তা আরো ভয়াবহ হয়ে উঠবে।

কয়েক মাস হলো যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। শত্রুরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিলো বাংলাদেশের সর্বত্র। বড় শহর থেকে ছোট শহরে, শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তর তারা ধাওয়া করে ফিরছিলো।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যেখানেই গিয়েছে পেছনে রেখে গেছে ধ্বংস আর মৃত্যুর স্বাক্ষর। যুদ্ধের প্রথম দিকে তারা সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই হত্যা

। পরের দিকে কিছুটা বাছাই করে হত্যা করতে থাকে (সাড়ে ছয়
। বাঙালীর ভেতর থেকে পছন্দমতো বেছে লোক শিকার। কি উত্তম
বা)

ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং খুলনার মতো বড় বড় শহরে এবং বেশ কিছু সংখ্যক
ছোট শহরের মানুষ (যারা বাঁচতে পেরেছিল) ইতিহাসের সব চাইতে জঘন্যতম
র পর ডুবি প্রত্যক্ষ করেছে।

পাক সেনাদের এই সব কীর্তির সবই কিন্তু সর্বোচ্চ পর্যায়ে সুন্দর পরি-
া মাফিকই করা হয়। সামরিক জান্তার অফিসার এবং অন্যান্য পদের
দের হত্যাযজ্ঞ চালাবার ঘৃণিত নির্দেশ দেয়া হলে তারা আনন্দের সাথেই
। পালন করেছিলো। করবেই না বা কেন? লুটের হিস্যাতো তারাও পাবে।
প্রাদেশনাল কমাণ্ডাররাও বাদ যাবে না।

বাঙালীদের দোকানগুলো থেকে পাকিস্তানীরা সোনা, রূপা, টেলিভিশন
ট, ট্রানজিষ্টার, রেফ্রিজারেটর, ঘড়ি, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম এবং অন্যান্য দামী
নিসপত্র নির্বিচারে লুট করেছে। বাসা বাড়ীও তাদের হাত থেকে রেহাই
য়নি। বাঙালীদের নগদ অর্থ, অলংকার, গাড়ী, আসবাবপত্র, প্লেট, পিরিচ,
মনকি ছাইদানী পর্যন্ত তখন পশ্চিম পাকিস্তানের পথে পার হতে থাকে।

তখনকার নিয়মে লুটপাটের জিনিস সবই ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারে জমা
করা হতো। তারপর সেগুলো ভাগ হতো সকলের মধ্যে সমান হারে।
পাকিস্তানী রেজিমেণ্ট এবং অন্যান্য সার্ভিসের যে সমস্ত সদর দফতর পশ্চিম
পাকিস্তানে ছিলো সেখানকার লোকেরা পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত তাদের সঙ্গীদের
কাছ থেকে নানান ধরনের লুটের জিনিষ উপহার পেতো। এখানকার ব্রিগেড
হেড কোয়ার্টার এবং ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা তাদের
অধীনস্ত ইউনিটগুলোর কাছ থেকে বিপুল পরিমানে ভোট সংগ্রহ করতো। পশ্চিম
পাকিস্তান থেকে জাহাজগুলো অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বোঝাই করে নিয়ে আসতো
আর ফিরে যাওয়ার সময় সেগুলো ভরে উঠতো গাড়ী, আসবাব পত্র, টেলিভিশন
সেট ও অন্যান্য লুটের মালামালে। সৈন্যদের মধ্যে হত্যা ও ধর্ষণ নিয়ে চলতো
প্রতিযোগিতা এবং এসব কাজের সাফল্যকে উর্দ্ধতন কর্মকর্তা পেশাগত দক্ষতার
মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করতো।

পাক বাহিনীর কতগুলো ইউনিটের কাছে এক ধরণের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খুবই
প্রিয় হয়ে উঠেছিল। অফিসার ক্যাডারের লোকেরাই এ খেলা বেশি পছন্দ
করতো। বন্দী শিবিরগুলো থেকে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তারা একটা
খোলা জায়গায় দাঁড় করাতো। তারপর বন্দীদের হাত পিঠমোড়া করে বেঁধে

দৌড় দিতে বলা হতো। প্রতিটি বন্দীর দেহেই একটি করে নাম্বার থাকতো এবং অফিসারদের জানা থাকতো কে কোন নম্বরকে মারবে। তারপর শিকার-গুলো দৌড়ে একশ গজের সীমারেখা অতিক্রম করতেই অফিসাররা নিজ নিজ শিকারের ওপর লক্ষ্য ভেদের অনুশীলন চালাতো। ধাবমান লক্ষ্য বস্তুগুলো যতক্ষণ দু'শ গজ থেকে তিনশ' গজের মধ্যে থাকতো ততক্ষণ এই অনুশীলন চলতো। এই সময়ের মধ্যে লক্ষ্যভেদ করার জন্য কে কতোটি গুলী ছুড়েছে এবং কার গুলী হতভাগ্যদের দেহের কতখানি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে বিদ্ধ হয়েছে সেটা হিসাব করে প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ধারিত হতো। এই দূরপাল্লার প্রতিযোগিতার নির্ধারিত সীমানার মধ্যেও যে সব ভাগ্যবানের দেহে গুলী লাগতো না তাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় মাটিতে শোয়ানো হতো। তারপর ওদের ওপর চলতো নিকট পাল্লার পিস্তল স্যুটিং প্রতিযোগিতা।

পাকিস্তানী সৈন্যরা যেখানেই গেছে সেখানকার লোকই জীবনের ভয়ে অন্যত্র পালিয়েছে। যারা পালাতে পারতো না তাদেরকে দিয়ে জবরদস্তি কাজ করানো হতো নতুবা সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলী করে হত্যা করা হতো। মেয়েদের বেছে বেছে আর্মী ক্যাম্পের হেরেমে নিয়ে যাওয়া হতো। প্রায়ই দেখা যেতো যুবকদের ট্রাক বোঝাই করে কোথায় যেনো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে এদেরকে আর কোনদিন দেখা যায়নি। পাকবাহিনীর ডাক্তাররা আবার যুবকদের দেহ থেকে রক্ত বের করে নিয়ে তা ব্যবহার করতো পাকিস্তানী আহতদের জন্য। ঢাকাস্থ ইস্টার্ণ কমাণ্ড থেকে সকল সামরিক ঘাঁটির প্রতি বিশেষ নির্দেশ ছিলো, যেভাবে হোক সর্বোচ্চ সংখ্যক বাঙালী যুবক নিধন করতে হবে। পাকিস্তানীরা সব দিক দিয়ে এমন ব্যবস্থা নিয়েছিলো যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য কোন যুবক যেনো আর অবশিষ্ট না থাকে।

সমগ্র জাতিই তখন পলায়নপর। নিরাপদ একটু আশ্রয়ের জন্য দলে দলে লোক এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালাচ্ছিলো। তারা নিজ দেশেই পরবাসী। তাদের বাড়ীঘর ভস্মীভূত হয়েছে, গাছপালা ধ্বংস হয়েছে। কেউ যাতে গা-ঢাকা দিতে না পারে সে জন্য ক্ষেতের ফসলে পর্যন্ত আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। ঘর ভেঙ্গে টিন খুলে নিয়ে বাংকার তৈরী করা হয়েছে, অনেক জায়গায় রেললাইন তুলে নিয়েও এই কাজে লাগানো হয়েছে। কর্ণফুলীতে একটি বিরাট ভাসমান সেতু ভেঙ্গে নিয়ে সামরিক প্রয়োজন মোতাবেক অন্যত্র 'বেইলী ব্রিজ' করা হয়েছে।

হাসপাতাল, বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্র এবং অধিকাংশ স্কুল কলেজ পাকিস্তানী সৈন্যদের ক্যাম্পে রূপান্তরিত হয়েছিলো। রাত নামলেই সেখান থেকে ভেসে

শোনতো রাইফেল আর পিস্তলের আওয়াজ। প্রতিটি ক্যাম্পে বন্দী বাঙালী পুরুষ ও নারীদের আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠতো। নির্যাতন, হত্যা-কাণ্ড দৈনন্দিন রুটিনে পরিণত হয়েছিলো। কত লাখ লোক যে তারা মেরেছিলো তার সঠিক হিসাব কেউ কোনদিন দিতে পারবেনা।

হত্যা ও ধ্বংসের ব্যাপকতা পল্লী অঞ্চলেই ছিলো বেশি। ইয়াহিয়া এই কাজে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। বাড়িঘর এবং লাশ পুড়িয়ে ফেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাটালিয়নগুলো পেট্রোলের বিশেষ সরবরাহ পেতো। বিভিন্ন সেনাদলকে 'ফ্লেম থ্রোয়ার'ও দেয়া হয়েছিলো এবং এগুলোর ব্যবহারও হতো যথেষ্ট; প্রতিটি জেলাতেই বিমান বাহিনী বেসামরিক নাগরিকদের ওপর বারবার হামলা চালিয়েছে। এমনকি তারা নাপাম বোমা পর্যন্ত ফেলেছে।

নৌবাহিনীর গানবোটগুলো নদীপথে যাতায়াতের সময়ও দুই তীরের গ্রাম গুলোতে গোলা বর্ষণ করে চলতো। যতক্ষণ গোলা থাকতো ততোক্ষণ তারা থামতো না। নদীতে হয়তো জেলেরা মাছ ধরছে অথবা কৃষক নদীর পাড়ে জমিতে কাজ করছে, গানবোটের মেশিনগানের গুলী তাদের কাউকে রেহাই দিতো না।

ট্যাংক, রকেট লাঞ্চার, রিকয়েল-লেস রাইফেল দিয়ে বাঙালীদের বাড়ী ঘর সহায় সম্পত্তি এক দিক থেকে গুড়িয়ে দিয়ে ওরা অগ্রসর হতো। বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে পাকা দালানকোঠা ধ্বংস করতো। দাতব্য কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ কিংবা মন্দির, হাসপাতাল কিংবা বসতবাড়ী, দোকানপাট কিংবা বাজার কিছুই পাকিস্তানীদের শ্যেণ দৃষ্টি থেকে বাদ পড়েনি। সব কিছু ধ্বংস করলেও ওদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিলো মানুষ। বস্তুত পাকিস্তানী সেনাদের নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী ছিলো বর্ণনাতীত। মানুষের কল্পনারও অতীত ছিলো সেসব কাহিনী। অনেক পাকিস্তানী সেনাই বাংলাদেশে গণহত্যার স্বরূপ দেখে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেলে তাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কিছু সৈন্য আবার দল থেকে পালিয়ে দেশে চলে গেছে। এদের মধ্যে একজন ছিলো ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেণ্টের এক পাঠান জেসিও। জানা গেছে, সে দেশে গিয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে ট্যাক্সী চালিয়ে জীবন ধারণের পথকে বেছে নিয়েছে। ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরের কোন এক সময় সেই পাঠান জেসিও এক বাঙালী অফিসার মেজর হাবিবকে নিয়ে ট্যাক্সীতে পিণ্ডি থেকে ইসলামাবাদ যাওয়ার পথে বাংলাদেশে তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলো: আমাদের রেজিমেণ্টকে হাওয়াই জাহাজে করে পূর্ব পাকিস্তান পাঠানো হলো। ওখানে গিয়েই শুনলাম, আমাদেরকে হিন্দু ও কাফের মারতে হবে। জুন মাসে কোন

একদিন আমরা একটি গ্রাম কর্ডন করি। ঘিরে ফেলার পর আমাদের ওপর হুকুম হয় ওখানে যত কাফের আছে সবাইকে মেরে ফেলতে হবে। গ্রামে ঢুকতেই দেখি ওদের সব মেয়েরা কোরান শরিফ পড়ছে, বয়োবৃদ্ধরা খোদার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার জন্য নফল নামাজে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু তাদের নসিব খারাপ। আমাদের কমাণ্ডিং অফিসার অযথা সময় নষ্ট না করার হুকুম জারী করলেন।

কয়েকদিন পর আমরা ছোট্ট এক শহরে গিয়ে উঠি। এখানে আমরা নির্দেশ মোতাবেক কিছু লোক ধরে এনে তাদেরকে জবরদস্তি একটি বাজার লুট করতে বলি। এই কাজের জন্য প্রায় দু'শ লোক আমরা ধরেছিলাম। আমাদের সঙ্গীদের সামনে ওরা যখন লুণ্ঠনে ব্যস্ত তখন আমাদের ক্যামেরাম্যান ক্লিক ক্লিক করে তাদের ছবি তুলছিলো। তারপর সবাইকে নিয়ে হাজির হলাম এক মাঠের মধ্যে। সারারাত ধরে তাদেরকে দিয়েই তাদের কবর খোড়ানো হলো। পরদিন সকাল হবার আগেই গুলী করে তাদেরকে গর্তের ভেতরে ফেলা হয়। কয়েকজন পাঠান সৈনিক গুলী চালাতে অস্বীকার করলে তাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়।

দিন দু'এক পরে আমরা আবার সেই গণহত্যার স্থানটির পাশ দিয়ে ফিরছিলাম। তখন দেখি ছোট্ট একটি মেয়ে সেই গণকবরের কাছে বসে রয়েছে। আমাদের দেখেও সে নড়লোনা। ঐ এলাকার অন্যান্য লোক আগেই পালিয়ে গিয়েছিলো।

তবে হালুয়াঘাট এলাকার ঘটনাই আমার জীবনের সবচাইতে বেশি মনোপীড়ার কারণ। বিশ্বাস করুন মেজর সাহেব, আপনাদের লোকদের ওপর যা করেছি সেজন্য খোদার গজব পড়বে আমাদের ওপর। একটি এলাকায় নাকি মুক্তি ফৌজ ছিলো। আমার কোম্পানীর ওপর নির্দেশ আসে ঐ অঞ্চল থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের হটিয়ে দিতে হবে। ওখানে পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের একটি কোম্পানী তল্লাশী অভিযান চালাচ্ছিলো। তাদরকে কিছু সময়ের জন্য অব্যাহতি দেয়ার উদ্দেশ্যেই আমাদের যেতে হয়।

পথে আমাদের সামনে প্রথম যে গ্রামটি পড়ে, পাঞ্জাবী কোম্পানীর হাতে সেটি পুরাপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। অধিকাংশ লোকই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে। বৃদ্ধ, নারী আর শিশুদের কতগুলো লাশ শুধু চোখে পড়েছিলো। পর পর আরো পাঁচটি গ্রাম আমরা অতিক্রম করি, সবগুলোতে প্রায় একই দৃশ্য। বিকালের দিকে আমরা শেষ গ্রামটিতে গিয়ে পৌঁছি। এখানেই একজন তরুণ লেফ্‌টেন্যাণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন পাঞ্জাবী কোম্পানীর কাছ থেকে আমাদের দায়িত্ব

হণের কথা। অফিসার ভদ্রলোক একটা পুকুরের পাড়ে বসে বিশ্রাম করছিলেন সেনারা যার যার হাতিয়ার পরিষ্কারে ব্যস্ত। অনেকগুলো বেয়োনেটে তখনো রক্ত লেগেছিলো।

অফিসার আমাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। তারপর দূরের কয়েকটি গ্রাম দেখিয়ে বলেছিলেন ওখানেই নাকি মুক্তিফৌজ তৎপর।

আমাদের চারপাশে তখন বাঙালীদের লাশ ছড়িয়ে ছিলো। কয়েকজন মুমূর্ষের কাতর আর্তনাদও শুনতে পাচ্ছিলাম। এরা সবাই ছিলো বেসামরিক, সাধারণ মানুষ। কতগুলো ঘর থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছিলো। প্রায় বিধ্বস্ত একটি ঘর থেকে হঠাৎ শিশুর কান্নার আওয়াজ পেলাম। গিয়ে দেখি, ভেতরে চারটি লাশ পড়ে আছে, একজন বৃদ্ধ লোক আর তিনজনই মেয়ে-লোক। ওদের গায়ে কোন কাপড় ছিলো না, দুপায়ের মাঝখান দিয়ে কেটে দেহ প্রায় দু'ভাগ করে ফেলা হয়েছিলো। একজনের একটি স্তন অর্ধেক কাটা, শিশুটি দুধের জন্য সেটা একবার মুখে তুলছিলো আর থেকে থেকে কাঁদছিলো। লেফ্‌টেন্যাণ্ট সাহেব এক হাতে শিশুটিকে তুলে ধরে আমার সৈন্যদের বললেন: 'আমি এটাকে ওপরের দিকে ছুঁড়ে মারলে তোমাদের মধ্যে কেউকি তা বেয়োনেট দিয়ে বিঁধতে পারবে?'

আমরা সৈন্যরা সবাই নিশ্চুপ। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলো পাঠান। বিশ্বাস করুন মেজর সাহেব, খোদার কসম খেয়ে বলছি, সে দৃশ্য আমরা পছন্দ করিনি।

আমি তাড়াতাড়ি লেফ্‌টেন্যাণ্টের হাত থেকে শিশুটিকে প্রায় কেড়ে নিয়েছিলাম এবং যতদূর সম্ভব ভদ্রভাবে বলেছিলাম, লেফ্‌টেন্যাণ্ট সাহেব, এ এলাকা এখন আমার অধীনে। আপনারা চলে গেলেই ভাল হয়। জবাবে তিনি বলেছিলেন, তোমাদের কেউ পারবে না তাই বলো। আমরা কিন্তু এ পর্যন্ত একটাও মিস্ করিনি। তারপর তিনি তার দলবল নিয়ে চলে গেলেন।

ঐ রাতেই আমি শিশুটিকে নিয়ে আমার রেজিমেণ্ট ত্যাগ করি। অবুঝ বাচ্চা তখনো কাঁদছিলো। মুক্তিফৌজ টের পেতে পারে এই ভয়ে ধান ক্ষেতের এক জায়গায় তাকে রেখে আমি পালাই। জানিনা পরে শিশুটির কি হয়েছে, বোধ হয় মরেই গেছে।

যুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের সমর্থক কিছু সংখ্যক বাঙালী ছিলো যাদের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোন অত্যাচার চালায়নি। প্রধানতঃ কয়েকটি গোঁড়া ধর্মীয় সংঠনের সদস্য ছিলো তারা। এইসব দলের সদস্যরা ফ্যাসিবাদী কায়দায় 'আল-বদর' এবং 'আল-শামস্' নামে দু'টি গ্রুপ গড়ে তোলে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বেসামরিক বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান

আলীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থেকে এরা কাজ করতো। এই গ্রুপদ্বয়কে নির্বাচিত ব্যক্তি-বিশেষের হত্যায় নিয়োজিত করা হয়েছিলো। সামরিক জান্তার উদ্দেশ্য ছিলো বাঙালী বুদ্ধিজীবী এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন সকলকে নির্মূল করে এখানে বুদ্ধিজীবী-নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি করা। বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আল-বদর ও আল-শামস্ সৃষ্টি করে পাকিস্তানীরা কিছু সংখ্যক বিশ্বাসঘাতকদের গ্রুপ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলো। এই গ্রুপদ্বয়ের অধিকাংশ সদস্যই বাঙালী হওয়ায় সহজেই তারা সকলের সাথে মিশে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করে শত্রু শিবিরে সরবরাহ করতে পারতো। প্রাথমিক পর্যায়ে কেউ তাদের তেমন সন্দেহ করতো না। বিশিষ্ট বাঙালীদের, বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থনকারী বুদ্ধিজীবীদের পরিচিতি সংগ্রহে এবং এঁরা কে কোথায় থাকেন সেসব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ আল-বদর, আল-শামস্'দের ব্যবহার করা হতো। চূড়ান্ত নির্দেশ পাওয়ার পর এই সব ঘৃণ্য লোকগুলো সুপরিকল্পিত উপায়ে স্বাধীনতার সমর্থকদের এক এক করে হত্যা করতো। বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট পেশাজীবীরাই ছিলো এই ঘৃণ্য দলের প্রধান শিকার। এই ঘৃণ্য গ্রুপ দু'টি শত শত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ এবং উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন লোককে হত্যা করেছে।[৭৭] এমনকি, পাক সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের পূর্বের দিনও আল-বদর, আল-শামস্-এর লোকেরা আমাদের বিপুল সংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বহু ক্ষেত্রেই এই ন্যাক্কার জনক বাহিনী পাকিস্তানীদের চাইতেও বেশি ক্ষতি করেছে।

পাকিস্তানী ধ্যান ধারণায় গঠিত শান্তি কমিটি প্রসঙ্গেও কিছু কথা বলার প্রয়োজন। বিভিন্ন স্তরে এই কমিটি গঠন করা হয়েছিলো। এদের মধ্যে শতকরা ৩০ থেকে ৪০ জন আদর্শগত ভাবে পাকিস্তান তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলো। অবশিষ্টরা শান্তি কমিটিতে বাধ্য হয়েই গিয়েছিলো, বিশেষ করে পাকিস্তানীদের রোষানল থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা এ কমিটিতে নাম লিখিয়েছিলো। এদের প্রধান দায়িত্ব ছিলো পাক সেনাবাহিনীর পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা। এছাড়া পাকিস্তানী সৈন্যরা কোথাও গেলে স্থানীয় শান্তি কমিটির তরফ থেকে এদের জন্য সব রকম সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হতো। অপরদিকে গেরিলা তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তান সরকার যে সব নির্দেশ দিতেন সেগুলোর বাস্তবায়ন করার দায়িত্বও থাকতো এই কমিটির ওপর। কিন্তু এইসব কমিটি কখনোই সামরিক জান্তার আশানুরূপ কাজ করে উঠতে পারেনি। কারণ শান্তি কমিটির সদস্যদের অনেকেই আমাদের সক্রিয় সমর্থক ছিলো। এমনকি অনেক কমিটির চেয়ারম্যানও আমাদের পক্ষে ছিলো।

গেরিলা তৎপরতা প্রতিরোধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অরেকটি আধা সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছিলো। এই সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যরা 'রাজাকার' নামে পরিচিত ছিলো।

রাজাকার সদস্যদের '৩০৩ রাইফেল' দেয়া হতো এবং থার্ড লাইন ডিফেন্স ফোর্স হিসাবে তাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছিলো। রাজাকারদের প্রধান কাজ ছিলো সড়ক, সেতু, রেল লাইন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র রক্ষা করা। এছাড়াও বিভিন্ন থানা, সীমান্ত ফাঁড়ি এমনকি বিভিন্ন সৈন্যদলের সাথেও বাড়তি শক্তি হিসাবে তারা কাজ করতো। নিজ নিজ এলাকায় রাজাকাররা পাক সেনাদের পথ প্রদর্শক এবং খবরাখবর সংগ্রহকারী হিসাবে কাজ করতো। এই দলেও আমাদের বিশ্বস্ত কিছু লোক ছিলো। এতদসত্ত্বেও বেশ কিছু সংখ্যক রাজাকার আমাদের জন্য বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছিলো। কখনো কখনো রাজাকার দমনেই আমাদের পুরো শক্তি নিয়োগ করতে হতো। কুখ্যাত রাজাকারদের উৎখাত এবং অবশিষ্টদের ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্য আমাদেরকে বিশেষ অভিযানের ব্যবস্থা করতে হয়েছিলো।

২৯
অপারেশন জ্যাকপট

ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৬ই মে বি এস এফ-এর নিকট থেকে বাংলাদেশে সামরিক তৎপরতা চালাবার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। এক সপ্তাহ পরে ২৩শে মে তারিখে ভাগিরথী নদীর তীরে একটা গোপন ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করা হয়। এই ক্যাম্পের অবস্থান ছিলো পলাশীর স্মৃতি সৌধের পাশে। এর সাংকেতিক নাম দেয়া হলো ক্যাম্প 'সি-২ পি'। ক্যাম্পের জন্য লোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অফিসাররা বিভিন্ন যুব শিবির সফরে বেরিয়ে পড়েন। আমাদের ক্যাম্পে আগত নৌ-বাহিনীর অফিসার বললেন, 'আমি কয়েকজন নিপুণ সাঁতারু বাছাই করতে চাই, তাদেরকে তরুণ এবং ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।' জুন মাসের মধ্যে ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবকের প্রথম দলটি বাছাই করে 'সি-২ পি ক্যাম্পে পাঠানো হয়। আগস্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এরা কঠোর এবং শ্রমসাধ্য ট্রেনিং সমাপ্ত করে। পুরো ব্যাপারটাই ছিলো ভারতীয় নৌ-বাহিনীর দায়িত্বে।

বাংলাদেশে নৌ-পথে সৈন্য এবং অন্যান্য সমর সরঞ্জাম পরিবহণের ব্যবস্থা বানচাল করার উদ্দেশ্যে জাহাজ এবং নৌ-যানগুলো ধ্বংস করাই ছিলো এই উদ্যোগের লক্ষ্য। অল্প খরচে দ্রুত এই লক্ষ্য অর্জনে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বেচ্ছা-সেবক দরকার ছিলো—যাদেরকে সাঁতারের এবং 'লিমপেট' মাইনসহ বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারের ট্রেনিং দেয়া যেতে পারে। এ কাজের জন্য উচ্চ ট্রেনিং প্রাপ্ত লোকদের নিয়ে একটা বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণীত হয় নৌ-বাহিনী হেডকোয়ার্টারে। পরিকল্পনা অনুসারে চট্টগ্রাম ও মংলার সামুদ্রিক বন্দর, চাঁদপুর, দাউদকান্দি, নারায়ণগঞ্জ, আশুগঞ্জ, নগরবাড়ী, খুলনা, বরিশাল, গোয়ালন্দ, ফুলছড়ি ঘাট এবং আরিচা ঘাটের নদী বন্দরগুলোর ওপর সরাসরি আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; অভিযানের সাংকেতিক নাম দেয়া হয় 'অপারেশন জ্যাকপট'। অপারেশন কার্যকরী করার চূড়ান্ত দায়িত্ব দেয়া হয় সংশ্লিষ্ট সেক্টর কমাণ্ডারদের উপর।

২৮শে জুলাই আমি ডেলটা সেক্টরের কমাণ্ডিং অফিসার ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং-এর সাথে বসে চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরী করেছিলাম। চার ঘন্টারও বেশি সময় আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি এবং চট্টগ্রাম বন্দর ও কর্ণফুলী নদীর ম্যাপ ও চার্ট পর্যালোচনা করি। চন্দ্রতিথি, আবহাওয়ার অবস্থা, জোঁয়ার ভাটার সময় বাতাসের গতি-প্রকৃতি, স্রোতের গতি এবং আরো অসংখ্য তথ্য আমাদের আলোচনায় প্রধান্য লাভ করে। মে মাস থেকেই বন্দরের তৎপরতা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম। আমরা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের বন্দর এলাকা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার চিত্রও পেয়ে যাই। অপারেশনে আমাদের নৌ-মুক্তি যোদ্ধারা কোথায় কি ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে পারে তাও আমরা বিশদভাবে পর্যালোচনা করি। বন্দরের জন্য পাক বাহিনী কি ধরনের রক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং শাস্ত্রীরা কোথায় কি ভাবে পাহারার ব্যবস্থা করেছে এ সব বিষয়ে আলোচনা হয়। সে সময়ে রাতের বেলায় নদীমুখে সকল প্রকার নৌ-চলাচল নিষিদ্ধ ছিলো। প্রধান কয়েকটি গান বোট নিয়মিত টহল কার্যে নিযুক্ত ছিলো। আমাদের পরিকল্পনা গোপন রাখতে পারলে এসব বাধা তেমন কোন সমস্যাই নয়। ঠিক হলো পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস অর্থাৎ ১৪ই আগস্টেই ৬০ জন ট্রেনিং প্রাপ্ত তরুণকে চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠানো হবে। রাতে তারা সাঁতার কেটে কর্ণফুলী পাড়ি দিয়ে যত দূর সম্ভব বেশি সংখ্যক জাহাজে লিমপেট মাইন লাগিয়ে দেবে। তারপর তারা ভাটার টানে দূরে সরে যাবে।

১০ই আগষ্ট 'অপারেশন জ্যাকপট' শুরু হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য বাছাইকৃত ৬০ জন তরুণকে তিন ভাগে ভাগ করি। ১ এবং ২ নম্বর গ্রুপ স্থলপথে মিরেশ্বরাই, সীতাকুণ্ড এবং চট্টগ্রাম শহর হয়ে কর্ণফুলীর পূর্বপাড় চরলাক্ষার সর্বশেষ ঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছাবে। ৩ নম্বর গ্রুপ চরলাক্ষায় উপনীত হবে নৌকা যোগে। তিনটি গ্রুপেরই সার্বিক কমাণ্ডে থাকবেন একজন কমাণ্ডার। তাদের সকলের কাছে থাকবে লিমপেট মাইন, এক জোড়া 'ফিন' (সাঁতারের সময় পায়ে লাগানোর জন্য) এবং শুকনো খাবার। প্রতি তিন জনের কাছে একটি করে স্টেনগান থাকবে। সার্বিক দায়িত্বে নিযুক্ত গ্রুপ কমাণ্ডারকে অরো দেয়া হয় হালকা ধরনের অথচ শক্তিশালী একটি ট্রানজিস্টার সেট। তার জন্য সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে, অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলকাতা কেন্দ্রের প্রতিটি সঙ্গীতানুষ্ঠান খুব মন দিয়ে শোনা। এতে ব্যর্থ হলেই সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।

৯ই আগস্ট হরিণা ক্যাম্পে তাদেরকে চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হয়। পথপ্রদর্শক এবং কুলীসহ তাদের সকলকে বলে দেয়া হয়, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়

কখন কি ভাবে অগ্রসর হতে হবে পথে কোথায় কোথায় থামবে ইত্যাদি। প্রতিটি এলাকায় আমাদের বিশ্বস্ত গেরিলা বেইস্ কমাণ্ডারদের ঠিকানা দিয়ে দেয়া হয়, এরা তরুণদের খাদ্য ও আশ্রয় দেবে এবং চরলাক্ষার পথে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। ১৩ই আগষ্ট ১ নম্বর এবং ২ নম্বর গ্রুপ চরলাক্ষার পূর্ববর্তী ঘাঁটিতে পৌঁছে যায়। জায়গাটি চট্টগ্রাম শহরের কাছেই। পথের অবশিষ্ট অংশটুকু এদের জন্য খুবই মারাত্মক, কারণ তাদেরকে শহরের ভেতর দিয়ে গিয়ে নৌকায় নদী পার হতে হবে। তারপরই তাদের শেষ ঘাঁটি চরলাক্ষা।

এদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে দখলদার বাহিনীর ওপর মুক্তিবাহিনী সাংঘাতিক আক্রমণ চালাবে। এ কারণে শত্রুরা ছিলো পুরো সতর্ক অবস্থায়। সারারাত ধরে কারফিউ চলতো। লোকজনকে তল্লাশীর জন্য পথের মোড়ে মোড়ে বসানো হয়েছিলো অসংখ্য চেক পোষ্ট। মেশিনগান ফিট করা আর্মি জীপগুলো সারা শহর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলো। নতুন করে আবার বাড়ী বাড়ী তল্লাশী শুরু হয়। বিভিন্ন এলাকা ঘেরাও দিয়েও অভিযান চালানো হয়। পথচারী সবাইকে কঠিন তল্লাশী করা হয়। এতসব তল্লাশী ফাঁকি দিয়ে শহরের মাঝখান দিয়ে পার হতেই হবে ১ নম্বর এবং ২ নম্বর গ্রুপকে। তারপর আছে নদী পার হবার সময় আর এক তল্লাশীর ঝামেলা। সেটা পার হলে আশা আছে, সময়মত এই দুই গ্রুপ চরলাক্ষায় পৌঁছে যাবে। কিন্তু কোন কারণে যদি দলের একজনও ধরা পড়ে তাহলে সমস্ত অভিযান বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা। তাই এই হামলাকারী দলের নেতা নিজেও আমাদের মতই চিন্তিত ছিলেন।

আরো একটি কারণে এই দলের নেতা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নৌকায় করে ৩ নম্বর গ্রুপটির ১৩ তারিখে যে ঘাঁটিতে পৌঁছার কথা ছিলো, তারা সে ঘাঁটিতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। এদিকে ১৩ই আগস্ট কলকাতা রেডিও-র সঙ্গীতানুষ্ঠান শোনার জন্য ট্রানজিস্টার খুলতেই তার কানে ভেসে এলো পুরনো দিনের এক বাংলা গান "আমার পুতুল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুর বাড়ী"। এই গানের ভেতর দিয়ে সে এবং তার দল প্রথম সংকেত লাভ করে। কমাণ্ডার জানে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরেকটি গান সে শুনতে পাবে। ওটি শোনার পরই সে ট্রানজিস্টার ফেলে দিতে পারবে। 'অপারেশন জ্যাকপট' সফল না হওয়া পর্যন্ত তাদের আর কোন গান শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রেডিও শুনতে হবেনা।

নগরীতে মোতায়েন আমাদের লোকেরা চমৎকার ভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলো। তারা মিশনের নৌ-মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদে একেবারে চরলাক্ষায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেয়। রাস্তায় একটি এ্যামবুলেন্স এবং বিদ্যুৎ বিভাগের

কটি পিকআপ ভ্যান দেখতে পেলেও পাকিস্তানী সৈন্যদের মনে তেমন সন্দেহ জাগেনি। শুধু তাই নয়, পাক বাহিনীর নাকের ডগা দিয়ে গেয়ো পোষাক পরা সাতজন লোক যখন ফলমূল, মাছ, চাউল এবং লবণের ঝুড়ি নিয়ে ফেরী নৌকায় ওঠে এবং চালক যখন নিশ্চিত মনে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে কর্ণফুলীতে পাড়ি জমালো তখনো পাকিস্তানীরা কিছু বুঝতে পারেনি। সবাই ভেবেছিলো লোক-জন বাজার সেরে বাড়ী ফিরছে। এই সব হাটুরে সওদার জন্য আগেই তাদেরকে কিছু পয়সা দেয়া হয়েছিলো। প্রতিটি ঝুড়ির একেবারে তলায় চটের থলেতে ছিলো 'লিমপেট মাইন', 'ফিন' ইত্যাদি। আবার কোনটায় ছিলো স্টেনগান।

১৪ই আগস্ট কলকাতা রেডিও-তে দ্বিতীয় বাংলা গানটি শোনা গেল: "আমি তোমায় যতো শুনিয়ে ছিলাম গান, তার বদলে চাইনি কোন দান"। আসলে এটা ছিলো একটা সাংকেতিক নির্দেশ। যার ফলে সেই রাতেই নৌ-মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানী জাহাজ সমূহে আঘাত করার কথা।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই দলের অভিযান একদিন পিছিয়ে গেলো। ৩ নম্বর গ্রুপ ছাড়া সকলেই রাতের মধ্যে চরলাক্ষায় পৌঁছে গিয়েছিলো। ৩ নম্বর গ্রুপের যোদ্ধারা প্রায় ৮০ মাইল হেটে আসার পর ১৪ই আগস্ট একটি দিন তাদের বিশ্রাম দরকার। দিনের আলোতে কিছুটা 'রেকী' করাও দরকার। লক্ষ্য জাহাজগুলো প্রতিটি সদস্যের দেখা উচিত। যেখান দিয়ে তারা পানিতে নামবে এবং কাজ শেষ করে যেখানে তাদের উঠতে হবে সে সব যায়গাও আগে থাকতে দেখে রাখতে হবে। তাই একেবারে তাড়াতাড়ি করলেও পরবর্তী রাতের আগে কিছু আর হচ্ছে না।

১৪ই আগস্ট এখানে কিছু না ঘটলেও শত্রু পক্ষের জন্য সময়টি খুব একটা স্বস্তির ছিলোনা। সারা রাত্রি সমগ্র সীমান্ত এলাকা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের যোদ্ধারা অসংখ্য আক্রমণ চালায়। আমাদের হতাশাগ্রস্ত জনগণও চাইছিলেন তাদের ছেলেরা ১৪ই আগস্ট কিছু একটা করুক। এমন একটা কিছু করুক যাতে পাকিস্তানীদের উচিত শিক্ষা হতে পারে।

১৫ই আগস্ট চরলাক্ষায় আমাদের ৪০ জন তরুণ—যাদের অধিকাংশেরই বয়স বিশের কোঠা পার হয়নি—তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে স্বল্প-ক্ষণের একটু ঘুম দেয়।

রাত ১টা। বন্দর নগরী পুরো নিদ্রামগ্ন। শান্ত নদীতে শুধু স্রোতের কুলু কুলু ধ্বনি। নিঃশব্দে ওরা নদীর পাড়ের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। অপর পাড়ের জেটিগুলো তখন বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল। সার্চ লাইট ফেলে নদীর ওপর লক্ষ্য রাখছে সান্ত্রীরা। ওরা ক্লান্ত। হয়তো ঘুমে ঢুলু ঢুলু।

১৪ই আগস্ট এবং তার পূর্ববর্তী কয়েকদিন পাকিস্তানীদের ওপর দিয়ে বেশ বড় রকমের ধকল গেছে। এ-রাতে তাদের সকলেই যেন একটু নিশ্চিন্ত। পাকা প্লাটফরম-এর ওপর লম্বালম্বি ক্রেনের ছায়াগুলোকে কেমন ভৌতিক মনে হয়। তবে সান্ত্রীরা এ ছায়া চেনে। নদীর দিক থেকে তাদের কোন ভয়ের আশংকা নেই। কোন নৌকা কিংবা সাম্পান জাহাজের দিকে অগ্রসর হতে চাইলেই পরিষ্কার দেখা যাবে। সে ক্ষেত্রে দূর পাল্লার অস্ত্রের কয়েকটি রাউণ্ডই যথেষ্ট। কিন্তু তেমন কখনো ঘটেনি।

এম.ভি. আল-আব্বাস এসেছে ৯ই আগস্ট। ১২ নম্বর জেটিতে নোঙ্গর করা এই জাহাজ ১০৪১ টন সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে।

এক খানি বার্জে (ওরিয়েণ্ট বার্জ নম্বর--৬) ২৭৬ টন অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ বোঝাই করে মৎস্য বন্দরের জেটির সামনে রাখা হয়েছে। এটাকে ট্রেনে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হবে।

এম.ভি. হরমুজ ১৪ই আগস্টেই চট্টগ্রাম পৌঁচেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে ৯,৯১০ টন সমর সম্ভার। ১৩ নম্বর জেটিতে জাহাজটি ভেড়ানো।

আরো কয়েকখানি জাহাজ ও বার্জ এদিক ওদিক রয়েছে। নেভাল জেটিতে ছিলো দু'টি গানবোট এবং একখানি বার্জ। সন্ধ্যার পরই গানবোট দু'টি অজ্ঞাত স্থান অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। আমাদের ছেলেদের কপাল খারাপ। এমন সুন্দর দুটি শিকার হাতছাড়া হলো। রাত সোয়া একটা। আল-আব্বাস এবং হরমুজের মাস্টার এবং ক্রুরা গভীর নিদ্রায় অচেতন। পাহারাদার এবং মিলিটারী সান্ত্রী আধো ঘুম আধো জাগরণে ঢুলছে। রাত দু'টো বাজলেই তাদের ডিউটি শেষ। আর মাত্র ৪৫ মিনিট বাকি। তারপর অন্যরা আসবে।

মাথাটা পানির ওপরে রেখে ততোক্ষণে আমাদের ছেলেরা যার যার লক্ষ্য বস্তুর কাছে পৌঁছে গেছে। কালবিলম্ব না করে তারা জাহাজগুলোর গায়ে 'লিমপেট মাইন' লাগিয়ে দিয়েই আবার তেমনি নিঃশব্দে নদীর ভাটিতে ভেসে যায়। আরো দক্ষিণে সরে গিয়ে তারা পূর্ব তীরে উঠে পড়ে। রাত পোহাতে তখনো অনেক বাকি। নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার পর্যাপ্ত সময় তারা পেয়ে যায়। সকাল নাগাদ তারা পটিয়া এবং সেখানে সারাদিন বিশ্রাম নিয়ে ১ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার হরিণার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।

রাত ১টা ৪০ মিনিট। হঠাৎ কান ফাটানো আওয়াজে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম কেঁপে ওঠে। লোকজন শয্যা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। শিশুরা ভয়ে কান্না শুরু করে। কিন্তু কি ঘটছে কেউ তা বলতে পারে না।

১টা ৪৫ মিনিট। আরেকটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। তারপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম। একটির পর একটি বিস্ফোরণে চট্টগ্রাম তখন থর থর করে কাঁপছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। সাত্রীরা দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে পাগলের মতো যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত গুলী ছুঁড়তে শুরু করে। ৬ নম্বর ওরিয়েণ্ট বার্জ দেখতে না দেখতে তলিয়ে গেল। আল-আব্বাস এবং হরমুজও দ্রুত ডুবতে থাকে। জাহাজের খোলে প্রচণ্ড বেগে তখন পানি ঢুকছে। আশে পাশের জাহাজ ও বার্জ গুলোও ক্ষতিগ্রস্ত। বিস্ফোরণে জাহাজের ক্রুদেরও অনেকে হতাহত হয়। কিন্তু ভয়ে কেউ সাহায্যের জন্য ওদিকে অগ্রসর হচ্ছেনা, পাছে আবার বিস্ফোরণ শুরু হয়ে যায়।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই সিনিয়র অফিসাররা দ্রুত বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হন। সমগ্র এলাকায় সান্ধ্য আইন জারী করা হলো। মুক্তি ফৌজের খোঁজে হেলিকপ্টারগুলো তখন আকাশে উঠে গেছে। পাকিস্তানীরা তাদের জিঘাংসা মেটাতে নদীর পূর্ব পাড়ের জনপদগুলোর ওপর নির্বিচারে কামানের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। নদীর পাড়ের গ্রামগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নিরপরাধ গ্রামবাসী এবং জেলেদের ধরে এনে মুক্তি ফৌজের খবর বের করার বহু চেষ্টা হয়। শেষে কিছু না পেয়ে নদীর পাড়ে দাঁড় করিয়ে তাদের গুলী করে হত্যা করা হয়। নিরপরাধ নিরস্ত্র গ্রামবাসী আর জেলেদের রক্তাক্ত লাশ গুলো স্রোতের টানে ভেসে চলে সমুদ্রের দিকে।

পটিয়াতে আমাদের যোদ্ধারা তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলো। তারা একটি অতি বিপজ্জনক ও জটিল 'মিশন' সফল করেছে। তাদের এ সফল অভিযান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

ভোর তখন পাঁচটা। ঢাকাস্থ ইস্টার্ণ কমাণ্ড হেডকোয়ার্টারের অপারেশন রুমে কর্তব্যরত ষ্টাফ অফিসার ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ না করেই সত্বর ঘটনা সম্পর্কে 'কোর' কমাণ্ডারকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত নেন। গেরিলাদের চাঁদপুর এবং মঙ্গলা বন্দরের হামলার খবরও কুমিল্লা এবং যশোর সেনানিবাস থেকে তরিৎ গতিতে হেড কোয়ার্টারে পাঠানো হয়। এই সকল আক্রমণে এক দিকে যেমন শত্রুর বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়, অপর দিকে পাকিস্তানীদের মিথ্যা দম্ভ আর অহমিকা হয় ধূলিস্যাৎ। 'অপারেশন জ্যাকপট' সফল হয় পুরোপুরি ভাবে।

এদিনের ঘটনা সম্পর্কে ১৬ই আগস্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তদন্ত রিপোর্টে লেখা হয়েছিলো: "পরিস্থিতি পর্যালোচনার প্রেক্ষাপটে ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহতের ব্যাপারে জাহাজের কোন ব্যক্তিকেই দায়ী করা চলেনা। কারণ পূর্ব

থেকে কিছুই টের পাওয়া যায়নি এবং গেরিলারা যে এমন ধরণের অভিযান চালাতে পারে বা চালাবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। অবশ্য নদীর দিকটা ভাল করে দেখাশোনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দিন রাত্রির কোন সময়েই কোন নৌকা ইত্যাদিকে আর জাহাজগুলোর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয়া হচ্ছে না।" (পাক সেনাবাহিনীর তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত)

সামুদ্রিক ও নদী বন্দর গুলোর ওপর এই চমকপ্রদ সফল হামলা পাকিস্তানীদের হতচকিত করে দিয়েছিলো। এমন একটা দুঃসাহসী অভিযান মুক্তিযোদ্ধারা চালাতে পারে এটা ছিলো পাকিস্তানীদের চিন্তারও বাইরে। এই হামলার আগ পর্যন্ত আমাদের যুদ্ধের পদ্ধতি সম্পর্কে পাকিস্তানীরা মোটামুটি পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। সারা দেশ জুড়ে এ সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা অসংখ্য ছোট ছোট হামলা চালায়। কিন্তু জুন-জুলাই মাসের এই সব ছোট ছোট হামলা ছিলো কম তাৎপর্য পূর্ণ। হ্যাণ্ডগ্রেনেড নিক্ষেপ করা, শত্রুর গাড়ী ধ্বংস, রাজাকার, দালাল, শান্তি বাহিনী বা আল-বদর, আল-শামস্-এর লোকজন হত্যার মধ্যে এ সময়ের ঘটনাবলী সীমিত ছিলো। কোন গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বস্তুর ওপর তখনও হামলা চালানো হয়নি। শত্রুপক্ষের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারাও ছিলো তখন পর্যন্ত অক্ষত। এমনকি নেতৃস্থানীয় বাঙালী দালালরা পর্যন্ত বেশ আয়েশের সাথে তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলো। মাঝে মধ্যে এদের ওপর পরিকল্পনাহীন কয়েকটি হামলা হলেও তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। মাঝখান থেকে গেরিলারা ধরা পড়ে পাকিস্তানীদের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

রণকৌশলের দিক থেকে শত্রুপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র সমূহ, বিভিন্ন হেড কোয়ার্টার, অফিসার মেস, অস্ত্র ও রসদ গুদাম, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী কেন্দ্র, বন্দর, রেলওয়ে এ সবের উপর আগস্ট পর্যন্ত কোন সুপরিকল্পিত 'গেরিলা' হামলা চালানো হয়নি। ফলে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে বাংলাদেশ প্রশ্ন মৃত প্রায় হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের এবং দেশের মানুষের মনোবল কিছুটা যেন ভেঙ্গে পড়ে।

অন্যদিকে পাক বাহিনীর অবস্থা তখন বেশ সুবিধাজনক। যুদ্ধের প্রথম দিকে আমাদের নিয়মিত বাহিনী তাদের বেশ কিছু ক্ষতি করেছিলো। শত্রুপক্ষে হতাহতের সংখ্যাও ছিলো প্রচুর। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবরে মোটামুটি জানা যায়, পাঁচ থেকে ছয় হাজার শত্রু সৈন্য নিহত এবং আট থেকে দশ হাজার তখন আহত হয়েছিলো। আহতদের মধ্যে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ পুনরায় যুদ্ধ করার অনুপযুক্ত হয়েছিলো।

সাময়িক ভাবে গেরিলা তৎপরতা সন্তোষজনক না হলেও ভবিষ্যতের জন্য আমরা অবশ্যই আশাবাদী ছিলাম। মুক্তিযোদ্ধারা সম্পূর্ণ প্রচলিত পদ্ধতিতে

দু থেকে তিন সপ্তাহের ট্রেনিং পেত এবং ট্রেনিং শেষ করেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদেরকে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতে হতো। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় সবারই বয়স কম, আবেগ বেশি। কেউ কেউ আবার অতিরিক্ত উচ্চাভিলাষী। এরা প্রত্যেকেই গ্রুপ লিডার কিংবা ঐ ধরনের কিছু একটা হতে চাইতো। এটা বুঝতে চাইতোনা যে সবাই 'লিডার' হলে অনুসারী কোথা থেকে আসবে। অবশ্য যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এর চাইতে বেশি কিছু আমাদের আশা করার ছিলোনা।

এমনি যখন আমাদের অবস্থা সে সময়ে 'অপারেশন জ্যাকপট'-এর সাফল্য এ কথা প্রমাণ করেছিলো যে, যথাযথ শিক্ষা এবং নেতৃত্ব দিতে পারলে আমাদের ছেলেরাও অবিশ্বাস্য কাজ করতে পারে। তাদের মধ্যে আন্তরিকতার কোন অভাব ছিলো না, তারা বুদ্ধিমান, কোন্ পরিস্থিতিতে কি করতে হবে দ্রুত তা বুঝে নিতেও সক্ষম। তাদের মানসিক উৎকর্ষ ছিলো নিঃসন্দেহে নিরক্ষর পাকিস্তানী সৈন্যদের চাইতে উত্তম। শিক্ষিত এক বিরাট গেরিলা বাহিনী আমরা পেয়েছিলাম, এটা আমাদের সৌভাগ্য।

সবকিছু বিবেচনা করে পুরো রণকৌশল সম্পর্কে নতুন ভাবে আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রতিটি গ্রুপকে (সাধারণতঃ আট থেকে দশ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে গঠিত) সবকিছু বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দেয়া ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুগুলোর ওপর আঘাত হানার জন্য বিশেষ কয়েকটি দল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিই আমরা সবাই। প্রতিটি গ্রুপের অভিযান পরিকল্পনা সেক্টর হেড কোয়ার্টারগুলোতে তৈরী হতে থাকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে সামান্য কিছু রদবদলের প্রয়োজন দেখা দিলে সেটা করার দায়িত্ব দেয়া হয় গ্রুপ কমাণ্ডারদের ওপর। কিন্তু আমরা গেরিলা দলগুলোর জন্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার ব্যাপারে সমস্যার সম্মুখীন হই। কোন সামরিক কমাণ্ডারেরই সে সময় এই ধরণের নেতৃত্ব তৈরী করার উপায় ছিলো না। উপযুক্ত লোক যে ছিলো না তা নয়, কিন্তু তারা ছিলো আমাদের কমাণ্ড-এর আওতার বাইরে।

গেরিলাদের সেকশন কিংবা প্লাটুন লীডার হতে পারে এমন কিছু তরুণ আমাদের যুব ক্যাম্প থেকে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছিলো। জুন মাসেই ব্যাপারটি আমাদের চোখে ধরা পড়ে। যুব শিবিরের কিছু নির্ধারিত তরুণ গোপন নির্দেশ পেয়ে শিবিরের বাইরে কোন এক স্থানে গিয়ে মিলিত হতো। সেখান থেকে তাদেরকে বিশেষ এক ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার তত্বাবধানে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হতো। এই ব্যবস্থা এতো সুপরিকল্পিত ছিলো যে, অতি গোপনে এদেরকে আনার নেয়ার জন্য বিমান পর্যন্ত ব্যবহৃত হতো। তারপর বিশেষ ধরনের ট্রেনিং

দিয়ে আবার গোপনেই সরাসরি এদেরকে বাংলাদেশের ভেতরে পাঠানো হতো। আমাদের কোন সেক্টর এলাকাতেই হয়তো তারা এসে কাজ শুরু করতো, অথচ আমাদের কিছু জানানো হতো না। এই ধরনের গোপন কার্যাবলী বন্ধ করার অনেক চেষ্টাই আমরা (সামরিক কমাণ্ডাররা) করেছিলাম। আমাদের যুক্তি ছিল :

ক. এসব যোদ্ধা আমাদের এলাকার সামগ্রিক পরিকল্পনার বাইরে কোন কাজ করলে আমরা যে অভিযানের পরিকল্পনা নিয়েছি তা বানচাল হয়ে যেতে পারে। আমাদের সাথে ওদের তৎপরতার সমন্বয় সাধন না হলে বিপদ ঘটতে পারে। যেমন, বাংলাদেশের বিশেষ কতগুলো এলাকায় আমরা কোন হামলা চালাতে চাইনি। শত শত গেরিলা যাতে নিরুপদ্রবে থাকতে পারে সেজন্য ইচ্ছে করেই এসব জায়গায় আমরা হাত দিতাম না। কিন্তু গোপনে পাঠানো বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত এই দলগুলো এসব কোন খবরই রাখতো না। তারা এসেই হয়তো ঐসব জায়গায় কোন কাণ্ড ঘটিয়ে বসতো। ফলে সঙ্গে সঙ্গে সারা তল্লাট জুড়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের তল্লাশী অভিযান শুরু হয়ে যেতো এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ত্যাগ করতে হতো তাদের আশ্রয় স্থল।

খ. সবচাইতে ভাল যোদ্ধাদেরকে নিয়ে এই ভাবে বিশেষ বাহিনী গঠন করা হলে সেক্টর কমাণ্ডারদের পক্ষে গেরিলা দলগুলোর নেতৃত্ব খুঁজে বের করা বেশ কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে। এতে করে আমাদের সামগ্রিক গেরিলা-কৌশল বিপন্ন হয়ে পড়বে। আর এ ধরনের আলাদা বাহিনী সৃষ্টির ফলে আমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে— কর্তৃপক্ষ বুঝি আমাদের বিশ্বাস করছেন না। সমস্যার সমাধানে চেষ্টার ত্রুটি আমরা করিনি, কিন্তু সবকিছুই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আমাদেরকে পরিষ্কার ভাবে বলে দেয়া হয়, "এসব ব্যাপারে নাক গলাবেন না।"

এ সব ব্যাপারে নাক গলাবার একমাত্র অধিকার ছিলো ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কেবিনেট ডিভিশনের। পরে জেনেছিলাম, সর্বোচ্চ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে কেবিনেট ডিভিশনের রিসার্চ এ্যাণ্ড এনালাইসিস উইং (রও) এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলো।

পরিকল্পনার সাংকেতিক নাম ছিলো 'রও'। এখানে নির্বাচিত ছেলেরা বিশেষ ধরনের ট্রেনিং, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, উন্নত শ্রেণীর অস্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম এমনকি যোগাযোগ রক্ষার জন্য সর্বাধুনিক যন্ত্রও লাভ করতো—যা আমরা পেতাম না।

সংক্ষেপে এই ছিলো 'রও'-এর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক সর্বনাশের পরিকল্পনা। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এই পরিকল্পনা মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছিলো। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের এতো বছর পরও

এর ক্ষতিকর জের শেষ হয়নি। আরো কতকাল সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে আমরা এই ভুল পরিকল্পনার শিকার হয়ে থাকবো—কেউ জানেনা।

এ সব 'বিশেষ ছেলেদের' সম্পর্কে কিন্তু আমাদের কোন সন্দেহ ছিলো না। আমরা জানতাম, স্বাধীনতার জন্য তারাও সমান আন্তরিক, তারাও সবকিছু উৎসর্গ করে এ পথে এসেছে। তাদের দেশপ্রেম প্রশ্নাতীত। বস্তুতঃ তারা ছিলো বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ, দেশের স্বার্থ তাদের কাছে ছিলো সবার উপরে। কিন্তু তাদের সেই মহৎ সম্ভাবনার অপব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের আপত্তি সেখানেই। আমরা চেয়েছিলাম দেশপ্রেমিক এবং সুশিক্ষিত নাগরিকেরা সাত্বিক জাতীয় স্বার্থেই শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করবে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

আমরা আরো জেনেছিলাম, কতগুলো রাজনৈতিক কারণেই নাকি পরিকল্পনাটির প্রয়োজন দেখা দেয়। তৎকালীন ছাত্রনেতা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি বিশেষ বাহিনী গঠনের সাথে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত ছিলেন। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের আইনানুগ সরকারের কাছ থেকেও কোন অনুমতি নেয়া হয়নি। অন্যান্য সেক্টর কমাণ্ডারদের মতো আমিও ব্যক্তিগত ভাবে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। কিন্তু তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, এ ব্যাপারে তিনিও বিশেষ কিছু জানেন না। জনাব তাজউদ্দিন আমাকে বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্ণেল এম. এ. জি. ওসমানীর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করতে বলেন। দেখলাম কর্ণেল ওসমানীও অখুশী। বিষয়টি সম্পর্কে ভারত সরকার অথবা আমাদের সরকারের কাছে কর্ণেল ওসমানী ব্যাখ্যা চাইবেন বলে আমাকে কথা দিলেন এবং বললেন ব্যাখ্যা চাওয়া পর্যন্ত যেন আমি অপেক্ষা করি।

প্রথমে এই বাহিনীর নাম দেয়া হয়েছিলো বি. এল. এফ. (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স)। কিন্তু বাংলাদেশে তারা 'মুজিব বাহিনী' হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে।

ভারতীয় মিজো এবং নাগা বিদ্রোহীদের নাশকতামূলক তৎপরতা প্রতি-রোধের দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল উবান। তাঁর নেতৃত্বেই মুজিব বাহিনীর সদস্যদের বিশেষ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের কোন এক গোপন সামরিক ঘাঁটিতে তারা ট্রেনিং লাভ করতো। আগেই বলেছি, তাদেরকে শক্তিশালী রেডিও সেট এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হতো। ট্রেনিং শেষে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বিশেষ কতগুলো বিষয়ে ভালভাবে 'নির্দেশ'

দিতেন। পরিকল্পনা মোতাবেক সকল প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর কতগুলো নির্দিষ্ট দয়িত্ব পালন করার জন্য তাদেরকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হতো।

বাংলাদেশ সরকার, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের (আওয়ামী লীগ) সদস্য-বৃন্দ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমাণ্ডারগণ—কেউই জানতেন না কি জন্য এই ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশে এসব ছেলের দায়িত্বই বা কি, অথবা কেমন ধরনের অস্ত্র ও যোগাযোগ সরঞ্জাম তারা পাচ্ছে তাও আমরা জানতাম না। শুধু শেখ ফজলুল হক মণি এবং ভারত সরকার মনোনীত অল্প কিছু লোক এই বাহিনী সম্পর্কে কিছু জানতেন—তা-ও পুরোটা নয়। আমরা শুধু জানতাম, বিশেষ বাহিনীর সদস্যদেরকে এমন ভাবে সবকিছু শেখানো হচ্ছে—যাতে তারা তাদের সার্বিক আনুগত্য সর্ব প্রথম শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি প্রকাশ করতে পারে।

আমরা আরো জানতাম, সর্বস্বত্যাগী এবং সত্যিকার দেশপ্রেমিক এই সব তরুণের কাছে স্বদেশ এবং স্বাধীনতাই ছিলো সবচাইতে প্রিয়। কিন্তু অসহায় ভাবে তারা নির্দেশিত ভূমিকায় অভিনয় করে গেছে। খুব যে আনন্দের সাথে করেছে তা-ও নয়।

আওয়ামী লীগ সদস্যরাও এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এমনকি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মহলের যে সব ব্যক্তি আমাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে কাজ করছিলেন—বি. এল. এফ. গঠনের প্রশ্নে তারাও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমরা সবাই ছিলাম অসহায় দর্শক মাত্র।

রণাঙ্গনে এরা কোথায় কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে—তা আমরা জানতে পারতাম না। আমরা সবাই বুঝতে পেরেছিলাম এই মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝির অবসান হওয়া দরকার। আমরা বিশেষ বাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী ছিলাম। তারা কোথায় কি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তা জানতে চাইতাম। আমাদের দুঃসময়ের দিনগুলোতে ভারত পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কোন দিন ভোলার নয়। ভারত এবং ভারতের জনগণ আমাদের জন্য যা কিছু করেছে সে জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ। তাই ভারতই পারে এই ভুল বুঝাবুঝির অবসানে সাহায্য করে বাংলাদেশের সাথে তার এই মৈত্রী বন্ধন আরো শক্তিশালী, আরো স্থায়ী করে তুলতে।

বিশেষ বাহিনী গড়ে তোলার পরিকল্পনাটি এক অদৃশ্য ও কাল্পনিক শত্রুর বিরুদ্ধে নতুন এক ফ্রন্টের উদ্বোধন ঘটায়। ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের এই সনাতন প্রতিযোগিতা এখানেও শুরু হয়ে যায়। কার কি রাজ-নৈতিক আদর্শ, জনগণের তা নিয়ে সে সময় মাথা ব্যথা ছিলো না। যুগ যুগ

ধরে তারা শুধু দেখেছে কঠিন নিপীড়ন ও শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার স্বপ্ন। এই সহজ কথাটি পরিকল্পনাকারীরা সম্ভবত ভুলে গিয়েছিলেন। দেশবাসীর আশা আকাঙ্খা পূরণের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের সকল প্রচেষ্টা কাজে লাগানো উচিত ছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধ পরবর্তীকালীন চাওয়া পাওয়ার আকাঙ্খা গগন চুম্বী রূপ লাভ করায় দেশের বিরাট জনশক্তির অপব্যবহার ঘটে। ফলে সৃষ্টি হয় মুক্তিযোদ্ধার একটা অংশ থেকে একটা রাজনৈতিক বাহিনী।

২৯শে আগস্ট এক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। আলোচনার মাধ্যমে এই বাহিনীর ব্যাপারে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আলোচনায় ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন মিঃ ডি. পি. ধর।

বৈঠকে বাংলাদেশ বাহিনী যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলো সে সব বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোন কোন ব্যাপারে, বিশেষ করে 'রও' গ্রুপগুলোর প্রশ্নে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মিঃ ডি. পি. ধর তাঁর স্বভাবসুলভ কূটনৈতিক চালে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এড়িয়ে যান। তাঁকে শুধু বলতে শোনা যায় বিশেষ 'রও' গ্রুপগুলোর ব্যাপারে কোন ভুল বোঝাবুঝি খুবই দুঃখজনক বিষয়। তারাতো আপনাদেরই ছেলে, স্বাধীনতা অর্জনের একই উদ্দেশ্যে তারাও যুদ্ধ করছে। আমরা তাদেরকে বিশেষ কতগুলো কাজের জন্য ট্রেনিং দিচ্ছি মাত্র।" অনেক ব্যাপারে আলোচনা শেষ হলেও 'রও' প্রশ্নে কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেলো না। তবে বাংলাদেশ সরকার সংশোধিত এক প্রস্তাবে সম্মত হন। প্রস্তাব অনুযায়ী বিশেষ গ্রুপের ছেলেরা যে সেক্টর এলাকায় গিয়ে উঠবে, সেই সেক্টরের কমাণ্ডারকে তাদের খবর জানানো হবে। নিঃসন্দেহে সম্মেলনে মিঃ ডি. পি. ধরেরই কূটনৈতিক বিজয় হয়েছিলো। কারণ, বাংলাদেশ সরকার সংশোধনী গ্রহণ করে প্রকারান্তরে বিশেষ গ্রুপগুলোকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অবশ্য এটা ছাড়া সে সময়কার বিপাকে পড়া বাংলাদেশ সরকারের করার খুব বেশি কিছু ছিলো না।

বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের মনোভাবও সম্মেলনে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এই অঞ্চলে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিনাশী যুদ্ধে পাকিস্তানের অর্থনীতির যত না ক্ষতি হচ্ছিলো, তার চাইতেও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলো ভারত। অতীতেও ভারত শরণার্থী সমস্যার মোকাবিলা করেছে; কিন্তু ৭১-এর সমস্যার আকার ও প্রকৃতি ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ভারতের মতো দেশের পক্ষে এতোবড় একটা বাড়তি বোঝা বেশি দিনের জন্য বহন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিলো।

পক্ষান্তরে গেরিলা যুদ্ধ আমরা যত দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাই না কেন পাকিস্তানীদের মতো নিয়মিত বাহিনীকে পরাভূত করা কষ্ট সাধ্য ছিলো।

করেছিলেন তার চাইতেও কম। ফলে পরিকল্পনাটি তেমন কোন কাজে আসেনি।

উপমহাদেশ জুড়ে একদিকে যখন ব্যাপকতর যুদ্ধ আসন্ন হয়ে আসছিলো তখন অন্যদিকে সামরিক তৎপরতা আরো জোরদার করার জন্য আমাদের অর্থাৎ সেক্টর কমাণ্ডারদের ওপরও চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। বলা হচ্ছিলো শত্রুকে আগে থাকতেই ছত্রভঙ্গ ও দুর্বল করে রাখতে হবে। তাহলে সহজেই চূড়ান্ত অভিযান চালিয়ে তাদের পরাভূত করা সম্ভব হবে এবং এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে যথাসাধ্য স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব হলে নভেম্বরের মধ্যেই।

অথচ অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য দিক দিয়ে আমাদের যা সামর্থ্য তাতে করে এই সীমিত সময়ের মধ্যে আরব্ধ দায়িত্ব পালন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমার ১ নম্বর সেক্টরের আওতায় ছিলো মুহুরী নদীর সমগ্র পূর্বাঞ্চল, অর্থাৎ পুরো চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা। এখানে শত্রুপক্ষের শক্তি ছিলো দুই ব্রিগেডেরও বেশি। এ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত আরো দু'টি আধা-সামরিক ব্যাটালিয়নও এই অঞ্চলে শত্রুপক্ষের শক্তিবৃদ্ধি করছিলো। আমাদের পক্ষে ছিলো ইপিআর, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর লোক নিয়ে তিনটি ব্যাটালিয়ন। সমগ্র সেক্টরে অফিসার পেয়েছিলাম সেনাবাহিনীর চারজন এবং বিমান বাহিনীর দু'জন। পাক সেনাবাহিনীর পক্ষে এখানে অফিসারের সংখ্যা ছিলো অন্যূন ১৫০ জন। ১ নম্বর সেক্টরের সাব-সেক্টরগুলোর প্রতিটির কমাণ্ডে ছিলেন একজন অফিসার কিংবা একজন জেসিও। কমাণ্ড সংক্রান্ত জটিল সমস্যাবলীর ব্যাপারে এঁদের অভিজ্ঞতা ছিলো নিতান্তই সামান্য। আর আমার এলাকায় সক্রিয় যুদ্ধ চলছিলো অর্ধ শতাধিক মাইলেরও অধিক সীমান্ত এলাকা জুড়ে।

সেক্টর হেড কোয়ার্টারেই সমস্যার চাপ ছিলো সবচাইতে বেশি। আমার একজন মাত্র স্টাফ অফিসারকে সকল প্রশাসনিক এবং সরবরাহ ব্যবস্থা দেখতে হতো। কাজের মেয়াদ ছিলো দিনরাতে ২৪ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে সাতদিন। কাজের অসহ্য চাপে আমার স্টাফ অফিসার শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু হাঁসপাতালে কয়েকদিন থাকার পর আবার তাকে কাজ শুরু করতে হয়। এই অবস্থার কোনো বিকল্প খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আমাদের সরবরাহ ঘাঁটি ছিলো হরিণা ক্যাম্প থেকে ১০০ মাইল দূরে আগরতলায়। তিনহাজার লোকের জন্য রেশন, জ্বালানী, ও অন্যান্য সরঞ্জাম, কাপড়-চোপড়, অস্ত্র-শস্ত্র, ঔষধপত্র সবকিছু সেখান থেকে নিয়ে আসতে হতো। সেই একই গাড়ীতে করে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল পাড়ি দিয়ে এগুলো আবার বিভিন্ন সাব-সেক্টরে পৌঁছানো হতো। বৃষ্টি বাদলের দিনে সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখতে

আমাদের জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিলো। কোনো কোনো সময় গাড়ী রাস্তার বাইরে গড়িয়ে পড়লে কিংবা হাটু সমান কাঁদায় চাকা বসে গেলে সেই গাড়ী না তোলা পর্যন্ত কিংবা রসদপত্র মাথায় করে গন্তব্যস্থলে না পৌঁছানো পর্যন্ত সেখানে একজন অফিসারকে অপেক্ষা করতে হতো।

গেরিলা বাহিনীর প্রশাসনিক এবং অভিযান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব ছিলো আরো কষ্টকর। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিযুক্তি লাভের আশায় শত শত গেরিলা প্রতিদিন আমার হেড কোয়ার্টারে আসতো। তাদেরকে এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করতে হতো, তারপর আসতো দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের ব্রিফিং-এর পালা। প্রতিটি গ্রুপকে ব্রিফিং করতে কম করে হলেও এক ঘণ্টা সময় লাগতো। বিশেষ কাজের জন্য ব্রিফিং-এ সময় লাগতো আরো বেশি। প্রত্যেক গ্রুপকেই অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ এবং রাহা খরচ দিতে হতো। ছেলেদের নিরাপদে ভেতরে পাঠানোর জন্য শত্রু বাহিনীর তৎপরতা ও চলাচল সংক্রান্ত সর্বশেষ খবর সংগ্রহ করতে হতো। টহলদার শত্রুসেনারা এক জায়গায় থাকতো না বলে সর্বশেষ খবরেও পরিবর্তন ঘটতো। এদের সাথে গাইড থাকতো। তারা নিরাপদ রাস্তা ধরে নিকটবর্তী ঘাঁটিতে (সাধারণতঃ সীমান্ত রেখা থেকে ৮-১০ মাইলের মধ্যে) গেরিলাদের পৌঁছে দিতো। নতুন আগন্তুকদের সম্পর্কে ঘাঁটিতে আগেই খবর দেয়া থাকতো। সেখানে তাদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা হতো। একই পদ্ধতিতে সেখান থেকে তাদের রওয়ানা হতে হতো পরবর্তী ঘাঁটিতে। তাদেরকে অতি সাবধানে আক্রমণ স্থলের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য যানবাহনের দরকার হতো। প্রত্যেক গ্রুপ সদস্যদের নাম ঠিকানা, তাদের পরিকল্পিত পথ, ঘাঁটি, অস্ত্র-শস্ত্র গোলা-বারুদের হিসাব, কাপড়-চোপড়, রেশন, পথ খরচের টাকা পয়সা সব কিছুর বিস্তারিত রেকর্ড রাখতে হতো। দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর প্রতিটি গ্রুপের সাথে আমাদের যোগাযোগ রাখতে হতো। তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা এবং নির্ধারিত দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করার ব্যাপারেও আমাদের তৎপর থাকতে হয়। গ্রুপগুলো নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাওয়ার পর আমাদের তারা সে খবর জানিয়ে দিতো। তারা কোন অভিযান চালালে কিংবা শত্রুপক্ষের কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে তাও আমাদের জানাতে হতো। আমাদের সেক্টরের ভিন্ন জায়গায় তিনটি গোপন অয়্যারলেস সেট চালু ছিলো। এগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে আমরা নিয়মিত খবর সংগ্রহ করতাম। এ ছাড়া খবর সংগ্রহ করে এক বিরাট নেট ওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলাম। বিভিন্ন দলের কাছ থেকে খবর নিয়ে এরা সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দিতো। ফেরার পথে আবার তারা বিভিন্ন দলের গাইড হিসাবে কাজ করতো।

এইভাবে তাদের আবর্তন মূলক কাজ চলতো দিনের পর দিন। চতুর্দিকে সবকিছু সবসময় চালু রাখাই ছিলো আমাদের প্রধান দায়িত্ব। এর কোন একটা থামলেই বিপদের সম্ভাবনা।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে জড়িত সকল শ্রেণীর লোকেরই তখন সঙ্গীন অবস্থা। মন্ত্রিসভার সদস্য বৃন্দ, আমি হেডকোয়ার্টাররের নেতৃবৃন্দ, কিংবা ফ্রন্ট লাইনে সংগ্রামরত যোদ্ধা সকলেরই অবস্থা অভিন্ন। যুদ্ধরত সৈনিক ও গেরিলাদের ওপর নির্দেশ আসতে থাকে যুদ্ধ আরো জোরদার করার। মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুকে অনবরত আঘাত হেনে চলেছিলো। তাদের হাতে বিপুল সংখ্যক শত্রু নিহত কিংবা আহতও হয়েছে। নিজেরাও হতাহত হয়েছে। কিন্তু কোন দিন এর স্বীকৃতি কিংবা প্রশংসা তারা খুব একটা পায়নি। এ কারণে স্বভাবতই তারা ছিলো ক্ষুব্ধ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে ডেমাগিরিতে কয়েক শত ছেলে ট্রেনিং নেয়ার জন্য মাসের পর মাস অপেক্ষা করেছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন জ্বরে এবং রক্ত আমাশয়েও মারা গেছে। অন্যদেরকে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অনাহারে কাটাতে হয়েছে। শত মাইল দুর্গম এবং পার্বত্য অঞ্চল ও নিবিড় বনানী পার হয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য তারা এসেছিলো কিন্তু কেউ তাদের সম্পর্কে সামান্যতম আগ্রহও প্রকাশ করেনি। তারা যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়ীঘর ছেড়েছিলো তার স্বীকৃতিও কারো কাছ থেকে তারা পায়নি।

যুদ্ধে নিয়োজিত গেরিলাদের শতকরা পঞ্চাশ জনের জন্য ভারত অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছিলো। (পরে অবশ্য শতকরা ৯০ জনকে অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়) বাকি ছেলেদের খালি হাতে যুদ্ধে পাঠানো কিংবা অপেক্ষা করতে বলা ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর ছিলোনা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ ছিলো, অস্ত্র ছাড়া কাউকে যেন গেরিলা-যুদ্ধে পাঠানো না হয়। আমাদের সব চাইতে সহজ উপায় ছিলো দুই গ্রুপের অস্ত্র দিয়ে তিনটি গ্রুপকে পাঠানো। ফলে প্রতিটি গ্রুপের শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ ছেলেকে সরবরাহের অপ্রতুলতার জন্য ক্যাম্পে বসিয়ে রাখতে হতো। এদের জন্য আবার রেশন পেতামনা, ফলে, সমস্যা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করতো। আমরা স্থানীয় ভাবে এর কিছুটা সমাধান বের করেছিলাম। সকল অফিসার, জেসিও এবং অন্যান্য র‍্যাংকের সৈনিক মিলে একটা মাসিক চাঁদার ব্যবস্থা করেছিলাম। এর মাধ্যমে যা কিছু আয় হতো তা দিয়ে বাড়তি আহার যোগানোর চেষ্টা চলতো। এই ব্যবস্থা ছিলো অনিয়মিত এবং পরিস্থিতির

চাপে পড়েই আমাদের এটা করতে হয়েছিলো। অথচ এর জন্যও আমাদের ভুল বোঝা হতো আমরা হতাম সমালোচনার পাত্র। উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা আমাদের সম্পর্কে অনেক গোপন চিঠিতে লিখতেন, "বাংলাদেশের সেক্টর কমাণ্ডাররা পুরো নিয়ম মেনে চলছেন না"। এ বিষয়ে ভারতীয় অফিসারদের এই মতামত সম্ভবত অনেকাংশে সঠিক ছিলো। তাদের উপর ভারতীয় আর্মী হেডকোয়ার্টারের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকতো, গেরিলাদের ট্রেনিং শেষ হওয়ার তিন থেকে চার দিনের মধ্যে সকলকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তা সে সবাইকে অস্ত্র সরবরাহ করে কিংবা মাত্র কিছু অস্ত্র সরবরাহ করেই হোক, কিন্তু আমাদের উপর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ ছিলো সবাইকে অস্ত্র সজ্জিত না করে কোন গ্রুপকেই যেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধে পাঠানো না হয়।

বাংলাদেশ আর্মী হেড কোয়ার্টার এবং ভারতীয় আর্মী হেড কোয়ার্টারের মধ্যে সমন্বয় তখনও পুরো গড়ে ওঠেনি বলেই হয়তো আমাদের জন্যে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিলো। অথবা এমনও হয়ে থাকতে পারে যে তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিলোনা, তবে আমাদের কাছে দুই হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ আসতো ভিন্নভাবে। সে যাই হোক, এই সব সমস্যার জন্যে আমরা স্থানীয়ভাবে সমাধানের ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। ফলে আমাদের বিরুদ্ধে নিয়ম মেনে না চলার অভিযোগ তোলা হয়। কিন্তু যুদ্ধের সেই অবস্থার পুরো নিয়ম মানাতো দূরের কথা নিয়ম মেনে চলার ভান করার মানসিকতা এবং উপায় কারোই ছিলোনা।

৩১
গেরিলা যোদ্ধা

আগস্ট মাস থেকেই কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম বন্দরের নিকটবর্তী বাংলাদেশের একমাত্র তৈল শোধনাগারটি অচল করার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছিলো। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র দুটি ধ্বংস হলে পাকিস্তানীদের চাইতে আমাদের ক্ষতি বেশি হবে মনে করে আমি দু'টি প্রস্তাবই প্রত্যাখান করি। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন এবং জ্বালানী সরবরাহে ঘাটতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই এই নির্দেশ ছিলো। জ্বালানীর অভাব দেখা দিলে শত্রুদের যানবাহন চলাচল সীমিত হয়ে পড়বে। এবং এতে করে তাদের তৎপরতাও হ্রাস পাবে। কিন্তু আমার মনে হয়েছিলো কেন্দ্র দু'টি ধ্বংস না করেও অন্যভাবে আমাদের লক্ষ্য হাসিল করা সম্ভব।

আমার ভাবনাকে সামনে রেখে আমি একটি নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং-এর সঙ্গে কথা বলি। তিনি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে ১,২ এবং ৩ নম্বর সেক্টরের কার্যক্রম ও চাহিদা সংক্রান্ত বিষয়ে সমন্বয়কারীর দায়িত্বে ছিলেন। আমার পরিকল্পনা ছিলো :

১. মদনঘাটে বিদ্যুৎ বিভাগের সাব স্টেশন ধ্বংস করা।

২. কাপ্তাই এবং চট্টগ্রামের মধ্যে যতগুলো সম্ভব বৈদ্যুতিক পাইলন ধ্বংস করতে হবে।

আমার বিশ্বাস ছিলো, দু'টি কাজ করতে পারলেই শত্রুপক্ষের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হবে এবং এতে ওদের বাণিজ্য ও জাহাজ নোঙ্গরে অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে।

যথারীতি পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এ কাজের জন্য আমি আমার সাথে কার্যরত বিমান বাহিনীর নির্ভীক অফিসার ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যান্ট সুলতানকে মনোনীত করলাম। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাকে আমি পরিকল্পনাটি বুঝিয়ে দিলাম এবং তার 'রেইডিং' পার্টির সদস্যদেরকে বেছে

নিতে বললাম। এরপর সবাই মিলে আমরা কয়েকটি মহড়া দিলাম। 'রেইডিং' পার্টির সদস্যদেরকে কি কাজে কোথায় পাঠানো হচ্ছে সেকথা আগে বলা হতো না। একেবারে সর্বশেষ ঘাঁটিতে পৌঁছার পর যখন তারা লক্ষ্য বস্তুর উপর আঘাত হানতে যাবে তখনই তাদেরকে বলা হবে, তার আগে নয়। সুলতান তার দলের লোক এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র বেছে নিলো। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ধ্বংস করা ছাড়াও সুলতানের ওপর ঐ এলাকায় গেরিলা তৎপরতা হ্রাস পাওয়ার কারণ নির্ণয়ের দায়িত্ব দেয়া হলো।

১১ই সেপ্টেম্বর সুলতানের সঙ্গে কয়েকজন বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং কিছু সংখ্যক নিয়মিত সৈন্যকে হরিণা থেকে এ অভিযানে পাঠানো হলো।

৩রা অক্টোবর তাঁর পার্টি দুঃসাহসী অভিযান চালিয়ে শহর থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরেই মদনাঘাটের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার ধ্বংস করে দিলো। বহু সংখ্যক বৈদ্যুতিক পাইলনও উড়িয়ে দেয়া হয়। এতে কাপ্তাই থেকে সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে। বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত মদনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির চার-দিকে ছিলো ইঁটের দেয়াল আর দুর্ভেদ্য কাঁটা তারের বেড়া। এখানে মোতায়েন থাকতো ১০ জন নিয়মিত সৈন্য এবং ২০ জন আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের একটি প্লাটুন। তারা সব সময় চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতো। তার মধ্য থেকে সুলতান তাঁর দল নিয়ে শত্রুর ওপর সফলতার সাথে এই আক্রমণ সম্পন্ন করে। আগস্ট মাসের মাঝামাঝিতে বন্দরের জাহাজ ধ্বংসের পর আবার দুঃসাহসী হামলায় শত্রুরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারলো যে গেরিলারা ক্রমান্বয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

অভিযান শেষ করে ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট সুলতান ঐ এলাকার অধিকাংশ গেরিলা গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাদের অসুবিধা এবং সমস্যাবলী নিয়েও আলোচনা হয়। ১১ই অক্টোবর হরিণায় ফিরে এসে সুলতান বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন।

গেরিলারা গ্রামাঞ্চলে বেশ কার্যকর অবস্থান গড়ে তুলছিলো। বস্তুতঃ তারা দেশটাই তখন বিরাট এক গেরিলা ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিলো। ফলে যখন তখন ছেলেরা যে কোন দিকে অভিযান চালাতে পারতো। রাতগুলো ছিলো একান্ত ভাবেই তাদের। ফলে পাকিস্তানী সৈন্যরা রাতের বেলায় পারত পক্ষে বাইরে বের হতো না।

আমাদের পক্ষে জনগণের সমর্থন ছিলো ব্যাপক। গেরিলাদের সাহায্যে আসতে পারলে লোকজন সম্মানিত এবং গর্ব অনুভব করতো। গেরিলাদের খাদ্য ও আশ্রয় দেয়ার অপরাধে পাকিস্তানীরা বহু লোককে হত্যা করেছে, তাদের

বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে, সহায় সম্পত্তি লুট করে সেই লুটের মালের বখরা পুরস্কার হিসাবে রাজাকার ও দালালদের দেয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও জনগণের হৃদয় আবেগ এবং উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, যখন দেখেছে অল্প বয়সী তরুণেরা ভারী অস্ত্র গোলাবারুদের ভারে ন্যুব্জ হয়েও দৃঢ় প্রত্যয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে শত্রু হননে এগিয়ে চলেছে। বাংলার জনগণ মুক্তিফৌজদের স্বাগত জানানোর জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেছে দিনের পর দিন। দেশের ভেতরে অবস্থানকারী লোকজন যদি সেদিন এই ত্যাগ স্বীকার না করতো তাহলে অঙ্কুরেই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতো।

গেরিলাদের মন্থর তৎপরতা জনগণকে ক্ষুণ্ন করতো। তারা মনে করতো শত্রুর উপর তাদের প্রতিটি আঘাত, তা যত ক্ষুদ্রই হোকনা কেন আমাদের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে। নানা কারণে তৎপরতায় অনেক সময় মন্থরতা লক্ষ্য করা যেতো। এর মধ্যে একটি ছিলো নেতৃত্বের অভাব। তাছাড়া গেরিলা আক্রমণের পর সেই এলাকার জনসাধারণের ওপর পাকিস্তানীদের নৃশংস প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ ও ধ্বংসলীলাও আমাদের যোদ্ধাদেরকে যথেষ্ট চিন্তিত করে তুলতো। অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা তাদেরকে দেয়া অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদকে অমূল্য সম্পদ বলে মনে করতো। কারণ একবার কোন অস্ত্র নষ্ট হয়ে গেলে সেটা মেরামত করা বাংলাদেশের ভেতরে তখন অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তেমনি গোলাবারুদ ব্যবহৃত হয়ে গেলে নতুন সরবরাহ পাওয়ার নিশ্চয়তাও ছিলো খুব কম। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সহজে ব্যবহার করতে চাইতো না। এটা কিছুটা বিচিত্র মানসিকতা। গেরিলা যুদ্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সাথে সাথে এই মানসিকতার পরিবর্তন হবে বলেই আমাদের গভীর বিশ্বাস ছিলো।

৩২
যুদ্ধের মুখোমুখি

আমাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভাঙ্গন ধরানোর জন্য পাকিস্তানীরা বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছিলো। এর একটি পদক্ষেপ হিসাবে তারা বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। ভারতে অবস্থানকারী কয়েকজন নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকের কাছে তারা এজেণ্ট পাঠায় এবং তাদেরকে স্বাধীনতা আন্দোলন ত্যাগ করতে প্ররোচিত করে। পাকিস্তান সরকার তাদেরকে বড় বড় পদ দেয়া হবে বলেও প্রলোভন দেয়। এ দেশের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইয়াহিয়া খানের ঘৃণিত খুনী বাংলাদেশী সরকারে যোগ দিতে সচেষ্ট কয়েকজন বাঙালী রাজনীতিকের নাম বেশ শোনা যাচ্ছিলো। এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগে ভাঙ্গন ধরাতে পারতো, ফলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারতো। এই ধরনের ভাঙ্গন ধরানোর জন্য পাকিস্তান সরকার নিঃসন্দেহে প্রচুর অর্থও ব্যয় করেছিলো।

পাকিস্তানীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর কাজেও সক্রিয় ছিলো। বিশেষ করে যুব শিবির এবং শরনার্থী শিবিরগুলোতে তাদের উস্কানিমূলক তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারীদের শিবিরগুলোতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গেলে আমরাই বিপদে পড়তাম। এতে আমাদের সমগ্র যুদ্ধ প্রচেষ্টারই ক্ষতি হতে পারতো। শিবিরগুলোর দাঙ্গা ভারতের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়লে ভারতীয় জনগণও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে চলে যেতো। ফলে ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর সরকার নৈতিক এবং অন্যান্য পূর্ণ সমর্থন দিয়ে আমাদের যেভাবে সাহায্য করছিলেন তাতেও অন্তরায় সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো।

বাঙালীরা মূলতঃ অসাম্প্রদায়িক বলে দাঙ্গা বাধাবার জন্য পাকিস্তানীদের এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

এই ধরনের আরো অনেক সমস্যা আমাদের বিব্রত করে তুলছিলো। তার ওপর ছিলো অভাবনীয় হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞে ক্ষতবিক্ষত সমস্ত বাংলাদেশ। তবু

সেই চরম দুর্দশার দিনে শত্রুর সমস্ত প্ররোচনা আর প্রচেষ্টা সত্বেও আমরা গভীর আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান ছিলাম যে, বাংলার নিরপরাধ মানুষের রক্তে রঞ্জিত ঐ সব ঘাতকদের সাথে আমরা কোনদিনই হাত মিলাবো না। পাকিস্তানের ভাঙ্গন তখন সম্পূর্ণ। ফেরার পথ হয়ে গেছে রুদ্ধ। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে। যুদ্ধের গতিকে সমস্ত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও জোরদার করে তুলতে হবে। তখন এসেছিলো শত্রুকে চরম আঘাত হানার সময়। তাই প্রয়োজন ছিলো আমাদের গেরিলা বাহিনী, সেক্টর ট্রুপস্ এবং অন্যান্য নিয়মিত ব্যাটালিয়নগুলোকে পুরোপুরি যুদ্ধে নিয়োজিত করা।

আমরা সিদ্ধান্ত নেই, রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এবং যে সব সীমান্ত ফাঁড়িতে শত্রুর প্রহরা একটু কম, সেগুলো দখলের মাধ্যমেই আমাদের অভিযান শুরু হবে। প্রতিটি অভিযান শুরুর পূর্বেই ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী আমাদের সহযোগিতা করবে। সীমান্তবর্তী এলাকা এবং সীমান্ত ফাঁড়ি দখল পরিকল্পনার পেছনে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিলো, সেগুলো হচ্ছে:

ক. এইসব সীমান্ত ফাঁড়ি বা সীমান্ত এলাকা দখলের যুদ্ধে আমাদের বাহিনীর দক্ষতা ও দুর্বলতা আমরা নিরূপণ করতে পারবো।

খ. সকলকে বুঝিয়ে দেয়া যে, লক্ষ্য অর্জনে আমরা বদ্ধপরিকর। এবং আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। এতে করে শত্রুরা গেরিলা বিরোধী তৎপরতা কমিয়ে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থায় আরো বেশি শক্তি নিয়োগ করবে। শত্রুদের এভাবে সীমান্ত এলাকায় ব্যস্ত রাখতে পারলে দেশের অভ্যন্তর ভাগে শত্রুর সংখ্যা কমে যাবে ফলে গেরিলাদের কাজ করা আরো সহজ হবে।

গ. এ ধরনের সংঘর্ষের মাধ্যমেই শত্রুর প্রস্তুতি এবং তার প্রতিরোধ ক্ষমতার মাত্রাও আমরা পরিমাপ করতে পারবো।

সীমান্ত রেখা বরাবর আমাদের তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানীরা ঠিকই অভ্যন্তর ভাগের শক্তি কমিয়ে সীমান্তে এনে সৈন্য জড়ো করতে থাকে। এতে বিভিন্ন স্থানের পরিস্থিতি গেরিলাদের অনুকূল হয়ে ওঠে। অবশ্য এই সঙ্গে কিছুটা অসুবিধাও দেখা দেয়। সীমান্ত এলাকার শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাদের সেই পথ দিয়ে দেশের ভেতরে পাঠানো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ভেতরে প্রবেশের প্রায় সকল পথই শত্রু সৈন্যরা বন্ধ করে দেয়।

২২শে সেপ্টেম্বর চম্পকনগর সীমান্ত ফাঁড়ি এবং প্রধান সড়কের ওপর গুরুত্বপূর্ণ বল্লভপুর এলাকা দখল করার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালাই। আক্রমণের আগে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী লক্ষ্যস্থলের ওপর গোলাবর্ষণের মাধ্যমে শত্রুর সুদৃঢ় অবস্থানগুলো ধ্বংস করার চেষ্টা করে।

কিন্তু দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হই। কামানের গোলায় শত্রুর তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। পাকিস্তানীদের বাংকারগুলো ছিলো খুব মজবুত। প্রতিটি প্রতিরক্ষা বাংকারেই শত্রুরা ভূগর্ভে কয়েকদিন থাকার মতো রসদপত্র মজুত করে রেখেছিলো। ঘাঁটি গুলোর মধ্যে আবার গভীর ট্রেঞ্চ পথে যোগাযোগ ছিলো। তাছাড়া আমরা যা অনুমান করেছিলাম তার চাইতেও বেশি ছিলো তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সম্ভার।

চম্পকনগর সীমান্ত ফাঁড়ি আক্রমণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো ক্যাপ্টেন মাহফুজকে। ফাঁড়ির ডান পাশ দিয়ে নিজেদেরকে আড়াল করে আমি ওদের অগ্রসর হবার নির্দেশ দেই। কিন্তু লক্ষ্যস্থলের চারপাশে কয়েকশ' গজ এলাকায় গা ঢাকা দেয়ার মত তেমন কোন ফসলের ক্ষেত, উঁচু ভূমি অথবা বন জঙ্গল ছিলো না। পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড় থেকে আমি যুদ্ধ পরিচালনা করছিলাম। ফাঁড়িটি থেকে এর দূরত্ব ছিলো আটশত গজের মত। সেখান থেকে আমি লক্ষ্যস্থলের অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম। অয়্যারলেসে মাহফুজ আমার সাথে যোগাযোগ রাখছিলো। আমাদের বাহিনীর 'কভার' দেয়ার জন্য কামানসহ ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর একজন পর্যবেক্ষকও আমার সাথে ছিলেন। আগেই উল্লেখ করেছি, আমাদের সৈন্যদের অগ্রসর হওয়ার আগে কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়। কামানের গোলাবর্ষণ শেষ হলে আমাদের বাহিনী চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। এ সময় শত্রুরাও প্রচণ্ড বেগে গুলীবর্ষণ শুরু করে। ফাঁড়ির ডান এবং বাম উভয় পার্শ্ব থেকেই একটি করে মেশিনগান আমাদের 'কোম্পানীকে' যথেষ্ট বিপাকে ফেলে দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে মাহফুজের একমাত্র অয়্যারলেস সেটটিও তখন বিকল হয়ে পড়ে। একটির বেশি দেবার মত মজুদ কোন সেট আমাদের ছিলো না। অয়্যারলেস সেট নষ্ট হতেই মাহফুজ তার প্লাটুনের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে এবং আমার ও মাহফুজের মধ্যকার সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই শুভপুর সেতুর দিক থেকে পাকিস্তানীদের কামানের গোলা আমাদের ওপর এসে পড়তে থাকে। এদিকে করেরহাট এলাকা থেকে আরো শত্রুসৈন্য দ্রুত চম্পক নগর এসে পৌঁছায়। কামানের গোলা, বিশেষ করে এয়ারবার্স্ট শেল বিস্ফোরণের ফলে আমাদের কোম্পানীর পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছিলো না। পাকিস্তানী মেশিনগানগুলোর সঠিক অবস্থান জানার জন্য আমি মাহফুজের সাথে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করি। অবস্থান জানতে পারলে ভারতীয় কামান থেকে মেশিনগানের ওপর গোলাবর্ষণ করা যেতো। আমাদের অবস্থান থেকে আমি কিংবা ভারতীয়

গোলন্দাজ পর্যবেক্ষক কেউই মেশিনগানগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম না। যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ায় আমদের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

এই পরিস্থিতিতে কোম্পানীকে আরো এগিয়ে যেতে বলা আত্মহত্যারই সামিল ছিলো।

বল্লভপুর এলাকাতেও আমাদের কোম্পানী কমাণ্ডারকে শুরুতেই থমকে পড়তে হয়। তার দুটি প্লাটুন লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, কিন্তু প্লাটুন কমাণ্ডারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তার হাতে কোন অয়্যারলেস সেট ছিলো না। প্লাটুন দুটির সন্ধান লাভের জন্য সে তখন বার্তা বাহক পাঠায়। তাদের খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো বটে, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। দিনের আলো ফুটে উঠতেই পাকিস্তানীরা আমাদের দেখে ফেলে এবং তাদের কামানগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে।

এই দুটি আক্রমণেই একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে আমরা সফল হতে পারিনি। কোম্পানী কমাণ্ডারদের যোগাযোগ রক্ষার জন্য আমার কাছে অয়্যারলেস সেট ছিলো অপ্রতুল আর প্লাটুন কমাণ্ডারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য কোম্পানী কমাণ্ডারদের কোন অয়্যারলেস সেট ছিল না। নিজের প্লাটুন গুলোর সাথে সুষ্ঠু সংযোগ না থাকলে কোন কোম্পানী কমাণ্ডারের পক্ষে রাতে এ ধরণের আক্রমণ চালানো বেশ অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

সাময়িকভাবে আমরা ব্যর্থ হলেও এ দুটো প্রচেষ্টায় আমরা বুঝতে পারি, যে আমাদের সেনারা যুদ্ধের জন্য উল্লেখযোগ্য দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। যথাযথভাবে পরিকল্পনা নেয়া হলে এবং যোগাযোগের সাজ সরঞ্জাম ও ভারী অস্ত্রের সাহায্য পাওয়া গেলে, আমাদের বিশ্বাস, নিশ্চয়ই আমরা জয়ী হতে পারবো।

যুদ্ধের তখন ছয় মাস চলছে। এ সময়ে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এগুলো পরোক্ষভাবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপর নতুন প্রভাব বিস্তার করে। ঘটনাগুলোর একটি হচ্ছে—ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিস্বাক্ষর। চুক্তি অনুযায়ী দু'দেশ কোন সংকট এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখে পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে বলে অঙ্গীকার করে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর আমাদের সাহায্য করার ব্যাপারে ভারত আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতের সরকার এবং জনগণ বুঝতে পারে, বাংলাদেশ প্রশ্নে তারা যে পদক্ষেপ নিয়েছে, সে ব্যাপারে এখন আর তারা একা নয়। অচিরেই এই প্রতিরক্ষা চুক্তির প্রভাব ভারতে এবং বাংলাদেশে, বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারত এতদিন পর্যন্ত খুব সন্তর্পণে এবং সাবধানে এগিয়ে চলছিলো।

চুক্তির পর আমাদেরকে সর্বাত্মক সাহায্যের ব্যাপারে তার সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে যায়।

এদিকে দুই পক্ষেই যুদ্ধ পরিকল্পনা আরো ব্যাপকতর হয়ে ওঠে। গেরিলা-দের মধ্যে যেন নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হয়। প্রতিদিনই সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার কাজ চলতে থাকে। প্রকাশ্য দিনের বেলাতেও হামলা ও অ্যাম্বুশ শুরু হয়ে যায়। ভারতীয় ও পাকিস্তানীদের উভয় পক্ষের কামানের গর্জনে সীমান্ত এলাকা হয়ে উঠে চরম উত্তেজনাময়।

এদিকে ২৮শে সেপ্টেম্বর নাগাল্যাণ্ডের ডিমাপুরে বাংলাদেশী পাইলটরা ট্রেনিং শুরু করে। গোড়াপত্তন হয় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর। প্রায় একই সময় পাকিস্তান নৌ-বাহিনী থেকে পালিয়ে আসা ৪৫ জন নৌ-সেনা নিয়ে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীরও গোড়া পত্তন হয়। সেপ্টেম্বরে দুটি নৌ-যানও আমরা সংগ্রহ করি। এম. ভি. পলাশ এবং এম. ভি. পদ্মা নামের জাহাজ দুটি ছিলো কলকাতা পোর্ট কমিশনারের। প্রায় ৩৮ লাখ টাকা খরচ করে এগুলোকে যুদ্ধের উপযোগী করে তোলা হয়। প্রতিটি নৌযানে দুটি করে ৪০ মিলিমিটার কামান (এল-৬০) বসানো হয়। অক্টোবরের মধ্যে দুটি জাহাজই অভিযান শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। "অপারেশন হট প্যাণ্টস" সাংকেতিক নামে শুরু হয় নতুন অভিযান, যার লক্ষ্য ছিলো খুলনা ও মঙ্গলা এলাকায় শত্রুপক্ষের নৌযানের ওপর আঘাত হানা এবং পশুর নদীর মোহনায় মাইন স্থাপন করা।

৩৩
হতবুদ্ধি ইয়াহিয়া

অক্টোবর থেকে আমরা গেরিলাদের তৎপরতা সম্পর্কে উৎসাহ ব্যঞ্জক খবর পেতে থাকি। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্দর দিয়ে পণ্য সামগ্রী বাইরে প্রেরণ এবং বাইরে থেকে সামরিক সরঞ্জাম ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে আসা অব্যাহত গতিতেই চলতে থাকে। বাইরের যে সব মালামাল আসতো সেগুলো আবার যথারীতি দেশের ভেতর বিভিন্ন গন্তব্য স্থলে পৌঁছে যাচ্ছিলো। নৌ-বাহিনীর ডুবুরীদের সাফল্যজনক তৎপরতা সত্ত্বেও নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে আমরা বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারিনি। বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে বেশ কতগুলো কারণে পাকিস্তান সরকার তার নৌ-যোগাযোগ মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে চালু রাখতে সমর্থ হয়েছিলো :

ক. বিদেশী শিপিং কোম্পানীগুলোকে পাকিস্তান সরকার যে কোন সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ দানের প্রস্তাব করেছিলো।

খ. আভ্যন্তরীণ নদীপথগুলোতে মোটামুটি ব্যাপকভাবে সশস্ত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ নৌ-যান গুলোর চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

গ. উপকূল এলাকা এবং সামুদ্রিক বন্দরগুলোতে গানবোটের তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়।

ঘ. শত্রুরা নৌ-কমাণ্ডারদের কার্যপদ্ধতি জেনে যাওয়ায় তারা পর্যাপ্ত রক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে আমরা বেশি করে নৌ-কমাণ্ডো নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেই। আমরা আরো যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি সেগুলো ছিলো ;

ক. আই, ডব্লিউ, টি. এ.-এর জাহাজ গুলোতে ক্রু হিসাবে গোপনে নৌ-কমাণ্ডো নিয়োগ করা হবে।

খ. নদীর তীর এবং সাগরের উপকূল থেকে সুবিধাজনক দূর পাল্লার হাতিয়ারের সাহায্যে নৌ-যান গুলোর ওপর সরাসরি আক্রমণ চালানো, এবং,

গ. এতদঞ্চলের আবহাওয়াগত কারণে সকাল সন্ধ্যায় সৃষ্ট মৌসুমী কুয়াশার

সুযোগ নিয়ে 'লিমপেট' মাইন দ্বারা পাকিস্তানী জাহাজ সমূহ ধ্বংস করা।

১২ই অক্টোবর ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষায় 'জাতীয় জীবনের এই ভয়াবহ মুহূর্তে' আল্লাহ এবং ইসলামের নামে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর পেছনে ঐক্যবদ্ধ হতে বললেন। বিরস, গম্ভীর এবং মদালস কণ্ঠে তিনি বললেন—

ক. পাকিস্তানের সমগ্র সীমান্ত বরাবর ভারত ব্যাপকভাবে সৈন্য সমাবেশ করেছে।

খ. ট্যাংক, গোলন্দাজ ইউনিট এবং বিমান বাহিনীকে পাক সীমান্তের কাছে এনে জড়ো করা হয়েছে (তাঁর জিজ্ঞাসা, 'এ সবের অর্থ কি ?') এবং

গ. চট্টগ্রাম এবং মঙ্গলা বন্দরে নৌ-বাহিনীর ডুবুরীদের হামলা হয়েছে। সড়ক, রেলপথ ও সেতু ধ্বংস করা হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে।[১৮]

ইয়াহিয়ার এই বক্তৃতার বিশেষ কয়েকটি দিক লক্ষণীয়। সব কিছুর জন্য তিনি বারবার ভারতকেই দোষারোপ করেছেন এবং সচেতনভাবে মুক্তিবাহিনীর কথা এড়িয়ে গেছেন।

এতে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, তিনি যুদ্ধ করার একটা অজুহাত খুঁজছেন। এক বদ্ধ উন্মাদ, যে মুক্তিবাহিনীর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, ক্রোধোন্মত্ত, তাঁর কথায় সেটাই প্রমাণিত হলো। ততদিনে আমরা তাকে আরো নির্মম আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছি।

জুলাই মাস থেকেই চট্টগ্রাম বন্দর এলাকার তেল সংরক্ষণাগারে একটা আক্রমণ চালানোর জন্য আমরা পরিকল্পনা করছিলাম। এ কাজের জন্য বিশেষভাবে বাছাই করা কয়েকটি ছেলেকে আলাদাভাবে ট্রেনিং দেয়া হয়। কিন্তু যথাযথ হাতিয়ার না পাওয়ায় অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। পাকিস্তানী বিমানের জন্য উচ্চ দাহ্য শক্তি সম্পন্ন জ্বালানী ভর্তি ট্যাংকগুলো ছিলো সংরক্ষণাগারটির প্রধান আকর্ষণ। ১৬ই অক্টোবর ট্রেনিং প্রাপ্ত গণ-পরিষদ সদস্য জনাব মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে বিশেষ দলকে উক্ত তেল সংরক্ষণাগারে আক্রমণ চালানোর জন্য পাঠানো হয়। আক্রমণের আগের রাতে শত্রুরা কিভাবে যেন শহরে গেরিলা দলের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। চট্টগ্রামে তাঁরা যেখানে উঠেছিলো পাকিস্তানীরা সে এলাকা ঘিরে ফেলে। সৌভাগ্য-ক্রমে একটি ড্রেনের ভেতর দিয়ে আমাদের পুরো দলটি আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু তাদের অস্ত্রশস্ত্র খোয়া যায়। ফলে আক্রমণের পরিকল্পনা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।

ওদিকে ইয়াহিয়া খান ভারত আক্রমণের একটি যথাযথ অজুহাত খুঁজছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে একটি মারাত্মক আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি করে বাংলাদেশের সমস্যা থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানো যাবে। তাঁর সমর অধিনায়করাও সে ধরণের একটি যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে সৈয়দপুরে এক জনসমাবেশে পাকিস্তানী ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের কমাণ্ডার লেঃ জেনারেল নিয়াজী ঘোষণা করলেন, উভয় ফ্রন্টেই পরবর্তী যুদ্ধ ভারতের মাটিতেই হবে।[৭৯] নিয়াজীর মুখ থেকে কথাটা বোধ হয় বেফাঁস বেরিয়ে পড়েছিলো—কারণ ইয়াহিয়া খান তখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে যুদ্ধের কথা বলেননি। কিন্তু না বললে কি হবে, ২০ এবং ২২শে অক্টোবর পাকিস্তানীরা সীমান্ত থেকে ভারতের পাঁচ মাইল অভ্যন্তরে কমলপুর গ্রামের ওপর গোলাবর্ষণ করলো। যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানী উস্কানিমূলক তৎপরতায় বহুসংখ্যক বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং আহত হলো। একদিন পর ২৩শে অক্টোবর পাক সেনা-বাহিনী পশ্চিম ফ্রন্টের সম্ভাব্য রণাঙ্গণগুলোতে সৈন্য সমাবেশ শুরু করে।

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী যুক্তরাষ্ট্র সহ পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে তিন সপ্তাহের সফরে বেরুলেন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে তিনি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে বোঝাতে চেষ্টা করে বললেন, বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচনে যে রায় দিয়েছে পাকিস্তান সরকার তা মেনে না নেয়া পর্যন্ত সারা উপ-মহাদেশে শান্তির আশা করা বৃথা।[৮০]

এইসব দেশের জনগণ আমাদের দুঃখ দুর্দশার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আমাদের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন জানালেও কয়েকটি দেশের সরকার আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে আশাব্যঞ্জক ভূমিকা পালন করেননি। লক্ষ কোটি বাঙালীর দুর্গতির প্রতি তাঁরা চরম উদাসীনতাই প্রকাশ করেছেন। তাদের মনোভাব দেখে সেই আপ্ত বাক্যের কথা মনে পড়ে। "লাখ লাখ মৃত্যু পরিসংখ্যানের কয়েকটি সংখ্যা মাত্র।" আসলে পাকিস্তানে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিলো এবং একারণেই তারা ইয়াহিয়া খানকে কখনো গণহত্যা বন্ধ করতে তো বলেনইনি, উপরন্তু তারা গোপনে আরো জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। জনগণ বুঝতে পেরেছিলো ইয়াহিয়া খান যতদিন সেইসব বিদেশী সরকারের রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণ করবেন ততোদিন তিনি একজন মানুষ মারুন অথবা লাখ লাখ মানুষ হত্যা করুন সে কারণে কেউ তাঁকে সমালোচনা করে অসন্তুষ্ট করবে না।

পাকিস্তানের অস্তিত্বই ছিলো ঐ সব শক্তির ওপর নির্ভরশীল। ঐ সব বৃহৎ শক্তি ইচ্ছা করলে একটা সমাধানের জন্য তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারতো

কিন্তু ইয়াহিয়াকে তারা কিছু বলেনি। ফলে কোন এক অদৃশ্য পশুশক্তির জোরে দিনদিন তার নৃশংসতা বেড়ে চলছিলো। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের প্রহসনও শুরু করে দিয়েছিলেন।

মোহমুক্ত মিসেস গান্ধী বিদেশ সফর শেষ করে দেশে ফিরলেন। তাঁর শান্তি-পূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। ফলে তাঁর সামনে সর্বশেষ এবং অবাঞ্ছিত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা রইলো না।

৩৪
অঘোষিত যুদ্ধ শুরু

বৃটিশ জাহাজ 'দি সিটি অব সেইণ্ট আলবান্‌স' হুগলী নদী দিয়ে চালনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। আবহাওয়া ছিলো চমৎকার। জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং ক্রুরা শংকিত ছিলো হয়তো। এর আগেই মুক্তিবাহিনী সকল দেশের জাহাজকে বাংলাদেশের বন্দর এলাকা থেকে দূরে থাকার জন্য হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলো। অন্যথায় গেরিলারা জাহাজ ডুবিয়ে দেবে, না হয় ধ্বংস করবে বলে ঘোষণা করেছিলো। পাকিস্তান সরকার জাহাজে করে বাংলাদেশে যাতে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র না আনতে পারে এবং এদেশের পাট, চা এবং অন্যান্য পণ্য বাইরে বিক্রি করে যাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে না পারে সে জন্যই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো।

তখন মধ্যরাত কেবল পেরিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর একটি গানবোট বৃটিশ জাহাজটির দিকে এগিয়ে গেলো। ঠিক ১টা ৩০ মিনিটে 'দি সিটি অব সেইণ্ট আলবান্‌স'-এ মুক্তিবাহিনীর গানবোট থেকে আক্রমণ চালানো হয়। জাহাজের ক্রুরা পরে স্বীকার করেছিলো 'দশ মিনিট ধরে যে কি তাণ্ডবলীলা চলেছিলো তার বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। কোন মতে জাহাজটি পেছনে ফিরে অতিকষ্টে আবার কলকাতার দিকে ফিরে যায়'।

১৬ই আগষ্ট রাতে মঙ্গলায় আরেকটি বিদেশী জাহাজ এম. এস. লাইটনিং লিমপেট মাইনে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এটি অবশ্য পরে মেরামত করা হয়েছিলো, কিন্তু নভেম্বরের দ্বিতীয় দফা হামলায় লাইটনিং জাহাজটি ডুবে যায়।[৮১]

নভেম্বর পর্যন্ত ৮৬০জন ট্রেনিং প্রাপ্ত নৌ-কমাণ্ডোকে হামলা চালাবার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিলো। এরা বিপুল সংখ্যক কোষ্টার, ট্যাংকার টাগ, বার্জ এবং বৃহদায়তন জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত অথবা নিমজ্জিত করেছিলো। বাংলাদেশের সব জায়গাতেই ছিলো নৌ-কমাণ্ডোদের অবাধ গতি। সাগরের প্রধান জাহাজ চলাচল পথের ৮টি বয়া ধ্বংস করে দেয়া হয়। ফলে দিনে জাহাজ চলাচল বাধাগ্রস্ত এবং রাতে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পশুর নদীর মোহনায় মুক্তিফৌজের

গানবোটগুলো মাইন ছড়িয়ে রাখে। তাই পাকিস্তানীদের নৌ-যোগাযোগ চরম ভাবে ব্যাহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের এই নৌ তৎপরতায় পাকিস্তানীদের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিলো ৪০ কোটি টাকারও বেশি।

নভেম্বর নাগাদ ভারতের তিনটি কোরের অধীনে সাতটি পদাতিক ডিভিশন যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কুন্তীগ্রামের ঘাঁটি পুনরায় চালু করা হয় এবং ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ইস্টার্ণ ফ্লীটকে সক্রিয় করা হয়। যে কোন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তাদের ব্যাপক পরিকল্পনা তখন চূড়ান্ত।

ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব ফ্রন্টে পাকিস্তানের সকল দুষ্কর্মের উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলো। এসময়ই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বেলুনিয়া পুনর্দখল করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। একই সঙ্গে অন্যান্য সেক্টরেও অনুরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বেলুনিয়ায় ৫ই নভেম্বর আক্রমণের (ডি-ডে) দিন নির্দ্ধারিত হয়।

কিন্তু ৪ঠা নভেম্বর এক মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা সকলেই বিচলিত হয়ে পড়ি। আমার অন্যতম সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন শামসুল হুদা সেদিন রাত সাড়ে ৮টায় মারা যান। বেলুনিয়া অভিযানে তিনটি কোম্পানীকে তাঁর নেতৃত্বে রাখার পরিকল্পনা ছিলো। অকুতোভয় যোদ্ধা হিসাবে সৈন্যরা তাঁকে ভালবাসতো, প্রশংসা করতো। আমি নিজেও বহুবার দেখেছি, কি নির্ভীক ভাবে রণাঙ্গনের অগ্রবর্তী এলাকায় সে দায়িত্ব পালন করছে। এরূপ একজন অফিসারকে দেখলাম তাঁর ক্যাম্পের মধ্যে পড়ে আছেন, প্রাণহীন নিস্পন্দ। জায়গায়টি রক্তে ভেসে গেছে, মাথার খুলী ছিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে চারদিকে ছড়ানো। কয়েক মিনিট আগেও সে তাঁর সৈন্যদের সাথে কথা বলেছে, পরের দিনের অভিযান সম্পর্কে কয়েকটি চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়েছে। যতদূর জানা যায়, বাড়ী থেকে তার খুব খারাপ খবর এসেছিলো। বিগত কয়েক মাস ধরে আমরা অনিশ্চয়তার মধ্যে যুদ্ধ করছিলাম। অনিশ্চয়তা ও হতাশায় মনোবল ঠিক রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো কিছু লোকের পক্ষে। আমার সেক্টরে বাড়ি ঘর নিয়ে কিংবা পরিবারিক কোন বিষয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলাম। খুবই নিষ্ঠুর আদেশ সন্দেহ নেই, কিন্তু সৈনিকগনের ওপর ক্ষতিকর আবেগ সৃষ্টি করতে পারে এমন ধরনের কথাবার্তা থেকে বিরত রাখার জন্যই এটা করতে হয়েছিলো। আমাদের দুর্ভাগ্য, ৪ঠা নভেম্বর রাত সোয়া ৮টার দিকে ক্যাপ্টেন শামসুল হুদাকে তাঁর বিছানায় বসে কি যেন চিন্তা করতে দেখা যায়। সীমাহীন এক অবসাদ তাঁকে পেয়ে বসেছিলো। এক সময় আপনার অজান্তেই সে স্টেনগান হাতে তুলে নিয়ে নলটি নিজের চিবুকে ঠেকায়। তারপর যন্ত্রচালিতের মতো ট্রিগার চালায়।

বেলুনিয়া অভিযান নিয়ে আমি তখন ভারতীয় ব্রিগেড কমাণ্ডারের সাথে আলোচনা করছিলাম। খবর পেয়ে প্রথম বিশ্বাসই করতে পারিনি। কিন্তু কঠিন বাস্তবতাকে এক সময় স্বীকার করে নিতেই হলো। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামীকালই অভিযান শুরু হবে। পুরো একটা জাতির ঘোর দুর্দিনে ব্যক্তি জীবনের ট্রাজেডীগুলো আমরা শুধু মনে মনেই রাখতে পেরেছি, আর কিছু করতে পারিনি সেদিন।

নিয়মিত পদাতিক বাহিনী এবং মিলিশিয়া নিয়ে বেলুনিয়ায় পাকিস্তানের শক্তি ছিলো দুই ব্যাটালিয়নের মতো। এক ব্যাটালিয়ন ছিলো উত্তরের অংশে এবং বাকি অংশ ছিলো দক্ষিণ ভাগে। শক্তিশালী বাংকার তৈরী করে এবং বেশ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে মাইন পেতে তারা অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। এ সমস্ত অবস্থান সম্পর্কে সন্ধান না নিয়ে আক্রমণ চালালে অহেতুক লোকক্ষয় হতে পারে। কোন ভাবে উত্তরের অংশের শত্রুদলকে বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, বিচ্ছিন্ন অংশে সাহায্য সহযোগিতা প্রেরণ বন্ধ করতে পারলে পাকিস্তানীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। আত্মসমর্পণ না করলেও কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের নির্মূল করা সম্ভব হবে। আমরা তাই সিদ্ধান্ত নেই, উত্তরের এবং দক্ষিণের এই দুই অংশের মাঝামাঝি কোন স্থানে অতি সন্তর্পনে রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে অবস্থান গ্রহণ করবো। ট্রেঞ্চ এবং বাংকার গড়ে তুলবো রাতারাতি। এবং পরদিন সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লেই পাকিস্তানীরা দেখতে পাবে তাদের উত্তরের অংশ দক্ষিণের বাহিনী থেকে রাতের অন্ধকারে হয়ে পড়েছে বিচ্ছিন্ন। মাঝখানে বসে আছে তাদের যমদূত—মুক্তিসেনারা।

নভেম্বরের ৪ তারিখ। অন্ধকার এবং শীতের রাত। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ক্যাম্প ছেড়ে বেলুনিয়া অভিযানে এগিয়ে চলে মুক্তিসেনাদের দল। সৈন্যদের দীর্ঘ-সারি যাত্রা শুরু করতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। বৃষ্টির সাথে বাতাসের বেগও বেড়ে যায়। হাড় কাঁপানো শীতে আমাদের ঠোঁট কাঁপছিল। আমরা পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কষ্ট হলেও বস্তুত আমাদের সুবিধেও ছিলো যথেষ্ট। আবহাওয়া খারাপ দেখে সে রাতে শত্রুদের টহলদাররা আর বাইরে বেরোয়নি। তারা ধারনাও করতে পারেনি যে এই রাতটিকেই আমরা বেছে নেবো। দমকা বাতাসের গর্জনে আমাদের চলাফেরা এবং ট্রেঞ্চ খোঁড়ার আওয়াজ তলিয়ে যাচ্ছিলো। ভোর হতে না হতেই আমাদের সবগুলো কোম্পানী যার যার জায়গায় পৌঁছে প্রতিরক্ষামূলক ট্রেঞ্চে অবস্থান গ্রহণ করে। আমরা তখন শীতে প্রায় জমে যাচ্ছিলাম। কিন্তু একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গিয়ে পরিষ্কার সূর্যালোক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

দেরী না করে আমরা নিকটবর্তী শরণার্থী শিবির এবং গ্রাম থেকে লোক নিয়ে মালসরঞ্জাম বহনের ব্যবস্থা করি। যানবাহন চলাচলের জন্য পাহাড় এবং ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে চার মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তার ব্যবস্থাও আমাদের করতে হয়। হাজার হাজার লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিনরাত কাজ করে চলে। তিন দিনের মাথায় রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের উপযোগী হয়ে ওঠে। আমাদের সাহায্য করার জন্য বেসামরিক লোকদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ লক্ষ্য করি। ফলে আমাদের মনোবল বেড়ে যায় বহুগুণ।

একজন অধ্যাপক বাংকারের জন্য সি. আই. সিটের বোঝা মাথায় বহন করেছেন। চার মাইল পথ অতিক্রম করে টিনগুলো যথাস্থানে নামিয়েই আবার তিনি পেছন ফিরে দৌড়ে গেছেন আরেক বোঝা আনতে। ছয় বছরের একটি ছেলেকে দিয়ে কোন কাজ করানো হবে না বলাতে সে সেদিন কেঁদে ফেলেছিলো।

আমাদের এই অবস্থান গ্রহণ করায় শত্রুর মধ্যে তেমন কোন ত্বরিত প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম না। তারা হয়তো ভেবেছিলো, এটাও মুক্তিফৌজের অ্যামবুশ ধরনের কিছু একটা হবে। তারা মুক্তিবাহিনীকে হটিয়ে দেয়ার জন্য একটি কোম্পানী পাঠায়। কিছুক্ষণের সংঘর্ষে ২৯ জন শত্রুসেনা নিহত হয় এবং অন্যরা উপায়ন্তর না দেখে পালিয়ে যায়। এমন কি তারা লাশগুলোও নিতে পারেনি। ৭ই নভেম্বর দুটি স্যাবর জেট সারাদিন আমাদের অবস্থানের ওপর স্ট্র্যাফিং করে। এতে আমাদের টিন বহনকারী এক জন বেসামরিক লোক নিহত হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, শত্রুরা তেমন ব্যাপক আকারে আমাদের আক্রমণ করতে আসছিলো না। তাছাড়া, উত্তর অংশে পাকিস্তানীদের আমরা যে ভাবে ঘিরে ফেলেছিলাম—সেখান থেকে তাদের মুক্ত করারও তেমন কোন চেষ্টাও করছিলোনা। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, পাকিস্তানীরা এতদিনের আক্রমণাত্মক ব্যবস্থার পরিবর্তে এখন আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। এ সময়ে বেলুনিয়ায় পাকিস্তানীদের একটি অয়্যারলেস বার্তা আমরা 'ইন্টারসেপ্ট' করি। সেটা ছিলো "বেলুনিয়া থেকে নিজেরাই পালাবার ব্যবস্থা করো"।

কয়েকজন শত্রুসেনা আমাদের ব্যূহ ভেদ করে পালাবার চেষ্টাও করেছিলো, কিন্তু তারা আমাদের গুলীতে নিহত হয়। ১১ই নভেম্বরের মধ্যে আমরা অবশিষ্ট শত্রুসেনাদের ধ্বংস করে ফেলি। বেশ কিছু পাকিস্তানী আমাদের হাতে বন্দী হয়।

যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দুর্ভাগ্যের কথা আমরা জানতে পারি। সর্বত্রই শত্রু সৈন্যদের একটা সাধারণ অভিযোগ ছিলো যে, অফিসাররা তাদের সাথে ফ্রন্ট লাইনে থাকতো না। শুধু গোলাবারুদ ছাড়া অন্য সবকিছুরই অভাব ছিলো। তাদের তিক্ত অভিযোগ: "এমনকি খাদ্যের

জন্যও আমাদেরই ব্যবস্থা করতে বলা হতো"। প্রতিটি সেক্টরে যুদ্ধবন্দীদের কাছে এবং মৃত সৈনিকদের পকেটে অনেক চিঠি পাওয়া গেছে। এগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের মা-বাবা এবং আত্মীয়স্বজনের কাছে লেখা। কিন্তু পাঠাতে পারেনি। এসব চিঠিতে তাদের করুণ অবস্থা এবং প্রতিটি স্তরে শৃঙ্খলার কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ার এক করুণ চিত্র পাওয়া যায়। এই ছিলো তাদের সাফল্য। মাসের পর মাস দস্যুবৃত্তি, পাশবিক অত্যাচার এবং যাবতীয় জঘন্য অপরাধের উপযুক্ত পুরস্কার। একজন সিপাই তার বাবাকে লিখেছে, "গতমাসে এগারোশত টাকা পাঠিয়েছি, বোধ হয় পেয়েছেন। দু'দিন যাবত অজ্ঞাত পরিচয় এক স্থান অভিমুখে আমরা চলেছি। গতকাল মুক্তিবাহিনীর হামলার মুখে পড়েছিলাম। এতে আমাদের প্লাটুনের দু'জন মারা গেছে। এর আগে খালের পানিতে পড়েও একজন মারা যায়। এখানে ভীষণ বৃষ্টি হয়। যেদিকে তাকাই সে দিকেই শুধু বড় বড় নদী আর পুকুর।

লোকজন ভয়ে আমাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না। গ্রাম থেকে আমরা খাবার সংগ্রহ করি, কিন্তু এর জন্য কোন দাম দেইনা। আমাদের অফিসাররাও কোন দাম দেয় না। আমরা এখন একটি গ্রামে বিশ্রাম নিচ্ছি। কাল সকালেই আবার রওয়ানা হতে হবে। রাতে চলাফেরা করতে পারিনা। এখানে অনেক মুক্তিফৌজ। আমি পশ্চিম পাকিস্তান বদলী হওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছি। আমার জন্য দোয়া করবেন।"

পরদিন ভোরেই মুক্তিবাহিনী এই প্লাটুনটি অ্যামবুশ করে। ফলে দলের আরো দশজন সৈন্য মারা যায়। নিহতদের একজনের পকেটেই চিঠিটি পাওয়া গিয়েছিলো।

আমরা বেলুনিয়া অভিযানের আয়োজন করেছিলাম ৪ঠা নভেম্বর। অর্থাৎ এই তারিখ থেকেই সীমিত এবং স্থানীয় পর্যায়ে হলেও, ভারতীয়রা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়।[৮২] আর ৫ই নভেম্বর শুরু হয়ে যায় ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যকার অঘোষিত যুদ্ধ।

৩৫
যুদ্ধ পরিকল্পনা

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই আমরা বেলুনিয়া থেকে শত্রু সেনাদের পুরোপুরি বিতাড়িত করি। পাকিস্তান রেডিও অবশ্য তখনো বেলুনিয়া তাদের দখলে আছে বলে সমানে প্রচার করে চলছিলো। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ একদিকে মিথ্যা প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলো অপরদিকে ঢাকা চট্টগ্রাম রোডের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ কেন্দ্র ফেনী থেকে ক্রমান্বয়ে তাদের সৈন্য সরিয়ে নিচ্ছিলো।

২১শে নভেম্বর ঢাকা থেকে এপি প্রতিনিধি একটি বার্তায় বলেন, পাকবাহিনীর এবং মুক্তিফৌজের মধ্যে মরণপণ লড়াই শুরু হয়েছে। এই লড়াইয়ে পাকিস্তানীদের যে শক্তি ক্ষয় হচ্ছে তাতে ভারতের সাথে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তারা যে কি করবে বোঝা যাচ্ছে না।[৮৩] ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য শহরে গেরিলাদের হামলায় পর্যুদস্ত পাকিস্তানীরা দিশেহারা। এ সময়ে মুক্তিফৌজ অন্তত সাতটি থানার ওপর আক্রমণ চালিয়ে থানাগুলোকে মুক্ত করেছে। দেশের অধিকাংশ স্থানে মুক্তিবাহিনী বিদ্যুৎ সরবরাহ চরমভাবে ব্যাহত করেছে। বন্দরে কাজ কর্ম বন্ধ। শিল্প কারখানার শ্রমিকরা যে যার বাড়ির পথ ধরেছে। বিস্তীর্ণ পল্লী অঞ্চল মুক্তিফৌজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। সেখানে তারা নিজেদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। রাজাকার এবং দালালদের বিচার শুরু হয়ে গেছে। মুক্তিফৌজের দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি এবং অভিযানের তীব্রতায় ইয়াহিয়া খান এবং নিয়াজী বেসামাল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাকিস্তানীরা বিতাড়িত হচ্ছিলো, প্রতি মুহূর্তে লোক ক্ষয়ের সংখ্যা বাড়ছিলো। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, পূর্ব পাকিস্তান শীঘ্রই হাতছাড়া হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আর এই আশংকা সত্য হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উৎকৃষ্ট কয়েকটি ডিভিশন তাদের হারাতে হবে দীর্ঘদিনের জন্য।

ইতিমধ্যে পাকিস্তান কয়েকবারই পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করে। পূর্ব ফ্রন্টে নিয়াজী দুঃসাহসী একটা কিছু করে তার সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা ২১শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের

রানাঘাটের নিকটবর্তী ভারতীয় বয়রা গ্রামে হামলা চালায়। ট্যাঙ্ক কামান ও জঙ্গী বিমান তাদের সহযোগিতা করেছিলো। এতে কয়েকজন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়। তবে বেশি মারা যায় বেসামরিক ব্যক্তিরাই। বিপুল সংখ্যক লোক আহতও হয়। "ভারতের মাটিতেই যুদ্ধ হবে" নিয়াজী বোধহয় তাঁর এই দম্ভের যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতীয় এলাকায় অনুপ্রবেশের অনুমতিও তিনি নিশ্চয়ই ইয়াহিয়ার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এর খেসারতও তাকে হাতে হাতে পেতে হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে তারা শুধু পেছনেই হটে আসেনা ১৩টি শেফি ট্যাংক এবং ৩টি স্যাবর জেটকে এই সীমিত যুদ্ধে হারিয়ে ফিরে আসতে হয় নিজ এলাকায়। দুজন পাকিস্তানী পাইলট বন্দী হয় ভারতের হাতে।

এসব উস্কানীতেও মিসেস গান্ধী ছিলেন স্থির। পাকিস্তানী কামানের গোলায় ভারতের বেসামরিক লোক হতাহত হচ্ছিলো। বিষয় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ছিলো প্রচুর। তা সত্ত্বেও ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। মিসেস গান্ধী অবশ্য আশা করছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত কয়েকটি বৃহৎ শক্তিবর্গের সুমতি হবে। তারা ইচ্ছা করলে ইয়াহিয়াকে দিয়ে বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধ করিয়ে সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান করাতে পারবেন।

২১শে নভেম্বর পাকিস্তান সমূহ বিপদ টের পেয়ে জাতিসংঘে এক নালিশ দায়ের করে বসে। তাদের বক্তব্য, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১২টি ডিভিশন পূর্ব পাকিস্তানের চারটি সেক্টরে আক্রমণ শুরু করেছে।[৮৪] একই দিন ইয়াহিয়া সারা পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা জারী করেন।[৮৫] এর চারদিন পর অর্থাৎ ২৫শে নভেম্বর পাকিস্তান সফররত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এক চীনা প্রতিনিধিদলের ভোজসভায় ইয়াহিয়া বক্তৃতাচ্ছলে জানিয়ে দেন যে, "হয়তো দিন দশেকের মধ্যে আমাকে আর এখানে না-ও পাওয়া যেতে পারে—কারণ আমাকে সম্ভবত যুদ্ধে যেতে হবে"।

২৭শে নভেম্বর পাকিস্তানী গোলন্দাজ বাহিনী পশ্চিম দিনাজপুরের ভারতীয় শহর বালুরঘাটের উপর প্রচণ্ড হামলা চালায়। কামানের গোলার ছত্রছায়ায় এক ব্রিগেড পাকসেনা হিলিতে ভারতীয় অবস্থানের ওপর আক্রমণ করে। পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে ট্যাংক বহরও ছিলো। প্রথম দফায় পাকিস্তানীদের ৮০ জন সৈন্য ও চারটি ট্যাংক ধ্বংস হয় এবং তাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়। পরের দিন দ্বিতীয় দফা হামলার সময় তিনটি পাকিস্তানী ট্যাংক আটক করা হয় এবং তাদের বহুসংখ্যক সৈন্য প্রাণ হারায়। ভারতীয় পক্ষের ক্ষয়ক্ষতিও ছিলো ব্যাপক। এবার ভারতীয়রা প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসে বিপুল শক্তিতে।

তারা আন্তর্জাতিক সীমারেখা পার হয়ে বাংলাদেশের ভেতরে কয়েক মাইল ঢুকে পড়ে। ভারত সরকার আগেই তার সৈন্যদের সীমান্ত এলাকায় সীমিত আকারে অভিযান পরিচালনার আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন। নির্দেশ ছিলো, সীমান্তের ওপার থেকে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার হুমকি দেখা দিলে সৈন্যরা তা নির্মূল করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে। ভারত তখন শুধু তার সীমান্ত রক্ষাই নয়, প্রয়োজন দেখা দিলে সমুচিত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যও পুরোপুরি প্রস্তুত।

পরিস্থিতি বিস্ফোরন্মুখ হয়ে উঠলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন প্রস্তাব দেন যে, ভারত এবং পাকিস্তান দুই পক্ষকেই সীমান্ত এলাকা থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। ইয়াহিয়া খান বাহ্যতঃ প্রস্তাবে সম্মতি জানান। অপরপক্ষে ভারত এই শর্তে সম্মত হয় যে, বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানকে তার সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। সকল সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর কার্যকলাপ এবং এদেরকে সরিয়ে নেয়া না হলে এই অঞ্চলে শান্তি আসবে না। এই সব প্রস্তাব এবং পাল্টা প্রস্তাব যখন আদান প্রদান হচ্ছিলো পাকিস্তান তখন পশ্চিম ফ্রন্টে রাতের অন্ধকারে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্থানে সৈন্য সমাবেশ করে। এ ঘটনা ১লা ও ২রা ডিসেম্বরের। ২রা ডিসেম্বরেই পাকিস্তান সংঘর্ষের বিস্তৃতি ঘটানোর অসৎ উদ্দেশ্যে মরিয়া হয়ে আগরতলার ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় গোলাবর্ষণ করে। এ দিন নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতাকালে মিসেস গান্ধী স্পষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "তথাকথিত বৃহৎ শক্তিবর্গ যেভাবে চাইবে সেভাবে কাজ করার দিন শেষ হয়ে গেছে। ভারতের স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আজ আমাদের কাজ করতে হবে।"

অক্টোবর মাসেই জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টরে পাকিস্তানীদের প্রথম যুদ্ধ প্রস্তুতি লক্ষ্য করা গিয়েছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানে সমর প্রস্তুতি এবং তৎসঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থার ক্রম-অবনতি এবং কোটি কোটি বাঙালীর চরম দুর্দশার প্রতি বৃহৎ শক্তিগুলোর উদাসীনতা লক্ষ্য করে ভারত সরকার তখনই তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে "সম্ভাব্য আপতকালের"—জন্য পুরোপুরি হুঁশিয়ার থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। "পাকিস্তান এর আগে তিনবার ভারত আক্রমণ করেছে"—সেকথা ইন্দিরা গান্ধী ভুলে যাননি।

ভারতের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধে পাকিস্তান পশ্চিম ফ্রন্টে প্রথম অভিযানেই রাজনৈতিক এবং রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যতদূর সম্ভব বেশি এলাকা দখল করে নেয়ার পরিকল্পনা করেছিলো। পাকিস্তানের মূল পরিকল্পনায় ছিলো, একটি সাঁজোয়া ডিভিশন এবং দুটি পদাতিক ডিভিশন এগিয়ে গিয়ে

ভারতের ওপর হামলা চালাবে। দরকার হলে আক্রমণকারী ডিভিশনগুলোর শক্তি বৃদ্ধির জন্য আরো পদাতিক ও সাজোয়া বাহিনীর সৈন্য পাঠানো হবে। পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত পাক সেনাবাহিনীর বাকি অংশের দায়িত্ব ছিলো সমস্ত সীমান্ত বরাবর ভারতীয় বাহিনীকে স্থানীয়ভাবে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে ব্যস্ত রাখা। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে অনেকগুলো প্রলুব্ধকারী হামলার পরিকল্পনাও করা হয়। পাকিস্তানীরা আশা করেছিলো এইসব প্রলুব্ধকারী হামলায় বিভ্রান্ত হয়ে ভারত তার সেনাবাহিনীকে বিশেষ করে সেনাবাহিনীর শক্তি-শালী 'রিজার্ভ' বাহিনীকে মূল রণাঙ্গন থেকে অন্য কোন ক্ষেত্রে নিয়োজিত করে ফেলবে; ফলে পাকিস্তানের মূল আক্রমণকারী বাহিনীর পক্ষে অতি সহজে এবং স্বল্প প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা এবং জয়লাভ করা সম্ভব হবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখে পাকিস্তান তার ১২ পদাতিক ডিভিশনের ওপর পুঞ্চ এলাকা দখল করার দায়িত্ব অর্পণ করে। পাকিস্তান আশা করেছিলো, পুঞ্চ এলাকায় হামলা চালালে জম্মু ও কাশ্মীরে অবস্থিত ভারতীয় বাহিনী এ এলাকাতে তীব্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে ফলে তারা আর চেনাব নদীর দক্ষিণে যাবার সুযোগ পাবে না। সেই ফাঁকে পাকিস্তান চেনাব নদীর দক্ষিণে তার মূল হামলা চালিয়ে সফল হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য, পাকিস্তানের এই ডিভি-শনটি কাশ্মীরেই অবস্থান করছিলো এবং এর অধিকাংশ সৈন্য কাশ্মীরেরই লোক। পাকিস্তান আরো পরিকল্পনা করেছিলো যে রাভী নদীর বরাবর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যূহ গঠন করে তারা নওশেরা-রাজৌরি এলাকা দখল করে ফেলবে। এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হলো গুজরাটে অবস্থিত ২৩ পদাতিক ডিভিশনকে।

১ নম্বর কোরের উপর দায়িত্ব দেয়া হলো সাকারগড় এলাকায় ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার। প্রলুব্ধকারী হামলা চালিয়ে ভারতীয় বাহিনীকে ঐ এলাকায় যুদ্ধে নামাবার পরিকল্পনা করা হয়। উদ্দেশ্য ছিলো আসল আক্রমণ এলাকা সম্পর্কে যেন ভারত কিছুই বুঝে উঠতে না পারে।

লাহোর এবং কাসুর-সোলেমানকি এলাকায় ৪ নম্বর কোরকে ইরাবতী এবং গ্রাণ্ডট্রাংক রোডের মধ্যবর্তী চান গানওয়ান নালা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল রক্ষা করার দায়িত্ব দেয়া হয়।

রহিম ইয়ার খান এবং করাচীসহ কচ্ছের রানের মধ্যবর্তী এলাকা রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয় ১৮ পদাতিক ডিভিশনের উপর।

ইয়াহিয়া খান চেয়েছিলেন, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ভূখণ্ড, বিশেষ করে জম্মু-কাশ্মীর সেক্টরের বেশ কিছু এলাকা প্রথমেই দখল করে ফেলতে। যুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের কোন জায়গা খোয়া গেলে ভবিষ্যতে তা উদ্ধারের

জন্য পশ্চিমাঞ্চলের এই দখলকৃত জায়গার বিনিময়েও তিনি দর কষাকষি করতে পারবেন, এই ছিলো তার আশা।

লক্ষ্য অর্জনের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে তাকে প্রথমেই আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিতে হবে এবং পূর্বাঞ্চলে জেনারেল নিয়াজীকে রাখা হবে আত্মরক্ষামূলক ভূমিকায়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী তার ইস্টার্ণ কমাণ্ড অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্য সীমিত সংখ্যক আক্রমণাত্মক অভিযানসহ প্রধানতঃ আত্মরক্ষামূলক তৎপরতার ভিত্তিতে একটি পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো। গুটি কয়েক আক্রমণাত্মক অভিযানের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো শুধু যুদ্ধটাকে ভারতের মাটিতে গড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে।

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী সীমান্ত রেখার যত কাছে অবস্থান নেয়া যায় ততদূর পর্যন্ত এলাকা নিয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়। ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার যতগুলো পথ রয়েছে সেই সবগুলো পথেই এই ধরণের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং যোগাযোগ কেন্দ্র যেমন—চট্টগ্রাম, ফেনী, লাকসাম, চাঁদপুর, কুমিল্লা, আখাউড়া, দাউদকান্দি, ভৈরব, ঢাকা, খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহ এবং বগুড়ার চারপাশে চূড়ান্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হয়। যে কোন মূল্যে ঢাকাকে রক্ষা করাই ছিলো পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

এই ধরণের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে পাল্টা আঘাত (কাউন্টার এ্যাটাক) হানার জন্যও প্রস্তুতি নেয়া হয়। পাকিস্তান ইস্টার্ণ কমাণ্ডের এই বিস্তারিত রণ-পরিকল্পনা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চীফ-অব-ষ্টাফ আগষ্টের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ সফরকালে অনুমোদন করেছিলেন। পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিলো মুক্তিযোদ্ধারা যাতে কোনো শহর দখল করে সেখানে সরকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারে। কারণ, এটা করতে পারলেই তারা বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করবে। পাকিস্তানীরা অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলোতে তিন থেকে চার সপ্তাহ চলার মতো গোলাবারুদ, রসদ পত্র রাখার এবং পশ্চাদবর্তী প্রতিরক্ষা অবস্থানসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণে রসদ রাখার ব্যবস্থাও করে। অগ্রবর্তী ঘাঁটি রক্ষা দুস্কর হয়ে পড়লে সেখান থেকে যোগাযোগ কেন্দ্র কিংবা গুরুত্বপূর্ণ শহরে পশ্চাদপসরণ করে সে সব স্থান রক্ষার জন্য লড়াই করে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়।

কয়েক মাস ধরেই পাক সেনাবাহিনী এইসব প্রতিরক্ষা ঘাঁটির সকল ব্যবস্থা নিয়ে বেশ তৎপর ছিলো। তারা হাজার হাজার কংক্রিটের বাংকার এবং

পিলবক্স নির্মাণ করে। ট্যাংক চলাচল ঠেকানোর জন্য সম্ভাব্য পথগুলোতে গভীর নালা কেটে রাখে।

এ ব্যাপারে পাকিস্তানীদের অর্থের কোন অভাব ছিলোনা। "শরণার্থী সাহায্য ও পুনর্বাসন কর্মসূচী"র নাম করে ইয়াহিয়া খান মোটা অংকের অর্থ যোগাড় করেছিলেন। আসলে ভারত থেকে তখনো কোন শরণার্থী ফিরে আসেনি। অল্পসংখ্যক যারা এসেছিলো তারাও সেনাবাহিনীর তথাকথিত অভ্যর্থনা কেন্দ্র দিয়ে ফিরে আসেনি। তারা যে পথে ভারত গিয়েছিলো সেই গোপন পথেই ফিরেছে। মাঝ থেকে শরণার্থীদের জন্য পাওয়া পুরো টাকাটাই প্রতিরক্ষা বাজেটের অংশ হিসাবে নিয়াজীর হাতে তুলে দেয়া হয়। বেলুনিয়ার একটি মাত্র ট্যাংক বিরোধী নালা তৈরী করতে পাকিস্তানীরা প্রায় ২০ লাখ টাকা খরচ করে।

অপরপক্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনী পশ্চিম ফ্রন্টে আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা এবং পূর্ব ফ্রন্টে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশকে মুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অবশ্য পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতীয় সেনাবাহিনী অনুকূল পরস্থিতির সুযোগে কোন কোন সেক্টরে পুরোপুরি আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যতদূর সম্ভব অগ্রসর হওয়ারও পরিকল্পনা করে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সামরিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো ছিলো নিম্নরূপ:

১. যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে (সর্বাধিক তিন সপ্তাহের ভেতরে) মুক্তি-ফৌজের সহযোগিতায় বাংলাদেশ স্বাধীন করা।

২. চীন দেশের দিক থেকে সম্ভাব্য হামলার বিরুদ্ধে ভারতের উত্তর সীমান্ত রক্ষা করা।

৩. আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতের সংহতি রক্ষা এবং

৪. নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর এবং মিজোরাম এলাকায় বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা দমন করা।

এই কাজগুলো মোটেই সহজসাধ্য ছিলো না। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি দ্রুত সৈন্য চলাচলের জন্য অনুপযুক্ত। দেশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে নদী নালা খাল বিল। এগুলোর জন্য যে কোন বাহিনীর অভিযাত্রা ব্যাহত হতে বাধ্য।

এইসব প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা অবস্থানের মূল্যায়ন করে বাংলাদেশকে মোটামুটি চারটি পৃথক সেক্টরে ভাগ করা হয়। এইসব সেক্টরে ভারত এবং পাকিস্তানীদের অবস্থান ছিলো নিম্নরূপ:

১. উত্তর পশ্চিম সেক্টর: যমুনার পশ্চিম এবং পদ্মার উত্তরের অঞ্চল এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। সেক্টরের আওতাধীন জেলাগুলো ছিলো রংপুর,

দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী এবং পাবনা। মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহের অধীনে পাকিস্তানের ১৬ ডিভিশন এই সেক্টরের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে ছিলো নাটোরে। এই সেক্টরে সর্বত্র এবং বিশেষ করে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, হিলি ও রংপুরে দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিলো।

পাকিস্তানী ১৬ ডিভিশনের মোকাবিলায় ভারত তার ৩৩ কোরের (লেঃ জেনারেল থাঁপা) অধীনে দু'টি মাউণ্টেন ডিভিশনকে নিয়োজিত করে। এই ডিভিশন গুলোর সহায়ক হিসাবে নিয়োজিত ছিলো ডিভিশনাল গোলন্দাজ বাহিনী, একটি মাঝারী ট্যাংক রেজিমেণ্ট এবং হালকা উভচর ট্যাংকের (পি. টি. ৭৬) আর একটি রেজিমেণ্ট। ভারতীয় ডিভিশনগুলো ছিলো : উত্তরে কুচবিহার জেলায় ৬ মাউণ্টেন ডিভিশন, বালুরঘাট এলাকায় ২০ মাউণ্টেন ডিভিশন এবং শিলিগুড়ি এলাকায় ৭১ ব্রিগেড। বাংলাদেশে অভিযানের দায়িত্ব পালন ছাড়াও ৩৩ কোরকে সিকিম ও ভুটানের মধ্য দিয়ে সম্ভাব্য চীনা আগ্রাসন প্রতিহত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো।

২. পশ্চিম সেক্টর : পদ্মার দক্ষিণ এবং পশ্চিম এলাকা নিয়ে গঠিত এই সেক্টরের জেলাগুলো হচ্ছে কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল এবং পটুয়াখালী। এই সেক্টরে মেজর জেনারেল এম. এইচ. আনসারীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের ৯ পদাতিক ডিভিশন মোতায়েন করা হয়। এই সেক্টরের হেড-কোয়ার্টার ছিলো যশোরে। পাকিস্তানী ৯ পদাতিক বাহিনীর মোকাবিলায় ভারতীয় পক্ষে ছিলো জেনারেল রায়না'র কমাণ্ডে নবগঠিত ২ কোর। এই কোরের আওতায় দু'টি ডিভিশন ছিলো : মেজর জেনারেল দলবীর সিং-এর নেতৃত্বে ৯ পদাতিক ডিভিশন এবং মেজর জেনারেল মহিন্দর সিং বারার-এর নেতৃত্বে ৪ মাউণ্টেন ডিভিশন। জেনারেল রায়নার সহায়তায় আরো ছিলো ২টি ট্যাংক রেজিমেণ্ট এবং ডিভিশনের সহায়ক গোলন্দাজ বাহিনী।

৩. উত্তর সেক্টর : এই সেক্টর গঠিত হয়েছিলো ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার কিছু অংশ নিয়ে। পাকিস্তানীদের পক্ষে এই সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার এ. কাদেরের নেতৃত্বে ৯৩ ব্রিগেড এবং এর আওতায় ৩১ বালুচ ও ৩৩ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, আধা সামরিক বাহিনী (নবগঠিত ইপি-সিএপি-এর দু'টি উইং), কয়েকটি মুজাহিদ ইউনিট এবং একটি মর্টার ব্যাটারী। এই এলাকার উত্তরাংশে পাকিস্তানীদের প্রধান শক্তি ছিলো লেঃ কর্ণেল সুলতান মাহমুদের নেতৃত্বে ৩১ বালুচ রেজিমেণ্ট। এদেরকে ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলে মোতায়ন করা হয়েছিলো। উল্লেখ্য যে, সুলতান মাহমুদই ছিলো সবচাইতে বেশি সংখ্যক বাঙালীকে হত্যার প্রধান হোতা। কমলপুর-বকশীগঞ্জ-জামালপুর এবং হাতিবান্ধা-

শেরপুর-জামালপুর বরাবর যে এলাকা রয়েছে তার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ছিলো এই রেজিমেণ্টের ওপর। এ ছাড়া ডালু-হালুয়াঘাট ময়মনসিংহ বরাবর এলাকার দায়িত্বও এরা পালন করতো।

এই সেক্টরের বিপরীতে ভারতীয় মেঘালয় এলাকায় ছিলো ১০১ কমুনিকেশন জোন। এই জোনের আওতাধীন ভারতীয় সৈন্যরা আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড এবং মিজোরামে দায়িত্ব পালনরত সৈন্যদের চলাচল ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করতো। এই এলাকায় ভারতীয়দের যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত না থাকায় বিরাট বাহিনীর পক্ষে এখানে দীর্ঘস্থায়ী তৎপরতা চালানো সম্ভব ছিলো না। তাই এই সেক্টরে ভারতীয় সৈন্য সংখ্যা ছিলো সীমিত। এলাকাটি প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় মেজর জেনারেল ওরবক্স সিং। তাঁর অধীনে ছিলো ব্রিগেডিয়ার হরদেব সিং ক্লেয়ার-এর নেতৃত্বে ৯৫ মাউণ্টেন ব্রিগেড গ্রুপ এবং ২৩ পদাতিক ডিভিশন থেকে আনীত একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন। এখানে ভারতীয় বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে টাঙ্গাইল এলাকার সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধারা।

৪. ইস্টার্ণ সেক্টর : মেঘনার পূর্ব-পার্শ্বের এলাকা নিয়ে গঠিত এই সেক্টরের জেলাগুলো হচ্ছে সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম। পাকিস্তান এই সেক্টরে তাদের ১৪ ডিভিশন এবং ৩৯ অস্থায়ী ডিভিশন মোতায়েন করেছিলো। মেজর জেনারেল আবদুল মজিদের নেতৃত্বে ১৪ ডিভিশনের সৈন্যরা কুমিল্লা পর্যন্ত এলাকার দায়িত্বে ছিলো। ২০২ ব্রিগেড সিলেট, ২৭ ব্রিগেড ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আখাউড়া, ১১৭ ব্রিগেড কুমিল্লা, ৩১৩ ব্রিগেড ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তরাঞ্চল ও মৌলবী বাজার এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো। ৫৩ পদাতিক ব্রিগেড ছিলো লাকসাম ও ফেনীর দায়িত্বে।

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এলাকার দায়িত্বে ছিলো পাকিস্তানের ৩৯ পদাতিক ডিভিশন। কমাণ্ডার ছিলেন মেজর জেনারেল রহিম খান।

ভারতের পক্ষে এই সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন লেঃ জেনারেল সগত সিং-এর নেতৃত্বাধীন ৪র্থ কোর। তাঁর অধীনে ছিলো মেজর জেনারেল কৃষ্ণরাও-এর ৮ম মাউণ্টেন ডিভিশন, মেজর জেনারেল গণযালভেস-এর ৫৭ মাউণ্টেন ডিভিশন এবং মেজর জেনারেল আর. ডি. হিরার অধীনে ২৩ মাউণ্টেন ডিভিশন। বাংলাদেশের ৮টি ব্যাটালিয়ন এবং আমাদের ১ থেকে ৫ নম্বর সেক্টরের সকল ট্রুপসকে সগত সিং-এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছিলো। অভিযান সংক্রান্ত দায়িত্ব ছাড়াও ৪র্থ কোরের ওপর আগরতলা শহর, বিমানঘাঁটি এবং ঐ এলাকায় বিমান বাহিনীর সকল প্রতিষ্ঠান রক্ষার ভার ছিলো।

প্রাথমিক অবস্থায় বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের ১৪ ডিভিশনে কেবল ৪টি পদাতিক ডিভিশন ছিলো। ২৮শে মার্চের মধ্যে ৯ এবং ১৬ ডিভিশন দুটি এখানে চলে আসে। এরপর বাংলাদেশে তারা আরো দুটি ডিভিশন গড়ে তোলে। এই দুটি ছিলো ৩৬ এবং ৩৯ অস্থায়ী ডিভিশন। ১৯৭১ এর অক্টোবরের মধ্যে পাকিস্তান এখানকার সবগুলো ডিভিশনের পুনর্গঠন কাজ সম্পন্ন করে। ডিভিশনগুলোর সাথে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ছিলো গোলন্দাজ ও ভারী মর্টার বহর এবং ট্যাঙ্ক বহর। আমেরিকান 'শেফি' ট্যাংক ছিলো ৬০টি। বিমান বাহিনীতে ছিলো ২০ খানি এফ-৮৬ স্যাবর জেট এবং নৌ-বাহিনীতে ছিলো অজ্ঞাত সংখ্যক গানবোট এবং অন্যান্য উপকূলীয় নৌ-যান।

ভারত এর মোকাবিলায় তার ৭টি পদাতিক ডিভিশনকে এই এলাকায় যুদ্ধ করার জন্য নিয়োজিত করে। পশ্চিম পাকিস্তানের ফ্রন্টে আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং চীন সীমান্তে সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সৈন্য নিয়োজিত করার পর বাংলাদেশে যুদ্ধ চালনার জন্য ভারতের হাতে এই ৭টি পদাতিক ডিভিশন ছাড়া আর কোন নিয়মিত ফোর্স ছিলোনা। এইগুলোর মধ্যে ৬টি ছিলো পূর্ণাঙ্গ ডিভিশন এবং ৩টি স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড। ডিভিশনগুলোকে যুদ্ধে পূর্ণ সহায়তা দেয়ার জন্য ছিলো হালকা এবং মাঝারী পাল্লার গোলন্দাজ বহর, পি. টি. ৭৬ ধরনের উভচর ট্যাংকের দুইটি রেজিমেণ্ট এবং টি.৫৪ ধরনের একটি ট্যাংক রেজিমেণ্ট। এ ছাড়াও ৩টি স্বতন্ত্র ট্যাংক স্কোয়াড্রন এবং ২টি দ্রুত চলাচল সক্ষম (মেকানাইজড্) ব্যাটালিয়নকে যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত করা হয়।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর ৭টি জঙ্গী এবং জঙ্গী বোমারু বিমানের স্কোয়াড্রন এই এলাকার জন্যে নিয়োজিত করা হয়। এ ছাড়া ছিলো সৈন্য পরিবহনের জন্য কিছু সংখ্যক হেলিকপ্টার। বিমানবাহী জাহাজ 'আই. এন. এস. ভীক্রান্ত' সহ ইস্টার্ণ ফ্লীট ছিলো এই অঞ্চলের সমুদ্রে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দী শক্তি। বাংলাদেশের উপকূলের অদূরবর্তী সমগ্র সাগর এলাকা অবরোধের দায়িত্ব ছিলো এই ইস্টার্ণ ফ্লীটের উপর ন্যস্ত। যুদ্ধ যদি শুরু হয় তাহলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমুদ্র পথে সৈন্য কিংবা সমর সরঞ্জাম নিয়ে আসা নিয়াজীর পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব হবে না।

এটা সাধারণ মাপকাঠি হিসাবে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত যে, কোন আক্রমণ পরিচালনা করে সফলতা অর্জন করতে হলে প্রতিটি আত্মরক্ষাকারী সৈনিকের বিরুদ্ধে তিন জন আক্রমণকারী নিয়োগ করতে হবে। পূর্বাঞ্চলে ভারত কিন্তু সেই অনুপাতে পাকিস্তানের চাইতে শক্তিশালী ছিলো না। অনুপাত যেখানে ৩:১ হওয়া দরকার'

সেখানে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনামূলক অনুপাত ছিলো ২:১। কিন্তু ইষ্টার্ণ কমাণ্ডার লেঃ জেনারেল অরোরা যে ৭টি ডিভিশন পেয়েছিলেন তার চাইতে বেশি সৈনিক পাওয়ার আর কোন আশাই করতে পারতেন না এবং এই বাহিনী দিয়েই তাঁকে তাঁর আরব্ধ কাজ সমাধা করতে হবে। এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

তবে জেনারেল অরোরার আস্থা ছিলো জয়ী তিনি হবেনই। বাংলাদেশের সমগ্র বাহিনী তাঁর সহযোগিতায় প্রস্তুত ছিলো। এরমধ্যে নিয়মিত ব্রিগেড-গুলো ছিলো কে-ফোর্স, এস-ফোর্স এবং জেড-ফোর্স। ৯টি সেক্টরের ২০ হাজার বাঙালী সেক্টর ট্রুপস্ অস্ত্র হাতে প্রস্তুত। এক লাখ গেরিলা সর্বত্র শত্রুকে তখন তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছিলো। সর্বশেষ এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য তৈরী হয়েছিলো। ইয়াহিয়া কিংবা নিয়াজীর জন্য তাদের অন্তরে করুণার লেশ মাত্র অবশিষ্ট ছিলো না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগেই বাঙালীদের এই ঘৃণা পাকিস্তানের পরাজয় একরূপ নিশ্চিত করে রেখেছিলো।

জনসাধারণের সমর্থনের ওপর ভিত্তি করেই প্রধানতঃ ভারতের বিজয় নিরূপণ করা হয়েছিলো। জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ ততোদিনে রাইফেল, এল. এম. জি., ষ্টেনগান ইত্যাদি চালানো কিংবা গ্রেনেড নিক্ষেপের কায়দা-কানুন শিখে ফেলেছিলো। শত্রুপক্ষের খবরা-খবর সংগ্রহ করা এবং প্রায় সকল ধরনের অস্ত্রের পরিচিতি সম্পর্কে তারা মোটামুটি অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলো। কোন্ অস্ত্রটি কোন্ দেশের তৈরী তাও অনেকে বলতে পারতো। আমার ২ নম্বর সাব-সেক্টরে আট বছরের একটি ছেলে প্রায় প্রতিটি টহলদার পার্টির সাথেই স্কাউট হিসাবে কাজ করতো। দিনের বেলা সে একাই চলে যেতো শত্রুর সবকিছু দেখে আসার জন্য। ফিল্ড ম্যাপের ওপর আঙ্গুল দিয়ে সে আমাদের বুঝাতো: "এই হচ্ছে বল্লভপুর গ্রাম, স্যার। আর এখানে আছে বড় একটা পুকুর। মেশিনগানটি বসানো আছে এইখানে। এই এলাকায় মাইন লাগানো আছে। কিন্তু আমি স্যার গরু বাছুর এখান দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছি—কিছুই হয়নি। তাই ওটা নিশ্চয়ই ভুয়া মাইনক্ষেত্র। এই যে এখানে একটি স্কুলবিল্ডিং, অফিসাররা এখানে থাকে।" এইভাবে যুদ্ধের এলাকার সবকিছু ছেলেটি আমাদের বুঝিয়ে দিতো।

বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে জেনারেল অরোরা তাঁর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছিলেন। প্রধান লক্ষ্য ছিলো, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢাকা মুক্ত করা। শত্রুর শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলো এড়িয়ে এবং যোগাযোগ

ও সরবরাহ লাইন দখল করে দ্রুত গতিতে ঢাকা দখল করাই ছিলো পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

ঢাকা একবার মুক্ত হয়ে গেলেই শত্রুর বিচ্ছিন্ন অবস্থানগুলো আপনা আপনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। তা না হলে অত্যন্ত ধীরে সুস্থে এই সব এড়িয়ে যাওয়া অবস্থানগুলোকে ধ্বংস করা যাবে।

প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ যুদ্ধের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে হলে এটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, ঢাকাকে আসল লক্ষ্য বস্তু হিসাবে যুদ্ধ চালাতে হবে এবং অন্যান্য লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করতে হবে প্রাকৃতিক সেক্টর হিসাবে আলাদাভাবে।

উত্তর পশ্চিম সেক্টরে বগুড়া ছিলো প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এই সেক্টরের সকল জায়গায় শত্রু সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে শেষ করতে হবে। তবে প্রধান অভিযান ঘোড়াঘাট ও গোবিন্দগঞ্জ হয়ে বগুড়া মুক্ত করার লক্ষ্যেই পরিচালিত হবে।

পশ্চিম সেক্টরে যশোর ছিলো প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র। ঝিনাইদহ-মাগুরা-ফরিদপুর হয়ে ঢাকার সাথে-এর সংযোগ। তাই ঝিনাইদহ এবং মাগুরা দখল করতে পারলে যশোরের পাকিস্তানীরা বিপাকে পড়বে এবং মিত্র বাহিনীর পক্ষে দ্রুত ঢাকা অভিমুখে যুদ্ধাভিযান চালানো সম্ভব হবে। তাই মূল হামলা ঝিনাইদহ-মাগুরা দখলের উদ্দেশ্যে পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্য যশোরের দিকে একটা আক্রমণ চালাবারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

উত্তর সেক্টরে মিত্র বাহিনীর একটি ব্রিগেডকে জামালপুর-টাঙ্গাইল সড়ক হয়ে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়।

পূর্ব সেক্টরে লক্ষ্য রাখতে হয়, ঢাকা যেন চট্টগ্রাম কিংবা কুমিল্লা থেকে কোন সাহায্য না পেতে পারে। মেঘনা নদী বরাবর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্থাৎ চাঁদপুর, দাউদকান্দি এবং আশুগঞ্জ দখল করতে পারলেই এই উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব। প্রথম অবস্থায় কুমিল্লা গ্যারিসন এড়িয়ে গেলেও চলবে।

ঢাকা মুক্ত করার লক্ষ্যে দাউদকান্দি থেকে ভৈরব পর্যন্ত মেঘনা নদীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং এর পর জামালপুর-টাঙ্গাইল অক্ষ বরাবর অগ্রসররত দলটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে রাজধানী অভিমুখে যুদ্ধাভিযান পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে পড়ে।

পশ্চিম সেক্টরের অগ্রসরমান কলামের জন্য গোয়ালন্দ ঘাট দিয়ে পদ্মা পার হওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। বিশাল এই নদীটি পার হওয়ায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আগে থাকতেই করে রাখতে হবে।

চট্টগ্রাম অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় আমার সঙ্গে নিজস্ব এক ব্রিগেড সেক্টর ট্রুপস ছাড়াও ভারতীয় ২টি বাহিনীর ব্যাটালিয়ন এবং বেঙ্গল রেজিমেণ্টের একটি ব্যাটালিয়ন ছিলো। এইসব সেনা নিয়ে গঠিত হয় বিচিত্র এক বাহিনী, যার নাম দেয়া হলো "কিলো ফোর্স"। আমাদের পথ ছিলো সবচাইতে দীর্ঘতম অথচ যানবাহনের সংখ্যা ছিলো সব চাইতে কম। ফিল্ড আর্টিলারী আমাদের সহায়তায় ছিলো বটে, তবে কোন ট্যাংক কিংবা অন্য কোন প্রকার সাহায্যকারী ইউনিট ছিলো না। এই সেক্টরে আমি ইতিমধ্যেই শত্রুর পশ্চাৎভাগে দুটি নিয়মিত কোম্পানীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার একটি কোম্পানী মীরেশ্বরাই এলাকায় এবং অন্যটি ফটিকছড়ি এলাকায় নিরাপদে ঘাঁটি স্থাপন করে বসেছিলো। সমগ্র বেলুনিয়া অঞ্চল বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই শত্রুমুক্ত হয়েছিলো। ফেনী মুক্ত করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ১৯৭১-এর ২রা ডিসেম্বরের কথা বলছি। পরের দিন মিসেস গান্ধী কলকাতায় এক জনসভায় বক্তৃতা দেবেন। আমরা অনেকেই আশা করছিলাম, এই সভায় হয়তো তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার কথা ঘোষণা করবেন।

৩৬

স্বাধীনতার চূড়ান্ত লড়াই

বেলুনিয়ায় আমার অগ্রবর্তী কমাণ্ড পোষ্টের দিকে জীপ চালিয়ে এগিয়ে যাই। ধূলায় আচ্ছন্ন পথ। দু'পাশে ফসলের সোনালী মাঠ। ধানকাটা মৌসুম এসে গেছে।

অন্যান্য দিনের মতই সূর্য ডুবে গেলো। তারপর সমস্ত এলাকা পূর্ণ চাঁদের আলোয় ভরে ওঠে। পথের পাশে একটা টহলদার দলকে ব্রিফিং দেয়া হচ্ছিলো। অল্পদূরেই আমাদের মেশিনগানের আওয়াজ শোনা যায়। ফাঁকে ফাঁকে পাকিস্তানীদের মেশিন গান, ... কখনও বা আর্টিলারী শেলিং শুরু হয়। সব কিছু নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ... বাংলাদেশের হয়তো সব ফ্রন্টেই তা ঘটছিলো প্রতিদিন।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধী সেদিন কলকাতায় এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিলেন। তাঁর নয়াদিল্লী ফিরে যাবার কোনো তাড়াহুড়োই ছিলোনা।

জেনারেল অরোরার ইষ্টার্ণ কমাণ্ড হেডকোয়ার্টারে আর একটা কর্মব্যস্ত দিনের অবসান ঘটলো। যেহেতু প্রধানমন্ত্রি রাজধানীর বাইরে—তাই ইষ্টার্ণ কমাণ্ডে কেউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত পাওয়ার আশা করছিলো না। ওদিকে ইয়াহিয়া খান তখন ইসলামাবাদে। "দশ দিনের মধ্যে যুদ্ধ" করার যে পূর্বাভাস তিনি দিয়েছিলেন তা শেষ হতে আরো দু'দিন বাকি।

ভারতের সমস্ত অগ্রবর্তী বিমান ঘাঁটি সমূহে যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিলো। তবে বিমান ঘাঁটি গুলোতে যুদ্ধের সবগুলো বিমান তখন পর্যন্ত পৌঁছেনি। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ইস্টার্ণ ফ্লীট এবং ওয়েস্টার্ণ ফ্লীট তখন পর্যন্ত শান্তিকালীন ঘাঁটিতেই অবস্থান করছিলো।

পাকিস্তানের বহুল প্রচারিত সাব মেরিন ৩১১ ফুট দীর্ঘ পি. এন. এস. গাজী এগিয়ে চললো ভারতের নৌ-ঘাঁটি বিশাখাপত্তমের দিকে। উদ্দেশ্য ছিলো ভারতের বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ ভীক্রান্ত-কে টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দেয়া। ৩রা ডিসেম্বর। শুক্রবার। ভারতীয় সময় বিকেল ৫টা ৪৭ মিনিটে পাকিস্তানী বিমান

বাহিনী অতর্কিতে ভারতের ৭টি বিমান ঘাঁটিতে একযোগে হামলা চালায়। রাত সাড়ে আটটায় জম্মু এবং কাশ্মীরের দক্ষিণ পশ্চিমে ছাম্ব এবং পুঞ্চ সেক্টরে ব্যাপক আক্রমণ অভিযান শুরু করে।

এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য ভারত পুরো প্রস্তুত ছিলো। মিসেস গান্ধী দ্রুত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ঐ রাতেই ১২টা ৩০ মিনিটে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষণে সকলকে চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য তৈরী হওয়ার আহ্বান জানালেন। ততোক্ষণে জেনারেল অরোরাও আক্রমণের নির্দেশ পেয়ে যান। ভারতীয় নৌ বাহিনী ইতিমধ্যেই সফল অভিযান শুরু করে দিয়েছিলো। বিশাখাপত্তম উপকূলের মাত্র কয়েক মাইল দূরে ভারতীয় ডেস্ট্রয়ার 'আই. এন. এস. রাজপুত' পাকিস্তানী সাবমেরিন গাজীর সন্ধান পেয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই 'রাজপুতের' ডেপথ-চার্জে পাকিস্তানের সবমেরিন গাজী টুকরো টুকরো হয়ে সাগর গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একই সঙ্গে অন্যদিকে ভারতীয় সেনা-বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করলো। ইষ্টার্ণ ফ্লীটও দ্রুত লক্ষ্যস্থল অভিমুখে অগ্রসর হলো। ভারতীয় বিমান বাহিনী কিছুক্ষণ আগে থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সবগুলো বিমান ঘাঁটি এবং রাডার কেন্দ্রের উপর আঘাত হেনে চলেছিলো। রাত ৩টায় ভারতীয় বিমানগুলো ঢাকা এবং কুমিটোলা বিমান ঘাঁটির উপর প্রথম হামলা শুরু করে। ইতিহাসের আর একটি মহান স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনা হলো।

যুদ্ধের প্রথম দিনে সকল রণাঙ্গনে পাকিস্তানীরা মরণপণ শক্তিতে আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলো। বেলা ১০টার মধ্যে 'ভীক্রান্ত' তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ৬টি 'সীহক' বিমান চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যস্থল গুলোতে আঘাত হানার জন্য ডেক থেকে উড়ে গেলো।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম সেক্টরে পাকিস্তানের ২৩ পদাতিক ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি) দিনাজপুর, সৈয়দপুর এবং রংপুর শহরে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলো। ইকবাল শফির হাতে আরো ছিলো ২৯ ক্যাভালরী রেজিমেণ্টের দুই স্কোয়াড্রন 'শেফি' ট্যাংক। পাকিস্তানের ২০৫ পদাতিক ব্রিগেডটি হিলির চারিদিকে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে অবস্থান করছিলো। এদের সহযোগিতায় ছিলো একটি ট্যাংক স্কোয়াড্রন এবং একটি ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেণ্ট। এই ব্রিগডের একটি ব্যাটালিয়ন পলাশবাড়ী, পীরগঞ্জ, গাইবান্ধা এবং বগুড়া এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। ৩৪ পদাতিক

ব্রিগেডের (ব্রিগেডিয়ার এন. এ. নঈম) একটি ব্যাটালিয়ন ছিলো পানিতলায়, একটি ছিলো নবাবগঞ্জে এবং অন্য আরেকটি ব্যাটালিয়ন ছিলো ঈশ্বরদীতে। ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার (১৬ ডিভিশন) বগুড়ায় শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলো।

ভারতের জন্য এই সেক্টরটি দুটি মারাত্মক আশংকার কারণ ছিলো। এই সেক্টরের পাকিস্তানী সৈন্যরা চেষ্টা করলে আসামের সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে সেক্টরের উত্তর পার্শ্বের এলাকাও দখল করে নিতে পারতো। দ্বিতীয়তঃ নেপাল ও ভুটানের মধ্যবর্তী 'করিডোর' হয়ে তিস্তা উপত্যকা বরাবর যে সব রাস্তা চীনের দিকে গিয়েছে সে গুলোর আরম্ভ হয়েছে ঠিক এই সেক্টরের উত্তর অঞ্চল থেকে। চীন যদি পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশে আসতো তাহলে সেটা হতো ভারতের জন্য খুবই বিপদের কারণ। এই উভয় আশংকা দূর করার জন্য ভারত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এলাকাটি দখল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো।

এখানে ভারতের পরিকল্পনা ছিলো, ৭১ মাউন্টেন ব্রিগেডকে পঞ্চগড়ের ভেতর দিয়ে ঠাকুরগাঁয়ের দিকে পরিচালনা করা। ২০ মাউন্টেন ডিভিশনের একটি ব্রিগেড দিনাজপুর হয়ে কান্তানগর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আত্রাই নদীর কাছে গিয়ে (যে স্থান থেকে একটি রাস্তা সৈয়দপুরের দিকে গিয়েছে) ৭১ মাউন্টেন ব্রিগেডের সাথে মিলিত হওয়ার পরিকল্পনা ছিলো। ২০ মাউন্টেন ডিভিশনের অন্য ব্রিগেডগুলো ফুলবাড়ী, পলাশবাড়ী এবং হিলি-গাইবান্ধা অক্ষ বরাবর অগ্রসর হয়ে পাঁচ দিনের মধ্যে ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, আত্রাই নদীর সেতু এবং পলাশবাড়ী মুক্ত করার পরিকল্পনা নেয়।

ভারতের ৩৩ কোরের প্রধান হামলা বালুরঘাট হয়ে হিলি অভিমুখে পরিচালিত হয়। কুঁচবিহার থেকে ৬ মাউন্টেন ডিভিশনের একটি ব্রিগেডও রংপুরের পথে অগ্রসর হয়।

ভারতের ৭১ মাউন্টেন ব্রিগেড পঞ্চগড় ও বোদা এলাকা মুক্ত করে ৬ই ডিসেম্বর কান্তানগর সেতুর কাছে পাকিস্তানী অবস্থানের সম্মুখীন হয়। পাকিস্তানীরা সেতুটি ধ্বংস করে দিয়ে পূর্ব তীরে শক্তিশালী ঘাঁটি গেড়ে বসেছিলো। তাই নদী পার হওয়ার চেষ্টায় ৭১ মাউন্টেন ব্রিগেডের বহু সৈন্য হতাহত হলো। বাধ্য হয়ে সরাসরি নদী পাড়ি দেয়ার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা ১০ মাইল উত্তরে সরে গিয়ে ধেপা নদী পার হয়ে দিক পরিবর্তন করে নীলফামারীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ২০ মাউন্টেন ডিভিশন হিলি-গাইবান্ধা অক্ষ বরাবর অগ্রসর হয়ে হিলিতে এসে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

বাংলাদেশ এবং ভারতের সীমান্ত রেখার ওপর অবস্থিত ছোট্ট শহর হিলি। উত্তর থেকে দক্ষিণ অভিমুখী বাংলাদেশের রেলওয়ে লাইন শহরটিকে প্রায় দুই ভাগে ভাগ করে রেখেছে। প্রধান শহরটি পড়েছে ভারতীয় অংশে এবং বাংলাদেশ অংশে রয়েছে রেলপথ, রেলওয়ে ষ্টেশন, কয়েকটি চালের কল, ছোট বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। হিলিতে এবং তার আশে পাশে কয়েকটি সীমান্ত ফাঁড়ি ছিলো। হিলি প্রতিরক্ষায় পাকিস্তানীদের মধ্যে ছিলো ৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ব্যাটালিয়ন। এদের সহযোগিতায় ছিলো একটি ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেণ্ট, একটি মর্টার বহর এবং এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক। পাকিস্তানীদের অবস্থান ছিলো খুবই শক্তিশালী। কামানের গোলাতেও তাদের বাংকারগুলোর ক্ষতি করা সম্ভব ছিলো না। এখানকার ঘাঁটি গড়ে তুলতে শত্রুরা পার্শ্ববর্তী জলাভূমিরও সুযোগ নিয়েছিলো। বিস্তীর্ণ এলাকায় তারা মাইনপেতে রেখেছিল। মাঝারী মেশিনগান এবং রিকয়েললেস রাইফেল ছিলো হিলি প্রতিরক্ষার প্রধান হাতিয়ার। তিরিশ দিনেরও বেশি সময় চলার মতো গোলাবারুদ এবং খাবারও পাকসেনারা মজুত করে রেখেছিলো।

ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ফরহাত ভাট্টির ২০২ মাউণ্টেন ব্রিগেড প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েও হিলির ঘাঁটি দখল করে উঠতে পারেনি। প্রথম আক্রমণে জলা-ভূমি ও ধানক্ষেতে ভারতীয় ট্যাংকগুলো আটকে যায়। ১১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত হিলির উপর অবিরাম আক্রমণ চলতে থাকে। ভারতীয় ব্রিগেড বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ চালিয়েও কৃতকার্য হতে পারেনি। প্রথম দুই দিনের যুদ্ধে ভারতের পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হয়।

এখানে ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে নিহত হয়েছিলো ৪ জন এবং আহত হন ৩ জন। জেসিও নিহত হয় ২ জন এবং অন্যান্য পদের ৬১ জন নিহত এবং ৮৫ জন আহত হয়। ভারতীয়রা পাকিস্তানীদের সুদৃঢ় ঘাঁটি দখলের জন্য সনাতন পদ্ধতিতে আক্রমণ চালায় বলেই এত অধিক লোক হতাহত হয়। হিলির যুদ্ধ ভারতীয়দের জন্য একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে। তাদের নেতৃস্থানীয় সমর নায়করা অধিক শক্তিশালী ঘাঁটির উপর এ ধরনের আক্রমণের অসারতা অনুধাবন করতে পেরে যুদ্ধের পরিকল্পনায় নতুন চিন্তা শুরু করেন। এর পর থেকে তারা এই ধরনের ঘাঁটি এড়িয়ে যাওয়ার কিংবা চারদিক থেকে ঘিরে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। নতুন পরিকল্পনায় শক্ত ঘাঁটি সমূহকে ঘিরে রাখার বা এড়িয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তারপর এই অবরুদ্ধ ঘাঁটিগুলোকে দীর্ঘ অবরোধের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা অনেক সহজ হবে।

পশ্চিম সেক্টরে ভারতের ২ কোরের সৈন্যরা কয়েকটি কলামে ভাগ হয়ে কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর এবং খুলনার দিকে অগ্রসর হয়। এর আগে মুক্তি-বাহিনী নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহেই চুয়াডাঙ্গার বেশ কিছুটা মুক্ত করে ফেলেছিলো। ভারতীয়দের আর একটি কলাম দর্শনা মেহেরপুরের দিকে অগ্রসর হয়। অন্য একটি দল 'চিতার বিলের' জলাভূমির ভেতর দিয়ে যশোর-ঝিনাইদহ সড়কের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। যশোর অভিমুখী মিত্র বাহিনীর প্রধান দলটি বয়রা এবং এর দক্ষিণ দিকের এলাকা থেকে যাত্রা শুরু করে।

উত্তর সেক্টরের ১০১ কম্যুনিকেশন জোনকে লড়াই শুরু হওয়ার ১৪ দিনের ভেতরে টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহে মোতায়েন পাকিস্তানীদের নির্মূল করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। এই এলাকায় পাকিস্তানী ৯৩ পদাতিক ব্রিগেড এবং এর অধীনস্থ অন্যান্য আধাসামরিক সৈন্যরা ছোট খাট যুদ্ধ করে ক্রমান্বয়ে ঢাকার দিকে পশ্চাদপসরণ করবে বলে অনুমান করা হয়েছিলো। মিত্র বাহিনীও তাই এদের ঢাকা ফেরার পথ বন্ধ করার পরিকল্পনা নেয়। পরিকল্পনা অনুসারে যথাসম্ভব শীঘ্র টাঙ্গাইল দখল করার উদ্যোগ নেয়া হয়। জামালপুর এবং ময়মনসিংহে সকল সড়ক যোগাযোগ টাঙ্গাইলের ভেতর দিয়ে হওয়ায় রণ-কৌশলের দিক থেকে টাঙ্গাইলের অবস্থান ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিত্র বাহিনী এই স্থানটির ওপর একবার পুরোপুরি দখল কায়েম করতে পারলে এদিককার শত্রুর পক্ষে আর ঢাকা পৌঁছানো সম্ভব হবে না। সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে টাঙ্গাইল দখল করার উপায় ছিলো ছত্রী সৈন্য নামিয়ে দ্রুত টাঙ্গাইল দখল করা। ছত্রী সেনাদের সহযোগিতার জন্য একই সঙ্গে উত্তর দিক থেকে মিত্র বাহিনীর স্থলপথে অগ্রসর হওয়াও প্রয়োজন ছিলো।

কিন্তু ভারতীয় ১০১ কম্যুনিকেশন জোনের প্রধান অংশটিকে প্রায় সীমান্ত রেখার ওপরে কামালপুরের যুদ্ধেই থেমে যেতে হয় কিছু সময়ের জন্য। এর আগে কামালপুরের ঘাঁটি ১ম বেঙ্গল রেজিমেণ্টের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলো। তখন আমাদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়। সর্বাত্মক লড়াই শুরু হওয়ার ফলে এবার কামালপুরের ওপর বিমান আক্রমণ চালানোর সুযোগ হয়।

এখানে প্রথম বিমান হামলা শুরু হয় ৪ঠা ডিসেম্বর বেলা প্রায় সাড়ে ৯টায়। এই দিন আরো দু'বার বিমান আক্রমণ চলে। বিমান আক্রমণে ঘায়েল হয়ে কামালপুরের শত্রুসেনারা ৪ঠা ডিসেম্বরই সন্ধ্যা ৭টায় আত্মসমর্পণ করে। ৫ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার এবং মেজর জেনারেল গীলের জীপ কামালপুর ফাঁড়ির নিকট ট্যাংক বিধ্বংসী মাইনে উড়ে গেলে তারা দু'জনেই গুরুতররূপে আহত হন। এরপর ১০১ কম্যুনিকেশন জোনের দায়িত্ব দেয়া হয় মেজর জেনারেল গন্ধর্ব নাগরার ওপর।

এদিকে ভারতের ১ম মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি গ্রুপ, ১৩ রাজপুতনা রাইফেলস্ ব্যাটালিয়ন গ্রুপ এবং কয়েকটি ফ্রিডম ফাইটার কোম্পানী বখশীগঞ্জের শক্তিশালী পাকিস্তানী ঘাঁটি এড়িয়ে দুটি ভিন্ন পথে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ৪ঠা ডিসেম্বর রাতে বখশীগঞ্জের ঘাঁটি রক্ষাকারী পাকিস্তানীরা তাদের অবস্থান ত্যাগ করে পেছনের দিকে পালিয়ে যায়। ৫ই ডিসেম্বর ভোর নাগাদ বখশীগঞ্জে যৌথ বাহিনীর পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরদিন সকালে ভারতের ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেড এবং মুক্তিবাহিনী পুনরায় তাদের যাত্রা শুরু করে। একটি ব্যাটালিয়ন গ্রুপ বখশীগঞ্জ জামালপুরের প্রধান অক্ষ বরাবর পলায়নপর পাকিস্তানীদের পশ্চাদ্ধাবন করে। ব্যাটালিয়নের অপর একটি গ্রুপ বখশীগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর অক্ষ বরাবর অগ্রসর হতে থাকে। তৃতীয় একটি ব্যাটালিয়ন শ্যামনগরের দিকে অগ্রসর হয় পায়ে হেঁটে। যানবাহন চলাচলের রাস্তা না থাকায় এদের ভারী জিনিসপত্র গরুর গাড়ীতে বহন করতে হয়। শ্যামনগরে মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় কলামের সামনে পড়বে ব্রহ্মপুত্র নদী। ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ দিকে অন্ততঃ পাঁচ মাইল চলার পর একস্থানে জামালপুর গ্যারিসনের সৈন্যদের পালানোর পথ বন্ধ করার জন্য গড়ে তুলতে হবে শক্তিশালী প্রতিবন্ধক। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে রাস্তা অবরুদ্ধ করার কাজ শেষ হওয়ার পরই জামালপুর গ্যারিসনের ওপর আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পূর্ব সেক্টর অর্থাৎ মেঘনার পূর্ব দিকের অঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্যদের ধ্বংস করার দায়িত্ব ভারতীয় ৪র্থ কোরের ওপর ন্যস্ত ছিলো। এই সেক্টরে প্রধান সড়ক পথে রণকৌশলগত প্রতিবন্ধকতা ছিলো দুটি স্থানে—ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং লাকসামে। ব্রাহ্মবাড়িয়া দখল করতে পারলে পূর্ব সেক্টরের সকল পাকিস্তানী সৈন্য বিশেষ করে সিলেট ও মৌলবী বাজারের সৈন্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। একই সঙ্গে লাকসাম আমাদের দখলে এলে কুমিল্লা গ্যারিসন চট্টগ্রাম ও ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। চাঁদপুর ও ফেনী দখলের দায়িত্বও ছিলো ৪র্থ কোরের উপর। যুদ্ধ শুরু হওয়ার ১০ দিনের মধ্যেই এই স্থান দু'টি দখল করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। একই সঙ্গে উত্তরে শমসেরনগর বিমান ঘাঁটি, মৌলবী বাজার এবং সিলেটও মুক্ত করার দায়িত্ব এই কোরের ওপর ছিলো। ৪র্থ কোরের প্রাথমিক পরিকল্পনায় ঢাকা মুক্ত করার পরিকল্পনা ছিলো না। সেই অনুসারে কোর কমাণ্ডার সগত সিং ৮ নং মাউন্টেন ডিভিশনকে শমসেরনগর বিমান ঘাঁটি, মৌলবীবাজার এবং সিলেট শহর মুক্ত করার নির্দেশ দেন। করিমগঞ্জের নিকট সীমান্ত অতিক্রম করে ৮ম মাউন্টেন ডিভিশনের একটি কলাম সিলেটের দিকে

এবং অন্য একটি মৌলবী বাজারের দিকে অগ্রসর হয়। শমসেরনগর বিমান ঘাঁটি মুক্ত হয় প্রথম দিনেই। পাকিস্তানীরা অবস্থা বেগতিক দেখে এই অঞ্চলের অধিকাংশ সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে।

এই কোরের ৫৭তম ডিভিশনকে আগরতলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পর আখাউড়া মুক্ত করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পথে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কুমিল্লা এবং ময়নামতি মুক্ত করার কাজে নিযুক্ত ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনকে সাহায্য করাও ৫৭ ডিভিশনের দায়িত্ব ছিলো। তারপর মেঘনা নদীর তীরে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র চাঁদপুর এবং দাউদকান্দি দখল করার লক্ষ্যে যুদ্ধাভিযান চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশও এই ডিভিশনকে দেয়া হয়।

২১শে নভেম্বর থেকে মুক্তিযোদ্ধারা আখাউড়ায় শত্রু অবস্থানের ওপর হামলা চালিয়ে আসছিলো। ভারতীয় ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশনের ২টি ব্রিগেড ৪ঠা ডিসেম্বর ভোরে দুই দিক থেকে আখাউড়ার ওপর আক্রমণ চালায়। বাংলাদেশ বাহিনীর একটি ব্যাটালিয়নও আক্রমণে অংশ নেয়। পাকিস্তানের ২৭ ব্রিগেড এই আক্রমণ তীব্রভাবে প্রতিরোধ করে চলে। ভারতের প্রত্যেকটি ব্রিগেডকে সাহায্য করছিলো একটি করে ট্যাংক স্কোয়াড্রন। ৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে আখাউড়া শত্রু মুক্ত হয়। মিত্র বাহিনী তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পথে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এই ব্রিগেড এগিয়ে গিয়ে দখল করবে ভৈরব যা ঢাকা-ময়মনসিংহ এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ জংশন।

আরো দক্ষিণে কুমিল্লা ও ময়নামতি-লালমাই হিল কমপ্লেক্স রক্ষা করার কাজে নিযুক্ত ছিলো পাকিস্তানীদের ১১৭ ব্রিগেড। ওদের ৫৩ ব্রিগেড ছিলো লাকসামের চতুর্দিক প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। এইসব প্রতিরক্ষামূলক ঘাঁটি ছিলো খুবই শক্তিশালী। গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র মজুতের পরিমাণও পর্যাপ্ত ছিলো। ভারতীয় কোর কমাণ্ডার লাকসামকে অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। তারপর তিনি লালমাই ঘাঁটি এড়িয়ে চাঁদপুর ও দাউদকান্দি অভিমুখে অগ্রসর হবেন। ভারতের ৬১ ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার টম পাণ্ডে) গোমতী নদী পার হয়ে ময়নামতি-কোম্পানীগঞ্জ সড়ক এবং ময়নামতি-দাউদকান্দি সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলার নির্দেশ পান। সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার পরই ৬১ ব্রিগেড ২৩ ডিভিশনকে ময়নামতি দখলের প্রচেষ্টায় সহায়তা করার জন্য এগিয়ে যাবে। ৬১ মাউন্টেন ব্রিগেড ৪র্থ কোর হেডকোয়ার্টারের সরাসরি কমাণ্ডে যুদ্ধ করে চলছিলো।

৭ই ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডের নেতৃত্বে মিত্র বাহিনী গোমতী পার হয়ে চান্দিনা এবং জাফরগঞ্জে অবস্থান গ্রহণ করে এবং সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

করে দেয়। একটি ট্যাংক বহরের সহায়তায় দুই কোম্পানী মুক্তিফৌজ এবং ভারতের ১৫ কুমায়ূন ব্যাটালিয়ন দাউদকান্দির গুরুত্বপূর্ণ ফেরীঘাট দখল করার জন্য ঝড়ের বেগে অগ্রসর হয়। পূর্ব সেক্টরে অন্যান্য স্থান থেকে সড়ক পথে ঢাকা যেতে হলে দাউদকান্দিতেই প্রথম এবং প্রশস্ততম ফেরী পার হতে হবে।

এই সেক্টরে আরো দক্ষিণে ফেনী শহর থেকে পাকিস্তানীরা এক সময় সন্তর্পণে পালিয়ে যায়। সাথে সাথে আমার বাহিনী শহরটিতে প্রবেশ করে। ফেনী আমাদের হাতে চলে আসায় চট্টগ্রামে পাকিস্তানীদের সঙ্গে দেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ সময় কুমিল্লা ও লাকসাম এলাকায় প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়।

মিত্র বাহিনী যুদ্ধের প্রথম দু'দিনে উত্তর পশ্চিম সেক্টরে শত্রু মুক্ত করেছিলো পীরগঞ্জ, খানপুর, হাতিবান্ধা, পঞ্চগড়, বোদা, চরকাই, ফুলবাড়ী, নবাবগঞ্জ এবং কাঞ্চনদহ। পশ্চিম সেক্টরে অগ্রসরমান মিত্র বাহিনীর আক্রমণে ঝিকরগাছাও মুক্ত হয় এবং এই বাহিনীর মধ্যবর্তী অংশটি যশোর-ঝিনাইদহ সড়ক দখলের জন্য আক্রমণ চালায়। ফলে পাকিস্তানী ৯ ডিভিশনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ভাঙ্গন ধরে। ভারতীয়দের সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী জীবননগর ও দর্শনা মুক্ত করেছিলো। কোর্ট চাঁদপুর মুক্ত হয় ৫ই ডিসেম্বর। প্রথম দু'দিনের যুদ্ধে আরো মুক্ত হয়েছিলো সিলেট এলাকার মুন্সীনগর, শমসেরনগর বিমান ঘাঁটি এলাকা প্রভৃতি। আখাউড়া মুক্ত করে পাকিস্তানীদের সেখান থেকে সম্পূর্ণভাবে হটিয়ে দেয়া হয়। পাকিস্তানীদের ২৭ ব্রিগেড এখান থেকে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়।

উত্তর সেক্টরের কামালপুর ৪ঠা ডিসেম্বর এবং বখশীগঞ্জ মুক্ত হয় ৫ই ডিসেম্বর। এ সময় মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি কলাম ময়মনসিংহ ও জামালপুরের শত্রু ঘাঁটিগুলো বিচ্ছিন্ন করার এবং টাঙ্গাইলের যোগাযোগ কেন্দ্র মুক্ত করার লক্ষে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলো।

আমার সেক্টরে ফেণী এবং বেলুনিয়া এলাকা সম্পূর্ণভাবে শত্রুমুক্ত হওয়ার পর পাকিস্তানীরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে লাকসামের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এটাই হচ্ছে একমাত্র এলাকা (অর্থাৎ চট্টগ্রাম সেক্টর) যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোন নিয়মিত পুরো ব্রিগেড যুদ্ধে নিয়োজিত হয়নি। এখানে অভিযান চলেছে প্রধানত আমার তিন ব্যাটালিয়ন সেক্টর ট্রুপস্ (যার মধ্য থেকে ২ কোম্পানী ইতিপূর্বেই চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে প্রেরণ করা হয়েছিলো) এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুটি ব্যাটালিয়নের শক্তির ওপর নির্ভর করে।

যুদ্ধের প্রথম দুদিনের মধ্যে বাংলাদেশে পাকিস্তান বিমান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। বাংলার মানুষ যুদ্ধের প্রথম দিন কিছুটা বিমান যুদ্ধ উপভোগ

করতে পেরেছিলো, বিশেষ করে ঢাকার আকাশে। কিন্তু যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন থেকেই আকাশ-যুদ্ধ হয় সম্পূর্ণ একতরফা এবং ফলে তা প্রাণহীন হয়ে পড়ে। তবে ভারতীয় বিমানের আক্রমণে যখন একটার পর একটা পাকিস্তানী বিমানে আগুন লেগে যায়, তারপর বিধ্বস্ত হয়ে আছড়ে পড়ে মাটিতে, তখন বাংলার মানুষ হয়ে ওঠে হর্ষোৎফুল্ল। নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ হত্যাতেই ছিলো পাকিস্তানীদের বাহাদুরী, আর যুদ্ধের মাঠে ওরা পালাতেও ওস্তাদ। তাই নিরীহ অত্যাচারিত বাংলার মানুষ খুনী পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাজয়ে নিঃসন্দেহে খুশি। খুশি হয়েছিলো সমস্ত পৃথিবীর মানুষ। বীরকে মানুষ শ্রদ্ধা করে খুনী কাপুরুষকে সবাই ঘৃণা করে। তবে শুধু যে পাকিস্তানীদের বিমানগুলিই ধ্বংস হয়েছিলো তাই নয়, সমস্ত রানওয়ে এবং বিমান ঘাঁটির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করাও হয়েছিলো। আর পাকিস্তানীরা যাতে কোন রানওয়ে মেরামত করে তুলতে না পারে সে জন্যও বিমান আক্রমণ অব্যাহত রাখা হয়। নিয়াজীর হাতে অবশিষ্ট যে দু'একখানা বিমান ছিলো সেগুলোর আর উড়বার ক্ষমতা ছিলো না।

ভারতীয় নৌ-বাহিনীর জাহাজগুলো খুলনা, চালনা, ও মঙ্গলার ওপর আঘাত হানতে থাকে। ভিক্রান্ত এর বিমানগুলো সর্বত্র শত্রুর গানবোট এবং অন্যান্য জাহাজ তাড়িয়ে দিয়ে ফিরছিলো। সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুই তাদের শ্যেণদৃষ্টি এড়াতে পারছিলো না।

প্রথম দুদিনের যুদ্ধে স্থলভাগে অবশ্য যৌথ বাহিনী খুব বড় ধরনের সুবিধা করে উঠতে পারেনি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের মধ্যে তারা দশ থেকে পনের মাইলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো।

ওদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেণ্টাগনের সমর বিশেষজ্ঞরা নিশ্চয়ই চুপ করে বসে ছিলেন না। যুদ্ধের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তারা ভবিষ্যৎ ফলাফলও বুঝতে পেরেছিলেন যে ইয়াহিয়া খানের ধ্বংস এবং পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিশেষ উদ্যোগে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী অধিবেশন ডাকা হলো। তারিখটি ছিলো ৫ই ডিসেম্বর। এই অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন সঙ্গে সঙ্গে ভেটো দিয়ে বসে। বাংলাদেশের কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষকে মুক্ত করার জন্য যৌথবাহিনী যুদ্ধ করছে, জানত সোভিয়েট ইউনিয়ন এই যুদ্ধ থামানোর কোন প্রচেষ্টা সমর্থন করতে পারেনা। অপর দিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইয়াহিয়া খানকে উদ্ধার করতে আগ্রহী, তাকে তো মিত্রবাহিনীর হাতে ধ্বংস হতে দিতে পারেনা।

পরদিন ৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করেন। পাকিস্তান

করে দেয়। একটি ট্যাংক বহরের সহায়তায় দুই কোম্পানী মুক্তিফৌজ এবং ভারতের ১৫ কুমায়ূন ব্যাটালিয়ন দাউদকান্দির গুরুত্বপূর্ণ ফেরীঘাট দখল করার জন্য ঝড়ের বেগে অগ্রসর হয়। পূর্ব সেক্টরে অন্যান্য স্থান থেকে সড়ক পথে ঢাকা যেতে হলে দাউদকান্দিতেই প্রথম এবং প্রশস্ততম ফেরী পার হতে হবে।

এই সেক্টরে আরো দক্ষিণে ফেনী শহর থেকে পাকিস্তানীরা এক সময় সন্তর্পণে পালিয়ে যায়। সাথে সাথে আমার বাহিনী শহরটিতে প্রবেশ করে। ফেনী আমাদের হাতে চলে আসায় চট্টগ্রামে পাকিস্তানীদের সঙ্গে দেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ সময় কুমিল্লা ও লাকসাম এলাকায় প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়।

মিত্র বাহিনী যুদ্ধের প্রথম দু'দিনে উত্তর পশ্চিম সেক্টরে শত্রু মুক্ত করেছিলো পীরগঞ্জ, খানপুর, হাতিবান্ধা, পঞ্চগড়, বোদা, চরকাই, ফুলবাড়ী, নবাবগঞ্জ এবং কাঞ্চনদহ। পশ্চিম সেক্টরে অগ্রসরমান মিত্র বাহিনীর আক্রমণে ঝিকরগাছাও মুক্ত হয় এবং এই বাহিনীর মধ্যবর্তী অংশটি যশোর-ঝিনাইদহ সড়ক দখলের জন্য আক্রমণ চালায়। ফলে পাকিস্তানী ৯ ডিভিশনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ভাঙ্গন ধরে। ভারতীয়দের সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী জীবননগর ও দর্শনা মুক্ত করেছিলো। কোর্ট চাঁদপুর মুক্ত হয় ৫ই ডিসেম্বর। প্রথম দু'দিনের যুদ্ধে আরো মুক্ত হয়েছিলো সিলেট এলাকার মুন্সীনগর, শমসেরনগর বিমান ঘাঁটি এলাকা প্রভৃতি। আখাউড়া মুক্ত করে পাকিস্তানীদের সেখান থেকে সম্পূর্ণভাবে হটিয়ে দেয়া হয়। পাকিস্তানীদের ২৭ ব্রিগেড এখান থেকে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়।

উত্তর সেক্টরের কামালপুর ৪ঠা ডিসেম্বর এবং বখশীগঞ্জ মুক্ত হয় ৫ই ডিসেম্বর। এ সময় মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি কলাম ময়মনসিংহ ও জামালপুরের শত্রু ঘাঁটিগুলো বিচ্ছিন্ন করার এবং টাঙ্গাইলের যোগাযোগ কেন্দ্র মুক্ত করার লক্ষে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলো।

আমার সেক্টরে ফেণী এবং বেলুনিয়া এলাকা সম্পূর্ণভাবে শত্রুমুক্ত হওয়ার পর পাকিস্তানীরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে লাকসামের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এটাই হচ্ছে একমাত্র এলাকা (অর্থাৎ চট্টগ্রাম সেক্টর) যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোন নিয়মিত পুরো ব্রিগেড যুদ্ধে নিয়োজিত হয়নি। এখানে অভিযান চলেছে প্রধানত আমার তিন ব্যাটালিয়ন সেক্টর ট্রুপস্ (যার মধ্য থেকে ২ কোম্পানী ইতিপূর্বেই চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে প্রেরণ করা হয়েছিলো) এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুটি ব্যাটালিয়নের শক্তির ওপর নির্ভর করে।

যুদ্ধের প্রথম দুদিনের মধ্যে বাংলাদেশে পাকিস্তান বিমান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। বাংলার মানুষ যুদ্ধের প্রথম দিন কিছুটা বিমান যুদ্ধ উপভোগ

করতে পেরেছিলো, বিশেষ করে ঢাকার আকাশে। কিন্তু যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন থেকেই আকাশ-যুদ্ধ হয় সম্পূর্ণ একতরফা এবং ফলে তা প্রাণহীন হয়ে পড়ে। তবে ভারতীয় বিমানের আক্রমণে যখন একটার পর একটা পাকিস্তানী বিমানে আগুন লেগে যায়, তারপর বিধ্বস্ত হয়ে আছড়ে পড়ে মাটিতে, তখন বাংলার মানুষ হয়ে ওঠে হর্ষোৎফুল্ল। নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ হত্যাতেই ছিলো পাকিস্তানীদের বাহাদুরী, আর যুদ্ধের মাঠে ওরা পালাতেও ওস্তাদ। তাই নিরীহ অত্যাচারিত বাংলার মানুষ খুনী পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাজয়ে নিঃসন্দেহে খুশি। খুশি হয়েছিলো সমস্ত পৃথিবীর মানুষ। বীরকে মানুষ শ্রদ্ধা করে খুনী কাপুরুষকে সবাই ঘৃণা করে। তবে শুধু যে পাকিস্তানীদের বিমানগুলিই ধ্বংস হয়েছিলো তাই নয়, সমস্ত রানওয়ে এবং বিমান ঘাঁটির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করাও হয়েছিলো। আর পাকিস্তানীরা যাতে কোন রানওয়ে মেরামত করে তুলতে না পারে সে জন্যও বিমান আক্রমণ অব্যাহত রাখা হয়। নিয়াজীর হাতে অবশিষ্ট যে দু'একখানা বিমান ছিলো সেগুলোর আর উড়বার ক্ষমতা ছিলো না।

ভারতীয় নৌ-বাহিনীর জাহাজগুলো খুলনা, চালনা, ও মঙ্গলার ওপর আঘাত হানতে থাকে। ভিক্রান্ত এর বিমানগুলো সর্বত্র শত্রুর গানবোট এবং অন্যান্য জাহাজ তাড়িয়ে দিয়ে ফিরছিলো। সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুই তাদের শ্যেণদৃষ্টি এড়াতে পারছিলো না।

প্রথম দুদিনের যুদ্ধে স্থলভাগে অবশ্য যৌথ বাহিনী খুব বড় ধরনের সুবিধা করে উঠতে পারেনি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের মধ্যে তারা দশ থেকে পনের মাইলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো।

ওদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেণ্টাগনের সমর বিশেষজ্ঞরা নিশ্চয়ই চুপ করে বসে ছিলেন না। যুদ্ধের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তারা ভবিষ্যৎ ফলাফলও বুঝতে পেরেছিলেন যে ইয়াহিয়া খানের ধ্বংস এবং পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিশেষ উদ্যোগে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী অধিবেশন ডাকা হলো। তারিখটি ছিলো ৫ই ডিসেম্বর। এই অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন সঙ্গে সঙ্গে ভেটো দিয়ে বসে। বাংলাদেশের কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষকে মুক্ত করার জন্য যৌথবাহিনী যুদ্ধ করছে, জানত সোভিয়েট ইউনিয়ন এই যুদ্ধ থামানোর কোন প্রচেষ্টা সমর্থন করতে পারেনা। অপর দিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইয়াহিয়া খানকে উদ্ধার করতে আগ্রহী, তাকে তো মিত্রবাহিনীর হাতে ধ্বংস হতে দিতে পারেনা।

পরদিন ৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করেন। পাকিস্তান

সংগে সংগে ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ভারতে সকল প্রকার মার্কিন অর্থনৈতিক সহযোগিতাও বন্ধ হয়ে যায়। আমেরিকার ৭ম নৌবহর ছিল দক্ষিণ চীন সাগরে—উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত। তাকে সতর্ক করে দিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু রণাঙ্গনে ততোক্ষণে পাকিস্তানী সৈন্যদের পলায়ন পর্ব শুরু হয়ে গেছে।

৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে পাকিস্তানীদের জন্য পরিস্থিতি অনিবার্য পরিনতির দিকে মোড় নেয়। নিয়াজী দিশেহারা হয়ে পড়েন। অধিকাংশ এলাকা থেকেই তাঁর বাহিনী তখন পিঠটান দিতে আরম্ভ করেছে।

এদিকে উত্তর-পশ্চিম সেক্টরে মিত্র বাহিনী তিস্তা নদী বরাবর লালমনিরহাট মুক্ত করে ফেলেছে।

হিলিতে ভারতের ২০তম ডিভিশন একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছিলো। হিলির যুদ্ধের জন্য কিছু সংখ্যক সৈন্য রেখে দিয়ে ডিভিশনের বাকি সৈন্যরা পলাশবাড়ী অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। উদ্দেশ্য, সেখান থেকে তারা দক্ষিণ মোড় নিয়ে বগুড়া মুক্ত করবে। এই সেক্টরে ভারতীয় বাহিনী কিছুটা সমস্যারও সম্মুখীন হয়। ফুলবাড়ী এবং চরকাইয়ের দিকে যাওয়ার পথে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যবাহী সাজোয়া যানবাহন (এ. পি. সি.) মাটিতে আটকে যায়। এর ফলে শুরুতেই অভিযানের প্রায় ২৪ ঘণ্টা বিলম্ব ঘটে। ভারতের ডিভিশন কমাণ্ডার তার একটি ব্রিগেডকে পীরগঞ্জ মুক্ত করার জন্য অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। পীরগঞ্জ মুক্ত করার পর এরা সেখানকার রাস্তা বন্ধ করে দেবে যাতে রংপুর এবং দিনাজপুরের পাক সৈন্যরা বগুড়া এবং নাটোর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই লক্ষ্যে মিত্র বাহিনীর অগ্রযাত্রা ৭ই ডিসেম্বর বিকালে করতোয়ার সেতুর কাছ থেকে আবার যাত্রা শুরু হয়। ভারতীয় ৬৯তম সাজোয়া রেজিমেণ্টের এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক (পি টি-৭৬) হিলির যুদ্ধের জন্য পেছনেই রেখে যাওয়া হয়।

এখানে অগ্রসরমান মিত্রবাহিনীতে ছিল ভারতের দুটি ট্যাঙ্ক স্কোয়াড্রন, একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন এবং বাংলাদেশ বাহিনীর দুটি কোম্পানী। পীরগঞ্জ দখলে এদের বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হয়নি। রংপুর এবং বগুড়া মহাসড়কের উপর লালদীঘি বাজার এলাকায় এই বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করে। মিত্র বাহিনীর এই অবস্থান গ্রহণের ফলে রংপুর এবং দিনাজপুর অন্যান্য স্থান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পাকিস্তানীরা যৌথ বাহিনীর এই ত্বরিত অগ্রগতি এবং অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়ার আগেই চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। একটি 'কনভয়ে' পাকিস্তানী সৈন্য বোঝাই অনেকগুলো জীপ রংপুর

থেকে পীরগঞ্জের দিকে এগিয়ে চলছিল। কিন্তু পাকিস্তানীরা চিন্তাও করতে পারেনি যৌথ বাহিনী লালদীঘি বাজারে তাদের জন্য মরণ ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে। পাকিস্তানী জীপগুলো লালদীঘি বাজারে পৌঁছলে ভারতীয় ট্যাংকগুলো শত্রু ধ্বংসের উল্লাসে মেতে উঠে। সংগে সংগে যৌথ বাহিনীর অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানীদের ওপর প্রবল গুলীবর্ষণ শুরু করে।

পাকিস্তানী জীপগুলোর একটিতে ডিভিশন্যাল কমাণ্ডার মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহও ছিলেন। বিরাট বপু জেনারেল খুব বেশি নড়াচড়া করতে পারতেন না। তিনি কোন রকমে লাফিয়ে পড়ে অন্ধকারে সুযোগে বুঝে কতগুলো বাঁশের আঁড়ালে গিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন। তারপর অবস্থা বুঝে সেখান থেকে উঠে গ্রামে এক বাঙালীর বাড়ীতে আশ্রয় নেন পরে তিনি সেই গ্রামবাসীর সহায়তায় তার বাহিনীর সাথে আবার মিলিত হতে পেরেছিলেন। এই অ্যামবুশে অনেকগুলো পাকিস্তানী জীপ ধ্বংস হয়। একজন পাকিস্তানী সৈন্য আটক এবং সামরিক ম্যাপ সহ বেশ কিছু মূল্যবান দলিলপত্র হস্তগত হয়। রাস্তা বন্ধের খবর পেয়ে পাকিস্তানী ৩২ বালুচ রেজিমেন্টের কমাণ্ডার দু'টি কোম্পানীসহ বগুড়া থেকে অকুস্থলে ছুটে যায়। তারা প্রতিবন্ধক সরাবার চেষ্টা করতেই যৌথ বাহিনী বিশেষ করে ভারতের ২/৩ গুর্খা রাইফেলস-এর সৈন্যরা অতর্কিত আক্রমণ শুরু করে। ৭ই ডিসেম্বর মধ্যরাতে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড গুলী বিনিময়ে পাকিস্তানীদের বহু লোক হতাহত হয়। সংঘর্ষে পাকিস্তানীদের ৩২ বালুচ ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার নিহত হন। পরদিন তার লাশ উদ্ধার করা হয়। প্রায় একই সময় পাকিস্তানের পাঞ্জাব রেজিমেন্টের দু'টি কোম্পানী ট্যাংক বহরসহ রংপুর থেকে লালদীঘি বাজার সড়ক প্রতিবন্ধকের দিকে অগ্রসর হয়। এবারও পাকিস্তানীদের বহু সৈন্য হতাহত হয়, এবং তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

৮ই ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর ব্রিগেড পলাশ বাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়। শক্তিশালী এবং দ্রুত চলাচলে সক্ষম এই কলামের সাথে অস্ত্র ও গোলাবারুদের মজুত ছিলো পর্যাপ্ত। যৌথবাহিনী যাত্রার পথে পাকিস্তানীদের সকল বাধা বিপত্তি পর্যুদস্ত করে সমস্ত এলাকা পাঁড়ি দিয়ে সহজেই পলাশ বাড়ী শত্রুমুক্ত করে। এরপর যৌথবাহিনী দক্ষিণ দিকে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। এবারের লক্ষ্যস্থল বগুড়া।

পীরগঞ্জ এবং পলাশবাড়ী মুক্ত হওয়ায় এবং সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় রংপুর ও দিনাজপুরে অবস্থানকারী পাক বাহিনীর পালাবার সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। ১০ই ডিসেম্বর খবর পাওয়া গেলো রংপুর এবং সৈয়দপুরে অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈন্যরা যমুনা নদীর ফুলছড়ি ঘাট ফেরী পার হয়ে

ঢাকার দিকে পশ্চাদপসরণের চেষ্টা করছে। সাথে সাথে ঐদিন ফেরী ঘাটটি দখল করার জন্য যৌথবাহিনী এগিয়ে যায়। পথে বিকালের দিকে গাইবান্ধা মুক্ত করা হয় এবং তার কয়েক ঘণ্টা পরই যমুনার পশ্চিম পাড়ে ফুলছড়িঘাট যৌথবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। প্রায় একই সময়ে ১০১ কম্যুনিকেশন জোনের অধীনস্থ উত্তর সেক্টরের যৌথবাহিনী ফুলছড়িঘাট বরাবর যমুনার পূর্ব পাড়ে তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে।

ডিসেম্বরের ১০ তারিখের মধ্যেই ৩৩ কোর এবং মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে দিনাজপুর, রংপুর এবং সৈয়দপুরের শত্রু বাহিনীকে সাফল্যের সাথে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে রাজধানী ঢাকা এলাকায় শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে এই সব পাকিস্তানী সৈন্যের যোগদানের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর আসে বগুড়া মুক্ত করার পালা। বগুড়া মুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে রংপুর-বগুড়া সড়কের ওপর অবস্থিত ছোট শহর গোবিন্দগঞ্জ মুক্ত করা প্রয়োজন। এ সময় একটি পাকিস্তানী ব্যাটালিয়ন গোবিন্দগঞ্জ রক্ষার দায়িত্বে ছিলো। দু'টি ভিন্ন অক্ষ বরাবর মিত্র ও মুক্তি বাহিনীকে এদিকে অগ্রসর হতে হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি কলাম মহাসড়ক ধরে এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিক থেকে শত্রুদের মোকাবিলা করবে। একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন এবং দুটি ট্যাংক স্কোয়াড্রন সমন্বয়ে গঠিত দ্বিতীয় 'কলামটি' প্রায় ৩০ মাইল পথ ঘুরে গোবিন্দগঞ্জের দক্ষিণ দিক থেকে শত্রুর ওপর আক্রমণ চালাবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক উত্তর দিকের কলামটি ১১ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় হামলা শুরু করে শত্রুদের ঐদিকে যখন ব্যস্ত রাখছিলো, তখন অপর কলামটি দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে শত্রু ঘাঁটির পেছনের অংশের ওপর প্রচণ্ড গতিতে আঘাত হানে। পাকিস্তানীরা পেছন থেকে আক্রান্ত হওয়ার কথা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করেনি। টি-৫৫ ট্যাংকের প্রচণ্ড আক্রমণে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। অন্ধকারে লক্ষ্যস্থল দেখার জন্য ট্যাংকের সংগে সংযুক্ত বিশেষ ধরনের 'ইনফ্রা রেড' যন্ত্র এই যুদ্ধে খুবই কাজে লেগেছিল। মিত্রবাহিনীর ট্যাংকের আক্রমণে পাকিস্তানী অবস্থানগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। পরের দিন অর্থাৎ ১২ই ডিসেম্বর সকালের মধ্যে পাকিস্তানীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ভারতের ৩৪০ মাউন্টেন ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার বখশী যোগিন্দর সিং) এবং মুক্তি বাহিনীর কয়েকটি কোম্পানী সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নিয়ে গোবিন্দগঞ্জ যুদ্ধে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিলো। সংঘর্ষে পাকিস্তানী পক্ষে নিহতদের সংখ্যা ছিল শতাধিক। এছাড়া এখানে পাঁচটি ১০৫ মিলিমিটার ব্যাসের কামান, তিনটি শেফি ট্যাংক, ৩৫টি সামরিক

যান, বিপুল পরিমাণ গোলা এবং ছোট হাতিয়ারের গুলী, বিস্ফোরক এবং মাইন মিত্রবাহিনীর হস্তগত হয়।

১২ই ডিসেম্বর ভোরে গোবিন্দগঞ্জ মুক্ত হওয়ার পর ১৩ই ডিসেম্বর দুপুরে মিত্রবাহিনী বগুড়ার দিকে অগ্রসর হয়। বগুড়ার কয়েকটি কামান এবং ট্যাংক-সহ একটি বালুচ রেজিমেণ্ট অবস্থান করছিলো। এদিকে কিছু কিছু পাক সেনা হিলি ত্যাগ করে বগুড়ায় চলে আসছিলো। হিলির রক্ষাব্যূহ কিছুটা দুর্বল হওয়ায় এই সুযোগে ভারতের ৬৬ মাউণ্টেন ব্রিগেড অগ্রসর হয়ে ঘোড়াঘাট মুক্ত করে। ভারতের ১৬৫ ব্রিগেড হিলির দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে বিনা বাধায় পাঁচবিবি এবং জয়পুরহাটে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত হিলিতে পাকিস্তানীদের ওপর প্রচণ্ড হামলা অব্যাহত থাকায় এবং প্রচুর লোক হতাহত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানীরা মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

১৩ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে যৌথবাহিনী বগুড়া শহর ঘিরে ফেলে। শত্রুরা যাতে বাইরের কোন সাহায্য না পেতে পারে এবং বগুড়া থেকে বাইরে পালাতে না পারে সে জন্য চতুর্দিকের রাস্তাগুলোতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়। উত্তর দিক থেকে সড়ক বরাবর প্রথম পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। এই আক্রমণ পরিচালনা করে ২/৩ গুর্খা রাইফেলস-এর সৈন্যরা এবং এক স্কোয়াড্রন ট্যাংকসহ মিত্র বাহিনীর একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন। দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন দক্ষিণ দিক থেকে এবং তৃতীয় আরেকটি ব্যাটালিয়ন পূর্ব-উত্তর দিক থেকে শহরটির উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। ১৪ই ডিসেম্বর দুপুরের মধ্যে বগুড়ার পাকিস্তানী ডিভিশন হেড কোয়ার্টার এবং ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের পতন ঘটে। শত্রু পক্ষের পালাবার সকল পথ তখন বন্ধ। কোন দিক থেকে সাহায্য পাওয়ার আশাও বৃথা। এই দিনের মধ্যেই মিত্রবাহিনীর বগুড়া অভিযান সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়। যদিও ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত শহরের দু-একটি এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন দু-একজন পাক সেনা উৎপাত অব্যাহত রেখেছিল তবে সামরিক দিক দিয়ে এই তৎপরতার কোন গুরুত্ব ছিলো না।

বগুড়া মুক্ত হওয়ার পর ঐ এলাকায় বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানী সেনা মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। শুধু বগুড়া শহরেই আত্মসমর্পণ করে ৫ জন অফিসার, ৫৬ জন জে. সি. ও. এবং ১৬১৩ জন সৈন্য। এ ছাড়া ১৪ই ডিসেম্বর এই শহরের দশটি ১০৫ মিলিমিটার কামান, পাঁচটি শেফি ট্যাংক, ৫০০ ছোট খাট হাতিয়ার, একটি ওয়ার্কশপ, একটি সরবরাহ ডিপো ও তিনটি অস্ত্রাগার মিত্রবাহিনীর হস্তগত হয়।

বগুড়ার পরই পেছনে ফেলে আসা রংপুর মুক্ত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। মিত্রবাহিনী বিভিন্ন দিক থেকে শহরটির দিকে অগ্রসর হয়ে ১৫ই ডিসেম্বর

দিবাগত রাতে রংপুর শহরতলীতে এসে পৌঁছে। পরদিন আক্রমণ শুরু করার কথা ছিল, কিন্তু এর মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হওয়ায় আক্রমণ চালাবার আর প্রয়োজন হয়নি।

পশ্চিম সেক্টরে ৪ঠা ডিসেম্বর ভারতের ৯ ডিভিশন যশোর টাউনের পশ্চিম এলাকার জলাভূমি বরাবর প্রথম পাক সেনাদের মোকাবিলা করে। পুরো দুইদিন আক্রমণ প্রতিরোধ করার পর ৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের ৯ ডিভিশন (জেঃ আনসারী) যশোর পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। জেনারেল আনসারী কেন যে এত-তাড়াতাড়ি যশোর পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা পরিষ্কার ভাবে জানা যায়নি। এই শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এত শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য ছিল যে, এটা দখল করতে গেলে মিত্র বাহিনীকে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হতো। দু'দিনের যুদ্ধে মিত্র বাহিনীর অনেক সৈন্য ইতিমধ্যেই হতাহত হয়েছিল। যশোর আক্রমণে ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ঘোরিয়াও আহত হয়েছিলেন। ৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানীরা যশোর ছেড়ে পালিয়ে গেলেও মিত্রবাহিনী শহরে প্রবেশ করেছিল একদিন পরে, ৭ই ডিসেম্বর।

জেনারেল আনসারী তার ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারের সেনাদের নিয়ে যশোর থেকে মাগুরায় সরে আসেন এবং এর পর মধুমতী নদী অতিক্রম করে ফরিদপুরের দিকে পালাতে থাকেন। অন্যদিকে পাকিস্তানের ১০৭ পদাতিক ব্রিগেড খুলনার দিকে পালাতে শুরু করে। খবর পেয়ে ভারতের নবম মাউণ্টেন ডিভিশনের ৩২ পদাতিক ব্রিগেড পাকিস্তানী ১০৭তম পদাতিক ব্রিগেডকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে খুলনা অভিমুখে তীব্র গতিতে এগিয়ে চলে। ১১ই ডিসেম্বর দৌলতপুরে এই দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের সংঘর্ষ ঘটে। আগে থেকেই দৌলতপুরে পাকিস্তানী ৬ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের একটি ব্যাটালিয়ন প্রতিরক্ষা গড়ে তুলেছিলো। পাকিস্তানী ঘাঁটির একদিকে ছিলো জলাভূমি এবং অন্যদিকে ছিলো ভৈরব নদী। দু'দিকের প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করে তুলেছিলো। তাই কোনদিক দিয়ে ঘুরে শত্রুকে আঘাত করা মিত্রবাহিনীর পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল। সামনা সামনি আক্রমণেও তেমন অগ্রগতি হচ্ছিলোনা। মিত্রবাহিনীকে সহায়তা দানের জন্য ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তানী অবস্থানসমূহের ওপর অনেকগুলো বিমান হামলা চালিয়েছিলো। তবু ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের পূর্ব পর্যন্ত দৌলতপুরকে পুরাপুরি শত্রু মুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

এই পশ্চিম সেক্টরের উত্তরাংশে ভারতীয় জেনারেল মহিন্দর সিং এর ৪র্থ মাউণ্টেন ডিভিশন ৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে জীবননগর, দর্শনা এবং

কোর্টচাঁদপুর মুক্ত করেন। এরপর চুয়াডাঙ্গা এবং ঝিনাইদহের মধ্যে একস্থানে রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে সেখানে একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন এবং একটি সাঁজোয়া স্কোয়াড্রন মোতায়েন করা হয়। ভারতীয় ৪১ মাউন্টেন ব্রিগেড এবং মিত্র বাহিনীর অন্যান্য সৈন্যরা বহুকষ্টে পায়ে হেঁটে ৬ই ডিসেম্বর ঝিনাইদহ পৌঁছে এবং শহরটি মুক্ত করে। ঝিনাইদহ মিত্রবাহিনীর হাতে চলে যাওয়ায় এবং মিত্র বাহিনীর অভিযানের গতি ও প্রচণ্ডতা দেখে জেনারেল আনসারী সম্ভবত মনোবল হারিয়ে ফেলেন। তিনি হয়তো মনে করেছিলেন যে, মাগুরা হয়ে ঢাকা ফেরার রাস্তাও হয়তো যৌথবাহিনীর সৈন্যরা বন্ধ করে দেবে। তাই তিনি যশোর থেকে বেরিয়ে মাগুরা এবং সেখান থেকে ফরিদপুরের পথে দ্রুত পালাবার চেষ্টা করেন। মিত্রবাহিনীও আনসারীর পেছন ছাড়েনি। ভারতের ৬২ মাউন্টেন ব্রিগেড ঝটিকা বেগে অগ্রসর হয়ে ৮ই ডিসেম্বর মাগুরা দখল করে ফেলে। কিন্তু ততোক্ষণে আনসারী এবং তাঁর নবম ডিভিশনের বাকি সৈন্যরা মধুমতী পার হয়ে গেছে। তবে পাকিস্তানের নবম ডিভিশনের তখন আর কোন সংহত কাঠামো অবশিষ্ট ছিলোনা। পাকিস্তানী নবম ডিভিশনের ১০৭ পদাতিক ব্রিগেড পালিয়ে ছিলো দক্ষিণ দিকে খুলনায় এবং ৫৭ পদাতিক ব্রিগেড উত্তরে কুষ্টিয়ার দিকে পালিয়ে যায়। ৮ই ডিসেম্বর মাগুরা মুক্ত হওয়ার পর ভারতের ৬২ মাউন্টেন ব্রিগেড ফরিদপুরের দিকে অভিযান অব্যাহত রাখে। এদিকে শত্রুরা পথে কামারখালী ঘাটের সেতুটি ধ্বংস করে দিয়ে যায়। পেছনে তাদের কিছু সৈন্য রেখে যায়। ৯ই ডিসেম্বরের মধ্যে মধুমতীর পশ্চিম তীরের বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রু মুক্ত হয়। কামারখালী ঘাটের সেতুটি শত্রুরা ভেঙ্গে ফেলাতে মিত্র বাহিনীকে এবার অন্যপথে নদী পার হওয়ার প্রস্তুতি নিতে হয়। মধুমতীর পূর্ব পাড়ে পাকিস্তানীরা তখন মূলত মিত্র বাহিনীর অগ্রাভিযান বিলম্বিত করার জন্যই অবস্থান নিয়ে বসেছিলো।

ওদিকে ভারতের সপ্তম মাউন্টেন ব্রিগেডকে কুষ্টিয়া এবং হার্ডিঞ্জ ব্রিজ মুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। এই ব্রিগেডের ২২ রাজপুত ব্যাটালিয়ন ট্যাংক নিয়ে সরাসরি কুষ্টিয়াস্থ ৫৭ পাকিস্তানী ব্রিগেডের উপর আক্রমণ করে বসে, কিন্তু এতে তাদের পক্ষেই অনেক সৈন্য হতাহত হয়। পাক ব্রিগেডটি অবশ্য কিছু সময় আক্রমণ প্রতিরোধ করার পর উত্তর পূর্ব সেক্টরে মোতায়েন তাদের ১৬ পদাতিক ডিভিশনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ১০ই ডিসেম্বর রাতে অনেক চেষ্টার পর পদ্মা পাড়ি দিয়ে নাটোর এবং পাবনার দিকে পালিয়ে যায়। ১২ই ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে পৌঁছে দেখে, শত্রুরা সেটি আগেই ধ্বংস করে রেখেছে।

প্রায় একই সময়ে ফরিদপুর মুক্ত করার জন্য মিত্রবাহিনী মধুমতী পার হওয়ার পরিকল্পনা করছিলো। ফরিদপুর থেকে একবার গোয়ালন্দ পৌঁছতে পারলে সামনে ঢাকার পথ তখন খোলা। মিত্র বাহিনীর একটি গ্রুপ দক্ষিণ দিকে এবং এবং অন্য গ্রুপ উত্তরের দিকে সরে গিয়ে নদী পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই পরিকল্পনা অনুসারে মিত্র বাহিনীর দুটি ব্রিগেড দুই দিক থেকে শত্রুর সম্মুখ অবস্থান এড়িয়ে শত্রুর অবস্থানের পেছনে যশোর-ফরিদপুর মহাসড়কে প্রতি-রক্ষা গড়ে তুলবে। তবেই আর শত্রুর পালাবার পথ থাকবেনা।

দু'টি ভারতীয় ব্রিগেড সমেত যৌথ বাহিনীর সৈন্যরা ১৪ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে নদী পার হয়। এই কাজে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা কয়েক শ' নৌকার ব্যবস্থা করেছিলো। ১৫ই ডিসেম্বর সকালের মধ্যে নদী পাড়ি দেয়ার কাজ শেষ হয়। তারপর মূল সড়ক মাঝখানে রেখে দুটি দল প্রায় ২০ মাইল পথ ঘুরে কামারখালী এবং ফরিদপুরের মাঝামাঝি এক জায়গায় এসে মিলিত হয় এবং সেখানেই রাস্তা বন্ধ করে দেয়। প্রতিবন্ধক রক্ষার জন্য একটি ব্রিগেডকে সেখানে রেখে অন্য ব্রিগেডটি পেছন থেকে কামারখালীর পাকিস্তানীদের ওপর আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানী জেনারেল আনসারী এই সাঁড়াশী আক্রমণের কিছুই জানতেন না। তিনি ফরিদপুরের দিকে পালাতে গিয়েই রাস্তায় প্রতিবন্ধকে আটকে যান। এই অবস্থায় ভীত সন্ত্রস্ত আনসারী ও তার সঙ্গীরা যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

উত্তর সেক্টরে (ময়মনসিংহ জেলা) মুক্তিবাহিনী এবং ১ম মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি ১৪ মাইল পায়ে হেঁটে ৬ই ডিসেম্বর বিকালে শ্যামপুরের নিকট খেয়াঘাটে পৌঁছে গিয়েছিলো। দলের যে সব ভারী জিনিসপত্র গরুর গাড়ীতে বয়ে আনা হচ্ছিলো সেগুলো তখনো এসে না পৌঁছায় নদী পার হতে দেরি হয়ে যায়। শেষে ৭ই ডিসেম্বর বিকেলে যৌথবাহিনী ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিলো। এরপর তারা অতি সন্তর্পণে দ্রুত অগ্রসর হয়ে রাত তিনটার দিকে জামালপুরের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 'ভাপকি' এলাকার রাস্তায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। ফলে, জামালপুর গ্যারিসনরক্ষীদের পলায়নের পথ বন্ধ হয়ে যায়। অবস্থা বুঝতে পেরে জামালপুরের পাকসেনারা মরিয়া হয়ে প্রতিবন্ধকের পাশ দিয়ে ঘুরে পালিয়ে ঢাকা আসার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের অনেক সৈন্যকে এই উদ্যোগের জন্য হতাহত হতে হয়। এ সময় উত্তর দিক থেকেও যৌথ বাহিনীর অন্যান্য কলাম জামাল-পুরের কাছে এসে পড়ে। জামালপুর গ্যারিসনে পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল ১৫০০ (৩১ বেলুচ রেজিমেন্টের সৈনিকবৃন্দ এবং ৯৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের কিছু সৈন্য)। এদের সাথে ছিলো ১২০ মিলিমিটার মর্টারসহ অত্যন্ত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।

ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে স্থাপিত ঘাঁটিতে ও ওখানকার পাকা ভবনগুলোতে এক মাসেরও বেশি সময় চলা যায় এই পরিমাণ গোলাবারুদ ও অন্যান্য রসদ মজুত করে রেখেছিলো। এই সেক্টরের যৌথ বাহিনীর তেমন কোন ভারী অস্ত্র ছিলো না। কয়েকটি হালকা কামান এবং উপস্থিত সীমিত সৈন্য শক্তি নিয়ে জামালপুর এবং ময়মনসিংহ মুক্ত করা এবং টাঙ্গাইল অতিক্রম করে ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়া ছিল যৌথ বাহিনীর সময় সাপেক্ষ কাজ। এই এলাকায় জামালপুরকে এড়িয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব ছিলো। সবদিক বিবেচনা করে বোঝা যায়, এই অবস্থায় জামালপুরের শক্তিশালী ঘাঁটিতে হাত দিলে যৌথবাহিনীর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। সে জন্য ওখানে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ ও বোমা বর্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যৌথ বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য পরে অবশ্য আরো একটি ব্রিগেড (১৬৭ পদাতিক ব্রিগেড) এই অঞ্চলে পাঠানো হয়। ১০ই ডিসেম্বর রাতে আরো অনেক পাকিস্তানী জামালপুর থেকে টাঙ্গাইলের দিকে পালাবার চেষ্টা করে। তারা রাস্তার এই নূতন প্রতিবন্ধকের কথা জানতো না। স্থানটিতে এসে পৌঁছতেই যৌথ বাহিনীর মারাত্মক গুলী বর্ষণে রাস্তার ওপরেই শতাধিক পাকিস্তানী নিহত এবং ২৩ জন আহত হয়। ৬১ জন ধরা পড়ে। এটা ছিল যেন পাকিস্তানীদের ধ্বংসের এক চমৎকার উৎসব। ১১ই ডিসেম্বর সকালে জামালপুর গ্যারিসন মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। এতদ-সত্ত্বেও প্রায় ২০০ পাকিস্তানীর একটি দল জামালপুর থেকে বের হয়ে ঢাকার দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

জামালপুরের পূর্বে হালুয়াঘাট এলাকায় আর এক প্রচণ্ড সংঘর্ষে পাকিস্তানী-দের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং তারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র ফেলে পালিয়ে যায়। ময়মনসিংহ অভিমুখী হালুয়াঘাট ফুলপুর পথে শত্রুরা মিত্র বাহিনীর অগ্রযাত্রা বিলম্বিত করার চেষ্টায় যুদ্ধ করতে করতে পেছনের দিকে সরতে থাকে। তারা তিনটি বড় সেতু ধ্বংস করে দিলে যৌথ বাহিনী এতে খুবই বিপাকে পড়ে যায়। কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর হাজার হাজার লোক স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে যৌথ বাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে আসে। তারা ইট, পাথর ফেলে নদী-গুলোতে দ্রুত জাঙ্গাল বেধে দেয়। এর উপর দিয়ে যৌথ বাহিনী নদী পার হয়ে যায়। এদিকে ১১ই ডিসেম্বর শত্রুরা ময়মনসিংহ ত্যাগ করে এবং টাঙ্গাইলের কাছে প্রতিরক্ষামূলক ঘাঁটিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

জামালপুর এবং ময়মনসিংহ শত্রু মুক্ত হওয়ার পর পলায়নপর পাকিস্তানীরা যাতে কিছুতেই ঢাকা গিয়ে সেখানকার সৈন্যদের শক্তি বৃদ্ধি না করতে পারে সেজন্য অবিলম্বে টাঙ্গাইল দখল করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

১১ই ডিসেম্বর বেলা তখন ৪টা। টাঙ্গাইলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীর উত্তর পাড়ে দু'টি ছত্রী ব্যাটালিয়ন প্যারাস্যুট নিয়ে লাফিয়ে নামতে থাকে। ছত্রী সেনাদের ওপর দায়িত্ব ছিলো পুংলী সেতু এবং খেয়াঘাট দখল করার। এ দুটি কাজ শেষ করতে রাত ৮টা বেজে যায়। এর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক পাক সেনা টাঙ্গাইলের ভেতর দিয়ে ঢাকার পথে রওয়ানা হয়ে যায়। যৌথ বাহিনীকে একদিন পর ১৩ই ডিসেম্বর টাঙ্গাইল থেকে রওয়ানা হ'তে হয়। পথে দু'এক জায়গায় ছোট খাট সংঘর্ষের পর ১৪ই ডিসেম্বর যৌথ বাহিনী তুরাগ নদীর পাড়ে শক্তিশালী পাকিস্তানী ঘাঁটির মুখোমুখি হয়। ট্যাংক বহরের সহায়তায় পুরো একটি শক্র ব্যাটালিয়ন এখানকার প্রতিরক্ষা অবস্থান প্রহরা দিচ্ছিল। এখানেও সেই জলাভূমি সামনে রেখেই পাকিস্তানীরা প্রতিরক্ষা গড়ে তুলেছিল। কাজেই শক্র পক্ষকে আগে থেকে কিছুটা ঘায়েল না করে সরাসরি ওদের ঘাঁটি দখল করতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে বলে মনে করা হয়।

পাকিস্তানীরা ছিলো তুরাগ নদীর দুই তীরেই। পূর্ব পাড়ে ছিলো ওদের প্রধান ঘাঁটি, আর পশ্চিম পাড়ে মেশিনগান নিয়ে একটি কোম্পানী অপেক্ষা করছিলো। সরাসরি না গিয়ে পাশ দিয়ে ঘুরে অন্য কোন জায়গা দিয়ে নদী পার হওয়া যায় কিনা তা দেখার জন্য ভারতীয় কমাণ্ডার কয়েকটি টহলদার দলকে বিভিন্ন দিকে পাঠান। নদী পার হওয়ার উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে গিয়ে একটি দল জনৈক পাকিস্তানী মেজরকে ধরে ফেলে। তার কাছে খবর পাওয়া যায়, পাকিস্তানের ৯৩ ব্রিগেড কমাণ্ডার এবং আরো কয়েকজন অফিসার কাছেই এক জায়গায় লুকিয়ে আছেন। খবরের সূত্র ধরে মিত্র বাহিনীর অগ্রবর্তী দল ত্বরিত বেগে পলায়নপর পাকিস্তানী ব্রিগেডকে খুঁজে বের করে। ব্রিগেড কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার কাদের এবং অন্যান্য অফিসারকেও পাকড়াও করা হয়। এদের কাছ থেকে মিত্র বাহিনী তুরাগের দুই পাড়ে পাকিস্তানীদের অবস্থান সম্পর্কে সব খবরই পেয়ে যায়।

একই দিন অর্থাৎ ১৪ই ডিসেম্বর তুরাগের পাক অবস্থানের ওপর ভারতীয় বিমান বাহিনী কয়েকবার আক্রমণ চালায়। কিন্তু এখানকার ঘাঁটির প্রতিটি বাংকারের আচ্ছাদনও বহুদিনের চেষ্টায় অত্যন্ত সুদৃঢ় করা হয়েছিল। তাই বিমান আক্রমণে বিশেষ কোন ফল হয়নি। এরপর যৌথবাহিনী প্রথমে পশ্চিম পাড়ের পাকিস্তানী অবস্থান দখল করার উদ্দেশ্যে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইদিক থেকে আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ১৪ই ডিসেম্বর বেলা ৩টার দিকে যৌথ বাহিনীর সৈন্যরা রাস্তা থেকে নেমে দুই পার্শ্বের লক্ষ্যস্থল অভিমুখে অগ্রসর

হতে শুরু করে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা তেমন ফলপ্রদ হয়নি। পরদিন সকালে আরো দুটি কোম্পানীকে দুই পার্শ্বের সৈন্যদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য পাঠানো হয়। নদীর পশ্চিম পাড়ে এই কোম্পানীগুলো এবার যথাস্থানে অবস্থান গ্রহণ করে বসতে পারে। সাথে সাথে সড়কের ওপর থেকে প্রধান দলও সরাসরি সেতুর দিকে আক্রমণ শুরু করে দেয়। পাকিস্তানীরা তখন নদী পার হয়ে পূর্ব তীরে আশ্রয় নেয়, কিন্তু যাওয়ার আগে সেতুটি ধ্বংস করে দিয়ে যায়। যৌথ বাহিনীর সামনে আবার সেই বিধ্বস্ত সেতু, আবার সেই নদী পার হওয়ার সমস্যা।

এই সেক্টরে (উত্তর সেক্টরে) মিত্র বাহিনীর অগ্রবর্তী দল তুরাগের পাড়ে এসে পৌঁছলেও বাকি দলগুলো তখনো অনেক পেছনে পড়ে। তারা একত্র হয়ে অগ্রবর্তী দলে মিলিত হবার চেষ্টা করছিলো। অধিকাংশ যানবাহন তখন পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র পার হতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে পেছনের দলগুলো না আসা পর্যন্ত অগ্রবর্তী দল তুরাগের পশ্চিম পাড়েই অপেক্ষা করা এবং সবাই একত্র হওয়ার পরই ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে একদিকে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী এবং অন্যদিকে ভারত মহাসাগরে মার্কিন ৭ম নৌবহরের তৎপরতা সমগ্র পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিলো।

তুরাগ নদীর কাছ থেকে যৌথ বাহিনীর একটি 'কলাম' ভারতের ১৩ গার্ডস এর নেতৃত্বে ১৪ই ডিসেম্বর রাতে চন্দ্রা-সাভার-নীরপুর অক্ষ বরাবর যাত্রা শুরু করে। ১৫ই ডিসেম্বর ভোরে তারা সাভার পৌঁছে দেখে যে, পাকিস্তানীরা সেস্থান থেকে পালিয়ে গেছে। তারা আরো বুঝতে পারে সাভার থেকে ঢাকা পর্যন্ত পথটুকু সবচাইতে বেশি বিপদসঙ্কুল হবে। এ পথে যৌথ বাহিনীর যে কোন অভিযান পাকিস্তানীরা নিশ্চয়ই দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করবে। এখানে পাকিস্তানীদের হাতে কিছু সংখ্যক ট্যাংকও ছিলো। অথচ উত্তর সেক্টরের যৌথবাহিনীর কাছে ট্যাংক বিধ্বংসী কোন হাতিয়ার ছিল না। শুধু টাঙ্গাইলে যে সব ছত্রীসেনা নামানো হয়েছিলো তাদের কাছে এই ধরনের কিছু অস্ত্র ছিলো।

সাভার থেকে এই ছত্রী ব্যাটালিয়নগুলোকেই ঢাকার দিকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। এরা যাত্রা শুরু করে ১৫ই ডিসেম্বর রাতে। পথে ছোট খাট কয়েকটি সংঘর্ষের পর ছত্রীসেনারা যখন গুরুত্বপূর্ণ নীরপুর ব্রিজের কাছে পাকবাহিনীর মুখোমুখী এসে যায়, তখন রাত ২টা। ওপাশেই রাজধানী শহর ঢাকা। ব্রিজটি একবার দখল করতে পারলে সরাসরি রাজপথ ধরে ঢাকার কেন্দ্রস্থলে পৌঁছানো কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র। ছত্রীসেনারা ব্রিজ দখলের জন্য প্রথমে কমাণ্ডো পদ্ধতিতে পাকিস্তানীদের ওপর আক্রমণ শুরু করলেও পাকিস্তানীদের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে তাদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়। ফলে তারা বাধ্য হয়ে ব্রিজের

অপর পাড়ে পশ্চাদপসরণ করে। পাকিস্তানীরাও এই সুযোগে ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়ার প্রস্তুতি নেয়। ঠিক এই সময়ে যৌথবাহিনীর অগ্রবর্তী কলামটি দ্রুত অগ্রসর হয়ে পশ্চিম পাড়ে ছত্রী সেনাদের সাথে যোগ দেয়। পাকিস্তানীদের লক্ষ্য করে সাথে সাথে তাদের প্রচণ্ড গুলীবর্ষণ শুরু হয়ে যায়। ফলে, ব্রিজের কাছে গিয়ে বিস্ফোরক স্থাপনের চেষ্টা করা পাকিস্তানীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে যৌথবাহিনীর বাকি সৈন্য ১৫ই ডিসেম্বর রাতে বিভিন্ন স্থান দিয়ে তুরাগ নদী পার হয়ে টঙ্গী অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে।

পূর্ব সেক্টরে মুক্তিবাহিনী এবং ভারতের ৮ মাউণ্টেন ডিভিশন ছাতক, ফেঞ্চুগঞ্জ, সুনামগঞ্জ প্রভৃতি এলাকা ইতিমধ্যে মুক্ত করে ফেলেছিলো। ১১ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী এবং ভারতের ৫৯ ব্রিগেডের হাতে ফেঞ্চুগঞ্জ মুক্ত হয়। মৌলভীবাজারে লড়াই শুরু হয় ৯ই ডিসেম্বর। আক্রমণের প্রচণ্ডতায় টিকতে না পেরে পাকিস্তানের ৩১৩ ব্রিগেড মৌলভীবাজার ত্যাগ করে সিলেটে পশ্চাদপসরণ করে। সিলেটে আগে থেকেই পাকিস্তানের ২০২ ব্রিগেড অবস্থান করছিলো। ৩১৩ ব্রিগেডের আগমনে এখানকার শত্রু ঘাঁটি দ্বিগুণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যৌথবাহিনীও বিভিন্ন দিক থেকে শহরটির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। যৌথবাহিনীতে ছিলো বাংলাদেশের কয়েকটি নিয়মিত ব্যাটালিয়ন, মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতের গুর্খা রাইফেলস (৪/৫ গুর্খা এবং ৫/৫ গুর্খা) ভারতের ৫৯ মাউণ্টেন ব্রিগেড ফেঞ্চুগঞ্জ মুক্ত করার পর ১৩ই ডিসেম্বর সিলেটে পাকিস্তানী অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়।

এরপর থেকে ভারতীয় ডিভিশন কমাণ্ডার সিলেটের চার পাশে অবরোধ গড়ে তোলে এবং শহরটির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ অব্যাহত রাখে। পাকিস্তানীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করবে এই আশায় শত্রু ঘাঁটির ওপর বিমান আক্রমণ এবং কামানের গোলাবর্ষণ চলতে থাকে। ১৭ই ডিসেম্বর অর্থাৎ যুদ্ধ বিরতির প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর সিলেট গ্যারিসন আত্মসমর্পণ করে। মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে ছিলো ৩জন ব্রিগেডিয়ার সহ ১০৭ জন অফিসার, ১৯১ জন জেসিও এবং বিভিন্ন র‍্যাংকের ৬,১২৪ জন সৈনিক।

ভারতের ৫৭ মাউণ্টেন ডিভিশনের এলাকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুক্ত হয় ৬ই ডিসেম্বর। কিন্তু সেখানে জয়ের আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়। শহরের একটি খালে যৌথবাহিনী ৪০ জন বাঙ্গালীর মৃতদেহ খুঁজে পায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নেতৃস্থানীয় ৪০ জন লোককে পলায়নপর পাকিস্তানীরা ৫ই ডিসেম্বর খুব সকালে ধরে নিয়ে যায়। তারপর এদের সবাইকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে রেখে যায় সেই খালে।

ব্রাহ্মনবাড়ীয়া মুক্ত হওয়ার পর যৌথবাহিনী দ্রুত এগিয়ে চলে পলায়নরত পাকিস্তানীদের ধ্বংস করার জন্য। ৮ই ডিসেম্বর যৌথ বাহিনী মেঘনা নদীর কূলে আশুগঞ্জে পৌছে যায়। কিন্তু ততক্ষণে পাকিস্তানী ব্রিগেডটি মেঘনার ওপরে বিশাল ভৈরব রেল সেতুর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ধ্বংস করে পালিয়ে গেছে নদীর ওপারে।

৩রা ডিসেম্বর রাতে যৌথ বাহিনীর ৩০১তম মাউন্টেন ব্রিগেড এবং মুক্তিবাহিনী ইষ্টার্ণ সেক্টরের দক্ষিণে লালমাই পাহাড় এবং লাকসামে পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে ফেলে। অগ্রসরমান ভারতীয় এবং মুক্তিবাহিনী মুদাফফরগঞ্জের নিকটে শত্রুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। স্বল্পকালীন সংঘর্ষে পাকিস্তানী ২৫তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কমাণ্ডিং অফিসার এবং তার অধিকাংশ সৈন্য আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। মুদাফফরগঞ্জ মুক্ত হয় ৬ই ডিসেম্বর। এরপর যৌথবাহিনী মেঘনা তীরবর্তী নদীবন্দর চাঁদপুর যাওয়ার পথে হাজিগঞ্জে পাকিস্তানীদের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ৩৬ ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ের পর ৮ই ডিসেম্বর হাজিগঞ্জ মুক্ত হয়। ৯ই ডিসেম্বর বিনা প্রতিরোধে চাঁদপুর শহর মুক্ত হয়। ইতিপূর্বে হাজিগঞ্জের যুদ্ধ যখন সমাপ্তির দিকে তখন পাকিস্তানী ৩৯ অস্থায়ী (এডহক) ডিভিশনের অফিসার কমাণ্ডিং মেজর জেনারেল রহিম খান চাঁদপুরে পলায়ন করেন এবং সেখান থেকে তিনি কয়েকটি গানবোর্ট, স্টীমার ও লঞ্চ যোগে নারায়ণগঞ্জের দিকে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারের লোকজন। ৮ই ডিসেম্বর ভোরে ভারতীয় বিমান বাহিনী মেঘনা বক্ষে পলায়নপর এই নৌ-বহরের ওপর হামলা চালায়। জেনারেল রহিম আহত হন। তার সঙ্গীদের মধ্যেও বহুসংখ্যক নিহত কিংবা আহত হয়। শেষ পর্যন্ত জেনারেল রহিম খান অবশ্য নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম হন। তিনি নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা এবং পাকবাহিনী আত্মসমর্পণের কিছু আগেই সেখান থেকে হেলিকপ্টার যোগে বার্মা পালিয়ে যান। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন পাকিস্তানীও হেলিকপ্টার যোগে বার্মায় পালিয়ে যায়।

লাকসামের ঘাঁটি রক্ষাকারী পাকিস্তানের ৫৩তম পদাতিক ব্রিগেড যৌথবাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে কুমিল্লা গ্যারিসনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করে। ৮ই ডিসেম্বর রাতে তাদের সে চেষ্টা সফল হয়। এরপর যৌথবাহিনী ময়নামতি (কুমিল্লা) গ্যারিসন অবরোধ করে এবং দু'দিক থেকে পাকিস্তানী অবস্থানের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় ১৮১তম মাউন্টেন ব্রিগেড দক্ষিণ দিক থেকে এবং মুক্তিবাহিনীর আরেকটি দল ও ভারতীয় ৬১ মাউন্টেন ব্রিগেড উত্তর দিক থেকে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের দিকে ক্রমশ অগ্রসর

হচ্ছিলো। ময়নামতিতে পাকিস্তানীরা পর পর তিনটি ব্যুহ রচনা করে অবস্থান গ্রহণ করে ট্যাংক ও পুরো কামান বহরের সহায়তায় তারা ইতিমধ্যেই শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তুলেছিলো। এদের অবস্থানগুলো ছিলো ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর, এর চতুর্দিক ছিলো ঢালু। আত্মরক্ষার জন্য খুবই উপযোগী ছিলো এইসব ছোট ছোট পাহাড়গুলো। কারণ, কোন প্রকার আড়াল বিহীন এই স্থানে যে কোন আক্রমণকারীকে সহজেই মেশিনগান কিংবা ট্যাংক বিধ্বংসী হাতিয়ার দিয়ে ঘায়েল করা সম্ভব। এখানে কোন চূড়ান্ত আক্রমণ চালাতে হলে তার আগে অবশ্যই দূর পাল্লার কামান এবং বিমান আক্রমণের দ্বারা প্রতিরক্ষা ঘাঁটি সমূহ ধ্বংস করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। সেই হিসাবে বেশ কিছুদিন ময়নামতির ওপর কামান ও বিমান হামলা চালানো হলেও ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ময়নামতির ওপর কোন চূড়ান্ত আক্রমণ চালানো হয়নি। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণের পর ময়নামতি গ্যারিসনও মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করে। এখানে ২জন ব্রিগেডিয়ার সহ ৭৬ জন পাকিস্তানী অফিসার, ১৭৫ জন জেসিও এবং ৩,৯১৮ জন সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছিলো।

বেলুনিয়া ও ফেনীতে আমাদের হাতে চরম মার খাওয়ার পর ৫৩ ব্রিগেড সহ পাকিস্তানীদের ১৫ বালুচ রেজিমেণ্ট ৬ই ডিসেম্বর লাকসামের দিকে পলায়ন করছিলো। ৬ই ডিসেম্বরেই আমরা ফেনী মুক্ত করে চট্টগ্রামের পথে অগ্রসর হই। সামনে আমাদের ৬৫ মাইল পথ। শুভপুরের কয়েক মাইল দক্ষিণে ধূমঘাট রেল সেতুটি দখল করা এবং রক্ষা করার জন্য আমি সাথে সাথেই দুটি প্লাটুনকে পাঠিয়ে দেই ধূমঘাটের পথে। চট্টগ্রামের পথে অগ্রসরমান আমাদের মূল বাহিনীতে ছিলো আমার সেক্টরের তিনটি নিয়মিত ব্যাটালিয়ন এবং বাংলাদেশের একটি কামান বহর.....নাম ছিলো "মুজিব ব্যাট্যারী" (শেখ মুজিবুর রহমানের নাম অনুসারে)। ভারতীয় বাহিনীতে ছিলো ২য় রাজপুত ব্যাটালিয়ন, বিএসএফ-এর একটি ব্যাটালিয়ন এবং একটি গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট। এই সেক্টরে বাংলাদেশ বাহিনীর কমাণ্ডার হিসাবে আমি এবং ভারতীয় বাহিনীর কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার আনন্দ স্বরূপ ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাজ করে চলছিলাম। আগেই বলা হয়েছে আমাদের এই যৌথ বাহিনীর নাম ছিলো 'কিলোফোর্স'।

ফেনী থেকে রওনা হওয়ার পর পথে পাকিস্তানের ৩৯ অস্থায়ী ডিভিশনের সৈন্যদের মোকাবিলা হবে বলে আমরা জানতাম। পাকিস্তানী এই ডিভিশনের সঙ্গে কামান ও সাঁজোয়া বহরও ছিলো। আমার বা ভারতীয় বাহিনীর সাথে কোন ট্যাংক কিংবা ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র ছিলোনা। এই কারণে ভারতীয় বাহিনী একটু সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিলো। আমাদের মূল বাহিনী ঢাকা—

চট্টগ্রাম মহাসড়ক পথে অগ্রসর হচ্ছিলো। একই সাথে একটি বাংলাদেশ ব্যাটালিয়নকে চট্টগ্রামের পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয় হাটহাজারী এবং চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করার জন্য। এই জায়গাটি বন্দর নগরী চট্টগ্রামের কয়েক মাইল উত্তরে। আর আমরা মূল বাহিনী নিয়ে মহাসড়ক পথে চট্টগ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে এগিয়ে চললাম।

চট্টগ্রামের অগ্রাভিযানে আমরা ছাগলনাইয়া মুক্ত করার পর ৭ই নভেম্বর ফেনী নদীর সেই স্মরণীয় শুভপুর সেতুর কাছে গিয়ে পৌঁছি। চট্টগ্রামের পথে আমাদের সামনে এটিই হচ্ছে সর্বশেষ প্রধান বাধা। অবশ্য এর পরেও কয়েকটি ছোট খাট সেতু রয়েছে। শুভপুর সেতুর কাছে গিয়ে দেখি, পাকিস্তানীরা সুদীর্ঘ সেতুটির দুটি স্প্যান সম্পূর্ণ ধ্বংস করে রেখে গেছে। আমরা আরো খবর পাই যে, তারা ৮ মাইল দূরে মীরেশ্বরাইতে গিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলেছে।

তৎক্ষণাৎ ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং কোরের সদস্যদের ডাকা হয়। তারা যৌথবাহিনীর যানবাহন ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র পার করার জন্য ফেনী নদীতে একটি 'পনটুন ব্রিজ' তৈরী করার কাজে লেগে যায়। কিন্তু নতুন সেতুর জন্য অপেক্ষা না করে আমার সৈন্য দলের একটি অংশকে নিয়ে আমি ৮ই ডিসেম্বর বিকালে নৌকাযোগে নদী পার হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হই। স্বল্পতম সময়ে করেরহাটে আমার সেক্টর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করে আমরা জোরারগঞ্জ পর্যন্ত এলাকা শত্রু মুক্ত করি। ভারতের ব্রিগেড কমাণ্ডারও করেরহাট পৌঁছে যান। আমার এলাকায় যুদ্ধের জন্য রসদ-পত্র সংগ্রহই ছিলো বড় সমস্যা। আমাদেরকে খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য পুরোপুরি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছিলো। এগুলোর জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আবার তাদের পেছনের ঘাঁটির ওপর নির্ভর করতে হতো। এই ঘাঁটি ছিলো শুভপুর থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে। এই পথটুকুর অধিকাংশ স্থানই ছিলো আবার ভীষণ খারাপ। তাই আমাদের রসদ সরবরাহ ব্যবস্থায় একটা মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি হয়েছিলো। হয়তো এই কারণেই আমার সঙ্গের ভারতীয় ব্যাটালিয়নগুলো সাবধানে এগুতে চাইছিলো। ভারতীয় কমাণ্ডার যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং রসদের সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বেশি দূর সামনে অগ্রসর হতে চাইছিলেন না। এদিকে শত্রুরা শুভপুর সেতু ধ্বংস করে আমাদের সকলকে আরো সংকটে ফেলে দিয়েছিলো। এই প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও আমরা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। জাতিসংঘে আমাদের জন্য ক্ষতিকারক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং পাকিস্তানের অনুকূলে মার্কিন ৭ম নৌ-বহরের সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পূর্বেই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় আমাদের চট্টগ্রাম পৌঁছতে হবে।

ইতিপূর্বেই আমি মিরেশ্বরাইয়ের নিকট গেরিলা তৎপরতায় লিপ্ত আমাদের নিয়মিত কোম্পানী এবং মিরেশ্বরাই ও সীতাকুণ্ড এলাকার সকল গেরিলা গ্রুপকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম যে, তারা যেন শত্রুর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। ৯ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে প্রতিটি গেরিলা দল মহাসড়ক অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে তারা গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে সড়কের দিকে আসছিলো এবং এতে করে ২০ মাইল দীর্ঘ এবং ১০ মাইল প্রস্থ জুড়ে এলাকায় এমন একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, মনে হচ্ছিলো মুক্তিবাহিনীর পুরো একটি 'কোর'ই বোধহয় আক্রমণ চালিয়েছে। সেই রাতেই পাকিস্তানীরা পশ্চাদপসরণের আদেশের জন্য অপেক্ষা না করেই পেছনের দিকে পালিয়ে যায়।

এদিকে আমরা যখন একটি জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করছিলাম আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে তখন চলছিলো আরেক খেলা, কিছু আমাদের সমর্থনে আবার কিছু ছিলো আমাদের বিরুদ্ধে। ৫ই ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের পক্ষে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির জন্য যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিলো, সোভিয়েট ইউনিয়ন তাতে 'ভেটো' দেয়। পাকিস্তান যখন হেরে যাচ্ছিলো সেই মুহূর্তে যুদ্ধ বিরতি মানা হলে ইসলামাবাদেরই তাতে সুবিধে হতো। আর আমরা যেটুকু অর্জন করেছিলাম তা-ও হারাতাম।

এর পরের দিন অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রি মিসেস ইন্দিরা গান্ধী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের ঘোষণা করলে তা মুক্তিযোদ্ধাদের এবং বাংলাদেশের জনগণের মনোবলকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানের বন্দীশালায় আটক শেখ মুজিবুর রহমানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সেদিন মিসেস গান্ধী বলেছিলেন "এই নবজাত রাষ্ট্রের যিনি জনক, বর্তমান মুহূর্তে আমাদের সমস্ত চিন্তা তাঁকেই কেন্দ্র করে।"

৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সৈন্য প্রত্যাহারের একটি প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হয়েছিলো। প্রস্তাবটির উদ্যোক্তা ছিলেন মার্কিন সরকার। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন পাকিস্তানকে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ বিরতির পক্ষে ভোট দিয়েছিলো। প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট পড়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের। বৃটেন, ফ্রান্স এবং অন্য ৮টি দেশ ভোট দান থেকে বিরত থাকে।

সাধারণ পরিষদে মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণের বিষয়টি আমাদের কাছে তেমন বিস্ময়ের কিছু ছিলো না। এতে এমন কিছুই ঘটেনি যা আমাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে। ভারত, পাকিস্তান কিংবা এই মহতী জাতি সংস্থার অন্যান্য সদস্য হয়তো এই প্রস্তাব মানতে বাধ্য। কিন্তু আমরা তখনো জাতিসংঘের

সদস্য নই। এবং তাই এ প্রস্তাব মানতে বাধ্যও নই। আমরা যুদ্ধ করছিলাম নির্যাতিত বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুক্ত করতে। আমাদের এই লক্ষ্য ছিলো অত্যন্ত পবিত্র আর সেই লক্ষ্য অর্জনের প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম। এমনকি এ সময় যদি ৭ম নৌ-বহর পাকিস্তানের সহায়তা করার জন্য যেকোনো ভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তো তবুও আমরা এই মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যেতাম। ৭ম নৌ-বহরের যুদ্ধে যোগদানের ফলে হয়তো বাংলার আরো অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারাতো। কিন্তু মৃত্যু আর ধ্বংসযজ্ঞ এ দু'টোর কোনটিই তখন এদেশের মানুষের অজানা কিছু নয়। পাকিস্তানের জন্য এই যুদ্ধ ছিলো নিছক জয় এবং পরাজয়ের। কিন্তু আমাদের জন্য এই যুদ্ধ ছিলো জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার মরণপণ সংগ্রাম অন্যথায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার। এ যুদ্ধ আমাদের দেবে গৌরবময় জীবনের সন্ধান নতুবা মৃত্যু।

ভারতের চীফ অব আর্মী ষ্টাফ জেনারেল এস. এইচ. এফ. মানেকশ যুদ্ধের এক নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন ৮ই ডিসেম্বর থেকে। যৌথ বাহিনীর সাফল্যে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে তিনি এক সময়োচিত মনস্তাত্বিক যুদ্ধ (সাইকোলজিক্যাল ওয়ার) শুরু করেন। তাঁর ভাষণ পর্যায়ক্রমে বেতারে প্রচারিত হতে থাকে। অন্যদিকে এই ভাষণ প্রচার পত্রের মাধ্যমে বিমানের সহায়তায় পাকিস্তানী অবস্থান সমূহের ওপর বিলি করা হয়। বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের উদ্দেশ্যে মানেকশ তাঁর বার্তায় সরাসরি বলেন, "অস্ত্র সংবরণ করো, নইলে মৃত্যু অবধারিত। যৌথবাহিনী তোমাদের চারিদক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তোমাদের বিমান বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস, ওদিয়ে আর কোনো সাহায্য পাবে না। বন্দরগুলোও এখন অবরুদ্ধ, তাই বাইরে থেকেও কোনো সাহয্যে পাওয়ার আশা বৃথা। মুক্তিবাহিনী এবং জনগণ এখন প্রতিশোধ নিতে উদ্যত। তোমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।" সেই সাথে তিনি তাদের এই আশ্বাসও দেন, "সময় থাকতে অস্ত্র সংবরণ করলে তোমাদের সৈনিকদের যোগ্য মর্যাদা দেয়া হবে।"

মুক্তিযোদ্ধারা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী দীর্ঘদিন একত্রে থেকে কাজ করে আসছিলো। ১০ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সিনিয়র কমাণ্ডারদের অধীনে ভারত এবং বাংলাদেশ বাহিনীর এক যৌথ কমাণ্ড গড়ে তোলা হয়।

এই দিনই (১০ই ডিসেম্বর) ঢাকা রেডিও-র ট্রান্সমিটারের ওপর সরাসরি এক বিমান হামলায় বেতার প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। 'ভীক্রান্ত'-এর বিমান বহর তখন চট্টগ্রাম পোর্ট, বিমান বন্দর ও সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কেন্দ্রের ওপর সমানে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলো।

ভারতের ৫৭ মাউণ্টেন ডিভিশন এবং মুক্তিবাহিনী এ সময়ে আশুগঞ্জে মেঘনা নদীর পূর্ব তীরে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। দু' হাজার গজ প্রশস্ত প্রমত্তা মেঘনা তখন তাদের সামনে প্রধান বাধা। পাকিস্তানীরা, বিশেষ করে তাদের ২৭ ব্রিগেডের সৈন্যরা এখান দিয়ে পশ্চাদপসরণের সময় রেলওয়ে ব্রিজটি ধ্বংস করে দেয়। ব্রিজের দুটি স্প্যান যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাড়াতাড়ি এটা মেরামতের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং সুযোগ-সুবিধা যৌথবাহিনীর হাতে ছিলো না। কিন্তু এখানেও সেই একই প্রয়োজনীয়তা যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের ঢাকা মুক্ত করতে হবে।

তাই আশুগঞ্জে নদী অতিক্রমের এক স্মরণীয় অভিযানের বন্দোবস্ত করা হয়। প্রায় চৌদ্দটি এম-আই-৪ হেলিকপ্টার ভারতের ৩১১ মাউণ্টেন ব্রিগেডকে প্রায় শতাধিক দফায় নদীর এপারে এনে দেয়। এতে সময় লেগেছিলো ৩৬ ঘণ্টারও বেশি। পাশের গ্রামগুলোর হাজার হাজার বাঙ্গালী যৌথবাহিনীকে নদী পার হতে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিলো। ছোট বড় বিভিন্ন আকারের অসংখ্য নৌকা এবং অন্যান্য নৌযান কাজে লাগানো হয়েছিলো। এক একটি নৌকায় মালামাল বোঝাই করে লোকজন তা পার করে দিচ্ছিলো। উভচর ট্যাংকগুলো নদী পার হওয়ার জন্য পানিতে নেমে পড়ে, কিন্তু তীব্র স্রোতের মধ্যে চলতে গিয়ে এগুলোর ইঞ্জিন ভীষণ গরম হয়ে যায়। এ অবস্থায় এগুলোকে নৌকা অথবা টাগ দিয়ে টেনে নদী পার করতে হয়। ১১ই ডিসেম্বরের মধ্যে যৌথবাহিনীর চার ব্যাটালিয়ন সৈন্য, পিটি-৭৬ ট্যাংকের একটি বহর, মাউণ্টেন আর্টিলারীর দুটি ব্যাটারী, ১২০ এম-এম মর্টারের একটি ব্যাটারী এবং চারটি মাঝারি শ্রেণীর কামান মেঘনার ওপারে পার করে নিয়ে আসা হয়। আশুগঞ্জের রেল সেতুর কয়েক মাইল দক্ষিণে নদী পার হওয়ার পর যৌথ বাহিনী নরসিংদী-ডেমরা অক্ষ বরাবর তাদের যাত্রা শুরু করে। ১১ই ডিসেম্বরেই নরসিংদী মুক্ত হয়। ভৈরবে পাকিস্তানীদের অবশিষ্ট যে দু-একটি প্রতিরক্ষা ঘাঁটি ছিলো তাও ধ্বংস হয়ে যায়।

এরপর যৌথ বাহিনী ১৪ই ডিসেম্বর শীতলক্ষ্যার পাড়ে ডেমরায় পাকিস্তানীদের মোকাবিলা করে। যৌথ বাহিনী এখানে অবস্থান গ্রহণ করার পর বাংলাদেশের একটি ব্যাটালিয়ন আরো উত্তরে সরে গিয়ে একই দিন শীতলক্ষ্যা পার হয় এবং রূপগঞ্জ মুক্ত করে। আরেকটি বাংলাদেশ ব্যাটালিয়ন পুলিগাঁও বরাবর নদী পার হয়।

ওদিকে চাঁদপুর মুক্ত করার পর ভারতের ৩০১ মাউণ্টেন ব্রিগেড ১৪ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে দাউদকান্দি ঘাটে এসে জমায়েত হয়েছিলো। দাউদকান্দি থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র সমেত এই ব্রিগেডকে হেলিকপ্টার যোগে গোমতী

নদী পার করে মেঘনা নদী তীরবর্তী বৈদ্যের বাজারে নিয়ে আসা হয়। বৈদ্যের বাজার থেকে এরা হেলিকপ্টার ও নৌ-যানযোগে নারায়ণগঞ্জে যাওয়ার নির্দেশ পায়। এই দলের কিছু সৈন্য সড়ক পথেও যাত্রা শুরু করে। ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে ৩০১ ব্রিগেডের অধিকাংশ সৈন্য শীতলক্ষ্যার পূর্ব পাড়ে পৌঁছে কিন্তু তারা নদী পার হওয়ার আগেই যুদ্ধ বিরতি হয়ে যায়।

এই অংশে অগ্রসরমান যৌথ বাহিনীকে অনেকগুলো দুর্লংঘ নদী পার হতে হয়েছিলো। এসব নদীর সেতুগুলো পলায়নপর পাকিস্তানীরা ভেঙ্গে দিয়েছিলো। কিন্তু পথের কোনো বাধাই যৌথ বাহিনীর অগ্রাভিযান ঠেকাতে পারেনি। যেখানেই যৌথ বাহিনী কোনো প্রতিবন্ধকতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানেই হাজার হাজার গ্রামবাসী আকুল আগ্রহে এগিয়ে এসেছে যৌথ বাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে। বিজয়ী যৌথ বাহিনী যে পথেই অগ্রসর হয়েছে এ দেশের রাজধানী ঢাকাকে মুক্ত করতে, যে পথে-প্রান্তরে, মাঠের আলপথে দৃপ্ত পদক্ষেপে চলেছে যৌথ বাহিনীর বীর সেনানীরা—তাদের পাশাপাশি তেমনি জয়ের উল্লাসে এগিয়ে গেছে এই বাংলার অসংখ্য মানুষ—ছেলে-বুড়ো-নারী। তারা কাঁধে আর মাথায় বয়ে চলেছে যৌথ বাহিনীর সামরিক সরঞ্জামের বোঝা। রিকসা, গরুরগাড়ী, নৌকা বা অন্যান্য যানবাহন যাই পেয়েছে তাই দিয়ে বাংলার মানুষ যৌথ বাহিনীর সামরিক সরঞ্জামাদি-গোলাবারুদ ইত্যাদি সবকিছু বহনে সাহায্য করেছে। বাংলার অসহায় সেই সব মানুষ শুধু চেয়েছে—দ্রুত অতি দ্রুত এগিয়ে যাক যৌথবাহিনী, মুক্ত করুক প্রতিটি অঞ্চল—মুক্ত করুক বাংলার রাজধানী, দ্রুত হউক খুনী পাকিস্তানীদের ধ্বংস, বন্ধ হউক বাঙালী হত্যাযজ্ঞ। আর তাই বাংলার অসংখ্য মানুষ যৌথবাহিনীর চাইতেও দ্রুত এগিয়ে চলেছে পথে-প্রান্তরে, মেঠো পথ বেয়ে নদী-নালা বাধা বিপত্তি সবকিছু পার হয়ে। সে ছিলো এক অনন্য দৃশ্য। একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা চলে জনগণের এই অবিস্মরণীয় সহযোগিতার ফলেই পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় ত্বরান্বিত এবং সুনিশ্চিত হয়েছে।

মার্কিন ৭ম নৌ-বহরের টাস্ক ফোর্স ইতিমধ্যেই মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করে দ্রুত বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মার্কিনী এই বহরে ছিলো পারমাণবিক শক্তি চালিত বিশাল বিমানবাহী জাহাজ 'এণ্টারপ্রাইজ' এবং আরো ৬টি যুদ্ধ জাহাজ। এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অজুহাত ছিলো: 'বাংলাদেশে মার্কিন নাগরিকদের সরিয়ে নেয়ার জন্যই ৭ম নৌ-বহরকে এই অঞ্চলে আনা হচ্ছে।' এই যুক্তি মার্কিন জনসাধারণের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিলো না, কারণ আমাদের যৌথ কমাণ্ড ১১ই ডিসেম্বর থেকে বিমান হামলা সাময়িকভাবে

স্থগিত রেখে ঢাকা বিমান বন্দর মোরামতের সুযোগ করে দেয়, যাতে আন্তর্জাতিক পথের বিমানগুলোতে বিদেশী নাগরিকরা ঢাকা ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে এসময়ে ঢাকা ত্যাগের তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি।

ততক্ষণে যুদ্ধ সম্পর্কে সবাই স্পষ্ট ধারণা করতে পারছিলো। যৌথ বাহিনী সাফল্যের সাথে মেঘনার ওপারে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের পর সামরিক বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে ঢাকার পতন ঘটবে। নিয়াজী অবশ্য তখনো নিরাপদে ঢাকায় বসে হুংকার দিচ্ছিলেন, 'প্রতি ইঞ্চি জায়গার জন্য একটি প্রাণ বেঁচে থাকা পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবো'। রাও ফরমান আলী কিন্তু ঠিকই বুঝেছিলেন খেলা শেষ। বাংলাদেশে পাকিস্তানীরা যে জঘণ্য অপরাধ করেছিলো "অপারেশন জেনোসাইডে"র অন্যতম স্থপতি ফরমান আলী সে বিষয়ে পুরো সচেতন হয়ে পড়েছিলেন। পরাজয় তখন অবশ্যম্ভাবী। মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে ১১ই ডিসেম্বর তিনি যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘ সদর দফতরে এক আবেদন জানান। ফরমান আলী এখানকার সকল পাকিস্তানীকে অপসারণের ব্যবস্থা করারও অনুরোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহিয়া খান জাতিসংঘকে জানিয়ে দেন যে ফরমান আলীর প্রস্তাব 'অনুমোদিত'।

ইয়াহিয়ার তখনো আশা, যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন তাঁকে উদ্ধার করতে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে। নিয়াজীকে তিনি 'আরেকটু অপেক্ষা' করার জন্য নির্দেশ দেন।

চীন বোধহয় একটা অজুহাতের জন্যই অপেক্ষা করছিলো। আর ৪ঠা ডিসেম্বর মার্কিন ৭ম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে।

চট্টগ্রাম সেক্টরে আমাদের সকল সৈন্য ৯ই ডিসেম্বর বিকালের মধ্যে শুভপুর সেতু বরাবর ফেনী নদী পার হয়ে যায়। সামনে শত্রুরা কোথায় কি অবস্থায় আছে পর্যবেক্ষণের জন্য আমরা যথারীতি টহলদার দল আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পাকিস্তানীরা মিরেশ্বরাই ছেড়ে যাচ্ছে বলে ১০ই ডিসেম্বর একজন গেরিলা বেস কমাণ্ডার আমাকে খবর দেয়। মিরেশ্বরাই থেকে ১৫ মাইল দূরে গিয়ে সীতাকুণ্ডতে তারা নাকি নতুনভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছে। আমি সাথে সাথে মিরেশ্বরাই দখল করার জন্য একটি ব্যাটালিয়ন পাঠিয়ে দেই। তখনো আমাদের কোন যানবাহন ফেনী নদী পার হতে পারেনি। ব্যাটালিয়নের সৈন্যদের তাই পায়ে হেটেই অগ্রসর হতে হচ্ছিলো। ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও মালপত্র নেয়ার জন্য কয়েকটি রিক্সা ও গরুর গাড়ী জোগাড় করা হয়।

বিকেলে আমি পরিষদ সদস্য জনাব মোশাররফ হোসেনকে নিয়ে একখানি রিক্সায় মিরেশ্বরাইয়ের দিকে যাত্রা শুরু করি। আমাদের ব্যাটালিয়নও তখন একই দিকে মার্চ করে যাচ্ছিলো। পথে তাদের পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে যাই। অবশ্য এই ভাবে একা সামনে এগিয়ে যাওয়া ছিলো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। পাকিস্তানীরা ঠিক কোথায় রয়েছে তখনো আমরা তা জানতাম না। তারা সকলেই মিরেশ্বরাই ত্যাগ করেছে কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা ছিলো না। তবু আমি ঝুঁকি নিয়ে মিরেশ্বরাই পৌঁছে দেখি, একটু আগে শত্রু সেনারা সে স্থান ছেড়ে চলে গেছে। স্থানীয় কয়েকজন কর্মকর্তা মিরেশ্বরাই হাইস্কুল ভবনে আমার সাথে একত্র হলেন। পাকিস্তানীরা আবার রাতে ফিরে আসতে পারে বলে তারা আশঙ্কা করছিলেন। আমাদের তখন অত্যন্ত দ্রুত চট্টগ্রাম দখল করা দরকার। তাই মিরেশ্বরাইতে আমরা দ্রুত প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তুললাম। এপ্রিল ও মে মাসে এই অঞ্চলেই আমরা যুদ্ধ করেছিলাম, তাই পুরো এলাকাটি আমার এবং আমার অধিকাংশ সৈন্যের কাছে ছিলো সুপরিচিত। মিরেশ্বরাইতে আমরা বেসামরিক প্রশাসন চালু করি। করেরহাটে অবস্থানরত ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার আনন্দ স্বরূপকে আমার নতুন অবস্থানের কথা জানিয়ে তাঁকে সত্বর এখানে চলে আসার অনুরোধ জানাই। চট্টগ্রামের পথে শত্রু সেনার সঠিক অবস্থান জানার জন্য একটি টহলদার দলকে পাঠিয়ে দেই মিরেশ্বরাই থেকে সীতাকুণ্ডের দিকে। ভোরেই আবার যাত্রা শুরু করতে হবে। তাই মিরেশ্বরাই হাইস্কুলে সে রাতটা কাটালাম।

পরেরদিন স্বল্পকালীন সংঘর্ষের পরই সীতাকুণ্ডে শত্রুদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। সীতাকুণ্ড অতিক্রম করার পর ১৩ই ডিসেম্বর কুমিরায় পৌঁছে আমরা পাকিস্তানীদের শক্তিশালী ঘাঁটির সম্মুখীন হই। ভূমি বৈশিষ্ট্যের কারণে এই জায়গাটি শত্রুদের খুবই অনুকূলে ছিলো। পশ্চিমে সাগর এবং পূর্বে উঁচু পাহাড়ের মধ্যবর্তী সরু এলাকা জুড়ে পাকিস্তানীরা সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে বসেছিলো। সড়কের একস্থানে গভীর খালের ওপর সেতুটি ওরা ধ্বংস করে দিয়েছিলো। রাস্তার ওপর প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী উঁচু পাহাড়ে যক্ষ্মা হাসপাতালের কাছে ছিলো তাদের মূল প্রতিরক্ষা ঘাঁটি। পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা উভয়পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ হয়। আমাদের কয়েকজন সংঘর্ষে হতাহত হলেও পরদিন সকালের মধ্যে আমরা পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হই। বেসামরিক জনসাধারণ শত্রু সেনাদের অবস্থান সম্পর্কে আমাদে খবরাখবর দিচ্ছিলো। সংবাদ অনুযায়ী সঠিক লক্ষ্যস্থলের ওপর কামান দেগে ওদের ঘায়েল করছিলাম। ১৪ই ডিসেম্বর ভোর রাত ৩টায় আমরা কুমিরা পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করে ফেলি।

চট্টগ্রাম এখন মাত্র ১২ মাইল দূরে। কুমিরা মুক্ত হওয়ার মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে আমাদের যানবাহন এবং কামানগুলো ভাঙ্গা সেতু এড়িয়ে খাল পার হতে শুরু করে। কয়েক হাজার নারী পুরুষ ও শিশু ভাঙ্গা সেতুর কাছে জমায়েত হয়ে আমাদের সাহায্য করেছিলো। একদল খালের খাড়া পার কেটে 'ডাইভারসন' রোডের ব্যবস্থা করছিলো। অন্যদল আবার গাছ পাথর, মাটি যা কিছু পাচ্ছিলো তাই দিয়ে খাল ভরে ফেলার চেষ্টা করছিলো। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখেছিলাম। এই সময় এক বৃদ্ধা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "বাবা, চিন্তা করো না। এ কাজ আমরাই পারবো। দ্যাখো তোমাদের মালপত্র আর গাড়ী ঘোড়া কিভাবে পার করার বন্দোবস্ত করছি। দরকার হলে আমরা সবাই খালে শুয়ে পড়বো। আর তার ওপর দিয়ে তোমাদের গাড়ী পার করার ব্যবস্থা করবো। দেরী করোনা বাবা। প্রত্যেক মুহূর্তে ওরা আমাদের লোক মারছে।" বৃদ্ধা একটু থামলেন। তার দুই চোখ পানিতে ভরে গেছে। বৃদ্ধা বলে চললেন "তোমরা জানো না, কিছুদিন আগে ঈদের সময়ে চাঁটগায়ে একটি লোকাল ট্রেন থামিয়ে ওরা সকল বাঙ্গালী যাত্রীকে খুন করেছে। প্রায় এক হাজার হবে। দা-ছুরি এসব দিয়ে মেরেছে। বাচ্চাদেরও মেরেছে। আমার মেয়ে আর নাতী-নাতনীও ছিলো—আর বলতে পারবো না....তোমরাও এগিয়ে যাও, তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও।" তিনি আমাকে প্রায় ঠেলে দিয়েই আবার কাজে ফিরে গেলেন। আমিও পাকিস্তানীদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা শুনেছিলাম। তবে চট্টগ্রামের সর্বশেষ যে খবর আমি পেয়েছিলাম, তা ছিলো আরো ভয়াবহ। পাকিস্তানী সামরিক জান্তা এবং অবাঙ্গালীরা সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা করেছিলো চট্টগ্রাম শহরের কয়েক হাজার বাঙালীকে নির্বিচারে হত্যা করতে। এটা ছিলো তাদের শেষ মরণ কামড়।

একই দিন (১৪ই ডিসেম্বর) ঢাকাতেও বেছে বেছে অনেক বাঙালীকে হত্যা করা হয়। রাও ফরমান আলী এজন্য ১৫০০ লোকের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন বুদ্ধিজীবী, বিশেষ বিশেষ পেশার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং সরকারী কর্মকর্তা। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা বাঙ্গালী। ফরমান আলীর নির্দেশে তালিকাভুক্ত অনেককেই আল-বদর ও আল-শামস্ এর লোকেরা ধরে নিয়ে যায়। এবং তারপরই এসব বাঙালীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। পরে বধ্যভূমিতে তাঁদের লাশ পাওয়া গিয়েছিলো বটে, কিন্তু প্রায় কাউকেই আর সনাক্ত করা যায়নি। পীঠমোড়া করে হাত বেঁধে জঘন্যতম পন্থায় তাঁদের প্রাণ সংহার করা হয়েছিলো। কারো চোখ তুলে নেয়া হয়েছিলো, কারো বা মাথার খুলি ছিলো চূর্ণ বিচূর্ণ। পশুকেও মানুষ এমন নৃশংসভাবে বধ

করে না। কিন্তু মানুষরূপী নর ঘাতক পাকিস্তানীরা এবং তাদের ঘৃণ্য দোসর আল-বদর আর আল-শামস্‌রা তাই করেছিলো।

এই সময় প্রতিরোধ অব্যাহত রাখার যথার্থতা সম্পর্কে পাকিস্তানের কমাণ্ডের উচ্চ পর্যায়ে মতভেদের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিলো। উপরের নেতাদের ডিঙ্গিয়ে জাতিসংঘ হেড কোয়ার্টারে রাও ফরমান আলীর প্রস্তাব এই মতানৈক্যকে আরো প্রকট করে তোলে। ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশী সাংবাদিক, কূটনীতিক ও জাতিসংঘ কর্মকর্তারাও পাকিস্তানী হাই কমাণ্ডকে বাস্তবমুখী হতে এবং যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে ঢাকার শহরতলী এলাকায় ভারতীয় কামানের গোলা এসে পড়ছিলো, নগরীর কয়েকটি স্থানে রাস্তায় রাস্তায় মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা লড়াই করছিলো। যৌথ বাহিনীর আসন্ন উপস্থিতি মানুষের মধ্যে আনন্দের বার্তা বয়ে আনে। পাকিস্তানী অবস্থান গুলোর ওপর আঘাত হানার জন্য ঢাকার আকাশে রূপালী ডানার ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলো দেখা দেয়া মাত্রই ছেলে বুড় নারী সবাই ছাদে উঠে কিংবা রাস্তায় নেমে হাত নেড়ে নেড়ে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছিলো। অন্যদিকে বিষাদ মলিন পাকিস্তানী সৈন্যরা নিদারুণ ভয়ে আশংকায় জড়াজড়ি করে ট্রেঞ্চের ভেতরে বসে প্রাণ বাঁচাবার চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছিলো। নিয়াজী তখনো দ্বিধার মধ্যে ছিলেন। প্রদেশের বেসামরিক গভর্ণর ডাঃ মালেকও মন স্থির করে উঠতে পারেনি। ভারতীয় বিমানগুলোর হামলায় এরপর অবশ্য ডাঃ মালেকের সিদ্ধান্ত নিতে আর দেরি হয়নি। ১৪ই ডিসেম্বর গভর্ণর হাউসে (বর্তমান বঙ্গভবন) মালেক সাহেব মন্ত্রি সভার মিটিং করছিলেন। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা যথাসময়ে খবরটি বিভিন্ন চ্যানেলে যৌথ বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে ভারতীয় বিমানগুলো ঢাকার আকাশে এসে পড়ে এবং গভর্ণর হাউসের উপর সরাসরি আঘাত হানতে থাকে। বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলাগুলির মধ্য দিয়ে ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলো ড্রাইভ দিয়ে একটির পর একটি রকেট নিক্ষেপ করতে লাগলো। রকেটের আঘাতে গভর্ণর হাউসের এক একটি অংশ যখন হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ছিলো সেই সময় ভীত সন্ত্রস্ত ডাঃ মালেক আর কাল বিলম্ব না করে ইয়াহিয়া খানের সমীপে তার পদত্যাগ পত্র লিখে ফেলেন। একই পথ অনুসরণ করেন মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যও। তারপর তারা দ্রুত গিয়ে হোটেল ইণ্টারকণ্টিনেণ্টালে আশ্রয় নেন। হোটেলটিকে যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিলো।

এদিকে পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণ করার জন্য জেনারেল মানেকশর নির্দেশ রেডিওর মাধ্যমে বার বার প্রচার করা হচ্ছিলো। বাংলাদেশে শত্রু বাহিনীর

কমাণ্ডারদের নিকট ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধানের এবারের বক্তব্য ছিলো "আমি আবার বলছি, আর প্রতিরোধ করা নিরর্থক, ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢাকার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ঢাকা গ্যারিসন এখন সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের কামানের আওতায়।"

তবে ভারতীয় জেনারেল তাদেরকে এই আশ্বাসও দেন যে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে আত্মসমর্পণ করলে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী তারা পুরোপুরি যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা পাবে।

সেই সন্ধ্যায়ই ইয়াহিয়া হঠাৎ তার মনোভাব পরিবর্তন করে নিয়াজী এবং মালেককে যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে বলেন। ইয়াহিয়ার চিন্তা, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য এবং তাদের বশংবদদের প্রাণ কিভাবে রক্ষা করা যায়।

এতক্ষণে নিয়াজীর বোধোদয় হলো, তিনি বুঝতে পারলেন সকল দায়িত্ব তার ঘাড়েই চাপবে। চীন এবং মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রশ্ন তোলাতে ইয়াহিয়ার কাছ থেকে যখন কোন নিশ্চিত জবাব মিলছিলোনা, নিয়াজীর স্বপ্ন তখনই ভেঙ্গে গিয়েছিলো। অবস্থা তখন খুবই সঙ্গীন। তাঁর ৯ এবং ১৬ ডিভিশন দুটো পশ্চিম এবং উত্তর পশ্চিম সেক্টরে আটক। ঢাকা আসতে পারছে না। ময়মনসিংহের ব্রিগেডটির কোন খবর নেই। পূর্ব সেক্টর থেকে অল্প কয়েকজনই শুধু ঢাকা পালিয়ে আসতে পেরেছে, ইতিমধ্যেই তার হাজার হাজার সৈন্য ও অফিসার আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। হতাহতের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। সৈন্যদের ওপর তিনি যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন এই সোজা কথাটি এখন তার অজানা নেই। নিয়াজী আরো বুঝলেন বাকি সৈন্যরা এখন তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা না করেই আত্মসমর্পণ করবে। অবশ্যম্ভাবী পরাজয় এবং সম্ভাব্য ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে নিয়াজী শেষ রক্ষার চেষ্টায় মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে এই শর্তও আরোপ করেন যে, কয়েকটি নির্ধারিত এলাকায় তাঁর সৈন্যদের আবার সমবেত হতে দিতে হবে, ভারতীয় বাহিনীর সম্মতি অনুযায়ীই এসব জায়গা ঠিক করা হবে এবং সেখান থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরার বন্দোবস্ত করতে হবে। পরের দিন প্রস্তাবটি ভারত সরকারের হাতে পৌঁছে।

ততোক্ষণে বঙ্গোপসাগরে ৭ম নৌ-বহরের অনুপ্রবেশে পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে উঠেছিলো। চট্টগ্রামের কোন সমুদ্র উপকূলে টাস্ক ফোর্স-এর মার্কিন বাহিনী অবতরণ করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিলো। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা চট্টগ্রাম মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেই। সেই উদ্দেশ্যে ভারতের ২৩ ডিভিশনের ৮৩ ব্রিগেড লাকসাম থেকে দ্রুত যাত্রা শুরু করে এবং কুমিরার কাছে আমাদের সাথে যোগ দেয়। অন্যদিকে ভারতের বিমান বাহিনী ও ইস্টার্ণ ফ্লিট

পাকিস্তানী অবস্থানগুলোর ওপর অবিরাম বোমা বর্ষণ করে চলছিলো। এখানকার পাকবাহিনীকে ধ্বংস করা এবং পোর্ট অচল করে দেয়ার জন্যই এই আক্রমণ চলছিলো। বোমার আঘাতে জ্বালানী তেলের ট্যাংকগুলো কয়েকদিন ধরে জ্বলছিলো। ক্ষতিগ্রস্ত এবং নিমজ্জিত জাহাজের সংখ্যাও ছিলো প্রচুর। ডুবন্ত চ্যানেল প্রায় পুরোপুরি বন্ধ। পোর্টের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিলো ব্যাপক। ৫০০ এবং ১০০ পাউণ্ড বোমার গর্তগুলো ভরাট এবং ধ্বংস স্তূপ পরিষ্কার করতে পরে সময় লেগেছিলো এক বছরেরও বেশি।

মুক্তিযোদ্ধারা খবর নিয়ে এলো যে কিছু পাকিস্তানী অফিসার ও সৈন্য কক্সবাজার হয়ে স্থলপথে বার্মায় পালাবার চেষ্টা করছে। কেউ কেউ আবার জাহাজে করে কেটে পড়বার চেষ্টা করছে। কয়েকটি পাকিস্তানী জাহাজকে বিদেশী জাহাজের মতো রং লাগিয়ে এবং বিদেশী পতাকা উড়িয়ে ছদ্মবেশে পালাবার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এই খবর ভারতের ইষ্টার্ণ ফ্লিটকে পাঠালে ইষ্টার্ণ ফ্লিট সতর্ক হয়ে যায়। ছদ্মবেশে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি পাকিস্তানী জাহাজ 'ভীক্রান্ত'এর গোলায় মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বার্মা দিয়ে পাকিস্তানীদের পালাবার চেষ্টা বন্ধ করার জন্য এ সময়ে কক্স-বাজারে একটি অভিযানের পরিকল্পনা নেয়া হয়। সেই উদ্দেশ্যে "রোম ফোর্স" নামে গঠিত এক নতুন বাহিনী সৃষ্টি হয়। এই বাহিনীতে ছিলো ভারতের ১/২ গুর্খা রাইফেলস্ এবং ১১ বিহার রেজিমেণ্টের দুটি কোম্পানী। মর্টার সজ্জিত এই বাহিনী ভারতের একখানি সওদাগরী জাহাজে ১৪ই ডিসেম্বর কক্সবাজারের উপকূলে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সহায়তায় রোম ফোর্স তীরে অবতরণ করে। কিন্তু ঐ এলাকায় কোন পাকিস্তানীকে অবশ্য তারা পায়নি।

ঢাকার চারদিকে নদী-নালা ইত্যাদির যেসব প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা ছিলো, ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে তার প্রায় সবগুলোই মিত্রবাহিনী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। ঢাকার মাত্র কয়েক মাইল দূর থেকে ভারতীয় মর্টার ও কামানগুলো শহর ও শহরতলী অঞ্চলের সামরিক লক্ষ্য বস্তুগুলোর ওপর তখন অবিরাম আঘাত হেনে চলছিলো। এ সময়ে জেনারেল মানেকশ নিয়াজীর ১৪ই ডিসেম্বরের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বলেন, তিনি (নিয়াজী) আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতি হতে পারে না। তবে শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসাবে জেনারেল মানেকশ ১৫ই ডিসেম্বর ভোর ৫টা থেকে ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৯টা পর্যন্ত ঢাকার ওপর সকল প্রকার বিমান হামলা বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেন। যোগাযোগের সুবিধার জন্য তিনি বিশেষ একটি ফ্রিকোয়েন্সি নির্ধারণ করে তা নিয়াজীকে জানিয়ে দেন এবং

সেই অয়্যারলেস ফ্রিকোয়েন্সিতে সরাসরি নিয়াজীর জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। নিয়াজীকে তিনি এই অভয়ও দেন যে, "আমার কমাণ্ডের সৈন্যরা কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে না।" একই সঙ্গে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন, "আমার কথা (শর্তহীন আত্মসমর্পন) অনুযায়ী আপনি (নিয়াজী) আত্মসমর্পণ না করলে ১৬ই ডিসেম্বর বেলা ৯টায় আবার পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ শুরু করা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর থাকবে না।"

ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান নিশ্চিত ভাবেই বিজয়ীর আসন থেকে বিজিতের প্রতি কথাগুলো বলেছিলেন। যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল সম্পর্কে সকলেই তখন নিশ্চিত। বাংলাদেশের যুদ্ধের জন্য আগত ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকটি দলকে এই সময় চীন এবং পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তের দিকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কারণ তখন তাদের আর বাংলাদেশে থাকবার তেমন দরকার ছিলো না। যৌথ বাহিনীর স্বল্প প্রচেষ্টায় স্বল্পতম সময়ে বিজয় তখন সম্পূর্ণ নিশ্চিত বলেই এসব সৈন্যকে বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নেয়া শুরু হয়।

১৫ই ডিসেম্বর গভীর রাতে পাকিস্তানের চীফ অব আর্মী ষ্টাফের কাছ থেকে নিয়াজী শেষ নির্দেশ লাভ করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ আত্মসমর্পণের যে শর্ত দিয়েছেন যুদ্ধবিরতির জন্য তা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে এতে নিয়াজীকে পরামর্শ দেয়া হয়। এই রাতেই দু'টার মধ্যে বাংলাদেশের যে সব স্থানে পাকিস্তানী সেনাদল অবস্থান করছিলো নিয়াজী তাদেরকে অয়্যার-লেস যোগে যুদ্ধবিরতি পালন এবং যৌথবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ জারী করে দেন।

রাত শেষ হয়ে আসে। ১৬ই ডিসেম্বর শেষরাতের দিকে ভারতীয় ৯৫ মাউণ্টেন ব্রিগেডের কমাণ্ডে নিয়োজিত ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার নিয়াজীর হেড-কোয়ার্টারের একটি অয়্যারলেস মেসেজ ইণ্টারসেপ্ট করেন। এই বার্তায় ভোর ৫টা থেকে নিয়াজী তাঁর সকল সেনাদলকে যুদ্ধ-বিরতি পালন করতে বলেছিলেন। ক্লেয়ার সাথে সাথে এই অয়্যারলেস বার্তার কথা জেনারেল নাগরাকে জানিয়ে দেন। পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর ব্রিগেড কমাণ্ডার এবং ডিভিশনাল কমাণ্ডার মীরপুর ব্রিজের কাছে দ্বিতীয় ছত্রী ব্যাটালিয়ন যেখানে অবস্থান করছিলো সেখানে পৌঁছান। সেখানে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় প্যারা-ব্যাটালিয়ন থেকে তাঁরা জানতে পারলেন যে ভোর ৫টার পর ব্রিজের কাছে আর গোলাগুলী হয়নি। এরপর জেনারেল নাগরা তাঁর একজন এডিসি এবং ভারতীয় ছত্রী ব্যাটালিয়নের একজন অফিসারকে শ্বেত-পতাকাবাহী একটি জীপে করে ব্রিজের অপর পাড়ে পাঠিয়ে দেন। তখন বেলা ৯টা। জীপের আরোহীরা নিয়াজীর

উদ্দেশ্যে লেখা জেনারেল নাগরার একটি বার্তা বহন করছিলো। রণক্ষেত্রের কঠোরতার পরিবর্তে বার্তাটিতে নাটকীয়তাই ছিলো একটু বেশি। জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী এবং জেনারেল নাগরা দুজন ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে পরিচিত। সম্ভবতঃ তাই বার্তাটি ছিলো নরম সুরের ; "প্রিয় আবদুল্লাহ, আমি এসে পড়েছি। তোমার সব বাহাদুরী আর খেলা শেষ। আমার কাছে এখন আত্মসমর্পণ করবে, এই আমার উপদেশ।" পাকিস্তানের জন্য সত্যই তখন সকল খেলা শেষ। নিজ বাহিনীর প্রতি যুদ্ধবিরতি এবং আত্মসমর্পণ করার যে নির্দেশ নিয়াজী জারী করেছিলেন, ১৬ই ডিসেম্বর সকালেই তা ভারত সরকারকে জানিয়ে দেয়ার জন্য তিনি ঢাকাস্থ মার্কিন সামরিক এ্যাটাচীকে অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধ যথারীতি ভারতের মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে ভারত সরকারকে জানানো হয়।

চট্টগ্রাম এলাকায় আমরা তখন কুমিরার দক্ষিণে আরো কয়েকটি স্থান শত্রু মুক্ত করে ফেলেছি। আমাদের যাত্রা বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে এসব জায়গায় কিছু কিছু পাকিস্তানী সৈন্য অবস্থান করছিলো। পথের সকল বাধা দূর করে ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা ভাটিয়ারীর শক্তিশালী শত্রু ঘাঁটির সম্মুখীন হই। এখান থেকে ফৌজদারহাট এলাকা পর্যন্ত পাকিস্তানীরা দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষামূলক ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলো। এখানে তাদের অধিকাংশ এবং সমরাস্ত্র এনেও মোতায়েন করছিলো। আমাদেরও লক্ষ্য ছিলো কিভাবে এই কমপ্লেক্স আমরা ধ্বংস করতে পারি। যুদ্ধ করতে করতে ওরা যদি চট্টগ্রাম শহরের মধ্যে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করতে পারে তাহলে আমরা পড়বো বিপদে। বাড়ীঘর অধ্যুষিত এলাকায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে প্রতিটি বাড়ীই আত্মরক্ষাকারীর আড়াল হিসাবে কাজে লাগাতে পারবে। সেই পরিস্থিতিতে শহরের মধ্যে পা বাড়ানো আমাদের জন্য দুরূহ হয়ে পড়বে।

তাই ফৌজদারহাট এবং চট্টগ্রামের মাঝখানে শত্রুদের অবরোধ করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নেই। উদ্দেশ্য ছিলো ভাটিয়ারী এবং ফৌজদারহাটে অবস্থান গ্রহণকারী সৈন্যরা যেন পেছনে গিয়ে শহরে প্রবেশ করতে না পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রুবাহিনীর পেছনে আমাদের সৈন্যরা তাদের (শত্রুদের) পশ্চাদপসরণের পথ রুদ্ধকরে রাখবে এবং সামনে থেকে আমাদের অবশিষ্ট অংশ আক্রমণ চালাবে। অভিযানের এই পদ্ধতি কতকটা "ঘাড়ে ধরে মুখে আঘাত করার মতো" বলা যেতে পারে। সেই অনুসারে ভারতের ৮৩ ব্রিগেডের দুটি ব্যাটালিয়ন, রাজপুত এবং ৩ ডোগরাকে পেছনের পথ বন্ধ করে দেয়ার জন্য পাঠানো হয়। ভারতের তৃতীয় আরেকটি ব্যাটালিয়ন সম্মুখ

সমরে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ব্যাটালিয়নের সাথে যোগ দেয়। পূর্বোক্ত ব্যাটালিয়ন দুটি রাতের আঁধারে সড়ক থেকে প্রায় ১৫ মাইল পূর্ব দিক দিয়ে পাহাড়ী রাস্তা ধরে ফৌজদারহাটের কিছুটা দক্ষিণে গিয়ে আবার সড়কে উঠবে এবং সেখানে রাস্তা বন্ধ করে অবস্থান গ্রহণ করবে—এই ছিলো তাদের প্রতি নির্দেশ। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান এই দলের মালামাল বহনের জন্য প্রায় ১২০০ বেসামরিক লোক জোগাড় করা হয়। প্রয়োজনীয় সব জিনিসই এই বাহিনীর সাথে থাকবে যাতে তারা অন্ততঃ ৪ দিন চলতে পারে। খাদ্যদ্রব্য, গোলাবারুদ, ট্যাংক বিধ্বংসী কামান, মর্টার, মাটি খোঁড়ার সরঞ্জাম, রান্নার উনুন এবং অন্যান্য তৈজসপত্র পুরো দুটি ব্যাটালিয়নের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই বহন করতে হবে। এ ছাড়া বেসামরিক লোকজন যারা যাবে তাদের খাদ্য এবং কিছু জ্বালানি কাঠও সঙ্গে থাকবে।

১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার কিছু আগেই ব্যাটালিয়ন দুটি পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যাত্রা শুরু করে। স্থানীয় কিছু লোক আগে আগে থাকে 'গাইড' হিসাবে। এই অভিযানের সাফল্যের ওপরই চট্টগ্রামে আমাদের চূড়ান্ত লড়াইয়ের ফলাফল নির্ভর করছে।

ইতিমধ্যে আমার নির্দেশে মিরেশ্বরাই এবং সীতাকুণ্ড এলাকার প্রায় ২০০০ গেরিলা একত্র হয়ে কয়েকটি নির্ধারিত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। যথাসময়ে তারাও লড়াইয়ে যোগ দেবে। শহর এলাকা ভালভাবে জানে বলে রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তারা খুব কাজে লাগবে। তাই এদেরকে একত্র করে শহরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখলাম।

ভাটিয়ারীতে ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আমরা পাকিস্তানীদের প্রথম রক্ষাব্যূহের ওপর আক্রমণ চালাই। দুটি কোম্পানীর এই আক্রমণ ওরা প্রতিহত করে দেয়, আমাদের পক্ষে হতাহত হয় ২০ জন। ১৬ই ডিসেম্বর অগ্রবর্তী দলটি শত্রু পেছনে ব্যারিকেড সৃষ্টি করার পরই আমাদের আসল আক্রমণ শুরু হবে। তাই আমরা পরের দিন প্রধান হামলা চালাবার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করি।

ঢাকার অদূরে ভারতীয় জেঃ নাগরা যে দুজন অফিসার জেঃ নিয়াজীর কাছে পাঠিয়েছিলেন তারা ২ ঘণ্টা পর ১১ টার দিকে ফিরে আসেন। তাদের জীপের পেছনে পেছনে একখানি গাড়ীতে করে আসেন পাকিস্তানের ৩৬ ডিভিশনের কমাণ্ডার জেনারেল মোহাম্মদ জামসেদ। জেনারেল নিয়াজীর সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। এরপর নাগরা এবং আরো কয়েকজন অফিসারকে জামশেদের হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে তারা নিয়াজীর অফিসে যান। নিয়াজীর অফিসে

যাওয়ার প্রাক্কালে নাগরা কলকাতাস্থ ইস্টার্ণ কমাণ্ডের হেড কোয়ার্টার এবং ৪র্থ কোরের হেড কোয়ার্টারে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে যথারীতি খবর পাঠিয়ে দেন। এর আগে সকাল সাড়ে আটটার দিকে নিয়াজী অয়্যারলেস যোগে মানেকশকে আত্মসমর্পণের সর্বশেষ মেয়াদ আরও ৬ ঘণ্টা বাড়িয়ে দেয়ার অনুরোধ করে-ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি আরো অনুরোধ করেন যে, আত্মসমর্পণের শর্তাবলী নির্ধারণ করার জন্য তিনি যেন একজন সিনিয়র ভারতীয় সামরিক অফিসারকে ঢাকা পাঠিয়ে দেন।

এতসব ঘটনা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা ভাটিয়ারীতে তখনও যুদ্ধে লিপ্ত। আমাদের অগ্রবর্তী দল সাফল্যের সঙ্গে পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলো। কথা ছিলো ১৬ই ডিসেম্বর কোন এক সময়ে তারা শত্রুর পেছনের দিকের রাস্তা বন্ধ করে অয়্যারলেসে সে খবর আমাদেরকে জানিয়ে দেবে। আমরা সবাই তখন তাদের খবর শোনার জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম।

নাগরার কাছ থেকে নিয়াজীর আত্মসমর্পণের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে জেনারেল অরোরা তাঁর চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকবকে বিমানযোগে ঢাকা পাঠিয়ে দেন। ততক্ষণে নীরপুরে যৌথ বাহিনী ব্রিজ পার হয়ে ঢাকায় প্রবেশ করতে শুরু করে। এ সময়ে নগরীর রাস্তাঘাট ছিলো জনমানবশূণ্য।

মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সৈন্যদের রাজধানীতে প্রবেশের খবর দাবানলের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। উল্লাসের বাঁধ ভাংগা জোয়ারে ঢাকার লক্ষ লক্ষ লোক নেমে আসে রাস্তায়। জনমানবহীন নিঃশব্দ নগরী মুহূর্তে ভরে ওঠে মানুষের বিজয় উল্লাসে। 'ওরা এসেছে' এই বাণী উচ্চারিত হতে থাকে মানু-ষের মুখে মুখে। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধ্বনি ওঠে "জয় বাংলা"—সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। যৌথ বাহিনীর জন্যে মানুষ এগিয়ে আসে ফুলের ডালি নিয়ে—হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা নিয়ে।

ঢাকায় সেদিন একদিকে চলছিল মানুষের বিজয় মিছিল। তারই পাশাপাশি ছিলো পরাজিত পাকিস্তানীদের পলায়নের হাস্যকর দৃশ্য। কিন্তু মানুষ যে কত জিঘাংসা পরায়ণ হতে পারে পাকিস্তানীরা তার এক নতুন নজির সৃষ্টি করে-ছিলো। পালিয়ে যাবার সেই মুহূর্তেও পাকিস্তানীরা বিভিন্ন জায়গায় নিরীহ মানুষের ওপর এলোপাতাড়ি গুলী চালায়। ফলে বহু নিরীহ বাঙালী হতাহত হয়।

আত্মসমর্পণের একটি খসড়া দলিলসহ মেজর জেনারেল জ্যাকব বেলা ১টায় জেনারেল অরোরার হেডকোয়ার্টার থেকে ঢাকায় অবতরণ করলেন। বেলা ২টা ৫০ মিনিটে জেনারেল অরোরা তাঁর সৈনিক জীবনের সবচাইতে আকাঙ্খিত বার্তাটি পেয়ে গেলেন। জীবনে খুব কম সংখ্যক সেনানায়কই এমন

বার্তা পেয়েছেন। বার্তাটি ছিলো নিয়াজী তাঁর সেনাবাহিনীর সকলকে নিয়ে আত্মসমর্পণে রাজী হয়েছেন এবং আত্মসমর্পণের দলিলেও স্বাক্ষর করেছেন। পশ্চিম সেক্টরে পাকিস্তানী ৯ ডিভিশনের জি ও সি মেজর জেনারেল আনসারীর আত্মসমর্পণ পর্বও ততোক্ষণে সাঙ্গ হয়েছে। বিকাল ৩ টার মধ্যে মুক্তিবাহিনীর শত শত তরুণ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ব্রিগেড বিজয়ীর বেশে রাজধানী ঢাকায় প্রবেশ করে। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের জন্য জেনারেল অরোরা তাঁর বিমান ও নৌ-বাহিনীর চীফ অব স্টাফকে নিয়ে একটু পরেই ঢাকায় অবতরণ করলেন।

আমার বিশ্বস্ত জেসিও সুবেদার আজিজ এবং ১৫ বছরের এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা এতসব ঘটনার কিছুই অবহিত ছিলোনা। দুজনই তখন ভাটিয়ারীতে অন্যান্যের সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ। পাকিস্তানীদের একটি খালের অপর পাড়ে হটিয়ে দিয়ে পুনরায় আক্রমণ পরিচালনার জন্য তারা অবস্থান গ্রহণ করছিলো। অল্প বয়স্ক ছেলেটি কাছেরই এক গ্রামের। ওদের গ্রাম এর আগেই শত্রুমুক্ত হয়েছে। মা-বাবার সাথে দেখা করার জন্য ১৫ই ডিসেম্বর তাকে ১২ ঘণ্টার ছুটি দিয়েছিলাম। কিন্তু সে প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলো, "না স্যার। চট্টগ্রাম মুক্ত করার পরই আমি বাড়ী ফিরবো। ক'দিনই বা আর লাগবে"। আত্মসমর্পণের জন্য নিয়াজীর নির্দেশ তখনো তাঁর সকল সেনাদলের কাছে পৌঁছায়নি। আমরা জানতাম না যে, বেলা ৪টা ৩১ মিনিটে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হচ্ছে।

চট্টগ্রাম শহর থেকে মাত্র ৬ মাইল দূরে মহাসড়কের ওপর ভাটিয়ারী দখলের জন্য আমরা তখন লড়াই করছি। আক্রমণ চালাচ্ছে মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানী। ঘড়িতে তখন বেলা ৪টা ৩০ মিনিট। ঢাকায় এবং অন্যান্য জায়াগায় অস্ত্রের গর্জন থেমে গেছে। নিয়াজী এবং অরোরা হয়তো হাতে কলম নিয়ে আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন। নিয়তির নির্মম পরিহাস। ঠিক সেই মুহূর্তে ঢাকা থেকে ১৬০ মাইল দূরে পাকিস্তনীদের একটি কামানের গোলা আমার অধীনস্থ মুক্তিযোদ্ধা এই কোম্পানীর মাঝখানে এসে পড়লো।

সুবেদার আজিজ এবং ১৫ বছরের সেই ছেলেটি দু'জনই গোলার আঘাতে আহত হলো। আস্তে আস্তে পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবে গেল, সেই সাথে বাতাসে মিলিয়ে গেলো তাদের শেষ নিঃশ্বাস। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। একজন পাকিস্তানী মেজর ভাটিয়ারীর ভাঙ্গা ব্রীজের মুখে এসে দাঁড়ালো। হাতে তার সাদা পতাকা। তারা নিয়াজীর নির্দেশ পেয়ে গেছে, এখন আত্মসমর্পণ করতে চায়।

৩৭
পরিশেষ

রাণাঙ্গনে এবার নেমে আসে প্রশান্ত নীরবতা।

রাইফেল, মেশিনগান, মর্টার, কামানের গোলাগুলীর শব্দ থেমে যায়। থেমে যায় আহতের কান্না, মুমূর্ষের করুণ আর্তনাদ। নতুন এই রাত্রির প্রহর আসে কোন এক হারানো অতীতের শান্তির স্বপ্ন নিয়ে। এমনি সুন্দরের স্বপ্নে আবহমান কাল ধরে মানুষের সংগ্রাম চলেছে।

ভাটিয়ারীতে মহাসড়কের ওপর সেতুটি পাকিস্তানীরা ধ্বংস করে দিয়েছিলো। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা আর স্বেচ্ছাসেবক ১৬ই ডিসেম্বর সারারাত কাজ করলো ভাটিয়ারীর খালের মধ্য দিয়ে একটা বিকল্প রাস্তা তৈরি করতে। রাতেই আমাদের সমস্ত সৈন্য এবং গেরিলাদের চট্টগ্রাম শহরে এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য এলাকায় নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেই। ফেনীর অংশ বিশেষসহ শুভপুর পর্যন্ত এলাকার নিয়ন্ত্রণ ভার আমরা আগেই নিয়েছিলাম। আমার সম্পূর্ণ বাহিনীকে পরদিন খুব সকাল বেলায়ই চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশ করে গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণের নির্দেশ দিলাম। একটি ব্যাটালিয়নকে অবশ্য রাতেই খাল পার হয়ে শহর অভিমুখে যতদূর সম্ভব এগিয়ে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করতে পাঠিয়ে দিই।

শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সার্কিট হাউসকে আমার হেডকোয়ার্টার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্দেশ দেয়া হলো পোর্ট এলাকায় নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে এবং চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে আত্মসমর্পণের জন্য জমায়েত হতে। পাকিস্তানী বন্দীদের দায়িত্ব ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর ন্যস্ত হয়। চট্টগ্রামে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ১৬১ জন অফিসার, ৩০৫ জন জে. সি. ও এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সমপর্যায়ের লোক এবং তিন বাহিনীর ৮,৬১৮ জন সৈন্য আত্মসমর্পণ করে।

১৭ই ডিসেম্বর ভোর পর্যন্ত বিকল্প রাস্তার কাজ সম্পন্ন হলোনা। ফলে তখন পর্যন্ত সেস্থান দিয়ে গাড়ী পার করাও সম্ভব ছিলোনা। আমি পুলের

এপারে গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম একটা ছোট প্যাকেট হাতে নিয়ে। তারপর একটা লাঠিতে ভর দিয়ে খাল পার হয়ে ওপারে গিয়ে উঠলাম। দুদিন আগে কুমিরায় যুদ্ধে আহত হওয়ায় আমাকে লাঠিতে ভর দিয়ে বেশ খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছিলো।

পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে লোকজন তখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হ'তে পারেনি। তা সত্বেও শহরের কিছু লোক আমাদের এগিয়ে নেয়ার জন্য ভাটিয়ারীর ভাঙ্গা সেতু পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলো। আমি আমার এক বন্ধুর গাড়ীতে উঠে বসলাম। গাড়ী ছুটে চলল সোজা সার্কিট হাউসের দিকে।

অগণিত নারীপুরুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। পথের দুধারে দাঁড়িয়ে তারা হাত তুলে যৌথ বাহিনীর সৈন্যদের এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অভিনন্দন জানাচ্ছিলো। "জয় বাংলা" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বোধ হয় তখনো পুরো বিশ্বাস করতে পারেনি যে, সত্যিই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে বাড়ীর ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে তারা সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখছিলো। পাকিস্তানীদের তখন অস্ত্র সংবরণের পালা। বাস ও ট্রাকে করে তারা দ্রুত ছুটে পালাচ্ছিলো নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার এবং ক্যান্টনমেন্টের দিকে।

সার্কিট হাউসে তখন বহু লোক জমা হয়ে গেছে। জনতার ভীড় ঠেলে আমি এগিয়ে যাই। যুদ্ধের এ-কয় মাসে আমার দাড়ি বেশ বড় হয়ে যাওয়ায় অনেক বন্ধু এবং পরিচিতজনই আমাকে চিনতে পারলো না।

এমনি একটা সুন্দর মুহূর্তের জন্য সযত্নে এই প্যাকেটটি সাথে রেখেছি দীর্ঘ ন' মাস। এবার আমি তা খুলে ফেললাম। সুন্দর করে ভাঁজ করা বাংলাদেশের পতাকাটি একটা কিশোর ছেলের হাতে দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিলাম সার্কিট হাউসের ছাদে। সেখানে তখনো পাকিস্তানের পতাকা উড়ছিলো। ছেলেটি পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নীচে। সেখানে ওড়ানো হয় স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক—জাতীয় পতাকা। সে সময় হাজার হাজার মানুষ দৌড়ে আসছে সার্কিট হাউসের দিকে। সমস্ত এলাকা ভরে গেছে মানুষের ভীড়ে। পতাকা উত্তোলনের সময় মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ হয় উত্তাল জনসমুদ্র —অবিস্মরণীয় সেই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য। তারপর—বাতাসের দোলা লাগে, উড়তে থাকে নতুন পতাকা। নিস্তব্ধ জনতা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সেই জনসমুদ্রে ওঠে জয়ধ্বনি-"জয়বাংলা"।

পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী, ধ্বংসের পথযাত্রী একটা জাতি পেয়ে গেল স্বাধীনতা। দুঃস্বপ্নের রাতের শেষে সেই পতাকার রক্তিম সূর্য বাঙলার মানুষের জন্য নিয়ে এলো নতুন আশার বাণী। সমস্ত পৃথিবীতে সেই বিজয়ের বার্তা পৌঁছে দিতে যেন মানুষ একযোগে মুহুর্মুহু শ্লোগান দিতে থাকে "জয়বাংলা"।

শহরের প্রতিটি প্রান্ত হতে তেমনি আবেগে লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগলো "জয়-বাংলা"। খুলে গেল সমস্ত আবদ্ধ দুয়ার-বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মত বেরিয়ে আসে সকল মানুষ। দীর্ঘদিনের দুঃসহ যন্ত্রণার শেষে তারা উপভোগ করতে চাইলো উষ্ণ সূর্যালোক, মুক্ত বাতাস, সুন্দর সম্ভাবনাময় নতুন স্বাধীনতা। ভয়াবহ গণহত্যার মধ্য দিয়ে তারা বেঁচে থেকে স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করতে পারছে-একথা যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিলো না। তবুও সেই সব মানুষ বেঁচে আছে। মেঘ-মুক্ত নীল আকাশের নীচে সোনালী সূর্যের আলোকে মানুষ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে বাংলার নতুন পতাকার দিকে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পতাকাকে অভি-বাদন জানিয়ে আমি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণের জন্য, অবাক বিস্ময়ে ভুলে গেলাম আমার চার পাশের উত্তাল-জনসমুদ্রের কথা। তখন ৯টা ১৫ মিনিট, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় প্রতিটি ঘরে বিভিন্ন আকারের নতুন জাতীয় পতাকা শোভা পেতে লাগলো। শুধু ঘরের ছাদই নয়, গাছ-পালা, লাইট পোষ্ট, দোকান-পাট যেখানেই সম্ভব সেখানেই মানুষ উড়ালো নতুন পতাকা। উৎসবের সাড়া পড়ে গেলো সমস্ত শহরে। যুদ্ধের ন'মাস এমনি একটা সুন্দর মুহূর্তের জন্য প্রায় প্রতিটি বাঙালীর ঘরেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো বাংলাদেশের পতাকা। এই পতাকা রাখতে গিয়েই ধরা পড়ে অনেকেই আবার পাকিস্তানীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর সবচাইতে বেদনাময় ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটলো-হয়তো বা সাময়িকভাবে। এই নিষ্ঠুর ঘটনা ছিল অবিশ্বাস্য, আর তাই হয়তো এখানে কান্নার ভাষাও হারিয়ে গিয়েছিল। বিকৃত বিকারগ্রস্ত রক্তলিপ্সু পাকিস্তানীরা নিরীহ নারী, পুরুষ এবং শিশু হত্যার নৃশংসতায় হিটলারের নাৎসী বাহিনীকেও হার মানিয়েছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানীর পক্ষ অবলম্বণকারী দুটি সরকার ছাড়া আর সমস্ত পৃথিবীর সরকার একযোগে রুখে দাঁড়িয়েছিলো হিটলারের গণহত্যার বিরুদ্ধে। অথচ বাংলাদেশে পাকিস্তানীরা যখন গণহত্যা চালালো তখন এইসব সরকারের কয়েকটি পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং ইয়াহিয়াকে গণহত্যায় সহায়তা করলো। একটা কঠিন সত্য পৃথিবীর মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ক্রমানুয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের অনেকেরই নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। তাদের মুখে মানবতার বুলি আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

বিজয়ের মধ্য দিয়ে ন'মাসের দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটলো। বাংলার মানুষ আবার তার নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করলো। পথে প্রান্তরে—

পর্বতাঞ্চলে, নদ-নদী, খালে-বিলে, বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে বাঙালী আবার নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে। ছায়ার মতো অনুসারী মৃত্যুর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হবেনা আর। রাতের অন্ধকারে প্রতিটি অচেনা শব্দ মৃত্যুর অশুভ পদধ্বনি হয়ে আসবেনা। চারিদিকে তাই আনন্দ আর উল্লাসের ঢেউ। ২৫শে মার্চের সেই ভয়াবহ রাতের পর এই প্রথম মহিলারা নির্ভয়ে বেরুতে পারলো। ঘরের বাইরে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে ছুটে চলছে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে হাত মেলাতে। মার্চ করে চলেছে মুক্তিফৌজ। পথের দু'পাশের উচ্ছ্বসিত জনতা তাদের জানাচ্ছে প্রাণঢালা অভিনন্দন। সুখী মানুষের আনন্দ কোলাহলের সে এক অভূতপূর্ব সমাবেশ। মুক্তিযোদ্ধাদের ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছে কেউ। অনেকে গাইছে গান; নির্মম হাসিতে যেন সমস্ত মানুষের রূপ উদ্ভাসিত। কারো চোখে ছিল সুখের অশ্রুজল। একজন আনন্দের আতিশয্যে বাঁধ ভাঙ্গা চোখের পানি সামলাতে গিয়ে শাড়ীর আঁচল কামড়ে রেখেছেন দৃঢ় ভাবে। কাছেই কোথাও মাইকে বাজছিল অতি প্রিয় সেই গান, "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি"। এমনি অনেক ফুলের মত জীবনকে হয়ত আমরা যুদ্ধ করে বাঁচাতে পেরেছি। আবার অনেককেই আমরা বাঁচাতে পারিনি। আমার মনে হলো সেই সব শহীদের কথা, যারা নিজ দেশে বন্দীর মতো জীবন যাপন করছিলো। পাকিস্তানীরা এদেশকে পরিণত করেছিলো এক বন্দীশালায় যেখানে তারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে রেখেছিল বাংলার সাড়ে সাতকোটি মানুষকে। সেই বন্দী-শালায় পাকিস্তানীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত অসংখ্য মানুষের ত্যাগ আর গভীর জীবনবেদনা ছিল এতই মহান যে শ্রদ্ধায় নত হয়ে আমি অনুচ্চ স্বরে বললাম:

...এবং শান্তি, আর যুদ্ধ নয়—
তোমাদের বিদেহী আত্মার জন্য
চাই শুধু শান্তি, যুদ্ধ নয়।
এই বন্দীশালা, এখানেই ছিল
তোমাদের তীর্থের জীবন"

ইতিহাসের এই মর্মান্তিক নাটকের যবনিকাপাত সেকি বিজয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত—নাকি শোকের বেদনায় আপ্লুত? অথবা সেখানে ঘটেছে বিজয় আর বেদনার অপূর্ব সংমিশ্রণ? এই নির্মম ও অচিন্তনীয় গণহত্যাকে কি পৃথিবীর মানুষ ইতিহাসের পালাবদলের অমোঘ বিধান বলেই সমস্ত দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবে?

সার্কিট হাউসের সামনে সবুজ লনে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম সেই বিষাদময় সমস্ত ঘটনার কথা। যুদ্ধের ন'মাসের শহীদদের কথা আবার মনে পড়লো। পাকিস্তনীরা এদের হত্যা করেছিলো গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে, শহরে, মসজিদে-মন্দিরে। অনেককেই ধরে নিয়েছিলো আরো নিষ্ঠুরভাবে—অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করার জন্য। বাংলার এই অসহায় মানুষগুলো আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। কিন্তু পাকিস্তানীরা যখন এদেরকে বেঁধে নিয়ে যেতো হত্যা করার উদ্দেশ্যে, সেই মুহূর্তে এইসব অসহায় মানুষ কি ভাবতো কে জানে? তাদের আপনজনেরাই বা কি গভীর মর্মবেদনায় ভেঙ্গে পড়তো চির বিদায়ের সেই মুহূর্তে। এইসব মানুষকে যখন পাকিস্তানীরা লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করতো, রাস্তায় টেনে নিয়ে যেত জীপের পেছনে বেঁধে, বেয়োনেট আর রাইফেলের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতো, তখন মৃত্যুপথ যাত্রী সেইসব মানুষ কি ভাবতো আমরা কোনদিন তা জানবোনা। নিষ্পাপ শিশু, অবলা নারী, অসহায় বৃদ্ধ-এদের কেউই সেদিন রক্ষা পায়নি পাকিস্তানীদের হাত থেকে।

সেইসব লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন। আমার চিন্তায় বাধা পড়লো। একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন আমার দিকে। যুদ্ধে তাঁর ছেলে হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। মুখে তাঁর হাসি নেই—নেই অশ্রুজল। তিনি শান্ত, অতিশান্ত। আমাকে জড়িয়ে ধরে তিনি গভীর প্রশান্তিতে চোখ বুঁজে রইলেন কিছুক্ষণ।

মানব হৃদয়ের সেই অব্যক্ত বেদনা কেউ কোন দিন বুঝতে পারবে না।

পরিশিষ্ট-ক

টীকা ও তথ্য-নির্দেশ

রেলওয়ে বিভাগের জনাব এম. এল. করিম ও জনাব এ. কে. হকের কাঠের দোতালা বাসভবন

২ রেলওয়ে বিভাগের জনাব হকের বাসার টেলিফোন

৩ হ্যান্স জে. মর্গেনথু, মিলিটারী ইল্যুশনস্, দি নিউ রিপাবলিক, ওয়াশিংটন ডি. সি. ১৯ মার্চ, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ১৪-১৬

৪ "বাংলাদেশ ডকুমেণ্টস," ১ম খণ্ড, সংকলিত ভিয়েনা পেপারস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নয়াদিল্লী, সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পৃষ্ঠা ২০-২১

৫ "বাংলাদেশ ডকুমেণ্টস," ১ম খণ্ড, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নয়াদিল্লী, পৃষ্ঠা ১০৫-১২২

৬ জে. সেন. গুপ্ত, "এক্লিপস অব ইস্ট পাকিস্তান," কলকাতা, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ২০

৭ কে. ক্যালার্ড, "পাকিস্তান : এ পলিটিক্যাল স্টাডি," লণ্ডন, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩ এবং গ্যাঙ্কোভস্কি, "এ হিস্টোরী অব পাকিস্তান : ১৯৪৭-১৯৫৮," পৃষ্ঠা ১৯২

৮ এম. আইয়ুব খান, "ফ্রেণ্ডস নট মাস্টার্স," অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পাকিস্তান, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ১৮৭

৯ বদরুদ্দীন উমর, "পূর্ব-বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি," ১ম খণ্ড, ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯

১০ গ্যাঙ্কোভস্কি, "এ হিস্টোরী অব পাকিস্তান : ১৯৪৭-৫৮'

১১ কে. ক্যালার্ড, "পাকিস্তান : এ পলিটিক্যাল স্টাডি," লণ্ডন, ১৯৫৭ পৃষ্ঠা ১৭৪

১২ ডন, কারাচী, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭০

১৩ ডন, করাচী, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৭০

১৪ ডন, করাচী, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭০

১৫ ডন, করাচী ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭১

১৬ ডন, করাচী, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৭১
১৭ ইত্তেফাক, ঢাকা, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১
১৮ ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১
১৯ প্রাগুক্ত
২০ ডন, করাচী, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১
২১ ডন, করাচী, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১
২২ ডন, করাচী, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১
২৩ ডন, করাচী, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১
২৪ ডন, করাচী, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১
২৫ পূর্বদেশ, ঢাকা, ১লা মার্চ, ১৯৭১
২৬ ইত্তেফাক, ঢাকা, ২রা মার্চ, ১৯৭১
২৭ ইত্তেফাক, ঢাকা, ৩রা মার্চ, ১৯৭১
২৮ ইত্তেফাক, ঢাকা, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১
২৯ প্রাগুক্ত
৩০ প্রাগুক্ত
৩১ ইত্তেফাক, ঢাকা, ৭ই মার্চ, ১৯৭১
৩২ ইত্তেফাক, ঢাকা, ৮ই মার্চ, ১৯৭১
৩৩ পূর্বদেশ, ঢাকা, ৯ই মার্চ, ১৯৭১
৩৪ ইত্তেফাক, ঢাকা, ৮ই মার্চ, ১৯৭১
৩৫ ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৪ই মার্চ, ১৯৭১
৩৬ ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৫ই মার্চ, ১৯৭১
৩৭ দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১৫ই মার্চ, ১৯৭১
৩৮ পূর্বদেশ, ঢাকা, ১৫ই মার্চ, ১৯৭১
৩৯ ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৬ই মার্চ, ১৯৭১
৪০ দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১৭ই মার্চ, ১৯৭১
৪১ প্রাগুক্ত
৪২ পূর্বদেশ, ঢাকা, ১৬ই মার্চ, ১৯৭১
৪৩ ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৯শে মার্চ, ১৯৭১
৪৪ ইত্তেফাক, ঢাকা, ২০শে মার্চ, ১৯৭১
৪৫ পূর্বদেশ, ঢাকা, ২০শে মার্চ, ১৯৭১
৪৬ ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৩শে মার্চ, ১৯৭১
৪৭ **সাক্ষাৎকার : লেঃ কর্ণেল এম. এ. ওসমান চৌধুরী**

৪৮ সাক্ষাৎকার : ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ
৪৯ প্রাগুক্ত
৫০ সাক্ষাৎকার : লেঃ কর্ণেল হারুন আহমেদ চৌধুরী
৫১ জনপদ, ঢাকা, ২৫শে মার্চ, ১৯৭১
৫২ সাক্ষাৎকার : বেগম শেখ মুজিব, দৈনিক বাংলা, ঢাকা, ২৬শে মার্চ, ১৯৭২
৫৩ নিউইয়র্ক টাইমস, ২৮শে মার্চ, ১৯৭১
৫৪ সাক্ষাৎকার : মেঃ জেঃ কে. এম. সফিউল্লাহ
৫৫ পূর্বদেশ, ঢাকা, ৫ই আগস্ট, ১৯৭১
৫৬ "বাংলাদেশ ডকুমেণ্টস," ১ম খণ্ড, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নয়াদিল্লী, সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, পৃষ্ঠা ৬৭২
৫৭ সাক্ষাৎকার : লেঃ কর্ণেল এম. এ. ওসমান চৌধুরী
৫৮ প্রাগুক্ত
৫৯ দি হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, কলকাতা, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭১
৬০ সাক্ষাৎকার : লেঃ কর্ণেল এম. এ. ওসমান চৌধুরী
৬১ প্রাগুক্ত
৬২ দৈনিক বাংলা, ঢাকা, ২৬শে মার্চ, ১৯৭২
৬৩ প্রাগুক্ত
৬৪ সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ
৬৫ সাক্ষাৎকার : মেঃ জেঃ কে. এম. সফিউল্লাহ
৬৬ সাক্ষাৎকার : ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ
৬৭ পূর্বদেশ, ঢাকা, ২০শে মার্চ ১৯৭১
৬৮ সাক্ষাৎকার : মেঃ জেঃ কে. এম. সফিউল্লাহ
৬৯ প্রাগুক্ত
৭০ "বাংলাদেশ ডকুমেণ্টস," ১ম খণ্ড, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নয়াদিল্লী, পৃষ্ঠা ২৮১-৮২
৭১ সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্ণেল এম. এ. ওসমান চৌধুরী
৭২ প্রাগুক্ত
৭৩ প্রাগুক্ত
৭৪ ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইণ্ডিয়া, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭১, পৃষ্ঠা ২১-২২
৭৫ সাক্ষাৎকার : মেঃ জেঃ কে. এম. সফিউল্লাহ
৭৬ প্রাগুক্ত

৭৭ ডঃ মযহারুল ইসলাম অনুদিত "বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা," বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১৩৬
৭৮ ডন, করাচী, ১৩ই অক্টোবর, ১৯৭১
৭৯ দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ৮ই অক্টোবর, ১৯৭১
৮০ "বাংলাদেশ ডকুমেণ্টস," ২য় খণ্ড, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নয়াদিল্লী ১৯৭২, পৃষ্ঠা ২৩৭-২৭৬
৮১ পূর্বদেশ, ঢাকা, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
৮২ ডন, করাচী, ১১ই নভেম্বর, ১৯৭১
৮৩ ডন, করাচী, ২৩শে নভেম্বর, ১৯৭১
৮৪ দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৭১
৮৫ দৈনিক পাকিস্তান ঢাকা, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৭১

পরিশিষ্ট-খ

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সামরিক অফিসারগণের নাম

[একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সামরিক অফিসারদের নামের তালিকা নিম্নোক্তরূপে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই তালিকায় তাঁদের বর্তমান (জানুয়ারী ১৯৮৬) পদমর্যাদাও দেখানো হয়েছে। তালিকায় কারো নাম বাদ, ভুল অথবা পদবী যথাযথ না হলে তা একান্তই অনিচ্ছাকৃত]

হেড কোয়ার্টার ঃ বাংলাদেশ ফোর্সেস (বি. ডি. এফ)

জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী (মৃত), সর্বাধিনায়ক
এয়ার ভাইস মার্শাল এ. কে. খন্দকার, বীর উত্তম (অবঃ)
মেজর জেনারেল আবদুর রব, বীর উত্তম (মৃত)
মেজর জেনারেল নুরুল ইসলাম (অবঃ)
কর্ণেল এ. টি. এম. সালাহ্উদ্দীন, বীর প্রতীক (অবঃ)
উইং কমাণ্ডার শামসুল আলম, বীর উত্তম (অবঃ)
কর্ণেল এম. এ. ওসমান চৌধুরী (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল এম. এনামুল হক (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল এম. আবদুল মালেক মোল্লা
স্কোয়াড্রন লীডার বদরুল আলম, বীর উত্তম (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল ফজলুর রহমান, পিএসসি
মেজর ফাতাহ্ চৌধুরী (অবঃ)
ফ্লাইট লেঃ আহ্মেদ রেজা (অবঃ)
মেজর শামসুল আলম, বীর প্রতীক (মৃত)
ক্যাপ্টেন সৈয়দ মইনুদ্দীন আহমেদ, বীর প্রতীক
ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আলী (অবঃ)
লেঃ শেখ কামাল (মৃত)
ফ্লাইট লেঃ মতিউর রহমান, বীর শ্রেষ্ঠ (শহীদ)
লেঃ আনোয়ার হোসেন, বীর উত্তম (শহীদ)

১নং সেক্টর

মেজর রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম (অবঃ), সেক্টর কমাণ্ডার
মেজর জেনারেল শামসুল হক, এ. এম. সি. (পরে হেড কোয়ার্টার বিডিএফ-এ যান)
কর্ণেল খুরশীদ উদ্দিন আহমদ (অবঃ)
এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ, বীর উত্তম, পিএসসি (পরে হেড কোয়ার্টার বিডিএফ-এ যান)
মেজর জেনারেল হারুন আহমেদ চৌধুরী, বীর উত্তম
লেঃ কর্ণেল এ. ওয়াই. এম. মাহ্‌ফুজুর রহমান, বীর বিক্রম, পিএসসি (মৃত)
উইং কমাণ্ডার শাখাওয়াত হোসেন (অবঃ)
মেজর এনামুল হক (অবঃ)
মেজর শমসের মবিন চৌধুরী, বীর বিক্রম (অবঃ)
মেজর রেজাউল হক, এ. এম. সি. (অবঃ)
মেজর কামরুল ইসলাম (অবঃ)
মেজর লতিফুল আলম চৌধুরী (বরখাস্ত)
মেজর শওকত আলী, বীর প্রতীক (বরখাস্ত)
মেজর ফজলুর রহমান (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল রবিবুল ইসলাম
ক্যাপ্টেন আফতাব কাদের, বীর উত্তম (শহীদ)
ক্যাপ্টেন শামসুল হুদা (মৃত)
ক্যাপ্টেন মনসুরুল আমিন (বরখাস্ত)
মেজর এস. এম. শহীদুজ্জামান

২নং সেক্টর এবং 'কে' ফোর্স

মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তম (মৃত), সেক্টর এবং 'কে' ফোর্স কমাণ্ডার
ব্রিগেডিয়ার এম. এ. মতিন, বীর প্রতীক (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল আনোয়ারুল আলম (অবঃ)
কর্ণেল শওকত আলী (অবঃ)
ব্রিগেডিয়ার আইন উদ্দিন, বীর প্রতীক
ব্রিগেডিয়ার এম. আশরাফ হোসেন, পিএসসি
লেঃ কর্ণেল গাফফার, বীর উত্তম (বরখাস্ত)
লেঃ কর্ণেল বাহার (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল এ. টি. এম. হায়দার, বীর উত্তম (মৃত)

লেঃ কর্ণেল মেহ্‌বুবুর রহমান, বীর উত্তম (মৃত)
লেঃ কর্ণেল হারুনুর রশিদ, বীর প্রতীক, পিএসসি
লেঃ কর্ণেল ফজলুর কবীর, পিএসসি
লেঃ কর্ণেল আকবর হোসেন, বীর প্রতীক (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল ইমামুজ্জামান, বীর বিক্রম, পিএসসি
লেঃ কর্ণেল জাফর ইমাম, বীর বিক্রম (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল দিদারুল আলম, বীর প্রতীক (বরখাস্ত)
লেঃ কর্ণেল শহীদুল ইসলাম, বীর প্রতীক
লেঃ কর্ণেল এ. টি. এম. আবদুল ওহাব, পিএসসি
লেঃ কর্ণেল মুখলেসুর রহমান (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল মুস্তফা কামাল
লেঃ কর্ণেল জয়নুল আবেদীন (অবঃ)
মেজর সালেক চৌধুরী, বীর উত্তম (মৃত)
মেজর এ. আজীজ পাশা (অবঃ)
মেজর বজলুল হুদা (অবঃ)
মেজর দিদার আতোয়ার হোসেন (অবঃ)
মেজর সৈয়দ মিজানুর রহমান, পিএসসি (বরখাস্ত)
মেজর হাশ্‌মী মুস্তাফা কামাল (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল জামিল উদ্দিন আহসান, বীর প্রতীক
লেঃ কর্ণেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি
ক্যাপ্টেন হুমায়ুন কবীর, বীর প্রতীক (অবঃ)
ক্যাপ্টেন আখতার আহমেদ, বীর প্রতীক (অবঃ)
ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, বীর প্রতীক (অবঃ)
ক্যাপ্টেন মমতাজ হাসান, বীর প্রতীক (অবঃ)
লেঃ শাহ্‌রিয়ার হুদা (অবঃ)
লেঃ আজিজুল ইসলাম, বীর বিক্রম (শহীদ)
ক্যাপ্টেন আনোয়ারুল হক ভূঁইয়া (মৃত)
মেজর একরামুল হক খন্দকার (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল আবেদীন রহমান, পিএসসি
মেজর মোহাম্মদ সোলায়মান
মেজর আবদুল কাদের
মেজর কাজী মমিনুল হক (মৃত)

ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর ওসমান (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল মিরন হামিদুর রহমান
ক্যাপ্টেন সরোয়ার জাহান (অবঃ)

৩নং সেক্টর এবং 'এস' ফোর্স

মেজর জেনারেল কে. এম. সফিউল্লাহ, বীর উত্তম, পিএসসি (অবঃ), সেক্টর এবং 'এস' ফোর্স কমাণ্ডার
ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান, বীর উত্তম (অবঃ)
মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, বীর বিক্রম
মেজর জেনারেল এ. এস. এম. নাসিম, বীর বিক্রম, পিএসসি
ব্রিগেডিয়ার আবদুল মতিন, বীর প্রতীক, পিএসসি (অবঃ)
ব্রিগেডিয়ার সুবেদ আলী ভূঁইয়া, পিএসসি (সাবেক ১নং সেক্টর)
ব্রিগেডিয়ার মতিউর রহমান, বীর প্রতীক
ব্রিগেডিয়ার আজিজুর রহমান, বীর উত্তম, পিএসসি
কর্ণেল এস. এম. গোলাম হেলাল মোরশেদ খান, বীর বিক্রম, পিএসসি
কর্ণেল এজাজ আহমদ চৌধুরী
লেঃ কর্ণেল আবদুল মান্নান, বীর বিক্রম (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল এস. এম. ইব্রাহীম, বীর প্রতীক, পিএসসি
মেজর মনসুরুল ইসলাম মজুমদার (অবঃ)
মেজর আবুল হোসেন, পিএসসি
মেজর শামসুল হুদা বাচ্চু (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক, পিএসসি (অবঃ)
মেজর নাসির উদ্দিন (অবঃ)
মেজর মোহাম্মদ মুস্তাফা (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল সায়ীদ আহমেদ, বীর প্রতীক
মেজর সৈয়দ আবু সাদেক
ক্যাপ্টেন এম. কামাল চৌধুরী
ক্যাপ্টেন আহমদ আলী
লেঃ আই. এফ. বদিউজ্জামান, বীর প্রতীক (শহীদ)
লেঃ আনিস হাসান (অবঃ)
লেঃ কবির উদ্দিন (বরখাস্ত)
লেঃ সেলিম হাসান (শহীদ)

৪নং সেক্টর

মেজর জেনারেল সি. আর. দত্ত, বীর উত্তম (অব্যাহতি), সেক্টর কমাণ্ডার
কর্ণেল আবদুর রব, পিএসসি
লেঃ কর্ণেল শরিফুল হক, বীর উত্তম (অবঃ)
স্কোয়াড্রন লীডার নুরুল কাদের চৌধুরী (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল খায়রুল আনাম (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল এ. এম. রশাদে চৌধুরী, বীর প্রতীক (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল সাজ্জাদ আলী জহির, বীর প্রতীক (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল এ. এস. হেলাল উদ্দিন, পিএসসি (অবঃ)
মেজর আবদুল জলিল (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল এম. এম. কে. জেড. জালালাবাদী
লেঃ কর্ণেল নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
মেজর জহিরুল হক, বীর প্রতীক (অবঃ)
মেজর ওয়াকিউজ্জামান (অবঃ)
লেঃ আতাউর রহমান
মেজর দোস্ত মোহাম্মদ সিকদার (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল চৌধুরী মোহাম্মদ আলী
মেজর মুক্তাদির আলী (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল চন্দ্রকান্ত দাস
লেঃ কর্ণেল জীবন কানাই দাস

৫নং সেক্টর

লেঃ জেনারেল মীর শওকত আলী, বীর উত্তম, পিএসসি (অবঃ), সেক্টর কমাণ্ডার
মেজর মুসলেহ্ উদ্দিন (অবঃ), (সাবেক ১নং সেক্টর)
মেজর তাহের উদ্দিন আকঞ্জি (অবঃ)
মেজর এস. এম. খালেদ (বরখাস্ত)
লেঃ কর্ণেল আবদুর রউফ, বীর বিক্রম (অবঃ)
মেজর মাহবুবুর রহমান (অবঃ)
ক্যাপ্টেন হেলাল

৬নং সেক্টর

এয়ার ভাইস মার্শাল এম. কে. বাশার, বীর উত্তম (মৃত), সেক্টর কমাণ্ডার

এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিন, বীর প্রতীক (অবঃ)
কর্ণেল নওয়াজেশ উদ্দিন, পিএসসি (মৃত)
লেঃ কর্ণেল নজরুল হক, বীর প্রতীক (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল সুলতান শাহ্‌রিয়ার রশীদ খান (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল দেলোয়ার হোসেন, বীর প্রতীক, পিএসসি(মৃত)
লেঃ কর্ণেল মতিউর রহমান, বীর বিক্রম, পিএসসি (মৃত)
মেজর মোহাম্মদ আবদুল্লাহ
লেঃ কর্ণেল মাসুদুর রহমান, বীর প্রতীক
মেজর মেসবাহ উদ্দি ন আহমদ, বীর বিক্রম
সেকেণ্ড লেঃ এ. এম. এম. সামাদ, বীর উত্তম (শহীদ)
ফ্লাইট লেঃ ইকবাল রশীদ (অবঃ)
মেজর মোহাম্মদ আবদুস সালাম (অবঃ)
মেজর মোহাম্মদ আশরাফ-উ-দ্দৌলা (অবঃ)
মেজর খুরশীদ আলম বসুনিয়া
লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম
মেজর মফিজুর রহমান

৭নং সেক্টর

লেঃ কর্ণেল কাজী নুরুজ্জামান, বীর উত্তম (অবঃ), সেক্টর কমাণ্ডার
ব্রিগেডিয়ার গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী, বীর বিক্রম, পিএসসি (অবঃ)
কর্ণেল এম. আবদুর রশীদ, বীর প্রতীক, পিএসসি (মৃত)
মেজর নজমুল হক (মৃত)
মেজর বজলুর রশীদ (অবঃ)
মেজর আবদুল কাইয়ুম খান (বরখাস্ত)
মেজর এ. মতিন চৌধুরী (অবঃ)
মেজর আমিনুল ইসলাম
মেজর রফিকুল ইসলাম (অবঃ)
মেজর আওয়াল চৌধুরী (অবঃ)
ক্যাপ্টেন মহিউদ্দি ন জাহাঙ্গীর, বীর শ্রেষ্ঠ (শহীদ)
ক্যাপ্টেন কায়সার হক (অবঃ)
ক্যাপ্টেন ইদ্রিস (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল হারুনুর রশীদ

মেজর লিয়াকত আলী খান
লেঃ কর্ণেল এ. এল. এম. ফজলুর রহমান
ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ এ. বি. তাজুল ইসলাম (অবঃ)
মেজর জয়নাল আবেদীন খান (অবঃ)

৮নং সেক্টর

মেজর জেনারেল এম. এ. মঞ্জুর, বীর উত্তম, পিএসসি (মৃত), সেক্টর কমাণ্ডার
ব্রিগেডিয়ার শামসুদ্দিন আহমদ
কর্ণেল কে. এন. হুদা, বীর বিক্রম (মৃত)
লেঃ কর্ণেল এ. আর. আজম চৌধুরী, বীর বিক্রম (অবঃ)
ব্রিগেডিয়ার মোস্তাফিজুর রহমান, বীর বিক্রম
মেজর এম. শফিক উল্লাহ, বীর প্রতীক
মেজর অলিক কুমার গুপ্ত, বীর প্রতীক (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল ফজলুর রহমান, পিএসসি
লেঃ কর্ণেল মুজিবুর রহমান
স্কোয়াড্রন লীডার ইকবাল রশীদ (অবঃ)
মেজর এনামুল হক
মেজর মোহাম্মদ মোস্তফা (অবঃ)
মেজর রওশন ইয়াজদানী, বীর প্রতীক (মৃত)
ফ্লাইট লেঃ জামাল উদ্দিন চৌধুরী
ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহি চৌধুরী (সিভিল সার্ভিস)
ক্যাপ্টেন মাহবুব উদ্দিন আহমদ (পুলিশ সার্ভিস)
ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম

৯নং সেক্টর

মেজর এম. এ. জলিল (অবঃ), সেক্টর কমাণ্ডার
মেজর জিয়াউদ্দিন (বরখাস্ত)
মেজর শাহ্‌জাহান ওমর, বীর উত্তম (অবঃ)
মেজর মেহেদী আলী ইমাম, বীর বিক্রম (অবঃ)
মেজর আহসান উল্লাহ (বরখাস্ত)
ক্যাপ্টেন শচীন কর্মকার (অবঃ)
মেজর সৈয়দ কামাল উদ্দিন

ক্যাপ্টেন নুরুল হুদা (অবঃ, সিভিল)
ক্যাপ্টেন শামসুল আলম, বীর প্রতীক (অবঃ)
মেজর মোহাম্মদ আলী (অবঃ)
মেজর শেখ জমশেদ হোসেন (অবঃ)
মেজর এ. এফ. এম. শামসুল আরেফীন (অবঃ)
মেজর মোহাম্মদ আসাদুল হক (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান, পিএসসি

১১নং সেক্টর

কর্ণেল এম. আবু তাহের, বীর উত্তম (মৃত), সেক্টর কমাণ্ডার
কর্ণেল আবদুল আজীজ, পিএসসি
উইং কমাণ্ডার হামিদুল্লাহ, বীর প্রতীক (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল নুরুন্নবী
মেজর তাহের আহমদ, বীর প্রতীক
মেজর মিজানুর রহমান, বীর প্রতীক (অবঃ)
মেজর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অবঃ)
মেজর মাহবুবুর রহমান (অবঃ)
মেজর গিয়াস আহমদ (মৃত)
মেজর মইনুল ইসলাম (বরখাস্ত)
মেজর মোহাম্মদ ফজলুল হক (বরখাস্ত)
মেজর মোহাম্মদ খায়রুল আলম
মেজর মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

জেড ফোর্স

লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম, পিএসসি (মৃত), 'জেড' ফোর্স কমাণ্ডার
ব্রিগেডিয়ার মহসীন উদ্দিন আহমেদ, বীর বিক্রম, পিএসসি (মৃত), (সাবেক ১নং সেক্টর)
ব্রিগেডিয়ার এ. জে. এম. আমিনুল হক, বীর উত্তম (অবঃ), (সাবেক ২নং সেক্টর)
ব্রিগেডিয়ার খালেকুজ্জামান চৌধুরী (অবঃ), (সাবেক ১নং সেক্টর)
কর্ণেল শাফাৎ জামিল, বীর বিক্রম (অবঃ), (সাবেক ২নং সেক্টর)
ব্রিগেডিয়ার আনোয়ার হোসেন, বীর প্রতীক
কর্ণেল অলি আহমদ, বীর বিক্রম (অবঃ), (সাবেক ১নং সেক্টর)

ব্রিগেডিয়ার আমিন আহমদ চৌধুরী, বীর বিক্রম, পিএসসি
কর্ণেল বি. জি. পাটোয়ারী, বীর প্রতীক, পিএসসি (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল মাহবুবুল আলম, বীর প্রতীক
লেঃ কর্ণেল মোদাস্সের হোসেন খান, বীর প্রতীক (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল এস. এম. ফজলে হোসেন (মৃত)
কর্ণেল সাদেক হোসেন
লেঃ কর্ণেল এস. আই. এম. নুরুন্নবী খান, বীর বিক্রম (বরখাস্ত)
লেঃ কর্ণেল এস. এইচ. এম. বি. নূর চৌধুরী, বীর বিক্রম (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল আবদুল হালিম, পিএসসি
লেঃ কর্ণেল এম. জিয়াউদ্দিন ,বীর উত্তম (অব্যাহতি)
মেজর এ. কাইয়ুম চৌধুরী (অবঃ)
মেজর আনিসুর রহমান (অবঃ)
মেজর সৈয়দ মুনিবুর রহমান (অবঃ)
লেঃ কর্ণেল আবুবকর, বীর প্রতীক, পিএসসি
মেজর মঞ্জুর আহমদ, বীর প্রতীক (অবঃ)
মেজর ওয়ালিউল ইসলাম, বীর প্রতীক (সাবেক ১নং সেক্টর)
মেজর হাফিজুদ্দিন, বীর বিক্রম (অবঃ)
স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত, বীর উত্তম (অবঃ)
মেজর ওয়াকার হাসান, বীর প্রতীক (অবঃ)
ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান, বীর উত্তম (শহীদ)
ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ, বীর উত্তম (শহীদ)
লেঃ রফিক আহমদ সরকার (শহীদ)
লেঃ ইনদাদুল হক, বীর উত্তম (শহীদ)

পরিশিষ্ট-গ

নির্ঘন্ট

ব্যক্তি

অজয় রায়, ডঃ ২০৭
অজিত রায় ২০৭, ২১০
অরুপ রতন চৌধুরী ২০৭
অরোরা, জগজিৎ সিং, লেঃ জেনারেল ২৬৪, ২৬৭, ২৬৮, ৩০৩, ৩০৪,
অলি, ক্যাপ্টেন ৫৩, ৫৪

আইজুদ্দিন, সুবেদার ৭৭, ৭৮
আইয়ুব খান, জেনারেল ১৫, ১৯—২৫
আতাউর রহমান খান ১৫, ১৮, ১৯
আজম চৌধুরী এ. আর. ক্যাপ্টেন ১১৬, ২০০
আনসারী, ব্রিগেডিয়ার ৬, ৬০
আনসারী, জেনারেল ২৬১, ২৮০, ২৮১, ৩০৪
আবু হোসেন সরকার ১৯
আরবাব জাহানজেব, ব্রিগেডিয়ার ৫৬, ১২৫
আসগর খান, এয়ার মার্শাল (অবঃ) ৩৮, ৪৯
আলম ৫৪
আহসান, এস. এম. ভাইস মার্শাল ৩২, ৩৯
আহসান উল্লাহ, নায়েব সুবেদার ৫৬
আহমদ ৬৬
আহমদ, এম. এম. ৬৪
আরব আলী, হাবিলদার ২০০
আলমগীর কবির ২০৮
আলী আকবর, সুবেদার ২০৩
আলী যাকের ২০৮
আমিনুল হক বাদশা ২০৬

আলোকময় নাহা ২০৭
আশফাকুর রহমান ২০৬
আমিনুর রহমান ২০৬
আলী আহসান, সৈয়দ ২০৭
আনিসুজ্জামান, ডঃ ২০৭
আসাদ চৌধুরী ২০৭
আজিজ ৩০৪
আতাউল হক, সুবেদার ১৪৪
আপেল মাহমুদ ২০৭, ২০৯, ২১০
আনন্দ স্বরূপ, ব্রিগেডিয়ার ২৯৫
আব্বাস ১৫৭
আশরাফ, ক্যাপ্টেন ১৪৫
আনোয়ার, ক্যাপ্টেন ১৪৫, ২০৩
আনোয়ার, সিপাই ১৪২
আফতাব, সিপাই ১২৯
আফসার, ব্যারিষ্টার ১৭৬
আজমল হুদা মিঠু ২০৮
আবদুল আলী মালিক, ব্রিগেডিয়ার ৬৩
আবদুল মজিদ, মেজর জনারেল ২৬২
আবদুল হামিদ খান, জেনারেল ২৯, ৩০, ৫৭, ৫৯, ৬৫
আবদুল লতিফ ২০৯
আবদুল জব্বার ২০৭, ২০৯
আবদুল হক, হাবিলদার ২০১
আব্দুল্লাহ আল ফারুক ২০৬
আব্দুস শুকুর ২০৬
আবদুস শাকের, সৈয়দ ২০৬
আবদুল হাফিজ, অধ্যাপক ২০৭
আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মাওলানা ১৭, ৪৮, ৪৯
আবদুল গাফফার চৌধুরী ২০৭
আবুল হোসেন, সিপাই ১৯৩
আবুল কাশেম সন্দ্বীপ ২০৬

আবু সাঈদ, হাবিলদার ১৪২

ইউসুফ আলী, এম. অধ্যাপক ১৩৬
ইকবাল শফি, ব্রিগেডিয়ার, ৮০, ৮৮, ৯২, ১২১, ১২২, ২৬৮
ইকবাল, মেজর ৬২, ৬৩, ৭২
ইতবার, সুবেদার মেজর ৭০
ইলিয়াস, সুবেদার ২০০, ২০১
ইন্দিরা গান্ধী ১০৮, ২৪১, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৬, ২৫৭, ২৬৬—২৬৮, ২৭৫, ২৯০
ইসকান্দার মীর্জা ১৭ ১৯
ইয়াহিয়া খান. জেনারেল ২৭—৩৪, ৩৬—৩৮, ৪১—৪৪, ৪৬, ৪৮—৫০, ৫২—৫৮
৬৩—৬৬, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৯৪, ৯৫, ১৩৪, ১৫৪, ১৭০,
১৯২, ২০৭, ২১৫, ২৪৬—২৪৯, ২৫৫—২৫৮, ২৬০,
২৬৪, ২৬৭, ২৭৫, ২৯৪, ২৯৭, ২৯৮, ৩০৭

উমা চৌধুরী ২০৭
উবান, জেনারেল ২২৯
উথান্ট ৪৮
উম্মে কুলসুম ২০৭

এজাজ, লেফটেন্যান্ট ১১০, ১১২
এম. আর. আখতার মুকুল ২০৮, ২০৯
এনাম, ক্যাপ্টেন ৭৪, ৭৫

ওমর, জেনারেল ৫৩
ওসমান, মেজর ১১৫
ওয়াহাব, সুবেদার ১৯৬
ওয়াহিদুল হক ২০৭
ওসমানী, এম. এ. জি. কর্ণেল (অবঃ) ১৩৩, ১৩৪, ১৭৬, ১৭৯, ২২৯
ওসমান চৌধুরী, এম. এ. মেজর ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১৪৭, ১৪৮, ১৭৯, ১৮৪

কাজী নজরুল ইসলাম ৭৪
কাদের, ম্যানেজার ৮, ৭৭

কাদির, কর্ণেল ৫৮
কামরুজ্জামান, এ. এইচ. এম. ১৩৪
কামাল হোসেন, ডঃ ৫৬
কামাল ৬৭, ৬৯
কামাল, ক্যাপ্টেন ১১৬
কালিয়া ১০৮
কায়সার ৫৩, ৫৪, ৭৬, ৯০, ৯৭
কৃষ্ণ রাও, মেজর জেনারেল ২৬২
কল্যাণী ঘোষ ২০৭
কাদেরী কিবরিয়া ২০৭
ক্লেয়ার, ব্রিগেডিয়ার ২৭১, ৩০০
কাদের, ক্যাপ্টেন ১৫৬, ১৫৭
কাদের সিদ্দিকী ১৮৫, ২৬২
কায়কাউস, মোহাম্মদ ১৪২
কালাম, হাবিলদার ১৪৩
কাজিমউদ্দিন, সুবেদার মেজর ১৪৪
কামাল লোহানী ২০৮
কাদের এ. ব্রিগেডিয়ার ২৬১, ২৮৪
করম আলী, সুবেদার ২০৩
কামরুল হাসান ২০৭

খন্দকার, এ. কে. গ্রুপ ক্যাপ্টেন ১৭৯, ১৮০
খাজা নাজিমুদ্দীন ১৮
খাদেম হোসেন রাজা ৬০
খালেদ মোশাররফ, মেজর ১২০—১২৪, ১২৮, ১২৯, ১৬৫, ১৭৯, ১৮২, ১৯০
খালেকুজ্জামান, ক্যাপ্টেন ৮, ৫৩, ৫৪, ৭৭, ৭৮,
খিজির হায়াত, লেঃ কর্ণেল ১২১, ১২২
খোন্দকার মোশতাক আহমদ ১৩৪
খালেক, নায়েব সুবেদার ১৯৭
খালেক, এস. এম. লেঃ ১৯৭

গন্ধর্ব নাগরা, মেজর জেনারেল ২৭১

গনযালভেস, মেজর জেনারেল ২৬২
গীল, মেজর জেনারেল ২৭১
গুরবক্স সিং, মেজর জেনারেল ২৬২
গোলাম মোহাম্মদ ১৯, ১৯
গোবিন্দ হালদার ২০৯, ২২০
গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ২১০
গণি, সুবেদার ১২৯
গাজী-উল-হক ২০৭
গফফার, সুবেদার ২০০
গোফরান, নায়েব সুবেদার ১৯৭

ঘরিয়া, ব্রিগেডিয়ার ২৮০
ঘোষ, কর্ণেল ১০৯

চিত্তরঞ্জন দত্ত, মেজর ১৭৯, ১৮৩
চৌধুরী, এম. আর. লেঃ কর্ণেল ৮, ৫৫, ৬১, ৭৪, ৭৬, ১২০, ১৮০
চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ১৮
চুন্দ্রীগড়, আই. আই. ১৮
চে গুয়েভারা ১৭৫

জসীম উদ্দীন ১৫
জহির রায়হান ২০৭
জহুর আহমদ চৌধুরী ৯১
জানজুয়া, মেজর জেনারেল ৬৩
জানজুয়া, লেঃ কর্ণেল ৭৭
জয়নাল, সুবেদার ৭২
জাফর, ডাঃ ৩৭, ৩৮, ৫৩, ৫৪, ৫৯, ৬৫, ৬৬, ৭৬, ৭৮, ৯০, ৯১, ৯৭
জিয়াউর রহমান, মেজর ৮, ৫৫, ৬১, ৭৪, ৭৬—৭৮, ৮৯—৯১, ৯৭, ৯৮, ১১২ ১১৪, ১২০, ১৭৯, ১৮৫
জীবনানন্দ দাশ ১৫
জুলফিকার আলী ভুট্টো ২৮—৩২, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৪৪, ৪৯, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৮১, ১৯২

জ্যাকব, মেজর জেনারেল ৩০৩
জলিল, এম. এ., মেজর ১৪৫, ১৪৬, ১৮০, ১৮৪, ২০০
জিন্নাহ, এম. এ. ১০, ১৬
জাহাঙ্গীর, লেঃ ২০০
জিয়া, লেঃ ১৪৫, ২০০
জব্বার, নায়েব সুবেদার ১৯৯
জ। ঙ্গীর, সিপাই ১২৯

টম পাণ্ডে, ব্রিগেডিয়ার ২৭৩
টিক্কা খান, জেনারেল ৩১, ৩৯, ৪৮, ৮৪, ১৯৩,

তাজউদ্দীন আহমদ ৫৫, ১১৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৭৬, ১৭৯, ১৮৯ ২০৫, ২২৯
তাজ, লেঃ ৫০
তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ১২২
তাহের, আবু, মেজর ১৮৫
তৌফিক এলাহী চৌধুরী ১১৮
তোহা মিয়া, সিপাই ১৯৩
তাহের সুলতান, ২০৬, ২০৮
তাহেরুদ্দিন, লেঃ ১৯৭
তরিকুল্লাহ, হাবিলদার ১৯৯
তৌফিক এলাহী, ক্যাপ্টেন ২০০
তোয়াব খান, আব্দুল ২০৭

থাঁপা, লেঃ জেনারেল ২৬১
দলবীর সিং, মেজর জেনারেল ২৬১
দানেশ ১১৫
দিলওয়ার, ক্যাপ্টেন ৫১, ১৯৭
দেবদাস চক্রবর্তী ২০৭

ধর, ডি. পি. ২৩১
ধীরের দত্ত ১৫, ১৬
নওয়াজ, মেজর ১২১

গনযালভেস, মেজর জেনারেল ২৬২
গীল, মেজর জেনারেল ২৭১
গুরবক্স সিং, মেজর জেনারেল ২৬২
গোলাম মোহাম্মদ ১৯, ১৯
গোবিন্দ হালদার ২০৯, ২২০
গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ২১০
গণি, সুবেদার ১২৯
গাজী-উল-হক ২০৭
গফফার, সুবেদার ২০০
গোফরান, নায়েব সুবেদার ১৯৭

ঘরিয়া, ব্রিগেডিয়ার ২৮০
ঘোষ, কর্ণেল ১০৯

চিত্তরঞ্জন দত্ত, মেজর ১৭৯, ১৮৩
চৌধুরী, এম. আর. লেঃ কর্ণেল ৮, ৫৫, ৬১, ৭৪, ৭৬, ১২০, ১৮০
চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ১৮
চুন্দ্রীগড়, আই. আই. ১৮
চে গুয়েভারা ১৭৫

জসীম উদ্দীন ১৫
জহির রায়হান ২০৭
জহুর আহমদ চৌধুরী ৯১
জানজুয়া, মেজর জেনারেল ৬৩
জানজুয়া, লেঃ কর্ণেল ৭৭
জয়নাল, সুবেদার ৭২
জাফর, ডাঃ ৩৭, ৩৮, ৫৩, ৫৪, ৫৯, ৬৫, ৬৬, ৭৬, ৭৮, ৯০, ৯১, ৯৭
জিয়াউর রহমান, মেজর ৮, ৫৫, ৬১, ৭৪, ৭৬—৭৮, ৮৯—৯১, ৯৭, ৯৮, ১১২ ১১৪, ১২০, ১৭৯, ১৮৫
জীবনানন্দ দাশ ১৫
জুলফিকার আলী ভুট্টো ২৮—৩২, ৩৪, ৩৮, ৪৩, ৪৪, ৪৯, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৮১, ১৯২

জ্যাকব, মেজর জেনারেল ৩০৩
জলিল, এম. এ., মেজর ১৪৫, ১৪৬, ১৮০, ১৮৪, ২০০
জিন্নাহ, এম. এ. ১০, ১৬
জাহাঙ্গীর, লেঃ ২০০
জিয়া, লেঃ ১৪৫, ২০০
জব্বার, নায়েব সুবেদার ১৯৯
জ। ঙ্গীর, সিপাই ১২৯

টম পাণ্ডে, ব্রিগেডিয়ার ২৭৩
টিক্কা খান, জেনারেল ৩১, ৩৯, ৪৮, ৮৪, ১৯৩,

তাজউদ্দীন আহমদ ৫৫, ১১৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৭৬, ১৭৯, ১৮৯ ২০৫, ২২৯
তাজ, লেঃ ৫০
তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ১২২
তাহের, আবু, মেজর ১৮৫
তৌফিক এলাহী চৌধুরী ১১৮
তোহা মিয়া, সিপাই ১৯৩
তাহের সুলতান, ২০৬, ২০৮
তাহেরুদ্দিন, লেঃ ১৯৭
তরিকুল্লাহ, হাবিলদার ১৯৯
তৌফিক এলাহী, ক্যাপ্টেন ২০০
তোয়াব খান, আব্দুল ২০৭

থাঁপা, লেঃ জেনারেল ২৬১
দলবীর সিং, মেজর জেনারেল ২৬১
দানেশ ১১৫
দিলওয়ার, ক্যাপ্টেন ৫১, ১৯৭
দেবদাস চক্রবর্তী ২০৭

ধর, ডি. পি. ২৩১
ধীরের দত্ত ১৫, ১৬
নওয়াজ, মেজর ১২১

নওয়াজিশ, ক্যাপ্টেন ৬৩, ৭৯
নজর হোসেন শাহ, মেজর জেনারেল ৬৩, ২৬১, ২৭৭
নাজমুল হক, মেজর ১৭৯, ১৯৭, ১৯৮
নাসিম, ক্যাপ্টেন ১২৮
নান্নু, সিপাই ১২৯
নুরানী, মাওলানা ৪৩
নিয়াজী, এ. এ. কে., লেঃ জেনারেল ১৯৩, ২৪৮, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৯, ২৬০, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৭, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪
নঈম, এন. এ. ব্রিগেডিয়ার ২৬৯
নূরুজ্জামান, কাজী, মেজর ১২৮, ১৮২, ১৮৪
নজরুল, ক্যাপ্টেন ১৪৫, ১৯৭
নাসের, লেঃ ১৪৫
নূরুজ্জামান, মেজর (অবঃ) ১৭৯
নূরুন্নবী, লেঃ ২০৩
নাগরা, জেনারেল ৩০০–৩০৩
নারায়ণ ঘোষ ২০৮
নাসরিন আহমদ ২০৮
নিক্সন, রিচার্ড ২৫৭
নাজিম, হাবিলদার ১৪২
নিজাম, মেজর ১৪৩
নোয়াজিশ, ক্যাপ্টেন ১৯৭
নূরুল হুদা, ক্যাপ্টেন ১৯৯-২০১
নাসিমা চৌধুরী ২০৭
নওয়াজেস হোসেন ২০৭
নির্মলেন্দু গুণ ২০৭
নিতুন কুণ্ড ২০৭
নাজির আহমদ ২০৭
নজরুল ২০৬

পীরজাদা, লেঃ জেনারেল ২৯
প্রসেনজিৎ বোস ২০৮

প্রধান, মেজর ১৩৯
প্রবাল চৌধুরী ২০৭

ফরহাত ভাট্টি, ব্রিগেডিয়ার ২৭০
ফাতমী, লেঃ কর্ণেল ৫৭
ফরিদ সুবেদার ১২৮
ফজলু হক, এ. কে. ১৭, ১৮
ফিরোজ খান নুন ১৫, ১৮
ফয়েজ আহমদ ২০৭
ফজলুর রহমান, লেঃ ১৯৭
ফারুক ১৫৭
ফজলুর রহমান, সিপাই ১৯৩

বখশী যোগিন্দর সিং, ব্রিগেডিয়ার ২৭৮
বঙ্কিমচন্দ্র ১৪
বাশার, এম. কে., উইং কমাণ্ডার ১৭৯, ১৮৩
বি. এ. সিদ্দীকী ৩৯
বিদ্যাসাগর ১৪
বদিউর রহমান, হাবিলদার ১৪৩
বদরুল হাসান ২০৭
বাশার, সুবেদার ১৯৫, ১৯৬
বদি, নায়েব সুবেদার ১৯৭
বেলায়েত হোসেন, হাবিলদার ১৯৯
বেগ, লেফটেন্যান্ট ২০০, ২০১
বুলু মিয়া, নায়েব সুবেদার ২০৩
বাহার, মেজর ৮৭

ভুলু মিয়া, হাবিলদার ১৪৩

মজিদ, এম. এ., সুবেদার মেজর ১৯৮
মঞ্জুর, এম. এ., মেজর ১৮৪
মনসুর আলী, এম. ১৩৪

মধুসূদন ১৪
মযহারুল ইসলাম, ডঃ ২০৭
মজুমদার, ব্রিগেডিয়ার ৬, ৪৮, ৫৭, ৬০
মহাদেব সাহা. ২০৭
মহিউদ্দীন আহমদ ১৯
মাহমুদ-উল-ইসলাম, ডঃ ২০৭
মফিজ, সুবেদার ৮৯
মাহবুব তালুকদার ২০৭
মতিন, ক্যাপ্টেন ১১০
মতিন, এ. পাটোয়ারী, নায়েব সুবেদার ২০০
মতিউর রহমান, ক্যাপ্টেন ১২৮, ১৯৭
মতিউর রহমান ১৯৫
মজিদ মোল্লা, সুবেদার ১১৫
মনিরুজ্জামান, সুবেদার ২০০
মহিন্দর সিং বারাব, মেজর জেনারেল ২৬১, ২৮০
মল্লিক, এ. আর. ডঃ ২০৭
মতিউর রহমান, সুবেদার ১৪৪
মালেক, ডাঃ ২৯৭
মাও সেতুং ১৭৫
মাহবুবউদ্দিন আহমদ ১১৮
মানেকশ এস. এইচ., জেনারেল ২৯১, ২৯৭, ২৯৯, ৩০৩
মাহমুদ, সুদেবার ১৯৭
মাহবুব উদ্দিন ২০৬
মহিফুজ, ক্যাপ্টেন ২৪৩
মাহবুব, ক্যাপ্টেন ২০০
মান্নান ২০৫
মাধুরী চক্রবর্তী ২০৮
মিঠঠা খান, মেজর জেনারেল ৪৮, ৬৩, ৯২
মান্নান, এম. এ. ২০৭
মান্না হক ২০৭
মীর মশাররফ হোসেন ১৪
মীর শওকত আলী, মেজর ৯৭, ১৭৯, ১৮৩, ১৯৭

মুসলিম, ক্যাপ্টেন ১৯৭
মুখার্জী, লেঃ ২০০, ২০১
মুফতি মাহমুদ ৪৩
মুজিব, হাবিলদার ১৪৮, ১৪৯
মুসলিম উদ্দিন, ক্যাপ্টেন ৬৫
মুসলিম, হাবিলদার ১৪২
মুসা, সুবেদার ৮৭
মোস্তাফিজুর রহমান, ক্যাপ্টেন ২০০
মুস্তাফা আনোয়ার ২০৬
মুস্তাফিজুর রহমান, ল্যান্স নায়েব ১৪৪
মুস্তফা মনোয়ার ২০৮
মেহেরু সিং, ক্যাপ্টেন ১০৯
মেহেদী, লেঃ ১৪৫, ২০০
মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) ১৮
মোহাম্মদ জামসেদ, জেনারেল ৩০৩
মোনেম খান, আব্দুল ২২, ২৩
মোখলেস, লেঃ ১৯৫
মোরশেদ, লেঃ ১৪৫
মোহাম্মদ হোসেন, মেজর ১৪৪
মোশাররফ হোসেন, মেজর ২৩৩, ২৪৭, ২৯৫

রফিক, লেঃ ১৪৫
রফিকুল আলম ২০৭
রফিকুল ইসলাম, মেজর ৬, ৬২, ৭২, ৮১, ১৭৯, ১৮২,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪
রাও ফরমান আলী, মেজর জেনারেল ৩২, ২১৭, ২৯৪, ২৯৬
রায়না, জেনারেল ২৬১
রিজভী, মেজর (অবঃ) ৫০
রেজাউল জলিল, লেঃ কর্ণেল ১১৫, ১১৬
রথীন্দ্রনাথ রায় ২০৭, ২১০
রনেশ দাস গুপ্ত ২০৭

রোমেল ১৭৫
রব, এম. এ. লেঃ কর্ণেল ১৭৯, ১৮০
রব, ক্যাপ্টেন ১৯৬, ১৯৭
রাজু আহমদ ২০৮
রাশেদুল হোসেন ২০৬
রহিম ইয়ার ২৫৮
রহিম খান, মেজর জেনারেল ২৬২
রেজাউল করিম ২০৬

লস্কর, সুবেদার ২০০
লিয়াকত আলী খান ১৫, ১৮

শমসের মবিন, লেঃ ৫৩, ৫৪, ১১৩, ১৩২
শামসুল হক ৩৫
শাহপুর খান, কর্ণেল ৮৮
শেখ মুজিবুর রহমান ১৩, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৮১, ৮২, ৮৪, ৯৮, ১৩৪, ১৩৫, ১৪২, ২০৬, ২২৯, ২৩০, ২৪৯, ২৮৮, ২৯০
শেখ ফজলুল হক মণি ২২৯
শরিফ ২১
শচীন সিং ১০৯
শাহজাহান, লেঃ ২০০
শওকত ১৫৭
শামসুল হুদা, ক্যাপ্টেন ১৯৩, ২৫১
শরিফুল হক ডালিম, ক্যাপ্টেন ১৯৭
শাহরিয়ার, ক্যাপ্টেন ১৯৭
শফিক, হাবিলদার ১৯৮
শিবলী, ছাত্র ১৯৮, ১৯৯
শাহজাহান, শিক্ষক ২০১
শহীদুল ইসলাম ২০৬
শফিকুজ্জামান, এ. এম. ২০৫
শওকত ওসমান ২০৭

সমর দাস ২০৭, ২১০
সনজিদা খাতুন ২০৭
সদরুদ্দীন, স্কোয়াড্রন লিডার ১৯৭
সগত সিং, কোর কমাণ্ডার ২৭২
সগত সিং, লেঃ জেনারেল ২৬২
সাবেগ সিং, ব্রিগেডিয়ার ২২১, ২৩৮
সফিউল্লাহ, কে. এম., মেজর ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৭৯, ১৮২
সাফায়াত জামিল, মেজর ১২১, ১২২, ১২৩ ১২৮, ২০২, ২০৩
সামাদ লেঃ ১৯৭
সারোয়ার মোর্শেদ, ডঃ ২০৭
সালাউদ্দিন, ক্যাপ্টেন ১৯৯, ২০২
সাহেবজাদা ইয়াকুব, লেঃ জেনারেল ৩২, ৩৯
সাত্তার ৬৬, ১৪৪
সালেক উদ্দিন, নাঃ সুঃ ৫৬
সুলতান, ফ্লাঃ লেঃ ২৩৮, ২৩৯
সুকুমার বিশ্বাস ২০৬, ২০৭
সৈয়দ নজরুল ইসলাম ৫৬, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৮৯
সামসুল হুদা ২০৬
সোহরাওয়ার্দী, এইচ. এস. ১৭, ১৯, ১৮, ২০, ২১,
সিদ্দিকী, সুবেদার ১৪৫
সিদ্দিকী, এম. আর. ৩৭, ৩৮, ৫৪, ৫৯, ৬৫, ৮১, ৯১, ৯৬, ৯৭
সিকদার, টি. এইচ. ২০৬
সোবহান, হাবিলদার ২০১
সিকান্দার আবু জাফর ২০৭, ২০৯
সুভাষ দত্ত ২০৮
সুমিতা দেবী ২০৮
সুলতান মাহমুদ, লেঃ কর্ণেল ২৬১
সাইদুর রহমান, সিপাই ১২৯
সুলতান, নায়েব সুবেদার ১২৯
স্বপ্না রায় ২০৭

হরদেব সিং কেুয়ার, ব্রিগেডিয়ার ২৬২

হামিদুল্লাহ, ফ্লাইট লেঃ ১৮৫
হামুদুর রহমান ২১
হায়দার, ক্যাপ্টেন ১৮২
হায়াত, ক্যাপ্টেন ৬৭, ৬৮, ৭০
হাসান ইমাম ২০৮
হাসমত, সুবেদার ৬৭, ৬৮
হারুন, ক্যাপ্টেন ৫৩, ৫৪, ৮০, ৮১, ৮৯, ১১০, ১১৩, ১৩২
হাফিজ, ক্যাপ্টেন ২০২
হাফিজ, সুবেদার ১৪, ,১৯৭৪
হাবিব ৮৪
হাবিবুল্লাহ, কাজী ২০৬
হিরা, আর-ডি. মেজর জেনারেল ২৬২
হিটলার ৩০৭
হুদা, লেফটেন্যান্ট ১৪৫
হাবিব, মেজর ২১৫
হাই, এস. এ., কর্ণেল ১১৬
হাকিম, আবুল, নায়েব ১৪৩

সংগঠন

আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৭
আওয়ামী লীগ ১৯, ২০, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩৪, ৩৭, ৪৭, ৪৯, ৫৪, ৫৮, ৬৫, ৯০, ৯১, ৯৭, ১০৯, ১১৮, ১২২, ১৩৪, ১৭৬, ২৩০, ২৪১
এন. এস. এফ ২২
কাইয়ুম মুসলিম লীগ ৪৯, ৫২
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ৪৮, ১৭৬
পাকিস্তান পিপলস পার্টি ২৮, ৩১, ৪৯
মুসলিম লীগ ১৫, ১৭
যুক্তফ্রন্ট ১৭
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ২০
জম্মু ও কাশ্মির মুক্তিফ্রন্ট ৩০
স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৫২

রেসকোর্স মাঠের ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালের জনসভা ও ঐতিহাসিক ভাষনদানরত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ..... লক্ষ মানুষ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলো ..... 'জয় বাংলা'

লক্ষনীয়: বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত নতুন পতাকা দেখা যাচ্ছে। ৭ই মার্চ থেকে পাকিস্তানের পতাকা বাংলার মানুষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়

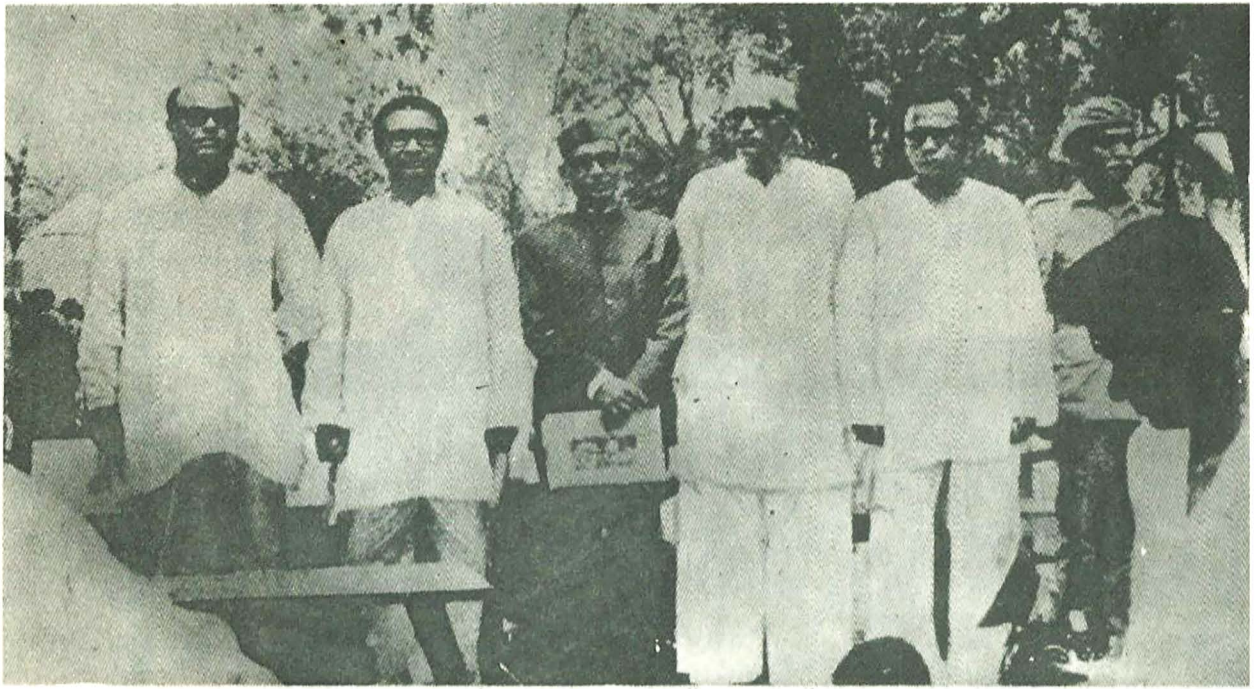

মুজিবনগরে গঠিত ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল প্রথম বাংলাদেশ সরকার। (বাম থেকে ডানে)—অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, আইন এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমাদ; অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, সর্বাধিনায়ক এম. এ. জি. ওসমানী

বীর শ্রেষ্ঠ—সাহসিকতার সর্বোচ্চ উপাধি (মরনোত্তর)
আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শহীদ সাত বীর শ্রেষ্ঠ

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

ফ্লাইট লেঃ মোহাম্মদ মতিয়ুর রহমান

ল্যান্স নায়েক আবদুর রউফ

ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ শেখ

সিপাহী মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

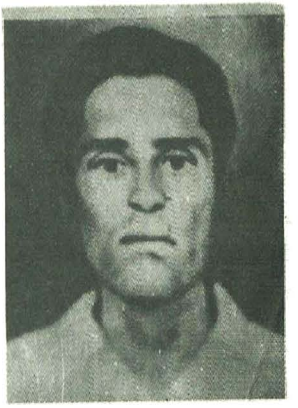

আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন

১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ বাংলাদেশ বাহিনীর ফোর্স এবং সেক্টর কমাণ্ডার বৃন্দ

বাম থেকে ডান দিকে

বসাঅবস্থায়

*লেঃ কর্ণেল খালেদ মোশাররফ ২নং সেক্টর কমাণ্ডার এবং 'কে' ফোর্স কমাণ্ডার (১৯৭১-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)	লেঃ কর্ণেল মীর শওকত আলী ৫নং সেক্টর কমাণ্ডার	লেঃ কর্ণেল এম. সফিউল্লাহ্ ৩নং সেক্টর কমাণ্ডার (১৯৭১ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) এবং 'এস' ফোর্স কমাণ্ডার	লেঃ কর্ণেল সি. আর. দত্ত ৪নং সেক্টর কমাণ্ডার	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ	*কর্ণেল এম. এ. জি. ওসমানী কমাণ্ডার-ইন-চীফ
*উইং কমাণ্ডার এম. কে. বাশার ৬নং সেক্টর কমাণ্ডার	লেঃ কর্ণেল মজুমদার (ভারতীয় সেনাবাহিনী)	*লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমান 'জেড্' ফোর্স কমাণ্ডার	লেঃ কর্ণেল কাজী নুরুজ্জামান ৭নং সেক্টর কমাণ্ডার (আগষ্ট—ডিসেম্বর '৭১)	*লেঃ কর্ণেল এম. এ. মঞ্জুর ৮নং সেক্টর কমাণ্ডার (আগষ্ট—ডিসেম্বর '৭১)	

দাঁড়িয়ে

*ক্যাপ্টেন এ. টি. এম. হায়দার ২নং সেক্টর কমাণ্ডার (ভারপ্রাপ্ত) (অক্টোবর - ডিসেম্বর '৭১)	মেজর হাবিবুল্লাহ বাহার প্রধান 'সিগনাল' অফিসার	*ক্যাপ্টেন আব্দুস সালেক চৌধুরী	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ৮নং সেক্টর কমাণ্ডার (আগষ্ট '৭১ পর্যন্ত)	ফ্লাইট লেঃ হামিদুল্লাহ ১১নং সেক্টর কমাণ্ডার (ভারপ্রাপ্ত) (নভেম্বর - ডিসেম্বর '৭১)	মেজর রফিকুল ইসলাম ১নং সেক্টর কমাণ্ডার
মেজর এ. এন. এম. নুরুজ্জামান ৩নং সেক্টর কমাণ্ডার (অক্টোবর - ডিসেম্বর '৭১)	লেঃ কর্ণেল সামসুল হক ('মেডিকেল কোর' প্রধান)	পরিচয় জানা যায়নি	পরিচয় জানা যায়নি	পরিচয় জানা যায়নি	

১৯৭২ সালের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ঢাকার ২৭ পার্ক ষ্ট্রীটে গৃহীত আলোক চিত্র

*চিহ্নিত অফিসারগণ ১৯৮৬ সালের জানুয়ারীর মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন

১১নং সেক্টর কমাণ্ডার *লেঃ কর্ণেল আবু তাহের এবং ৯নং সেক্টর কমাণ্ডার মেজর এম. এ. জলিল ছবিতোলার সময় অনুপস্থিত ছিলেন

২৫শে মার্চের রাতে পাকিস্তানীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত ছাত্রদের লাশ সার্জেণ্ট জহরুল হক হলের সামনে

জগন্নাথ হলের সামনের মাঠে ২৫শে মার্চ রাতে নিহত ছাত্রদের লাশ

১ম বেঙ্গল রেজিমেণ্টের সৈনিকদের কবর। ২৯শে মার্চের রাতে ঘুমের মধ্যে পাকিস্তানীরা এদেরকে আক্রমণ করে এবং হত্যা করে।

যশোর। ১৯শে মার্চ। আরেকটি বাঙালীর মৃতদেহ।

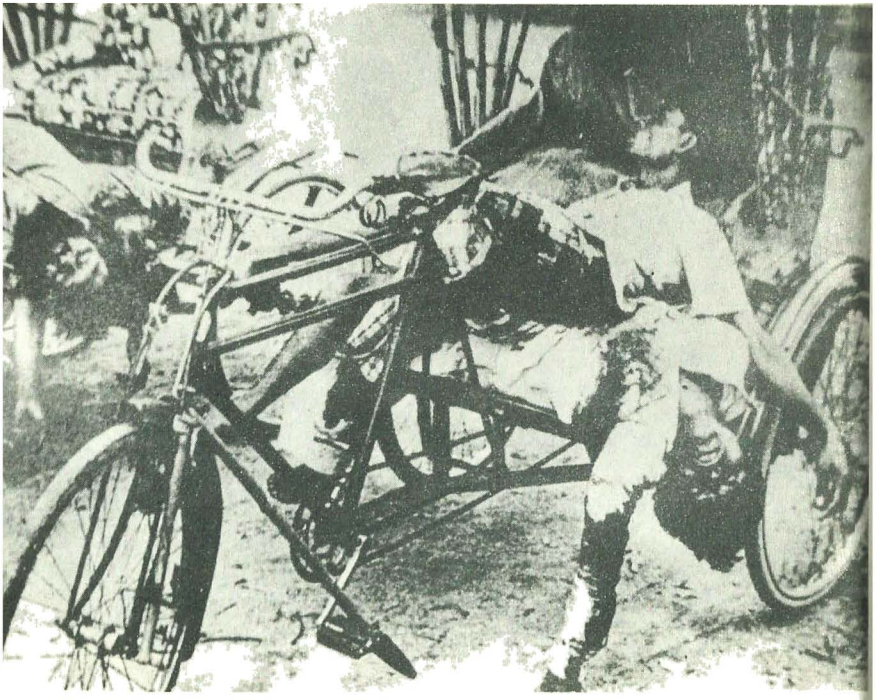

পাকিস্তানীদের হাতে রাজপথে নিহত বাঙালী (সৌজন্যে—টাইম ম্যাগাজিন)

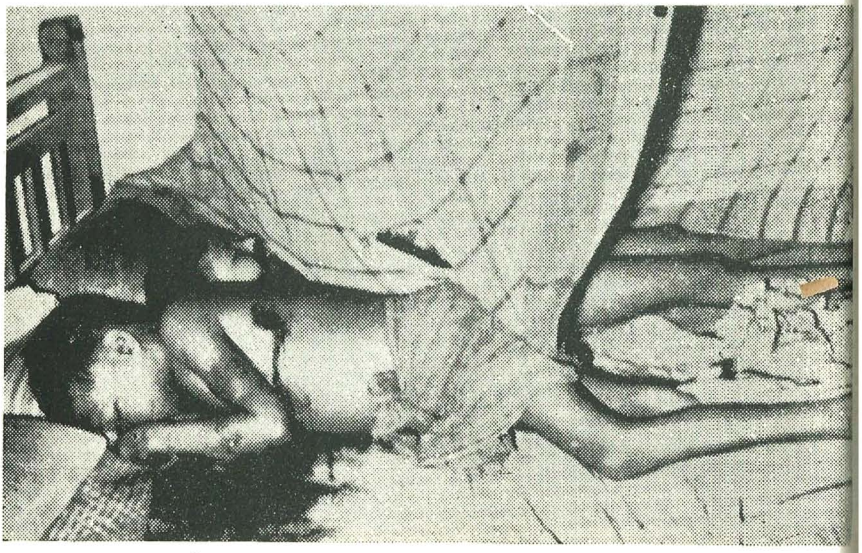

রক্ত পিপাসু বিকৃত মস্তিষ্ক পাকিস্তানীদের হাত থেকে
শিশুরাও রেহাই পায়নি

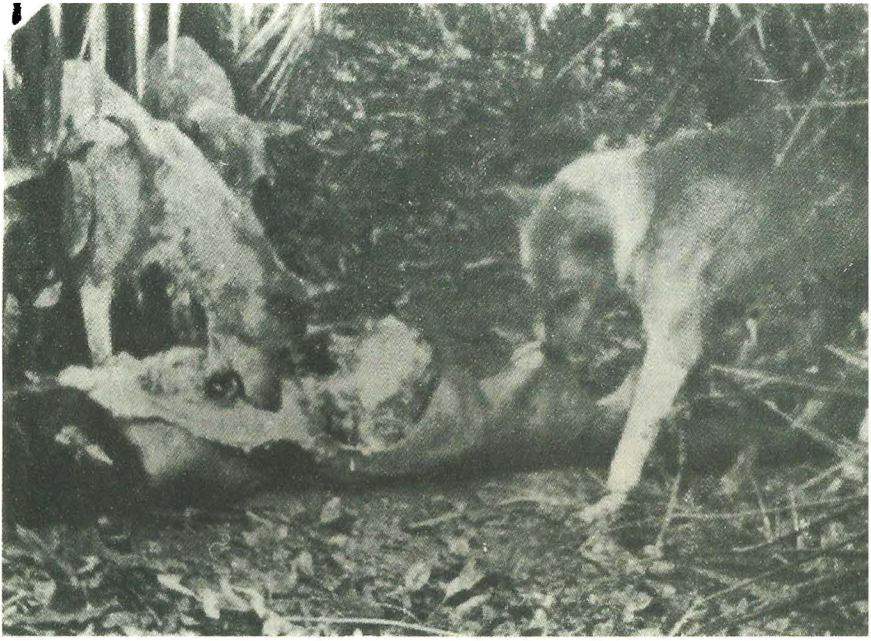

....পাকিস্তানীরা মেয়েটিকে তাদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। এক মাস পরে একটা ঝোঁপের পাশে শেয়ালে অর্ধেক খেয়ে ফেলা তার মৃতদেহ পড়ে থাকে

.....দড়ি দিয়ে বাঁধা বাঙালী যুবকদের লাশ। কুষ্টিয়ায় পাকিস্তানী মিলিটারী ক্যাম্পের পাশের দৃশ্য

"প্রায় প্রতিটি বাঙালী যুগ
যুগ ধরে বয়ে চলবে এমনি
অসংখ্য অবর্ণনীয় বেদনার স্মৃতি"
যশোহরের প্রেমতলায় এই বাঙালী
পরিবারকে পাকিস্তানীরা হত্যা
করে মাটি চাপা দিয়ে যায়

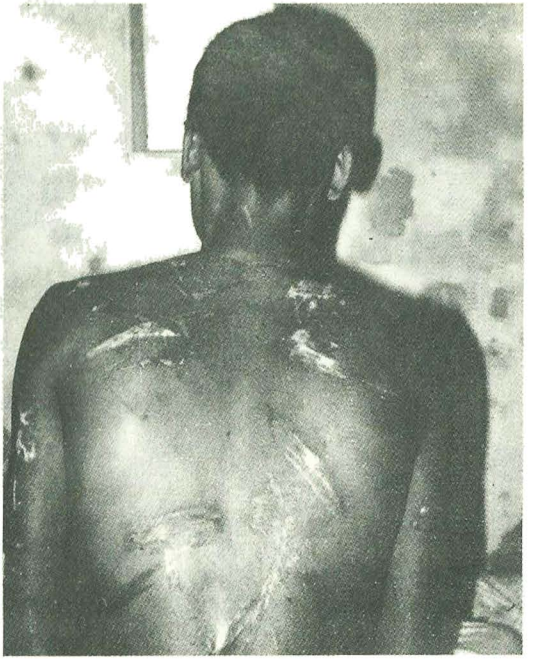

অত্যাচারের অভিনবত্ব।
ফিলিপনগরের রায়হান উদ্দীন।
পাকিস্তানীরা তার পিঠ ছুরি
দিয়ে কেটে কেটে লবন
লাগিয়ে দিয়েছিল

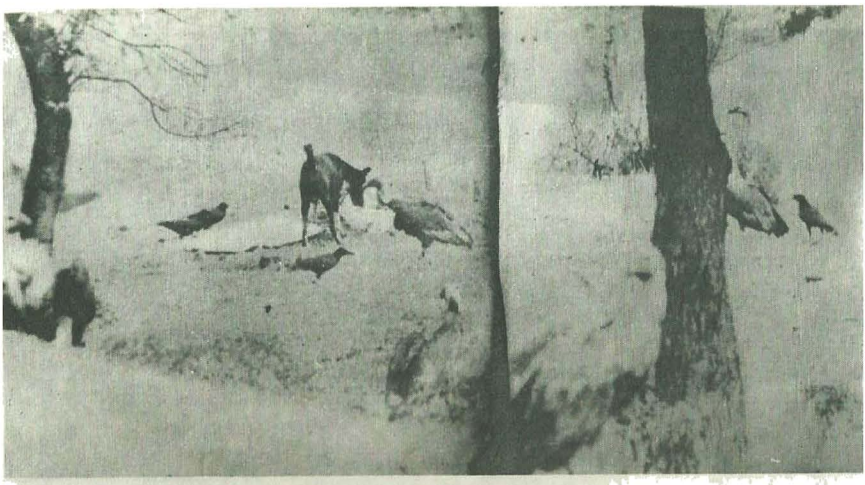

যুদ্ধের নয় মাস লক্ষ লক্ষ বাঙালীর মৃতদেহে লেগেছিলো
শকুনীর ভীড়

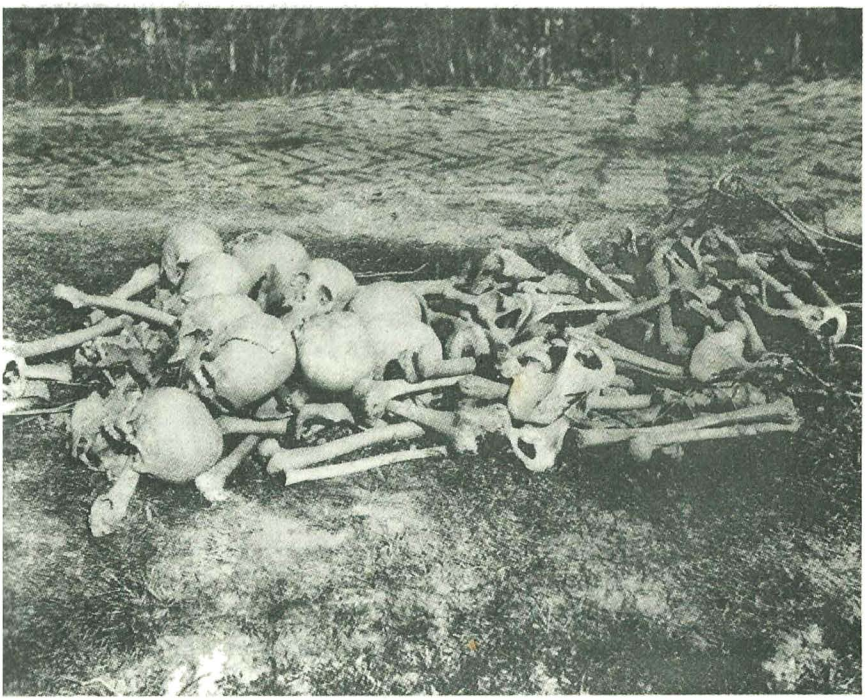

মানুষের জীবন কি শুধুই পরিসংখ্যানের রূপরেখা ?

—শরণার্থীর দল, চলেছে পায়ে হেঁটে

—কেউবা চলেছে গরুর গাড়ীতে

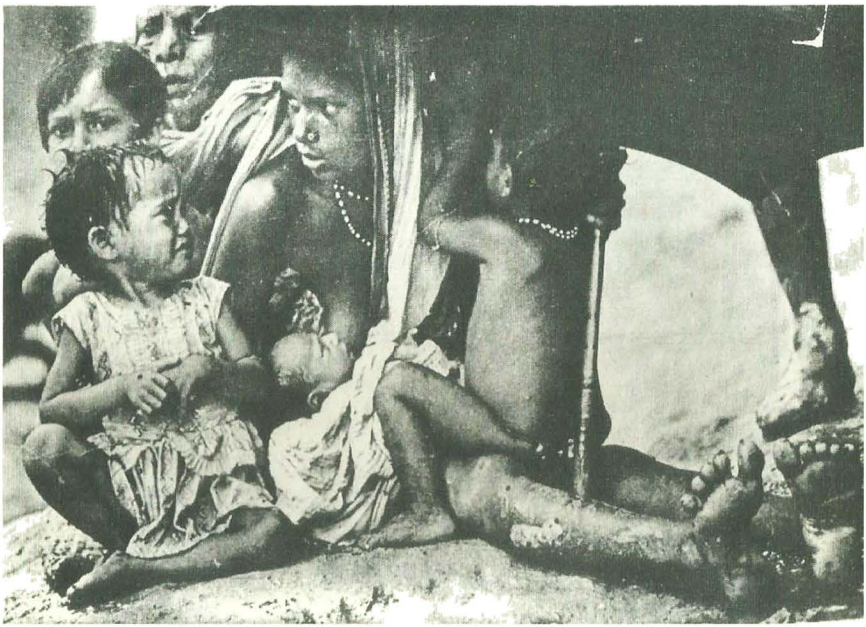

—শরণার্থীরা পাকিস্তানীদের হাত থেকে রক্ষা পেলো

(সৌজন্যে—টাইম ম্যাগাজিন)

—কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলোনা এদের অনেকেই। মৃত্যুপথ যাত্রী এক শরণার্থীকে সযত্নে খাওয়াবার চেষ্টা চালাচ্ছে তার কিশোর নাতি। দুঃসহ যাত্রার শেষে বৃদ্ধা পাকিস্তানী-দের হাত থেকে রক্ষা পেলেও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলনা।

(সৌজন্যে—কিশোর পারেখ)

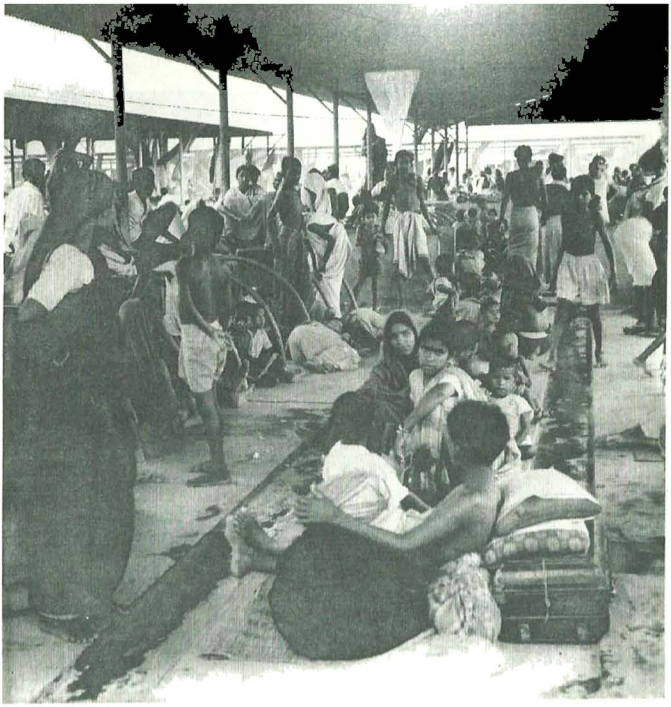

ভারতের বহু স্থানেই ছড়িয়ে পড়লো শরণার্থীরা

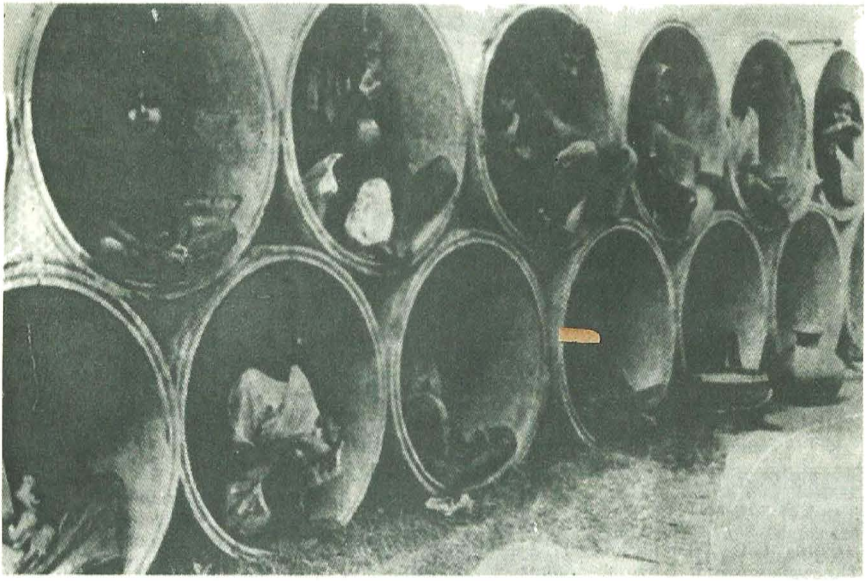

কলকাতা এয়ারপোর্টের কাছে ড্রেনের পাইপে
আশ্রয় নিয়েছে একদল শরণার্থী

(সৌজন্যে—টাইম ম্যাগাজিন)

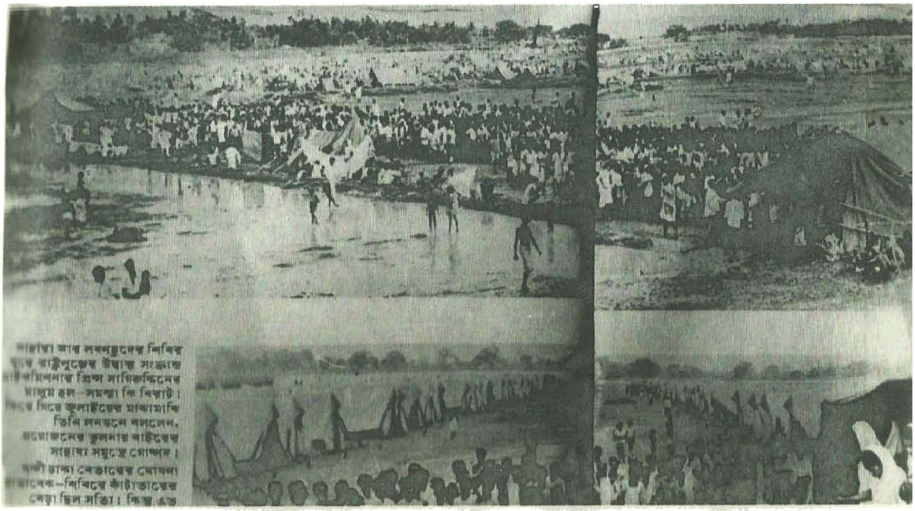

ভারত সরকার এক গভীর সমস্যায় জড়িয়ে পড়লো—
কলকাতায় দমদম এয়ারপোর্টের কাছে এক শরণার্থী ক্যাম্প

অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় ভেঙ্গে পড়া শরণার্থী।
এমনি এক অসহায় শরণার্থী শিশু

(সৌজন্যে—টাইম ম্যাগাজিন)

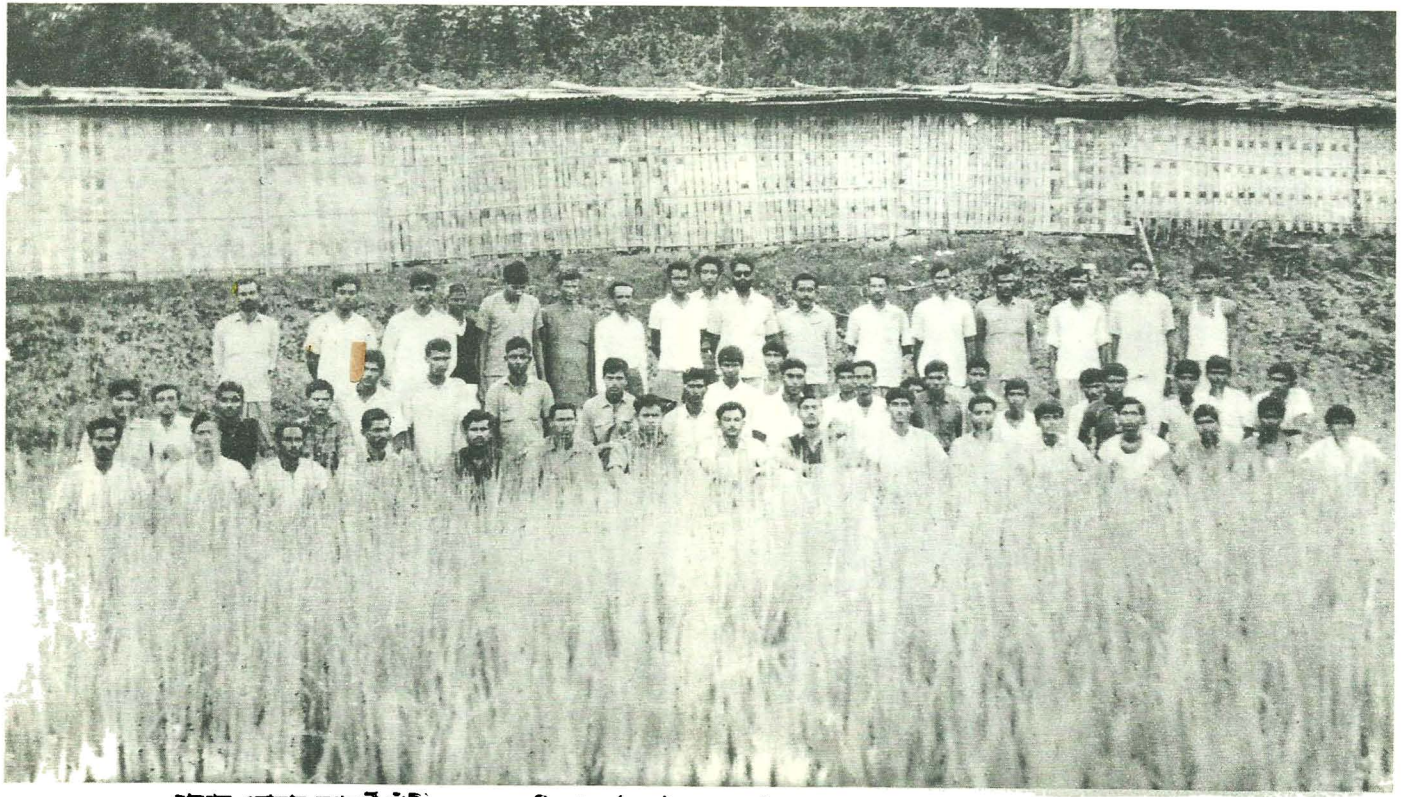

রামগড় এলাকার অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে একদল মুক্তিযোদ্ধা (সেপ্টেম্বর ১৯৭১)

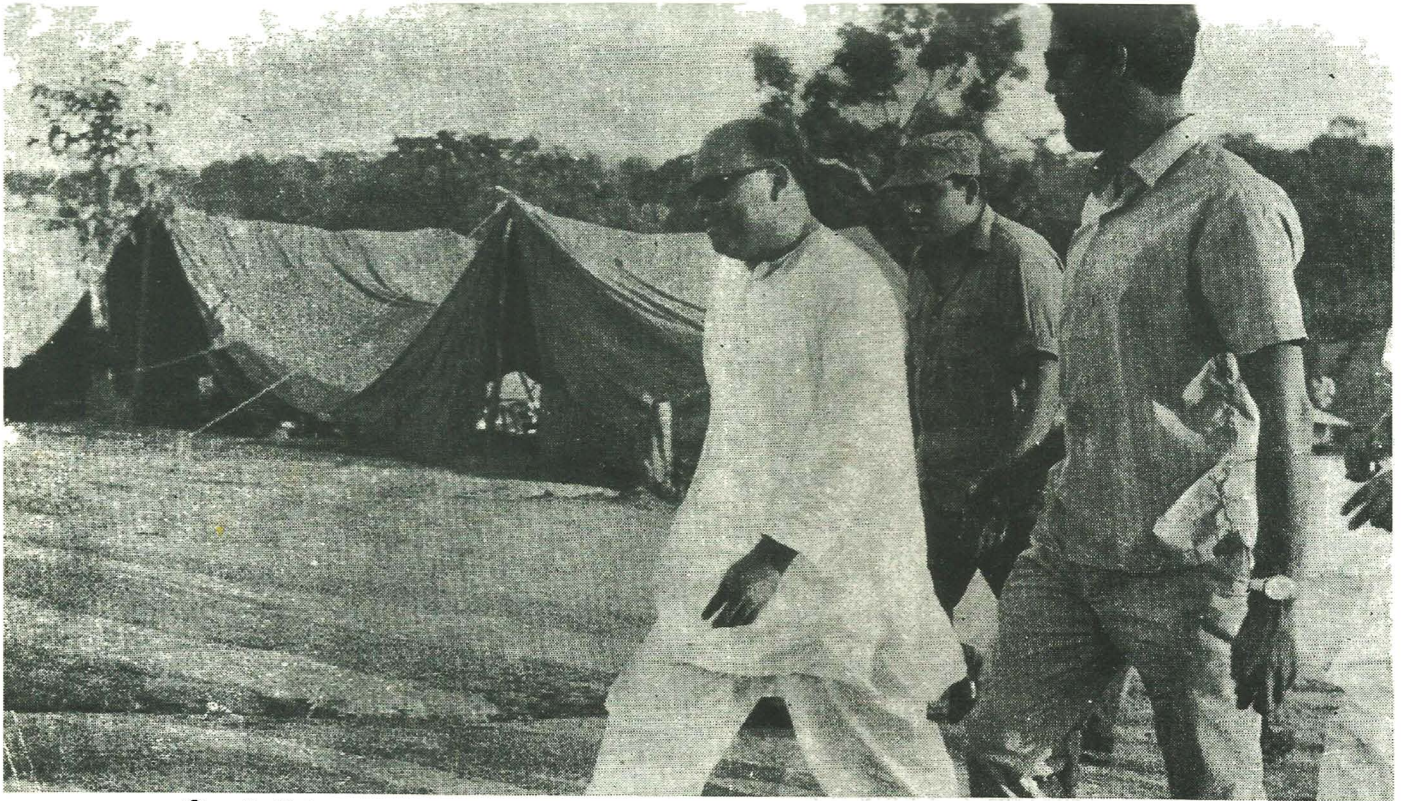

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ফুল সার্ট পরিহিত) হরিণায় এক নম্বর সেক্টর পরিদর্শন করছেন। তাঁর বাঁ পাশে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম (১৪ই অক্টোবর ১৯৭১)

এক ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং চলছে

যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে একদল মুক্তিযোদ্ধাকে ব্রীফিং দেয়া হচ্ছে
(১ নম্বর সেক্টর : অক্টোবর ১৯৭১)

মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধে চলেছে

আহত মুক্তিযোদ্ধা ও সহযোদ্ধারা

টাঙ্গাইলে নামানো হচ্ছে ভারতীয় ছত্রী সেনা (১১ই ডিসেম্বর ১৯৭১)

সম্মুখ সমরে নিহত একজন মুক্তিযোদ্ধা

খুলনা মুক্ত হওয়ার পর উৎফুল্ল জনতা

পাকিস্তানী অফিসাররা আত্মসমর্পণ করছে

ঢাকায় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মৃতদেহ। "তাদের চেনা যাচ্ছিলোনা .হাত পেছনে বাঁধা .চোখ উপড়ে ফেলা. মানুষ পশুকেও এমন নৃশংসভাবে হত্যা করে না। পাকিস্তানীরা এমনি নৃশংসভাবে বাঙালীদের হত্যা করে" (১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১)

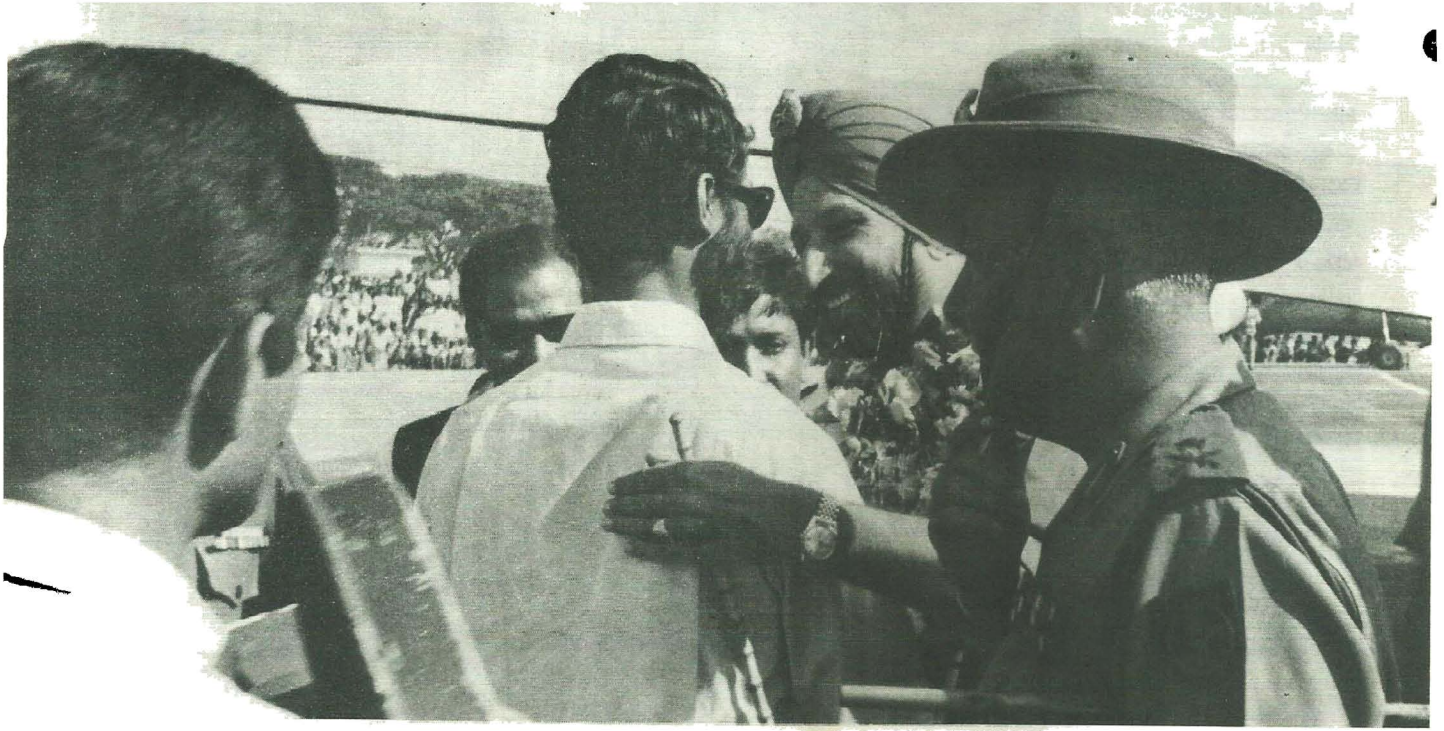

আমাদের মুক্তি বাহিনী তুমুল যুদ্ধের পর বেলুনিয়া এলাকা শত্রুর হাত থেকে দখল করার পর ভারতীয় লেঃ জেনারেল অরোরা (পাগড়ী পরিহিত) এক নং সেক্টর কমাণ্ডার মেজর রফিকুল ইসলামের সাথে কথা বলছেন। পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন ভারতীয় মেজর জেনারেল আর. ডি. হিরা (হ্যাট পরিহিত)। স্থানঃ ফুলগাজী, বেলুনিয়া; নভেম্বর ১৯৭১

মাত্র দশদিনও যুদ্ধ চালাবার সাহস নেই—তারপর বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ। পাকিস্তানীরা যুদ্ধে নয়, একমাত্র অসহায় নিরস্ত্র নরনারী হত্যাতেই পারদর্শী। পাকিস্তানী জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করে দলিলে সই করছেন, আর ভারতীয় জেনারেল অরোরা চেয়ে দেখছেন। (ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ; বিকেল ৪ : ৩০ মিনিট। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল)

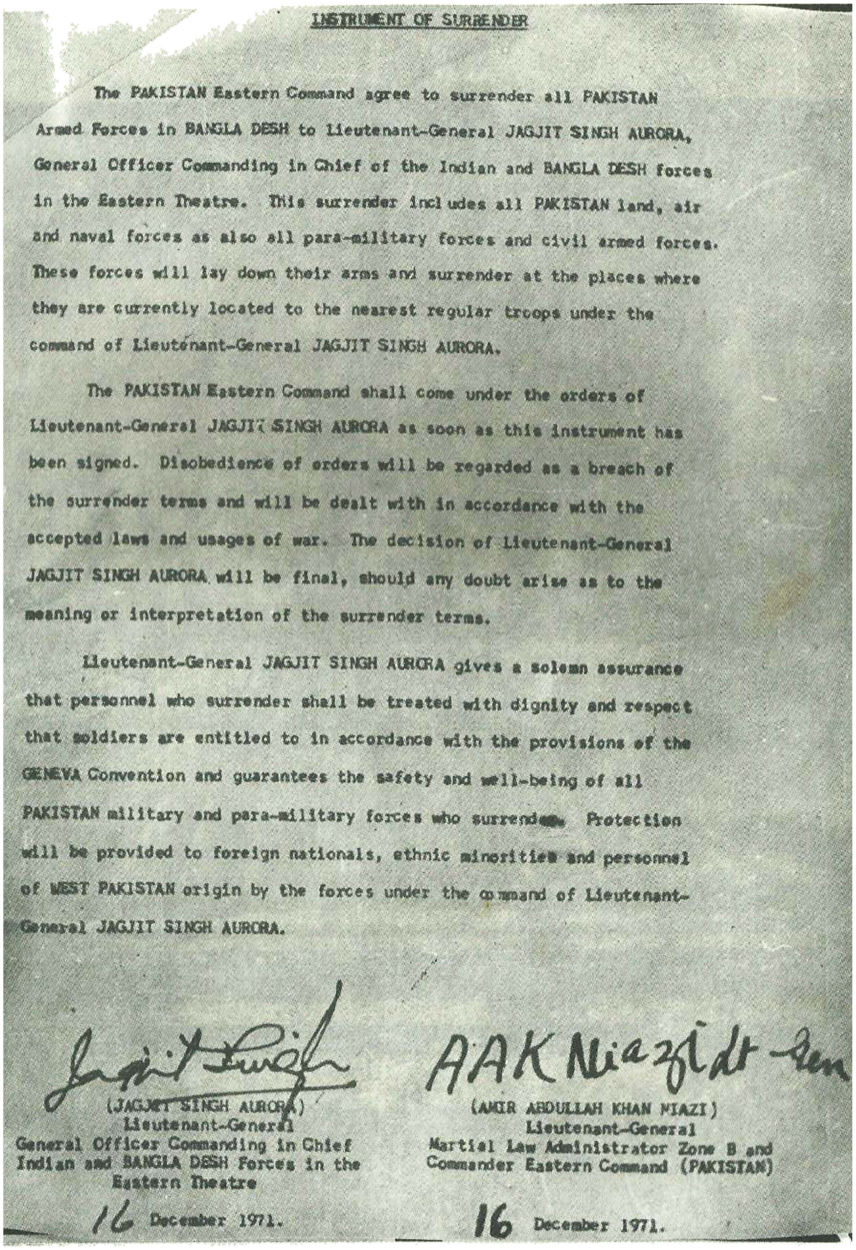

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (PAKISTAN)

16 December 1971.

আত্মসমর্পণের দলিল---লক্ষণীয় যে, এই দলিলেই পাকিস্তানীরা প্রথম বারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে "বাংলাদেশ" শব্দটি ব্যবহার করে

মাত্র দশদিনও যুদ্ধ চালাবার সাহস নেই—তারপর বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ। পাকিস্তানীরা যুদ্ধে নয়, একমাত্র অসহায় নিরস্ত্র নরনারী হত্যাতেই পারদর্শী। পাকিস্তানী জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করে দলিলে সই করছেন, আর ভারতীয় জেনারেল অরোরা চেয়ে দেখছেন। (ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ; বিকেল ৪ : ৩০ মিনিট। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল)

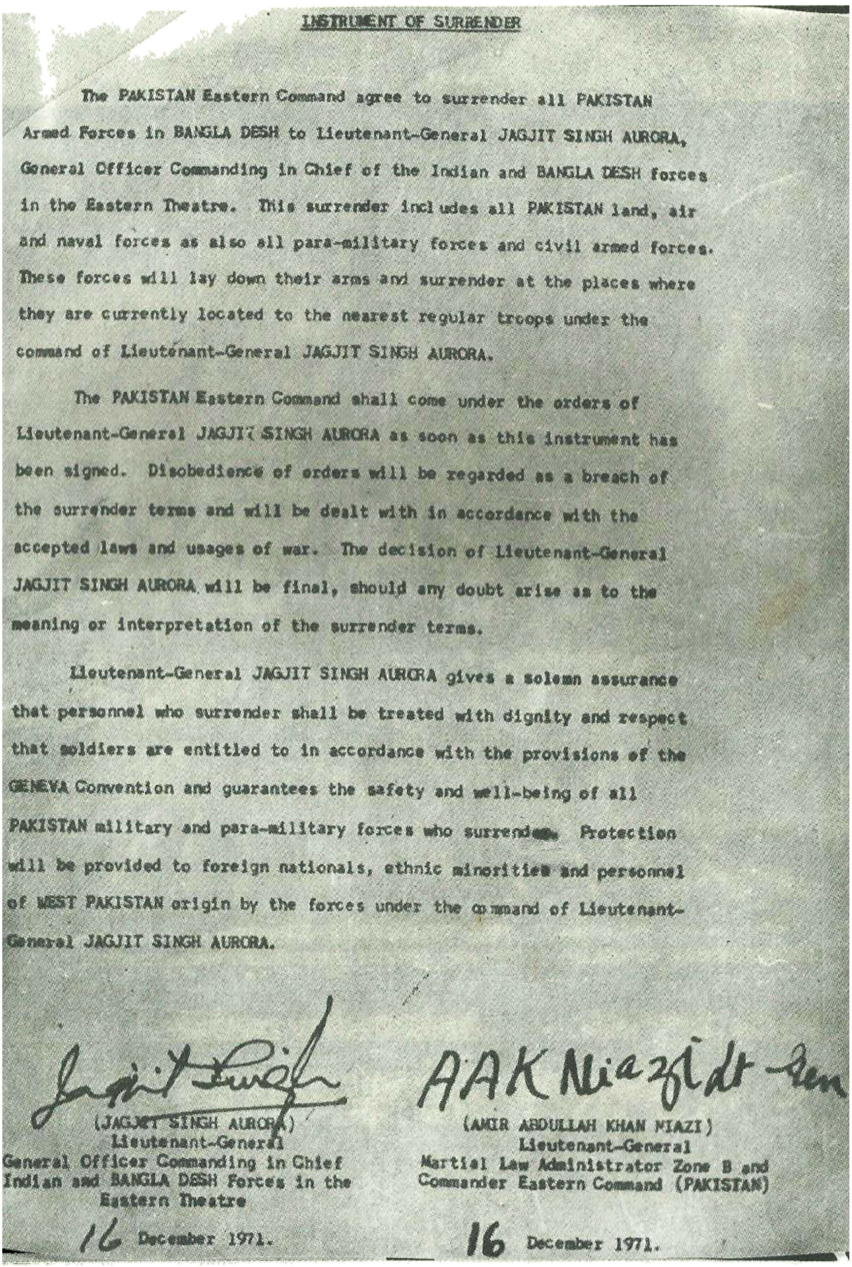

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (PAKISTAN)

16 December 1971.

আত্মসমর্পণের দলিল---লক্ষণীয় যে, এই দলিলেই পাকিস্তানীরা প্রথম বারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে "বাংলাদেশ" শব্দটি ব্যবহার করে

জাতীয় স্মৃতিসৌধ - সাভার, ঢাকা

স্যার,

আজ সকাল কোম্পানীর রেশন নেবার দিন, সকাল এন.সি.ও.কে পাঠালাম। সেদিন যে ছাগল দিতে চলেছিলেন, ৩৪সেরী পাকিস্তানী মৃত ভির অফিসারের জানের সদকা স্বরূপ ছিল — আপনার উপহার, ইত্যাদ। ঐটুকু গত সপ্তাহের দুধে রেশনের দুধে ছানিয়ে সকাল পাতলা হয়ে গেছে, আর এ সপ্তাহের দুধে, সেটি চারটা দিতে চলেছে, ঐটুকু?

দুধে মিলাবিহীন পাঠাতে ইচ্ছা যে কোম্পানীর আপনার কাছে, তা একটু বেশী বোঝে তুলছে যা সকাল চিকিৎসায় অটুরে। হাসপাতালে পাঠাতে হবে মনে হয়।

আজ ঔষধপত্রে দুটো প্লেটলেট রেশন হবে, ভেবে মারে। দয়া করে আপনার পিকে-আপটাকে করে ও সন্ধ্যায় করে ৩৪ লো পাঠিয়ে দেবেন অবশ্যই। রেশন একেবারে শেষ। ডিমগুলোর শেষ কিছু এলে থাকলে দিতে চেষ্টা করবে।

আজি সকালে, কিন্তু একেবারে ঘনোযোগে আছি। পরে সকাল, দোয়া করবেন। সকলকে সব জানাবেন?

শুভেচ্ছান্তে
লেফটেন্যান্ট
(কোম্পানী কমান্ডার)

উপরের চিঠিটি যুদ্ধের সময় আমার অধীনস্ত সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহফুজ আমাকে লিখেছিলো। যদিও মাহফুজ ৪টি দুম্বা চেয়েছিলো, আমি তাকে দিয়েছিলাম ৫টি (প্রতিটি শত্রু অফিসার নিধনের জন্য একটি করে ৩টি এবং সাপ্তাহিক রেশনের জন্য ২টি)। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯৮১ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর খুব ভোরে তাঁর ফাঁসি হয়। সে সময় মাহফুজ লেঃ কর্ণেল পদে উন্নীত হয়েছিলো এবং রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব হিসাবে কাজ করছিলো

My dear Rajsree,

My regards and best wishes to you. Hope you are in good health. I remember you all and is looking forward for meeting you all once again when you meet Sri Ghosh & his office, please convey to them my regards & best wishes.

Any news? Please do keep me informed. You are welcome at my loc. That's for the day. Please do drop a few lines at the earliest.

Thanking

Yours Sincerely,

Jia

হেড কোয়ার্টার, এফ. সেক্টর
২৪ জুলাই, ৭১

প্রিয় রফিক,

তোমার জন্য রইলো অনেক শুভেচ্ছা। আশা করি ভালো আছ। তোমাদের কথা আমার মনে পড়ে। তোমাদের সাথে আবার মিলিত হওয়ার প্রতীক্ষায় রইলাম। লেঃ কর্ণেল ঘোষ এবং তাঁর অফিসারদের আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে দিও।

কোন খবর আছে কি? আমাকে খবরাখবর জানিও। আমার এখানে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের জন্য এখানেই শেষ করছি। যত শীঘ্র সম্ভব অন্ততঃ কয়েক লাইনের হলেও আমাকে একটা চিঠি লিখে দিও।

শুভেচ্ছান্তে—
জিয়া

চিঠিটা যুদ্ধের সময় লেখা মেজর জিয়াউর রহমানের (পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি)—চিঠির একটি

ব্যাংক পুরাতন ঋণ,

আদায় করে নতুন করে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাকে ঋণচক্র বলে। ④ ঋণের পুনর্তফসিল — খেলাপি ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য ঋণের মেয়াদ বাড়ানো, কিস্তির সংখ্যা বাড়ানো বা কিস্তির পরিমাণ কমানো। ⑤ ঋণের পুনঃতফসিল — ঋণের মেয়াদ বাড়ানো, কিস্তির সংখ্যা বাড়ানো বা কিস্তির পরিমাণ কমানো। ⑥ ঋণের পুনর্গঠন — ঋণের মেয়াদ বাড়ানো, কিস্তির সংখ্যা বাড়ানো বা কিস্তির পরিমাণ কমানো এবং সুদের হার কমানো। ⑦ ঋণের মওকুফ — খেলাপি ঋণগ্রহীতার ঋণের সমস্ত বা আংশিক অংশ মওকুফ করে দেওয়া। এটি সবচেয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা। ⑧ ঋণের অবলোপন — যে ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা নেই, সেই ঋণকে ব্যাংকের হিসাব থেকে মুছে ফেলা। ⑨ ঋণের বিক্রয় — খেলাপি ঋণ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দেওয়া। ⑩ ঋণের সুরক্ষা — ঋণ যাতে খেলাপি না হয় সেজন্য আগে থেকে ব্যবস্থা নেওয়া। ⑪ ঋণের তদারকি — ঋণ দেওয়ার পর তা সঠিক খাতে ব্যবহার হচ্ছে কি না তা দেখা। ⑫ ঋণের তাগাদা — কিস্তি পরিশোধের জন্য বারবার মনে করিয়ে দেওয়া।

জাতীয় সঙ্গীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো.....
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে...
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা আমি নয়ন জলে ভাসি॥

লেঃ কর্ণেল খালেদ মোশাররফ
'কে' ফোর্স ও ২নং সেক্টর কমাণ্ডার
(সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)

লেঃ কর্ণেল কে. এম. সফিউল্লাহ
'এস' ফোর্স ও ৩নং সেক্টর কমাণ্ডার
(সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)

লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমান
জেড ফোর্স কমাণ্ডার

ক্যাপ্টেন এম. হায়দার
২নং সেক্টর কমাণ্ডার (ভারপ্রাপ্ত)
(অক্টোবর-ডিসেম্বর)

মেজর এ. এস. এম. নুরুজ্জামান
৩ নং সেক্টর কমাণ্ডার
(অক্টোবর-ডিসেম্বর)

লেঃ কর্ণেল সি. আর. দত্ত
৪নং সেক্টর কমাণ্ডার

লেঃ কর্ণেল কাজী নুরুজ্জামান
৭নং সেক্টর কমাণ্ডার
(সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)

মেজর আবু ওসমান চৌধুরী
৮নং সেক্টর কমাণ্ডার
(আগষ্ট '৭১ পর্যন্ত)

লেঃ কর্ণেল এম. এ. মঞ্জুর
৮নং সেক্টর কমাণ্ডার
(আগষ্ট-ডিসেম্বর '৭১)

'ফোর্স' সমূহ বর্ণানুক্রমিক এবং সেক্টর সমূহ সংখ্যানুসারে সাজানো

একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনানায়কবৃন্দ

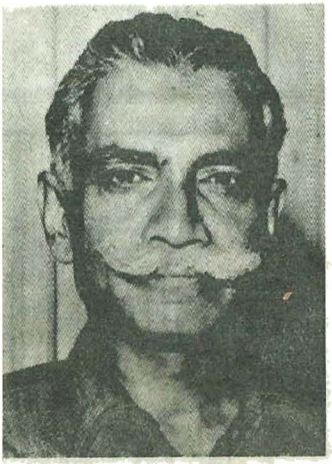

কর্ণেল এম. এ. জি. ওসমানী
সর্বাধিনায়ক

মেজর রফিকুল ইসলাম
১নং সেক্টর কমাণ্ডার

লেঃ কর্ণেল নীর শওকত আলী
৫ নং সেক্টর কমাণ্ডার

উইং কমাণ্ডার এম. কে. বাশার
৬নং সেক্টর কমাণ্ডার

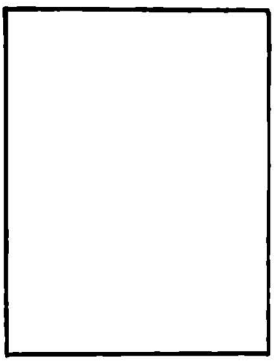

মেজর নজমুল হক
৭ নং সেক্টর কমাণ্ডার
(আগষ্ট'৭১ পর্যন্ত)

মেজর এম. এ. জলিল
৯ নং সেক্টর কমাণ্ডার

লেঃ কর্ণেল এম. এ. তাহের
১১ নং সেক্টর কমাণ্ডার
(নভেম্বর '৭১ পর্যন্ত)

ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট হামীদুল্লাহ্
১১নং সেক্টর কমাণ্ডার
(নভেম্বর-ডিসেম্বর'৭১)

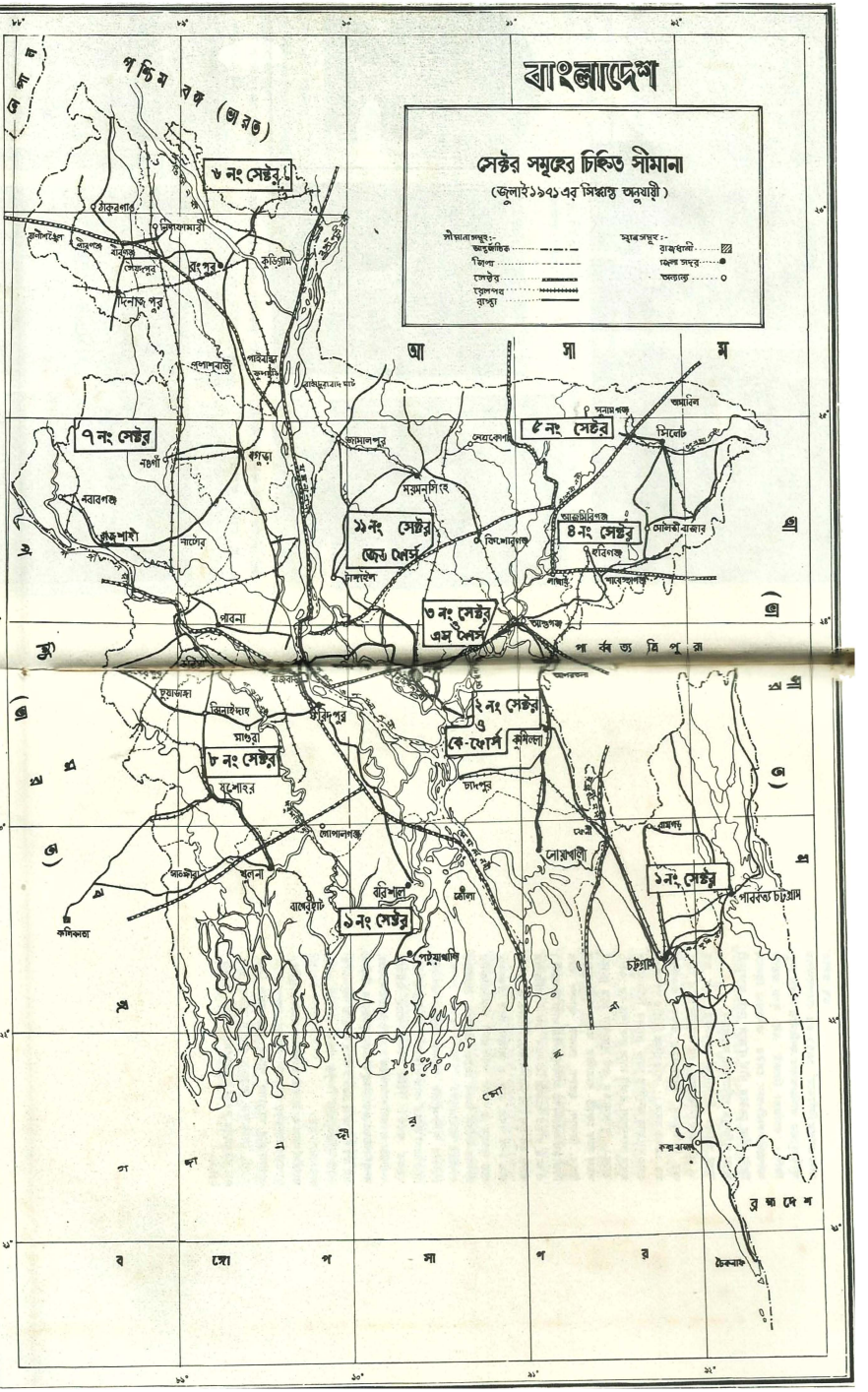
বাংলাদেশ
সেক্টর সমূহের চিহ্নিত সীমানা
(জুলাই ১৯৭১ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)
সীমানা সমূহ :-
আন্তর্জাতিক
জিলা
সেক্টর
রেলপথ
রাস্তা
স্থান সমূহ :-
রাজধানী
জেলা সদর
অন্যান্য
পশ্চিম বঙ্গ (ভারত)
৬ নং সেক্টর
৭ নং সেক্টর
৫ নং সেক্টর
১১ নং সেক্টর
জেড ফোর্স
৪ নং সেক্টর
৩ নং সেক্টর
এস ফোর্স
২ নং সেক্টর
ও
কে-ফোর্স
৮ নং সেক্টর
১ নং সেক্টর
আ সা ম
ত্রি পু রা
ব ঙ্গো প সা গ র
ব্রহ্মদেশ

'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনীর বিশ্বস্ত অনুলিপি। রচয়িতা নিজেই এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী-১নং সেক্টর কমান্ডার হিসাবে তিনি তাঁর সেক্টরে দীর্ঘ ন'মাস সেই রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।

'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' লেখকের মূল গ্রন্থ 'এ টেল অব মিলিয়নস্'-এর অনুবাদ। 'এ টেল অব মিলিয়নস্' ইংরেজীতে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ এবং বাংলায় অনুদিত 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে'র প্রথম সংস্করণ একই সাথে প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। মুক্তিযুদ্ধের এই মূল্যবান গ্রন্থে রয়েছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের উদ্ভব, বিকাশ, হতাশা, বেদনা, আনন্দ আর বিজয়ের সত্যনিষ্ঠ অবিস্মরণীয় ধারা বিবরনী। এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে একটি শান্তিপ্রিয় জাতি যুগ যুগ ধরে নিষ্পেষিত, শোষিত ও বঞ্চিত হয়ে শেষ পর্যন্ত এক ও অভিন্ন রূপে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নৃশংস ও বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ইস্পাত-কঠিন বন্ধন থেকে ছিনিয়ে এনেছিল প্রাণপ্রিয় 'স্বাধীনতা'।

গ্রন্থকার মুক্তিযুদ্ধের অনেক অজানা অস্পষ্ট দিকগুলো ভাস্বর করে তুলেছেন, নির্ভয়ে-জাতির বৃহত্তর স্বার্থে। তিনি বর্ণনার সাথে ঘটনার যথার্থতা ও সত্যতা সম্পর্কেও অতি সচেতন বলে বস্তুনিষ্ঠতা এবং নির্ভুলতার মূল্যায়নে উত্তীর্ণ এই গ্রন্থ। তাই ১৯৮১ সালে জাতীয় সংসদেও বইটি মুক্তিযুদ্ধের বিশ্বস্ত দলিল হিসাবে বহুল আলোচিত হয়।

সংকীর্ণ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রয়াসে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস বিকৃত, অস্পষ্ট ও ঝাপসা হয়ে যাওয়ার পূর্বেই মুক্তিযুদ্ধের এক অগ্রণী সৈনিকের সচেতন প্রয়াসে রচিত এই গ্রন্থ আমাদের মহান মুক্তিসংগ্রামের এক বিশ্বস্ত দলিল।

লেখক পরিচিতি

জনাব রফিকুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অধ্যয়ন করেন এবং ১৯৬২ সালে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে জনাব রফিকুল ইসলাম ইউ. পি. পি. সংবাদ সংস্থায় সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন।
১৯৬৩ সালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং আর্মি ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে কমিশন লাভ করেন। পরে তিনি আর্টিলারী কোরে যোগ দেন।

১৯৭০ সনের প্রারম্ভে তিনি ডেপুটেশনে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্-এর চট্টগ্রামস্থ হেড কোয়ার্টারে অ্যাডজুটেন্ট হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেন।

মুক্তিযুদ্ধে তিনি বাংলাদেশ বাহিনীর ১নং সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাহসিকতা এবং বীরত্বের জন্য তিনি জীবিত সামরিক ব্যক্তিবর্গের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব "বীর উত্তম"-উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯৭২ সালের ২৯শে এপ্রিলে তাঁকে সামরিক চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক "দি পিপলস্ ডিউ" এর সহযোগী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন।

পরবর্তীকালে রফিকুল ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রের হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ঢাকা ওয়াসার চেয়ারম্যান এবং বর্তমানে বাংলাদেশ হ্যাণ্ডলুম বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে কর্মরত।
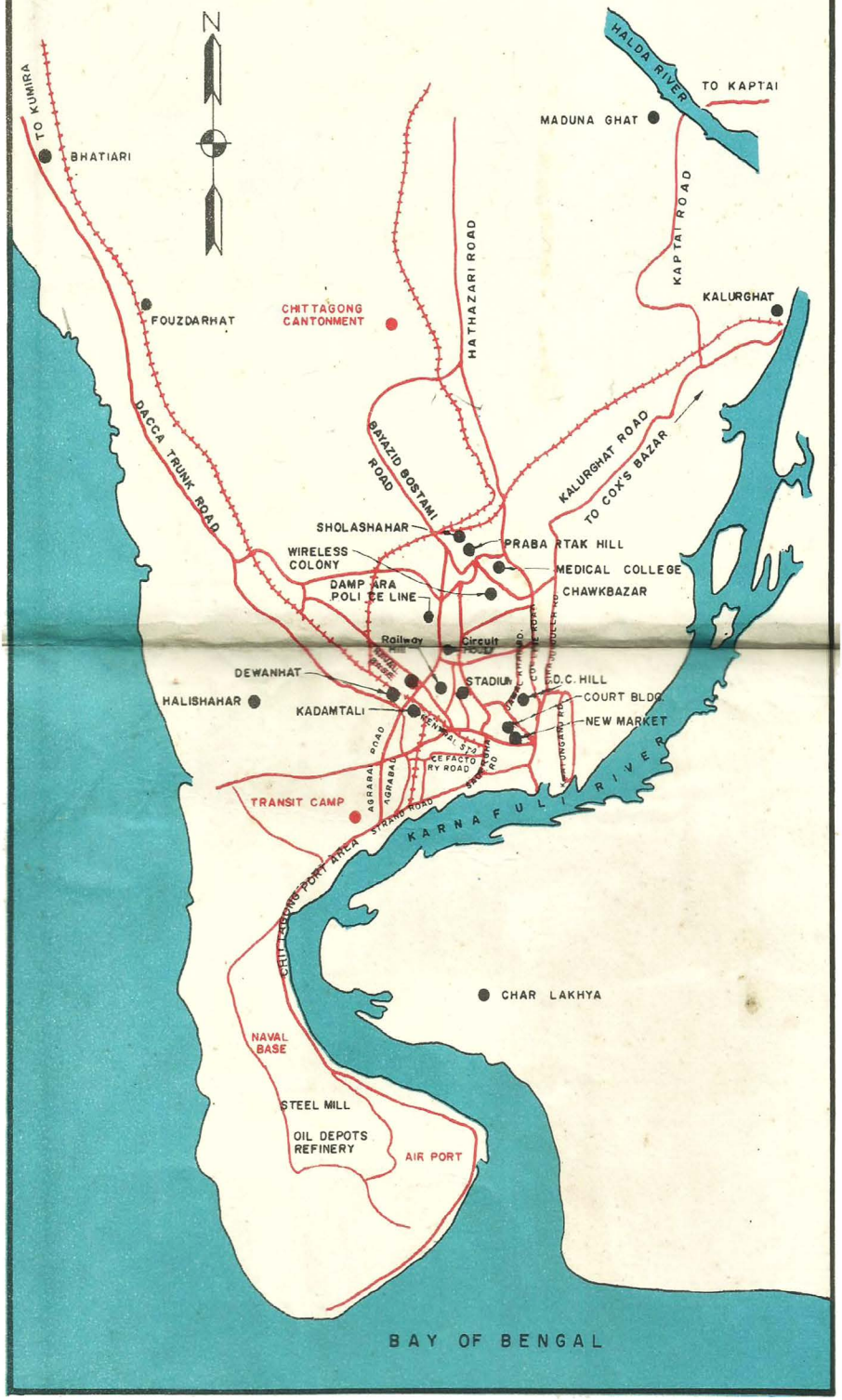
CHITTAGONG CITY AND OUT SKIRTS